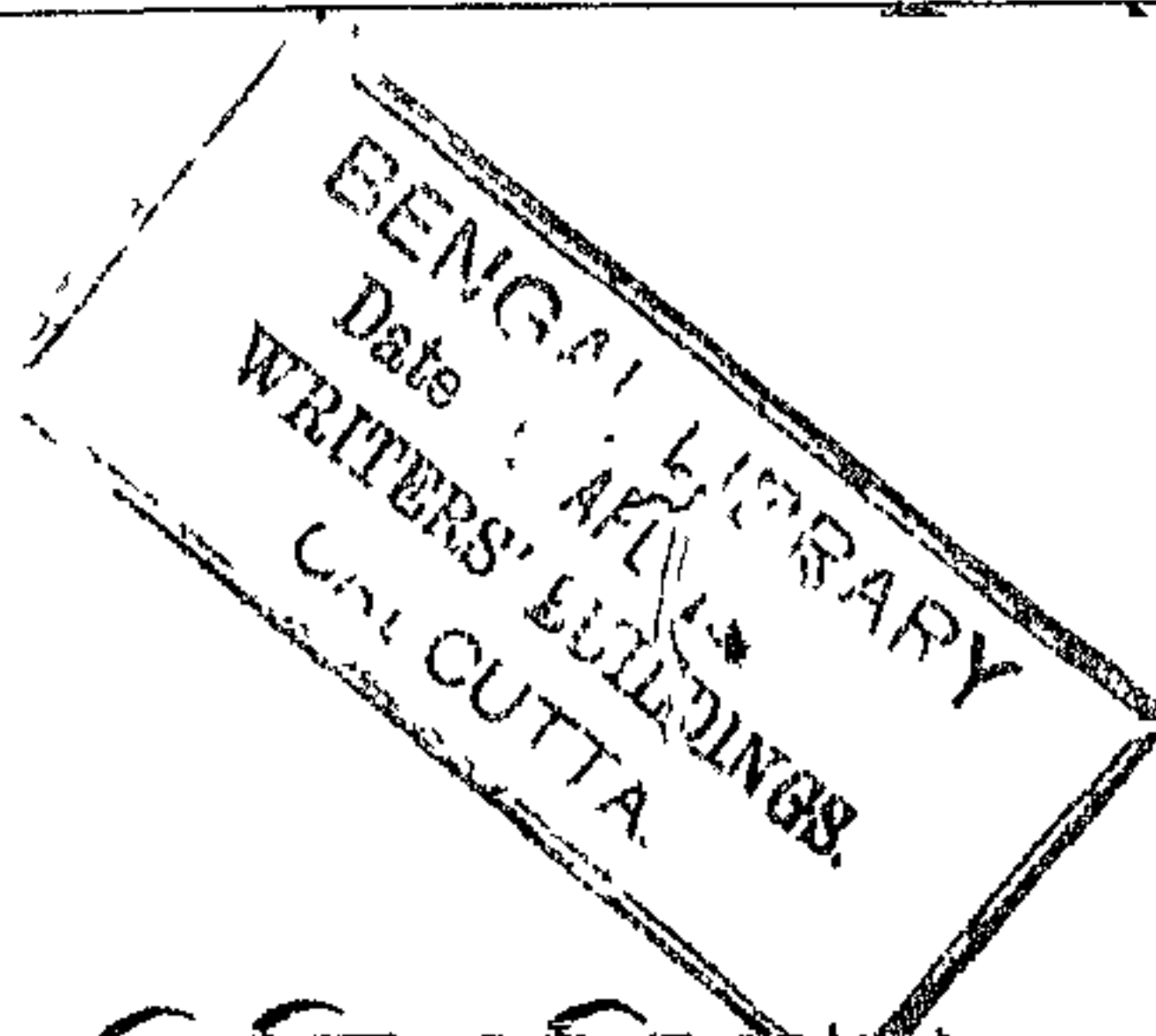


SCHOOL METHOD

(IN BENGALI)



বিবিধ বিষয়

By RAI BAHADUR AGHOR NATH ADHIKARI

F. R. A. I. (London).

FORMERLY SUPERINTENDENT, NORMAL SCHOOL

SILCHAR.



শিলচর নৰ্মাল স্কুল—আদৰ্শ বিদ্যালয় গৃহ ।

বিদ্যালয়-বিধায়ক

বিবিধ বিধান

বালকবালিকার

অধ্যাপক ও অভিভাবকের
সাহায্যার্থ

রায়বাহাদুর শ্রী অঘোরনাথ অধিকারী
প্রণীত

ষষ্ঠ সংস্করণ

ডক্টর এণ্ড সন্
কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪]

[মূল্য দুই টাকা ।

স্বায়ং বাহ্যিক কৃত অন্যান্য পুস্তক।

• পদার্থ পরিচয় (Object Lessons)

এ বিষয়ে একপাশ শিক্ষাপ্রদ পুস্তক আর নাই। (প্রবাসী)

বায়ামের ব্যবস্থা (Physical Exercise)

ড্রিল, কমনত, ডামবেল, জিমনাস্টিক, ফুটবল,
ক্রিকেট (যন্ত্রসহ)

• করকার্য (Hand Work)

চিত্রাঙ্কণ, মৃন্মূর্তি গঠন, উত্তান রচনা, কাগজ কাটা,
চাটাই ও চুবড়ী বুনন, কাঠি সাজান, কাঠের কাজ প্রভৃতি
(পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে)

মূল্য প্রত্যেক ২/- ভিঃ পিঃ ২।০।

কলিকাতা, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য এণ্ড সন।

কলিকাতা

৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য এণ্ড সন এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রকাশিত।

১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণপ্রসে,

শ্রীকরণাময় আচার্য দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র

যিনি কুলে শীলে, বিদ্যাতে বুদ্ধিতে, ধর্মে কন্ঠে, রাগে গুণে,
শিক্ষা-বিভাগে আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন,
বাঁহার স্নেহে সম্ভাষণে, স্মৃষ্টি বচনে ঐ স্নমধুর অধ্যাপনায়
শিষ্যমণ্ডলী বিগলিত হইয়া যাইতেন,
বাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, তেজস্বিতা ও সাধুতা দর্শনে
বন্ধু বান্ধব বিস্ময়াবিত হইয়া থাকিতেন,
বাঁহার সহৃদয়তা, স্বজনপ্রীতি, সহানুভূতি ও দয়াদাক্ষিণ্য
দরিদ্রে আত্মীয়গণের জীবনস্বরূপ ছিল,
বাঁহার জীবন্ত পরার্থপরতা, জলন্ত ধর্মবিশ্বাস ও অটল সত্যনিষ্ঠা
মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল,
সেই চিরশুদ্ধ, চিরপ্রশান্ত, চিরব্রহ্মচারী, পুণ্য-লোক বাসী
চন্দ্রমোহন মজুমদার এম, এ, বি এল,
(প্রেসিডেন্সী বিভাগের ভূতপূর্ব স্কল-ইন্সপেক্টার)
মহাশয়ের পবিত্র নামে
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ
উৎসর্গীকৃত হইল ।

বিদ্যাসাধন ।

ধাতং চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ ।

প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে পড়িবে ও পড়াইবে ।

সত্যং চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ ।

সত্যপথে থাকিয়া পড়িবে ও পড়াইবে ।

তপশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ ।

মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া পড়িবে ও পড়াইবে ।

দমশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ ।

ইন্দ্রিয়াদি নিরোধ করতঃ পড়িবে ও পড়াইবে ।

শমশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ ।

অতি প্রশান্তমনে পড়িবে ও পড়াইবে ।

মানুষঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ ।

মনুষ্যোচিত আচার রক্ষা করিয়া পড়িবে ও পড়াইবে ।

(তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)



এস্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য—কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের অধ্যাপক এসিষ্ট্যান্ট হেডমাষ্টার বাবু শশধর সেন একবার লিখিয়াছিলেন :—“* * * পান্নালাল বলিল তুমি যদি একখানি শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক পুস্তক লেখ তবে বেশ হয়। কারসিয়ং যেরূপ বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে আরও অনেকে তোমার নামই করিয়াছেন। আমাবও সেই মত। তোমার নোটগুলি আমি দেখিয়াছি; অন্ততঃ এই নোটগুলি ছাপাইলেও অনেক উপকার হইবে। তুমি নিজে না ছাপ, আমাকে সমস্ত পাঠাইয়া দিও, আমি ছাপিতে চেষ্টা করিব। ‘একখানি’ বাঙ্গালা পুস্তকের বড়ই অভাব বোধ হইতেছে। অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রগণকে সমস্ত শিখাইয়া দেওয়াও যায় না আব লেখাইয়া দেওয়াও যায় না। * * *”—শশধর সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিল। আমার সমস্ত নোট শশধরকে দিয়াছিলাম। তাহার হাতে এই কার্য নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হইত। কিন্তু শশধরের অকাল মৃত্যুতে সমস্ত কল্পনা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পাবনা জজ কোর্টের একজন প্রতিভাশালী উকিল (পুত্রের প্রমোশন উপলক্ষে) লিখিয়াছিলেন—“* * * তুমি বলিয়াছিলে যে কেবল একখান সাহিত্য পুস্তক কিনিয়া দিলেই চলিবে, অন্যান্য বিষয় শিক্ষকগণ মুখে মুখে শিখাইয়া দিবেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি এক বুড়ি পুস্তকেও কুলাই না। এই আমার ছেলের পুস্তকের ফর্দ :—সাহিত্য-কুসুম, পঞ্চমালা, ব্যাকরণশিক্ষা, ভারতের সরল ইতিহাস, গীর্জা ভূগোল, প্রাথমিক জ্যামিতি, শিশু পরিমিতি, খাদ্যের পাটীগণিত, অমূকের ড্রইং, ম্যাকমিলানের বিজ্ঞানপাঠ, দলিল লিখন, জমিদারী মহাজনী, জরিপ শিক্ষা, বাঙ্গালা কাপিবুক, সাহিত্য কুসুমের অর্থ, পঞ্চমালার অর্থ, ইতিহাসের প্রমোত্তর, বিজ্ঞানপাঠের প্রমোত্তর, বস্তু উপলক্ষে পাঠ, আরও যেন দুচারখানি কি মনে নাই; সর্বসমেত দুই ডজনের বেশী বই কম নহে। এই ফর্দ দেখিয়া

বেশ বুঝিতেছি যে তোমাদিগের এই নূতন প্রণালীর মর্ম অনেক শিক্ষকও বুঝিতে পারেন নাই। তুমি আমাকে যে যে পুস্তক পড়িতে বলিয়াছিলে, তাহার কিছু কিছু পড়িয়াছি কিন্তু পুস্তকগুলি খুব বড় বলিয়া শেষ করিতে পারি নাই। এমন একখানি পুস্তক পাওয়া যায় বাহাতে সকল কথাই অল্প সাজায় থাকে, তাহা হইলে তোমাদিগের সুবিধা হয়। বিশেষ বাড়ীর মেয়েদের জন্য একখানি বাঙ্গালী পুস্তক মুদ্রিত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। তোমার খাতাপত্রগুলি কি বস্তাবন্দী করিয়া রাখিবে, না তাহার কোন সদগতি করিবে? দর্শনের উপকার হউক না হউক, তোমার অনেক বন্ধুবান্ধবের উপকার হইত। * * *—পত্র লেখককে আমি H. Spencer's Education, Garlick's New Manual of Method, Garlick and Dexter's Psychology in the School Room, Murche's Object Lessons for Infants, Murche's Object Lessons in Science and Geography, Wiebe's Paradise of childhood এবং Cowham's School Organization পড়িতে বলিয়াছিলাম। ইংরাজী অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও অভিভাবকগণকেও আমি এই কয়েকখানি পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করি। [আমার অপর একটি বন্ধু এই ফর্দকে Allopathic prescription বলিয়া উপহাস করেন ও আমাকে একটা Homeopathic prescription করিতে বলেন। আমি তাহাকে Joyce's Hand Book of School Management ও Mrs. Brander's Kindergarten Teaching in India (Macmillan) পড়িতে দিয়াছিলাম।]

বর্তমান হইতে আমার সুপরিচিতা একজন সম্রাস্ত মহিলা এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—
 “* * * পুস্তকশ্রীর শিক্ষা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। Private tutor নিযুক্ত করিয়াছি। বটে কিন্তু তাহাতে কার্যের সুবিধা হইতেছে না, কারণ ইহারা art of teaching জানেন না। আমি নিজে ইংরাজী ভাল বুঝিতে পারি না বলিয়া ইংরাজী পুস্তক পড়িতে পারিতেছি না। * * * আপনারা বক্তৃতায় বলেন যে এদেশের মাতারা সন্তানশিক্ষায় অশক্ত কিন্তু তাহাদিগের সাহায্যার্থ আপনারা কিছুই করিতেছেন না। * * * এতি বৎসব দামোদরের বস্ত্রার স্থায় দেশ নাটক নভেলে প্রদর্শিত হইতেছে কিন্তু শিক্ষাদানের প্রণালী ত কেহই লিখিতেছেন না। ইংরাজীতে নাকি এই বিষয়ে দশ হাজারের অধিক পুস্তক আছে। কিন্তু তোমাদিগের দেশে দশখানাও হইল না। শ্রীমতী—লিখিয়াছিল আপনি নাকি এতদিন পরে একখানি পুস্তক প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনার ইচ্ছা

কার্যে পরিণত হইলে আমাদিগের অভাব দূর হইবে মনে হয়। * * *—মনে করিয়াছিলাম যে এই অভাব দূর করিতে কোন মহারথী অগ্রসর হইবেন। কিন্তু কাহাকেও না দেখিয়া নিজেই অগ্রসর হইলাম। ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে। “যে কার্যে দেবতারা প্রবেশ কবিত্তে শঙ্কায়িত হন, বাতুলেরা সে কার্যে অনায়াসে প্রবেশ করে।”

ছাত্রগণ কার্যস্থলে গিয়া নানা বিষয়ের পদ্ধতির^১ জ্ঞান পত্র লিখিয়া থাকেন। এই সকল পত্রের উত্তরে এক একটা প্রবন্ধ লিখিতে হয়। শিক্ষকগণের মধ্যেও অনেকে (অবশ্য যাহারা পরিচিত) নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন—তন্মধ্যে relief-map প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিষয়ক প্রশ্নই অধিক। সময় সময় ভিন্ন প্রদেশ হইতেও পত্র পাইয়া থাকি :—“No. 787. From K. B. Williamson Esqr. M. A, Inspector of Schools, Jubblepur Division. To Mr Aghornath Adhikari, Superintendent, Training School, Silchar. Dated Jubblepur, the 15th February, 1907. Sir, I shall be much obliged if you will be good enough to write a short account (of about one page foolscap or as long as may be necessary) of your methods of preparing relief maps and globes (giving practical details and some idea of cost) which you kindly described to us at the Educational Conference at Jubblepur. I have &c.”—এই প্রস্তরের দ্বারা আমার ছাত্রগণের উপকার হইবে বিশ্বাসে ইহার প্রচার। বন্ধুবান্ধবের কিঞ্চিৎ উপকার হইলে কৃতার্থ হইব।

এই আমার কথা। এখন এই পুস্তক সাধারণের প্রীতিকর না হইলে আমি বিশেষ দুঃখিত হইব না। কারণ আমি সাধারণের মনস্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহার রচনা করি নাই। সাধারণের মনস্তি কল্পা আমার সাধ্যাতীত ও অশীতীত।

গ্রন্থ প্রচারে অধিকার^২ তবে কেহ অধিকার সহজে প্রদান করিতে পারেন। তাহারও নজীর আছে। সর্বপ্রথমে অক্ষয়কুমার দত্ত “ধর্মসীতি” গ্রন্থে শিক্ষাসংক্রান্ত কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। শিক্ষাদান বিষয়ে এই প্রথম লেখা। তারপর ভূদেব সুখোপাধ্যায় “শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব” নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই প্রথম পুস্তক। তৎপর গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় “শিক্ষা-প্রণালী” নামক দ্বিতীয় গ্রন্থ রচনা করেন, সেই গ্রন্থ বহুকাল পর্যন্ত নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সর্বদা পাঠ করিয়াছে।

ইহার পর দীননাথ সেন “শিক্ষাদান-প্রণালী” নামে একখান পুস্তক প্রকাশ করেন। এ সকল ছাড়া আর যে দু'চারখানি শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যদুনাথ রায় লিখিত “শিক্ষা বিচার” গ্রন্থে (H. Spencer's Education নামক গ্রন্থ অবলম্বনে) সাধারণের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার, ভূদেব, গোপালচন্দ্র ও দীননাথ এককালে নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। আগিও নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (বেঙুও চতুষ্পদ), সুতরাং শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ প্রচারে আগারও অধিকার আছে। আর বিশেষ কথা এই, যাহারা শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যাপ্ত আছেন, তাহারা ভিন্ন এ শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিবেন কি? তবে যোগ্যতার কথা—তা কি করিব?—যখন যোগ্যতার কেহই মনোযোগ করিলেন না, তখন নিজকেই অগ্রসর হইতে হইল। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি এ শ্রেণীর পুস্তকের বড়ই অভাব।

গ্রন্থের ভাষা—অনেকগুলি নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। সেগুলি যে সমস্তই ভাল হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ও পণ্ডিত রামেন্দ্র সূন্দর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইলে এই পুস্তকের বৈজ্ঞানিক শব্দাদি পরিবর্তন করা যাইবে। তবে আমি কি প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, তাহা বলা আবশ্যক। একটী দৃষ্টান্ত দিলেই চলিবে। ‘তাপমান’ কথা ব্যবহার করিয়াছি—‘উষ্ণতামান’ কথা ব্যবহার করি নাই। তবে অনেক স্থলেই ‘থার্মমিটার’ কথা লিখিয়াছি। বাড়ীর মেয়েরাও বলিয়া থাকেন “থার্মমিটার আন, জ্বর কয় ডিগ্রি দেখি”। কাহাকেও “তাপমান (বা উষ্ণতামান) আন, জ্বর কত তাপাংশ দেখিব”—বলিতে শুনি না। ইংরাজ প্রদত্ত দ্রব্যগুলির ইংরাজী নাম রক্ষাই বৃত্তিসম্মত—দ্রব্যবাচক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ চলিবে না। রেলওয়ে, টিমার, টেলিগ্রাফ, স্কুল, বেঞ্চ, বোর্ড প্রভৃতি কথার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ চলিল না। তারপর action song এর প্রতিশব্দে ‘ভঙ্গী সঙ্গীত’ লিখিয়াছি, কারণ এখানে action অর্থ gesture, ‘কর্ম্ম’ নয়। Notes of Lessons এর স্থানে ‘পাঠনার নোট’ লিখিয়াছি, কারণ এখানে Lessons মানে ‘পাঠ’ নহে ও Note মানেও ‘টিকা’ নয়। তবে Note কথার একটা প্রতিশব্দ করা যাইতে পারিত, কিন্তু চলিবে না ভয়ে, করি নাই। Object Lessons এর প্রতিশব্দ ‘পদার্থ পরিচয়’ করিয়াছি। রায় রামকৃষ্ণ সাখ্যাল মুহাছরও এই কথাই ব্যবহার করিয়াছেন। বাঙ্গালায় অনেক রঙের নাম প্রচলিত আছে। কিন্তু কোন নামের দ্বারা কোন রঙ বুঝায়, তাহার পরিচয় করাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। এই জন্য একটা রঙ পরিচায়ক চিত্রের (১৮৩ পৃঃ) রচনা করিয়াছি; ইত্যাদি।

এই নোটগুলি ছাত্রগণের জন্য লিখিত বলিয়া ইহাতে অনেক স্থলেই 'তুমি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর এক কথা—শিক্ষকতা কার্যে অশ্রু যেরূপ গুণ থাকুক না কেন, একটা বিশেষ দোষ এই যে, ক্রমাগত ছাত্রগণকে উপদেশ দিতে দিতে আর ক্রমাগত তাহাদিগের ভুল ধরিতে ধরিতে, অজ্ঞাতসারে নিজকে কেমন যেন একটা দান্তিকতার ভাবে অধিকার করিয়া বসে। যদি কেহ ভাষায় কি ভাবে সেরূপ কোন দোষ পান, তবে 'বাঁধসায়ের দোষ' বিবেচনায় ক্ষমা করিবেন। এক শিক্ষক জাতি মাত্রেই ত "সবজাস্তা" আশি আবার তাহার উপরও এক ডিগ্রি ছুলিয়া গিয়াছি—কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা রচনা করিয়াছি। ভঙ্গী সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত দিতে হইল—কি করিব? তবে দৃষ্টান্ত কবিতার, কবিত্বের নয়।

মধ্যে মধ্যে সাগাশ্রু দুই একটা ভুলভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে—কোথাও বিষয়গত, কোথাও ভাষাগত, কোথাও মুদ্রাক্ষনগত। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। আর যেরূপ আগ্রহ সহকারে পুস্তক পাঠ করিলে পাঠকের চোখে ভুলভ্রান্তি পড়িতে পারে এ গ্রন্থের অদৃষ্টে সেরূপ পাঠক জুটিবে না—সুতরাং ভুল চোখে পড়িবে বলিয়া তেমন আশঙ্কা নাই।

কৃতজ্ঞতা—অনেক স্থলে ইংরাজী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ছ'চার খানি বাঙালী পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি। এই নোটগুলি কোন দিন মুদ্রিত হইবে বলিয়া মনে করি নাই। সেই জন্য কোন স্থলে কোন পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি, তাহা লিখিয়া রাখি নাই। এখন ঠিক করা অসম্ভব। কাজেই নাম উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

এই পুস্তক প্রকাশে আমার প্রিয় ছাত্রগণ বিশেষ উত্থোগী। তাহারাই সমস্ত সুগ্রহ করিয়াছে, তাহারাই সমস্ত নকল করিয়াছে আর তাহারাই সমস্ত প্রফ দেখিয়াছে।

তারপর আমার ঘেহভাজন ছাত্র ও আত্মীয়, কলিকাতা মাধ্যমিক কোম্পানীর অশ্রুতম অধ্যক্ষ শ্রীমান বিজয়কুমার মৈত্র, এই পুস্তকের মুদ্রাক্ষন ভার গ্রহণ না করিলে, ইহা চিরদিন বস্তাবন্দী হইয়া থাকিত। ইতি

শিলচর নর্মাল স্কুল
২১ অক্টোবর, ১৯০৯

নিবেদক

শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন ।

প্রথম সংস্করণের পুস্তক যে এক বৎসরেই নিঃশেষ হইবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।
ভগবানের কৃপা !

পূর্ববঙ্গ ও আসাম শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাহেব এই পুস্তক নর্মাল স্কুলের পাঠ্য নির্দেশ করিয়া আমাকে বিশেষ অনুগ্রহীত করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশের ডিরেক্টর সাহেব দয়া করিয়া অনেকগুলি পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সুরমা উপত্যকার ইন্স্পেক্টর মহোদয়গণ এই পুস্তক গুলি ট্রেনিং স্কুলের পাঠ্য নির্দেশ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক মধ্য ও উচ্চপ্রাইমারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করিতে আদেশ করিয়াছেন। এই সকল সহৃদয় মহাশয়গণকে সবিনয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

পুস্তকের আদর দেখিয়া ইহার উন্নতিকল্পে স্থানে স্থানে নূতন বিষয় ও নূতন চিত্রের সংযোগ করা হইয়াছে। তিনখানি চিত্র পরিবর্তন করিয়াছি। পুস্তকের আকার বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই।

ষষ্ঠ সংস্করণে নিবেদন ।

শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সমস্ত স্থানে স্থানে বিস্তৃত ভাবে ও স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ত ভাবে সন্নিবিষ্ট হইল। বাঙ্গলা দেশের বঙ্গ বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য তালিকা দৃষ্টে অনেক নূতন অনুচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে। এই জন্ত পুস্তকের কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু অপরদিকে যাহারা এই শ্রেণীর পুস্তকের গ্রাহক তাহাদিগের অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং কাগজ ও ছাপার মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিতে সাহস হইল না।

শিলচর
ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ . }

নিবেদক
শ্রী অঘোরনাথ অধিকারী ।



প্রথম ভাগ ।—সাধারণ বিধান ।

উপক্রমণিকা ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
উদ্বোধন	১	শিক্ষকের ধর্ম—নৈতিক	৮
শিক্ষকতা কার্যে লাভালাভ	৩	 শারীরিক	৯
শিক্ষকের দায়িত্ব ও গ্রেষ্ঠত্ব	৫	হিন্দুশাস্ত্রোক্ত গুরুশিক্ষণ	১০
শিক্ষাদান বিষয়ক পুস্তক পাঠের		ব্যবস্থা	১১
আবশ্যকতা	৬	শাসন	১২
শিক্ষকের ধর্ম—মানসিক	৭	শিক্ষা	১২

প্রথম অধ্যায় ।—স্বব্যবস্থা বিষয়ক ।

গৃহ ও প্রাঙ্গণ	১৩	খাদ্যপত্র	২৮
আসবাব ও সবজ্যাদি	১৮	শ্রেণী বিভাগ	৩৩
মিউজিয়াম	২৩	সময় নির্দেশক পত্র বা	
পুস্তকালয় বা লাইব্রেরী	২৫	রুটিন	৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ।—স্বশাসন বিষয়ক ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সময়নিষ্ঠা	৪৫	শাস্তি বিধান বিষয়ে আদালতের নজীর	৬১
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা	৪৬	গোলমাল ও নিশৃঙ্খলা	৬৬
নকল করা	৪৮	আলস্য ও অমনোযোগিতা	৭০
স্বাধীনতা ছুটামী	৫০	কর্মচারী শাসন	৭৩
মানসিক বা দৈহিক অপূর্ণতা	৫৪	সভ্য ব্যবহার	৭৪
শাস্তির ব্যবস্থা	৫৪	পুরস্কার	৭৫

তৃতীয় অধ্যায় ।—স্বশিক্ষা বিষয়ক ।

স্বশিক্ষা কাকে বলে	৮০	মনোবৃত্তি বিকাশে লক্ষ্য	১১৪
শারীরিকবৃত্তির অনুশীলন	৮৭	শিশুশিক্ষার স্বাভাবিক প্রণালী	১১৫
মানসিকবৃত্তির	৯২	মৌখিক শিক্ষাদানের ধারা	১১৮
ইন্দ্রিয়রোধ ও বস্তুজ্ঞান	৯৫	প্রশ্নের লক্ষণ	১২০
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পুষ্টিসাধন	৯৬	প্রশ্নের উদ্দেশ্য	১২২
মনোযোগ বা অভিনিবেশ	৯৮	উত্তরের লক্ষণ	১২৮
স্মৃতি	১০১	তুলনের ধারা	১৩০
কল্পনা	১০৭	জ্ঞানোপার্জনের ক্রম	১৩১
চিন্তা ও বিচার	১০৮	শিক্ষাদানের উপকরণাদির ব্যবহার	১৩৬
অনুভববৃত্তি	১১০	গৃহে পাঠাভ্যাস	১৪১
ইচ্ছাশক্তি	১১৩	উপসংহারে দুই একটি গোপনীয় কথা	১৪৫

দ্বিতীয় ভাগ ।—বিশেষ বিধান ।

প্রথম প্রকরণ ।—শরীরপালন বিষয়ক ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ব্যায়াম ।		ব্যায়ামের প্রকার ১৫৯	
উপকারিতা ১৪৯		" কটীন ১৫৯	
ওজন ও উচ্চতা ১৫০		অস্বাস্থ্য কথা ১৬১	
ব্যায়ামের বয়স ১৫২		২। স্বাস্থ্যরক্ষা ।	
" সময় ১৫৪		বিদ্যালয়ে ১৬৩	
অঙ্গ সঞ্চালন ১৫৫		ছাত্রাবাসে বা হোষ্টেলে ১৬৪	
ব্যায়ামের বিভাগ ১৫৬		সংক্রামক রোগে ১৬৫	
নিখাস প্রদান ১৫৭		আকস্মিক বিপদে ১৬৬	

দ্বিতীয় প্রকরণ ।—শিশুশিক্ষা বিষয়ক ।

১। কিণ্ডারগার্টেন ।		২য় খেলনা ১৮৬	
শব্দের অর্থ ১৬৯		৩য় খেলনা ১৮৯	
পেট্টোলজী ১৭১		গণনা শিক্ষা ১৯১	
ফ্রেবেল ১৭১		৪র্থ খেলনা ১৯৩	
কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী কি ? ১৭১		৫ম হইতে ৮ম খেলনা ১৯৫	
বিষ্ফুশর্মা ১৭২		কাঠী সাজান ১৯৫	
ফ্রেবেল প্রদর্শিত দ্বাদশ বিধান ১৭৩		গঠন শিক্ষা ১৯৭	
ক্রীড়নক ব্যবহারে লক্ষ্য ১৭৫		অক্ষর শিক্ষা ১৯৯	
শিক্ষার সরঞ্জাম ১৭৮		বীজ সাজান ২০৩	
১ম খেলনা ১৭৯		৯ম খেলনা ২০৪	
২য় খেলনা ১৮০		১০ম খেলনা ২০৫	
৩য় খেলনা ১৮৩		১১ম হইতে ১৪ম খেলনা ২০৮	

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫শ ও ১৬শ খেলনা	২১০	৩। ধারাপাত।	
১৭শ ও ১৮শ খেলনা	২১১	রোমান অক্ষ	২৩৫
১৯শ খেলনা	২১২	শতকিয়া শিক্ষা	২৩৬
২০শ খেলনা	২১৩	কড়া, গড়া প্রভৃতি	২৩৮
ভঙ্গী-সঙ্গীত	২১৪	মৌখিক যোগ, বিয়োগ	২৪০
ভঙ্গী-সঙ্গীতের আদর্শ	২১৫	৪। হস্তাক্ষর।	
উপকথা	২২১	শিক্ষাদানের নিয়ম	২৪১
অঙ্কন ও রঞ্জন	২২৪	অক্ষরের অংশ	২৪৪
কাগজ কাটা	২২৭	অক্ষ লিখন	২৪৫
২। বর্ণপরিচয়।		৫। শ্রুতলিপি।	
বর্ণের ধারা	২২৯	শিক্ষার উদ্দেশ্য	২৪৬
ধ্বনির	২৩০	শিক্ষাদানের নিয়ম	২৪৬
শব্দের	২৩০		
উচ্চারণ	২৩১		
সংযুক্ত বর্ণ	২৩৪		

তৃতীয় প্রকরণ।—ভাষা বিষয়ক।

১। সাহিত্য।	২। ব্যাকরণ।
শিক্ষার উদ্দেশ্য	আবশ্যকতা
শিক্ষায় লক্ষ্য	শিক্ষাদানের কথা
পাঠ	বিশেষী ও ক্রিয়া
শব্দার্থ	কর্মপদ
ব্যাখ্যা	বিশেষণ
সাহিত্যে ব্যাকরণ	সর্বনাম
পাঠনার আদর্শ	কাল

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কারক	২৮৪	প্রবন্ধ রচনা	২৯৭
স্বর ও ব্যঞ্জন	২৮৭	প্রবন্ধ রচনার নিয়ম	২৯৯
সন্ধি	২৮৮	পত্র রচনা	৩০২
সমাস	২৯০	দলিল রচনা	৩০৩
ছন্দ অলঙ্কার	২৯২	শিক্ষণীয় দলিল	৩০৪
৩। রচনা।		দলিল রচনা শিক্ষাদানের দ্বারা	৩০৫
বাক্য রচনা	২৯৩	কথোপকথন	৩০৬
গল্প রচনা	২৯৬		

চতুর্থ প্রকরণ।—গণিত বিয়য়ক।

১। পাটীগণিত।		ঐকিক নিয়ম	৩৫০
শিক্ষার উপকারিতা	৩০৯	অনুপাত ও সমানুপাত	৩৫১
শিক্ষাদানের কয়েকটি কথা	৩১০	ত্রৈরাসিক	৩৫২
সংখ্যা লিখন ও পঠন	৩১২	সুদকবা	৩৫৪
গ্রাব সাহেবের প্রণালী	৩১৩	ডিসকাউন্ট	৩৫৫
কাঠীর সাহায্যে যোগ বিয়োগ	৩১৮	কোম্পানীর কাগজ	৩৫৬
বলফ্রেম	৩২০	বিবিধ প্রশ্ন	৩৫৯
যোগ, বিয়োগের সাধারণ দ্বারা	৩২১	২। জ্যামিতি।	
গুণন	৩২৫	শিক্ষায় লাভ	৩৬০
ভাগ	৩৩১	ব্যবহারিক প্রশ্ন	৩৬৪
মিশ্র নিয়ম	৩৩৫	ব্যবহারিক জ্যামিতি	৩৬৫
জমা খরচ	৩৩৭	৩। পরিমিত।	
ল. সা. ও ; গ. সা. ও	৩৩৮	শিক্ষার আবশ্যিকতা	৩৬৬
ভগ্নাংশ	৩৩৯	শিক্ষাদানের অসম্ভাব	৩৬৭
দশমিক ভগ্নাংশ	৩৪৬	শিক্ষাদানের দ্বারা	৩৬৭
সাক্ষেতিক	৩৪৮		

পঞ্চম প্রকরণ ।—ভূগোলেতিহাস বিষয়ক ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ভূগোল ।			
শিক্ষার আবশ্যিকতা	৩৭০	দিবাবাত্র	৩৮৯
শিক্ষার কথা	৩৭১	মানচিত্রে শিক্ষা	৩৯১
শিক্ষাদানের ধারা	৩৭২	ভূগোল মুখস্থ করাইবার প্রণালী	৩৯৩
দিক্ শিক্ষা	৩৭৭	মানচিত্রাক্ষন	৩৯৫
নক্সা বা মান	৩৮১	শিক্ষাদানের ধারাবাহিক প্রণালী	৩৯৮
স্কুলের সাহায্যে নক্সা	৩৮২	২। ইতিহাস ।	
বন্ধুর মানচিত্র	৩৮৪	শিক্ষার উদ্দেশ্য	৪০৬
সূত্র শিক্ষা	৩৮৪	নিয়ন্ত্রণীতে ইতিহাস	৪০৭
শিক্ষার ধারা	৩৮৫	সম্যকশ্রেণীতে ইতিহাস	৪০৯
পৃথিবীর আকার ও গোলক	৩৮৭	ইতিহাস শিখাইবার নিয়ম	৪১১
অক্ষবেগা, জাতিমা	৩৮৮	মন তারিখ শিক্ষা	৪১৩
		ইতিহাস পাঠনার আদর্শ	৪১৭

ষষ্ঠ প্রকরণ ।—বিজ্ঞান বিষয়ক ।

১। পদার্থ পরিচয় ।		২। বিজ্ঞান ।	
শিক্ষার উদ্দেশ্য	৪২১	শিক্ষার আবশ্যিকতা	৪২৫
শিক্ষার বিষয়	৪২২	বিজ্ঞানের বিজ্ঞান	৪২৬
শিক্ষার দৃষ্টান্ত	৪২২	পরীক্ষণ বিষয়ের সাধারণ উপদেশ	৪২৬
শিক্ষার ধারা	৪২৪	পরীক্ষণের যন্ত্র	৪২৮

সপ্তম প্রকরণ।—শিল্প বিষয়ক।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। চিত্রাঙ্কন।		৩। সঙ্গীত।	
আবশ্যকতা	৪২৯	আবশ্যকতা	৪৪৯
বিভাগ	৪২৯	শিক্ষার ধারা	৪৫০
শিক্ষার আরম্ভ	৪৩০	স্বর সঞ্চয়	৪৫২
কাগজ, পেনসিল	৪৩২	স্বরের কথা	৪৫৪
চিত্রালিপি	৪৩৩		
ত্রুটি-লিপি	৪৩৪	৪। সূচী শিল্প।	
সময় বা কিউব অঙ্কন	৪৩৮	আবশ্যকতা	৪৫৫
রেখা-চিত্র	৪৪৪	আমদান	৪৫৫
ব্ল্যাকবোর্ডে চিত্রাঙ্কন	৪৪৫	শিক্ষার ধারা	৪৫৫
২। মনুমূর্তি গঠন।		আবশ্যক সেলাই	৪৫৬
আবশ্যকতা	৪৪৬		
মাটি প্রস্তুত	৪৪৬	৫। উদ্যান রচনা।	
আরম্ভ	৪৪৭	আবশ্যকতা	৪৫৭
ফল গঠন	৪৪৭	শিক্ষাদানের প্রণালী	৪৫৮

অষ্টম প্রকরণ।—নীতিধর্ম বিষয়ক।

১। নীতি।		২০। ধর্ম।	
কে দায়ী?	৪৬০	আবশ্যকতা	৪৬৬
শিক্ষার উপায়	৪৬০	শিক্ষার প্রণালী	৪৬৬

নবম প্রকরণ ।—নানা বিষয়ক ।

১। পাঠনার নোট ।	২। পাঠনা সমালোচনা ।
পাঠনার নোট কতক বলা : ... ৪৬৯	শিক্ষক বিষয়ক ... ৪৯৯
নোট লিখিবার নিয়ম ... ৪৭০	শ্রেণী বিষয়ক ... ৫০১
গদ্য সাহিত্য ... ৪৭৪	অধ্যাপনা বিষয়ক ... ৫০৪
পদ্য সাহিত্য ... ৪৭৬	প্রশ্ন বিষয়ক ... ৫০৫
পদার্থ পরিচয় ... ৪৮২	বিষয়গত ভুল ... ৫০৭
পাটীগণিত (নিম্ন) ... ৪৮৪	উপসংহার ... ৫০৭
পাটীগণিত (উচ্চ) ... ৪৮৬	৩। পরীক্ষা ।
ইতিহাস ... ৪৮৭	আবশ্যকতা ... ৫০৮
ভূগোল ... ৪৮৯	প্রকার ... ৫০৮
বিজ্ঞান ... ৪৯২	পরীক্ষার প্রশ্ন ... ৫০৮
কথোপকথন (বিস্তৃত) ... ৪৯৪	প্রশ্নোত্তর ... ৫০৯
(সংক্ষিপ্ত) ... ৪৯৬	কাগজ পরীক্ষা ... ৫১০
	প্রশ্নোত্তরের মূল্য ... ৫১১
	পরীক্ষার আধিক্য ... ৫১৩

উপসংহার ।

আত্মশিক্ষার আবশ্যকতা—আত্মশিক্ষার উপায়—আয়োজিত মূলমন্ত্র ... ৫১৪

১ম পরিশিষ্ট ।

পালিশ বার্মিশ—ব্লাকবোর্ডের রঙ—পুটিন—বন্ধুর মানচিত্র—গোলক—খাতার আদর্শ ৫১৭ .

২য় পরিশিষ্ট ।

ইতিহাসের কাল নিরূপণী রেখা—শিক্ষাপদার্থের পাঠ্য ... ৫২৪

৩য় পরিশিষ্ট ।

হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণের নিমিত্ত স্তোত্র ... ৫২৫

No. 90

From

THE SECRETARY, BOARD OF EXAMINERS.

To

THE SUPERINTENDENTS OF NORMAL SCHOOLS.

Dated Dacca, the 3rd April, 1914.

Sirs,

In continuation of our correspondence on the subject of Text-books on Method for Normal School examination, I have the honour to suggest to you that for succeeding years lectures on method—general and theoretical, should be based on Dexter and Garlick's New Manual of Method and that the students be recommended to base their study upon Babu Aghor Nath Adhikari's Bibidha Bidhan. The examiners will be informed that this recommendation has been made, and copies of the text books will be sent to them.

I have &c.

Sd. M. S. WEST

Secretary.



বিদ্যালয়-বিধায়ক বিবিধ বিধান।

প্রথম ভাগ—সাধারণ বিধান।

“There is but one question in the world : How to make man better
And but one answer : Education.”—Parker.

উপক্রমণিকা।

“উত্তীর্ণ জাগ্রত প্রাণ্য বরাগিবোধত।” কঠ।

উদ্বোধন—এক ফকিরের একটি কুকুর ছিল। [এইরূপ একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। ঘটনা সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না, তবে গল্পটি যে বেশ জ্ঞানপ্রদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।] কুকুরটি বড়ই রোগা। ফকির সেই কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। এক দিন এক গ্রামের মেয়েরা সেই শীর্ণকায় কুকুরটিকে লক্ষ্য

করিয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল, “ফকির সাহেব, তোমার ঐ মরা কুকুরটী কি কাজে লাগে ?” ফকির গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, “কুত্তা আচ্ছা ছায়, শের মারুণে-বি সেকতা ছায়।” (‘শের’ মানে বাঘ)। তখন মেয়েরা ফকিরকে বলিল, “ফকির সাহেব, একটা বাঘে আমাদের গাঁয়ের সব গরু বাছুর মেরে ফেলছে। তোমার কুকুরটীকে দিয়ে যদি বাঘটা মেরে দিতে পার, তবে তোমাকে খুব খুসী করব।” “আচ্ছা—হোগা” বলে ত ফকির বিদায় হইয়া গেলেন। কিন্তু দিনের মত দিন চলিয়া যায়, বাঘ মরা দূরে থাকুক, বাঘের উৎপাত দিন দিন বাড়িতেই লাগিল। এক দিন গ্রামের মেয়েরা খুব রাগ করিয়া ফকিরকে বলিল, “যাও ফকির সাহেব, তোমার সব কথা মিথ্যা; তোমার ঐ কুড়ে কুকুর নড়তেই পারে না, তাতে আবার বাঘ মারবে।” ফকির তখন একটু কাষ্টহাসি হাসিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, “মাই কুত্তা মন্ করে ত শের মারে, লেকিন্ মরেবি মন্ না করে।”

কথা ঠিক, মন করিলে অনেকেই বাঘ মারিতে পারে, কিন্তু কেহই যে তেমন মন করে না ইহাই ত দুঃখ। তাই বলি, একবার মন কর—মন করিলেই পারিবে, অসাধ্যও সাধন করিতে পারিবে। এই সাহিত্য, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান পড়াইয়া অজ্ঞাত দেশের শিক্ষকগণ কেমন শত শত জীবন্ত কর্মবীর ও প্রশান্ত ধর্মবীরের সৃষ্টি করিতেছেন; আর আমরা সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়া কি সৃষ্টি করিতেছি? হয় কতকগুলি চেতনাশূন্য জড়ভরত, না হয় কতকগুলি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য যণ্ডামর্ক। ইহার কারণ কি? কারণ, আমরা কার্যে তেমন করিয়া প্রাণ ঢালিয়া দিতে জানি না বা তেমন মন দিয়া কাজ করি না। তাই বলি, শিক্ষকগণ, আর অচেতন থাকিও না। দেশের প্রকৃত উন্নতির ভার তোমাদের হাতে; দেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত করিতে হইবে; দেশকে ধর্মে ও চরিত্রে উন্নত করিতে হইবে; একবার মনপ্রাণ দিয়া

কার্যে প্রবৃত্ত হও । দেখ, সকল দেশই বিজ্ঞাতে বুদ্ধিতে আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে লাগিল । একবার মন কর, মন করিলেই শিব গড়িতে পারিবে । এ দেশের পবিত্র মৃত্তিকা চিরদিনই শিব গড়িবার উপযোগী ।

শিক্ষকতা কার্যে লাভালাভ ।—যদি ধনের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিও না । যদি মানের প্রত্যাশা থাকে, তৎক্ষণে এদিকে আসিও না । যদি যশের কামনা থাকে, তাহা হইলেও শিক্ষকতা কার্যে গ্রহণ করিও না । সেকালের সেই নিকাম, নিস্পৃহ ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের মত যিনি “তিস্তিড়ি পত্রের অশ্বলে” পরগ তৃপ্তি-লাভ করিতে সমর্থ, তিনিই এ কার্যের উপযোগী ।

যদি তুমি বহুপরিবারযুক্ত হও, আর যদি কেবল তোমারই আয়ের উপর সংসারের সমস্ত ব্যয়ভার নির্ভর করে, তবে এ কার্য কখনই গ্রহণ করিবে না । আর যদি শিক্ষকতা কার্যের প্রতি তোমার স্বাভাবিক অনুরাগ না থাকে তবেও এ কার্যে আসিও না । যে ব্যক্তির পরিবার প্রতিপালনের অন্তরূপ সংস্থান আছে, বা যে ব্যক্তি বহুপরিবারগ্রস্ত নহে, আর যে ব্যক্তির শিক্ষকতা কার্যে একটা আন্তরিক অনুরাগ আছে, কেবল তাহাব পক্ষেই এ কার্যে প্রশস্ত ।

ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন, “যদি অর্থপ্রয়াসে আসিয়া থাকেন, তবে শীঘ্র এই কর্ম পরিত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর অনুসন্ধান করুন । যে হেতু শিক্ষকের কর্মে যথাক্রমিক্রমেও ধনশীল পরিপূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই । যখন দেখিবেন যে, আপনাদিগের অপেক্ষা অল্পবুদ্ধি, অল্পবিদ্যা, অল্পপরিশ্রমী এবং অল্পবয়স্ক লোকে অত্যন্ত রাজকার্যে বা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের অপেক্ষা ধনশালী এবং জনসমাজে অধিক গীর্জনীয় হইতেছেন, তখন আপনাদিগের মনোবেদনার পরিসীমা থাকিবে না । তখন স্বীয় ব্যবসায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবে ।” কোন স্মরণ্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কহিয়াছেন, “ইহলোকে মানুষের উপকার করা এবং পরলোকে তাহার পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া শিক্ষকের প্রতি ইহাই বিধাতার নির্বন্ধ ।”

শিক্ষকতা কার্য্য অর্থ উপার্জনের প্রকৃষ্ট পথ নহে বটে, কিন্তু সর্ব্ব অর্থের শ্রেষ্ঠ পরমার্থরূপ ধনলাভের যথেষ্ট সহায়তা করে । বিদ্যালয় প্রেমের রাজ্য, শিক্ষকতা প্রেমের কার্য্য । যদি ইহসংসারেই বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে চাও, তবে এস, এই নন্দনকাননে প্রবেশ কর । নন্দনগণের কমনীয়-কোমল-কোরক-সদৃশ মুখকমলে স্বর্গের শোভা সন্দর্শন কর । ইহারা এইমাত্র স্বর্গরাজ্য হইতে নামিয়া আসিয়াছে ; এখনও স্বর্গের সুবাসে ইহাদিগের অঙ্গ পরিপ্লুত । এই দেব-নন্দনগণের সঙ্গসুখ ভোগ করিয়া জীবন পবিত্র কর । নির্ভয়ে প্রবেশ কর, আবিলতায় এ কানন অপবিত্র হয় না ; কলুষ কালিমায় এ কানন কলঙ্কিত হয় না । চিরশান্তি বিরাজিত এ প্রেমের রাজ্যে শুদ্ধ শান্তভাবে রাজত্ব করিতে পারিলে আর অন্য সাধনের আবশ্যকতা হয় না ।

অন্যত্র যে বিভাগেই প্রবেশ কর না কেন, দেখিতে পাইবে, প্রলোভন তোমার পবিত্রতা বিনষ্ট করিবার জন্ত ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে । তুমি দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ, অতি সহজেই ফাঁদে জড়িত হইয়া অশেষ ক্লেশে পতিত হইবে । কিন্তু এখানে পাপ প্রলোভন নাই । উপরন্তু, পূর্ণমাত্রায় পুণ্য সঞ্চয়ের সুবিস্তীর্ণ পথ প্রশস্ত রহিয়াছে । যদি এই সমস্ত অপার্থিব পদার্থের প্রতি তোমার আকাজক্ষা থাকে, তবে এ বিভাগে প্রবেশ কর, তোমাকে সাদরে আবাহন করিতেছি । শিক্ষকতাকার্য্য অপেক্ষা সুখশান্তিময়, চিন্তা-উদ্বেগশূন্য, চিরপবিত্র ব্যবসায় আর নাই । ধন, মান, যশ উপার্জনে যে আনন্দ ভাষ্যভূত হয়, তাহা জ্ঞানার্জনজনিত আনন্দের সহিত তুলনায় অকিঞ্চিৎকর । শিক্ষকতাকার্য্যে এই চিরানন্দদায়ক জ্ঞানোপার্জনের যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগ রহিয়াছে ।

শিক্ষকতা কার্য্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, কি প্রকারে ছাত্রবর্গের সুশিক্ষা সম্পন্ন করিবেন, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি হইবে ; তাহাদিগের নির্মল অন্তঃকরণে পাছে কোন দুঃসংসার সংলগ্ন হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া আপনার স্ব স্ব চিন্তাশুদ্ধির চেষ্টা

পাইবেন । যদি কোন ভ্রান্তশিক্ষাবশতঃ তাহাদিগের কদাপি কোন অমঙ্গল ঘটে, এই জন্ত আপনার ভ্রমসংশোধনের নিমিত্ত যত্ন করিবেন । শিশুগণের প্রণয়ভাজন না হইলে তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষাসম্পন্ন করা যায় না, ইহা জানিয়া আপনাদিগের আগোদ প্রমোদও তাদৃশ বিপুল করিবেন । এইরূপে স্বীয় কর্তব্যের প্রতি অনুরাগ থাকিলেই, আপনাদিগের মন বিশদ, বুদ্ধি পরিষ্কৃত, বিদ্যা প্রমাদশূন্য এবং আগোদ অনিচ্ছিয়ণ হইবে । এই সকল গুণ উপস্থিত হইলে সুখেরই বা অভাব কি ? (ভূদেব বাবুর “শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব”) ।

শিক্ষকের দায়িত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ।—শিক্ষকতা অত্যন্ত দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্য । সংসারে ইহা অপেক্ষা অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য আছে বলিয়া বোধ হয় না । ধনপতি বণিক, সূক্ষ্মদর্শী ব্যবহারাজীব, ধনস্তরি সদৃশ চিকিৎসক, স্থপতিবিদ্যা পারদর্শী ইঞ্জিনিয়ার, গ্রামনিষ্ঠ বিচারক প্রভৃতি যাবতীয় সম্প্রদায়ের লোক কেবল ইহকালের হিতসাধনে ব্যস্ত । আবার পরম ধার্মিক মন্ত্রদাতা, আচারনিষ্ঠ পুরোহিত, উদারচিত্ত ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায় কেবল পরকালের মঙ্গলের জন্তই উৎকণ্ঠিত । কিন্তু জনসমাজ-উপেক্ষিত দীন, দরিদ্র, শিক্ষককে ইহকাল ও পরকাল, উভয়ের জন্তই সুব্যবস্থা করিতে হয় । শিল্প বিজ্ঞানাদির শিক্ষার দ্বারা যেমন সংসারযাত্রা নির্বাহের উপায় বিধান করিয়া দিতে হয়,—সেইরূপ নীতিশাস্ত্রাদির অনুশীলন দ্বারা আবার দিব্যচক্ষুও উন্মীলিত করিয়া দিতে হয় ।

“যাঁহার প্রসাদে বলবীৰ্য্যবিহীন, কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনারহিত, অজ্ঞানোচ্ছন্ন যুৎপিণ্ডপ্রায় শিশু—বীৰ্য্যবান, জ্ঞানালোকসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হয় ; যাঁহার প্রসাদে জন্মকালে সর্বজীব অপেক্ষা বলহীন ও নিরাশ্রয় হইয়াও, মনুষ্য পরে আপন প্রভাব ও বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া সকল জীবের উপর স্বীয় প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন ; যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য স্বকর্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বকীয় পদের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হন ; যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য সাহিত্য বিজ্ঞানাদি নানা শাস্ত্র চর্চা করিয়া পরম পবিত্র ত্রীতিক্ষুদ্রাকরণে’ অনুক্ষণ নিরতিশয় সুখ-সাগরে ভাসমান হইতে থাকেন ; যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য জগদীশ্বরের পরমাত্মত

স্বকৌশলসম্পন্ন কার্যকলাপ পর্যালোচনা করিয়া তাঁহাব অচিন্ত্য শক্তি, অপরিমীম জ্ঞান, অসুপম করুণা ও অপার মহিমার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এককালে বিমোহিত হইতে থাকেন এবং যাহার প্রসাদে মনুষ্য সৰ্ব্বাত্মকরণ সমর্পণপূর্বক অকপট শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের অর্চনা করিয়া স্বীয় জন্মের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হয়, সেই পরম পবিত্র চুল্লভ স্নেহভ্রম শিক্ষক অপেক্ষা আর কোন ব্যক্তি অধিক গৌরবান্বিত, পূজ্যপাদ ও প্রেমাস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পাবেন ? অনেক সুবিজ্ঞ মহাশয় ব্যক্তি একপ নির্দেশ কবিতাহেঁন যে রাজ্যমধ্যে শিক্ষক না থাকিলে বত ক্ষতি হয়, ধর্মোপদেশক যাজক না থাকিলে তত ক্ষতি হয় না । কারণ, বয়োবৃদ্ধদিগকে ধর্মোপদেশ দান অপেক্ষা শিশুদিগকে সমুদ্রপদেশ দানই অধিক আবশ্যক ও অধিক ফলোপধায়ক ।” (গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত “শিক্ষাপ্রণালী”) ।

শিক্ষাদান বিষয়ক পুস্তক পাঠের আবশ্যিকতা ।—শিক্ষা-প্রণালী বিষয়ক গ্রন্থে সুশিক্ষকগণের বহুদর্শিতার ফল লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে । যেমন বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের ভূয়োদর্শনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া নবীন চিকিৎসকগণ লাভবান হইয়া থাকেন, যেমন সুদক্ষ শিল্পিগণের শিল্প-কৌশলাদি সন্দর্শন করিয়া নবীন শিল্পী কার্য শিক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সুবিজ্ঞ শিক্ষকদিগের শিক্ষা-পদ্ধতি আলোচনা করিয়া নবীন শিক্ষকগণ শিক্ষাকার্য্যে দক্ষতালাভ করিয়া থাকেন ।

শিক্ষকতা করিতে করিতে একটা অভিজ্ঞতা জন্মে বটে, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পূর্বে কত ছেলেব যে মাথা খাইতে হয়, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা কত্তব্য । যদি প্রত্যেক চিকিৎসক, প্রত্যেক রোগীর উপর তাঁহাব ঔষধাদিব পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাব চিকিৎসা বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বে কত ব্যক্তির যে অকালমৃত্যু সংঘটিত হইবে তাহা ভাষিত্বোও ভয় হয় । যদি প্রত্যেক শিল্পীকে কেবল নিজ কার্য্যের দ্বারাই শিল্পকৌশল শিক্ষা করিতে হইত, তবে স্বর্ণকাব-পুঞ্জের দ্বারা কত লোকের যে স্বর্ণের সর্বনাশ হইত, নরসুন্দরের পুঞ্জের দ্বারা কত লোকের যে মাথা কাটা যাইত এবং দর্জির পুত্রের দ্বারা কত লোকের যে কাপড় নষ্ট হইত তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য । প্রত্যেক ব্যবসায়েতেই বিশেষ বিশেষ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় । নূতন লোকের পক্ষে এই সকল কৌশল শিক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক । শিক্ষাবিষয়ক

উপক্রমণিকা ।

পুস্তকে সুশিক্ষার নানাবিধ কৌশল বিবৃত হইয়া থাকে । “শিক্ষাশাস্ত্র আলোচনার প্রধান ফল এই যে, তদ্বিষয়ে স্ব স্ব বুদ্ধি পরিচালন হওয়াতে জনগণ আপন আপন উপযুক্ত পন্থা দেখিয়া লইতে পারেন ।”

শিক্ষকের ধর্ম্ম ।—মন্মথের ধর্ম্ম কি ? যাহা “থাকিলে মানুষ মানুষ—যাহা না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়—তাহাই মানুষের ধর্ম্ম । তাহার নাম কি ? ‘মন্মথত্ব’ । (বঙ্কিম) ।

শিক্ষকের ধর্ম্ম কি ? যাহা থাকিলে শিক্ষক শিক্ষক—না থাকিলে শিক্ষক শিক্ষক নয়—তাহাই শিক্ষকের ধর্ম্ম । তাহার নাম কি ? ‘শিক্ষকত্ব’ । কি কি গুণের অনুশীলনে এই শিক্ষকত্ব লাভ করা যায় ?

(১) মানসিক গুণ ।—শিক্ষকের বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকা বাঞ্ছনীয় । অন্ততঃ পক্ষে বিদ্যালয়ের অধীত বিষয় সমুদায়ে তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক । শিক্ষকতা কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে চিরজীবন নিত্য নূতন জ্ঞান সঞ্চয়ের নিমিত্ত অধ্যয়নে রত থাকিতে হইবে । তাঁহাকে অধিকতর বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত সদ্ভাব সংস্থাপনে যত্ন করিতে হইবে । ইহাতে যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইবে ও নিজের বিদ্যাজনিত দাণ্ডিকতার ভাবগুলি বিনষ্ট হইয়া যাইবে । নিজের বা অন্নের মনোগত ভাব বাক্যের দ্বারা অপরের মনের মধ্যে রোপণ করাই শিক্ষকের কার্য্য । সুতরাং তাঁহার বিষয়-বর্ণনা-শক্তির সম্যকরূপ অনুশীলন হওয়া আবশ্যিক । উত্তম উত্তম গ্রন্থাদি পাঠ দ্বারাই এই শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে । শিক্ষাদানের জন্ত তাঁহাকে বিশেষরূপ প্রস্তুত হইতে হইবে । বালকগণকে যাহা বলিঙ্গন বা শিক্ষা দিবেন, তাহা যেন বিপুল ও তাহাদের পক্ষে হিতকারী হয় । উদ্ভাবনী শক্তি (অর্থাৎ জটিল বিষয়াদি বালকগণকে সরল করিয়া বুঝাইবার জন্ত নব নব পন্থা নির্ধারণ), প্রতিভা (অর্থাৎ নব নব উন্মেষকারিণী বুদ্ধি), কল্পনা-শক্তি (অর্থাৎ অদৃষ্ট বিষয়াদির বর্ণনা পাঠ করিয়া তাহাদের অবস্থার উপলব্ধি

প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলিরও বিশেষরূপ অনুশীলন আবশ্যিক। স্মৃতি-শক্তির বৃদ্ধি করা কর্তব্য; কারণ শিক্ষককে অনেক বিষয় মনে রাখিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে হইবে। কেবল অবিরাম আলোচনার উপরই এই সকল বৃত্তির উন্নয়ন নির্ভর করে।

২। নৈতিক গুণ।—শিক্ষকের চরিত্র পবিত্র হওয়া আবশ্যিক। সাধারণে শিক্ষকের কার্যাদি যতদূর পর্যালোচনা করিয়া থাকে, বোধ হয় অল্প কাহারও কার্য ততদূর করে না। সুতরাং শিক্ষকের চরিত্র এমন নির্মল হওয়া আবশ্যিক যে, কেহ যেন কোনরূপ সন্দেহও করিবার সুযোগ না পায়। সত্যনিষ্ঠা একটা প্রধান গুণ। শিষ্য যদি বুঝিতে পারে যে শিক্ষকের কথাই প্রকৃতত্ব খুবই কম, তবে সেই শিক্ষকের প্রতি তাহার যে কেবল শ্রদ্ধা কমিয়া যাইবে তাহাই নহে, সে অধিকতর মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যাস করিবে। যে ধর্মোই হউক, শিক্ষকের আস্থাবান হওয়া উচিত। ছাত্র এ বিষয়ে প্রথমে গুরুর অনুকরণেই শিক্ষা করিবে। গ্রাম-পরায়ণতার দিকে যেন শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। তাঁহার দ্বারা যেন কখন কাহারও অনিষ্ট সাধিত না হয়। সাধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও অসাধুত্বের প্রতি ঘৃণা গ্রামপরায়ণতার লক্ষণ। শিক্ষককে সমদর্শী হইতে হইবে। সমস্ত শিষ্যবৃন্দকে তিনি সমান চক্ষে দেখিবেন। ধনী নির্ধন বিচার না করিয়া তিনি স্নেহ-সমতা বিতরণ করিবেন। রাজপুত্র ও ভিক্ষুক সমস্তান তাঁহার নিকট সমান আদরের পাত্র। তাঁহাকে সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হইতে হইবে। চঞ্চলমতি বালকেরা কতক উৎপাত করিবে, কত অপরাধ করিবে, কিন্তু তিনি শান্তভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া ও উদার-চিত্তে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তাহাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে যত্ন করিবেন। আত্মশাসন একটা মহা গুণ। ক্রোধাদিকে শাসনে রাখিতে হইবে। শিক্ষককে শ্রমশীল হইতে হইবে। শ্রমশীল শিক্ষকের ছাত্রেরাই পরিশ্রমী হইয়া থাকে, আর অলস শিক্ষকের ছাত্রগণ

উপক্রমণিকা ।

আলম্ভপরাগণ হয় । শিক্ষকের অন্তর সদা সন্তোষপূর্ণ ও না হইলে ছাত্র আকৃষ্ট হইবে না । প্রকৃষ্টে সাময়িক ভয় উৎপ্রফুল্ল বদনে চিরস্নেহের সম্বন্ধ সংস্থাপন করে । বৌদ্ধ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি জগৎগুরুবৃন্দ স্নেহে যত দেশ অধিকার —হানিবল, আলেকজেন্ডার, নেপোলিয়ান অস্ত্রের দ্বারা তাহার এক অংশও জয় করিতে পারেন নাই । সে স্নেহলব্ধ রাজ্য এ ভাবে বিরাজিত, কিন্তু সে অঙ্গলব্ধ রাজ্য কোন্ দিন বিগিয়াছে ।

৩। শারীরিক গুণ।—সুস্থ ও সবল ব্যক্তিই শিক্ষকপদে পাত্র । রুগ্ন ব্যক্তির মনও রুগ্ন হইয়া পড়ে ; ধৈর্য্য, ক্ষম প্রভৃতি গুণ হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় । সুস্থ ব্যক্তি বিক্রী হই কিন্তু রুগ্ন ব্যক্তি স্ত্রী হইলেও বিক্রী । উত্তম শ্রী চিত্তাকর্ষক নাই । বালকের হৃদয় সৌন্দর্য্যে অতি সহজেই বিমোহিত হয় । ব্যক্তি শিক্ষকতাকার্য্যের উপযোগী নহে । অতন্তঃ পক্ষে পক্ষ : কোনটির বিকলত্ব না থাকিলেও শিক্ষকতা কার্য্য চলিতে পারে স্বর সুস্পষ্ট, সুললিত, সুশ্রাব্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক । থাকিলে স্বর প্রায়ই সুগিষ্ট হইয়া থাকে । স্বরের সুশ্রা উচ্চারণের উপর নির্ভর করে ; আবার উচ্চারণের উন্নতি কেবল উপর নির্ভর করে । যিনি সর্বদা সুস্পষ্ট করিয়া বিশুদ্ধ (বাব ভাষায় কথাবার্তা বলিতে অভ্যাস করেন, যিনি সুবক্তাদিগে অনুকরণ করেন, তিনি সহজেই এই গুণ লাভ করিয়া থাকেন । প্রতিও শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । পরিচ্ছদ সুকৃতিসম্পন্ন পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক । জাঁকজমকযুক্ত পরিচ্ছদ বা অতি সর্বতোভাবে বর্জনীয় । এই সমস্ত সাধারণ গুণ না থাকিলে কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করা সুকঠিন ।

হিন্দুশাস্ত্রোক্ত গুরুলক্ষণ।—হিন্দুশাস্ত্রাদিতেও গুরু উক্ত লক্ষণসমূহের উল্লেখ আছে।

মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্—“অবদাতায়মঃ শুদ্ধঃ স্বেচিত্তাচারতৎপরঃ। আশ্রমী ক্রোধরহিতো বৈদবিৎ সৰ্ব্বশাস্ত্রনিৎ। শ্রদ্ধাবানননুসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ। শুচিঃ স্ববেশস্তরুণঃ সৰ্ব্বভূতহিতে রতঃ। শ্রীমাননুদ্যতমতিঃ পূর্ণোহহস্তা-বিমর্ষকঃ। সগুণোহর্চাসু কৃতবীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ, নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরাযণঃ। উহাপোহ-প্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ, ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ শ্রাদ্ধগরিমানুধিঃ।”

মন্ত্রমুক্তাবল্যগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে :—“সদংশজাত, পবিত্র যশাবসম্পন্ন, নিজেব ধর্ম্যানুযায়ী আচার পালনে তৎপর, গৃহস্থাশ্রমী অর্থাৎ যিনি উদাসীন নহেন, অক্রোধী, ধর্মশাস্ত্র এবং সাহিত্য, জ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষাদি সকল গ্রন্থেতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, শ্রদ্ধাবান, দ্বেষ্টরহিত, প্রিয়ভাষী, প্রিয়দর্শন, শুদ্ধচিত্ত, পবিত্রবেশধারী, তরুণবয়স্ক, সৰ্ব্বপ্রাণিহিতে রত, স্ত্রী অনুরক্ততম্ভাব, সৰ্ব্বকার্য্যে তৎপর, অহিংসক, তত্ত্ববিচারক্ষম, গুণশালী, ভগবদর্চনাতৎপর, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ ও অনুগ্রহকার্য্যে সক্ষম, হোমজপাদিকাৰ্য্যে নিরতচিত্ত, তর্ক-বিতর্ক পারদর্শী, বিশুদ্ধাত্মা ও কৃপালী—এই সকল লক্ষণযুক্ত গুরুই সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু।

পুনশ্চ বিষয়স্মৃতি—পরিচর্যা যশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্ণাদ্ গুরুর্নহি কৃপাসিকুঃ স্বথং পূর্ণঃ সৰ্ব্বসম্বোধপকারকঃ। নিস্পৃহঃ সৰ্ব্বতঃসিদ্ধঃ সৰ্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। সৰ্ব্বশংসযচ্ছেদনানলনো গুরুর্ব্যাহতঃ।

যিনি শিষ্ণেব নিকট পরিচর্যা অথবা যশোলাভে ইচ্ছুক নহেন, কৃপালুস্বভাব, সর্বপ্রাণীর উপকারে রত, ধনাদিলাভে নিস্পৃহ, সর্বমন্ত্রাদিতে সিদ্ধ, সর্ববিদ্যায় পারদর্শী, সর্বপ্রকার সংশয়চ্ছেদনে সমর্থ, আলস্যবিহীন—এইরূপ ব্যক্তি গুরুপদবাচ্য।

—প্রাচীন পণ্ডিতেরা কেবল গুরু এই সকল প্রশংসনীয় লক্ষণাদি নির্ণয় করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, তাহারা নিন্দ্য গুরু লক্ষণও বিবৃত করিয়াছেন :—

ক্রিয়ামারসমুচ্চয়ে।—খিজী চৈব গলৎকুঠনেত্ররোগী চ বামনঃ। কুনথঃ শ্রাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতোহধিকাজ্ঞকঃ। শ্বীনাস্তঃ কপটী রোগী বহ্বাঙ্গী বহুজল্লকঃ। এতৈর্দোষৈর্কিমুক্তো যঃ সঃ গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ।

ক্রিয়ামারসমুচ্চয়ে লিখিত আছে, খিজরোগযুক্ত, গলিতকুষ্ঠযুক্ত, নেত্ররোগযুক্ত ব্যক্তি ও অতি শিথিলকৃতি, কুনথী, কুদন্তী, স্ত্রীপরাযণ, বিকলাঙ্গ, কপটাচারী, চিররোগগ্রস্ত, বহুভোক্তা, বহুভাষী ব্যক্তি গুরু হইবার অনুপযুক্ত। এই সমস্ত দোষবিহীন ব্যক্তিই শিষ্যসম্মত গুরু।

এইরূপে বামলে, সম্ভানবিহীন ব্যক্তি পর্যন্ত গুরুপদের অনুপযুক্ত বলিয়া বখিত হইয়াছে । কারণ সম্ভানবিহীন ব্যক্তির হৃদয়ে স্নেহ, গমতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিসমূহের স্ফুরণ হয় না । তদুপাধে অত্যাশ্রয় কুলক্ষণের সঙ্গে, “দুর্গন্ধি-বাসবাহকঃ” অর্থাৎ যে ব্যক্তির প্রাণাসে দুর্গন্ধ অনুভূত হয় একরূপ ব্যক্তিকেও গুরু পদের অযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া হইয়াছে । বাস্তবিক কথাও, একরূপ অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি শিক্ষাগণের কিছুতেই আস্থা জন্মিতে পারে না । মনু, আগস্ত্য, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থে গুরুলক্ষণ বিষয়ে যথেষ্ট মন্তব্য আছে । এ সমস্ত পুস্তক এখনও অতি গৃহেই দেখিতে পাওয়া যায় । বাহুল্য ভয়ে সে সমস্ত গ্রন্থ হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করা হইল না ।

শিক্ষকের গুণ সম্বন্ধে, সুবিখ্যাত অধ্যাপক আরনল্ড সাহেবের কথাগুলি বিশেষ জ্ঞানপ্রদ । তিনি বলেন, “ধর্মপরায়ণতা, কার্যতৎপরতা, শারিরীক ও মানসিক বল, বালকের ন্যায় সারল্য, তথা গাম্ভীর্য, নম্রতা, বিচারা ও দক্ষিণা, এই সকল গুণ না থাকিলে কোন ব্যক্তি সুশিক্ষক হইতে পারেন না । কিন্তু এই সমুদয় সদগুণালঙ্কৃত পুরুষ প্রায় পাওয়া যায় না । এমন লোক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বটে, তথাপি যাহারা শিক্ষকের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য যে আপনারা এই সমুদয় গুণসম্পন্ন হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন ।”

যে সমস্ত সাধারণ গুণের কথা উল্লিখিত হইল তাহা সকল শ্রেণীর শিক্ষকের পক্ষেই প্রযুক্ত্য । পাঠশালার গুরু, টোলের পণ্ডিত, মাদ্রাসার মোলবী, শিল্পশিক্ষক, সঙ্গীতাচার্য্য, মন্ত্রদাতা, ধর্মোপদেষ্টা, সাধারণ বক্তা, সকলকেই এই সমস্ত গুণে গুণী হইতে হইবে । কিন্তু বর্তমান শিক্ষাবিভাগের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকতা করিতে হইলে এই সকল গুণের সঙ্গে আরও ত্রিবিধ গুণবিশিষ্ট শক্তির আবশ্যক :—
(১) ব্যবস্থা বিষয়ক, (২) শাসন বিষয়ক, (৩) শিক্ষা বিষয়ক ।

(১) ব্যবস্থা ।—বিদ্যালয়ের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থান নিরূপণ, প্রচুর পরিমাণে বায়ু ও আলো প্রবেশ করিতে পারে একরূপ ব্যবস্থা করিয়া গৃহ নির্মাণ, বিদ্যালয়ে আবশ্যকমত আসবাব সংগ্রহ করিয়া সুশৃঙ্খলমত

শ্রেণী সাজান, সময় নিরূপণপত্র (রুটীন) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অধ্যাপনার উপযুক্ত সময় নির্দেশ, বিদ্যালয় ও তৎপার্শ্বস্থ স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বালকদিগের খেলিবার স্থানের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের শোভাবৃদ্ধি ও ছাত্র শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে উদ্যান প্রস্তুত, মলমূত্র ত্যাগের স্থান নিরূপণ, উত্তম পানীয় জলের সংস্থান প্রভৃতি কার্যে বিচক্ষণতা প্রকাশ করিতে পারিলে শিক্ষক সুব্যবস্থার পরিচয় দিতে পারেন ।

(২) **শাসন**—বালকগণ যাহাতে নিয়মিত সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়, যাহাতে তাহারা মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করে, যাহাতে অবাধ্য ও অসভ্য না হয়, শিক্ষক ও ছাত্র যাহাতে সময় নিরূপণ পত্রের নির্দেশমত কার্য্য করে, যাহাতে বালকগণের চরিত্র উন্নত হয়, বিদ্যালয়ের ভৃত্যগণ যাহাতে নিজ নিজ কার্য্য সুসম্পন্ন করে, দিনের কার্য্য যাহাতে দিনেই শেষ হয়, যাহাতে কোনরূপ গোলমাল না হয়, ইত্যাদি কার্য্যের ব্যবস্থার নাম সুশাসন ।

(৩) **শিক্ষা**—বালকগণ যাহাতে শিক্ষায় আগ্রহ উপভোগ করে, যাহাতে তাহারা প্রত্যহ কিছু কিছু নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারে, যাহাতে তাহাদের উপার্জিত জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, যাহাতে তাহাদের সমুদয় বৃত্তির সম্যক অনুশীলন হয়, যাহাতে তাহারা ক্রমে ক্রমে পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের ব্যবস্থা করাই শিক্ষকের প্রধান কার্য্য । ইহাই সুশিক্ষার ব্যবস্থা ।

পরবর্তী তিন অধ্যায়ে এই তিনটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে ।



প্রথম অধ্যায় ।—সুব্যবস্থা বিষয়ক ।

গৃহ ও প্রাঙ্গণ ।—বড় বড় বিদ্যালয়ের গৃহাদি নির্মাণ বিষয়ে শিক্ষককে বড় একটা বেগ পাইতে হয় না; ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার-গণই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু ছোট ছোট বিদ্যালয়, গ্রাম্য পাঠশালা প্রভৃতি অনেক সময় শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানেই নির্মিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ সম্বন্ধে শিক্ষকগণের কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। বিদ্যালয় নির্মাণের স্থান—গ্রামের সংলগ্ন অথচ বাহিরে হইলেই ভাল হয়। নদী কি বড় পুষ্করিণীর ধার, ছোট টিলা কি পাহাড়ের ধার বা বিস্তীর্ণ মাঠই এ কার্যের জন্য প্রশস্ত। যেখানে সর্বদা নির্মল বায়ু প্রবাহিত হয়, চতুর্দিকের দৃশ্য যেখানে মনোহর, অথচ গ্রাম হইতে বহুদূর নয়, এইরূপ স্থান দেখিয়াই গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে। গৃহের চারিদিকে যেন অনেক গাছ বা জঙ্গল না থাকে। একখানি গৃহ, একটা ক্ষুদ্র উদ্যান ও বালকদিগের খেলিবার স্থানের যাহাতে সংকুলান হয়, বিদ্যালয়ের জন্য অন্ততঃ এ পরিমাণ জমি আবশ্যিক। দুই বিঘা জমির কমে এ সমস্তের ব্যবস্থা হওয়া কঠিন। অর্দ্ধ বিঘা জমিতে বিদ্যালয়ের গৃহ, অর্দ্ধ বিঘায় উদ্যান ও এক বিঘায় খেলিবার স্থান, ইহাই অতি সংক্ষেপ। সহস্রে এ পরিমাণ স্থানের যথেষ্ট মূল্য বটে, কিন্তু পল্লীগ్రামে এখনও এ পরিমাণ জমি

বিনা ব্যয়ে পাওয়া যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বিবেচনায় গৃহ ছোট বড় করিতে হইবে।

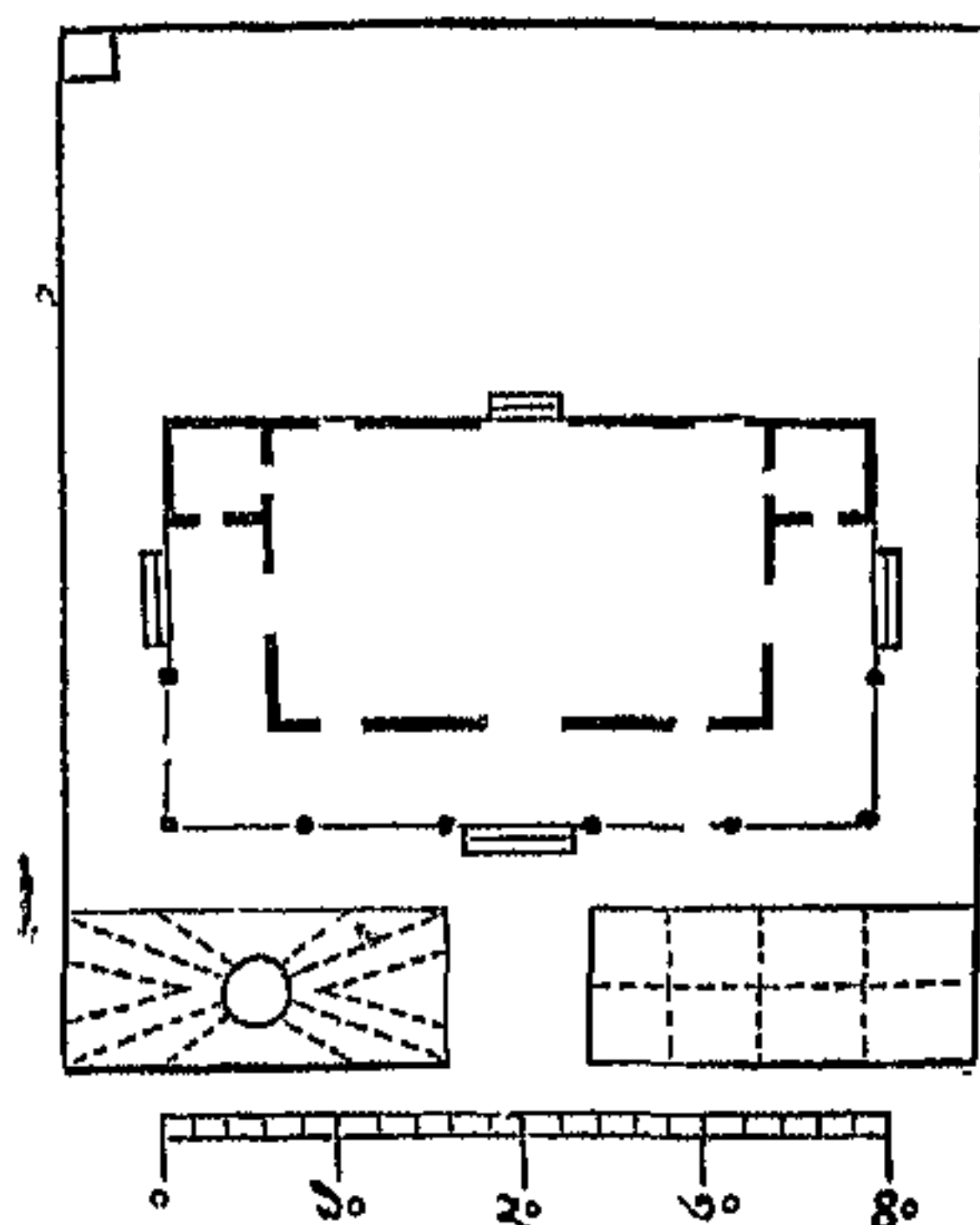
প্রত্যেক বালকের জন্য ভূ-পরিমাণ ১০ বর্গ ফুট আবশ্যিক। আমেরিকায় ১৬ বর্গ ফুট ভূমি ও ২৫০ ঘন ফুট বায়ুর ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ডের বোর্ড অব্ এডুকেশনের মতে ৬ বর্গ ফুট মেজে আবশ্যিক, আর ঘরের উচ্চতা ১২ ফুটের কম হওয়া উচিত নয়। শ্রেণীকক্ষের ক্ষুদ্রতম পরিমাণ ১৮' X ১৫'। ৩০' দূর পর্যন্ত সাধারণ লেখা পড়া যাইতে পারে, স্বতরাং ব্ল্যাকবোর্ড বা ম্যাপ ইহার অপেক্ষা দূরে রাখিলে চলিবে না। জানালা ২৪' এর দূরে হইলে কোনরূপ ফলোদয় হয় না। এ সমস্ত বিবেচনা করিয়াও কক্ষের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নির্ণয় করা যাইতে পারে। দরজা জানালাগুলি বাহিরের দিকে খুলিবার ব্যবস্থা থাকাই আবশ্যিক। অগ্নিভয় ও ভূমিকম্পের সময় সহজে বাহির হইতে পারা যায়।

গৃহের সম্মুখে একটা ছোট বারান্দা থাকিলে ভাল। বাহিরের কোন লোক, শিক্ষক কি কোন ছাত্রের সহিত দেখা করিতে আসিলে, তাহাকে এইখানে বসিতে দেওয়া যাইতে পারে, আর যে সকল বালক নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় (বিদ্যালয়ের গৃহ বন্ধ থাকিলে) তাহারা রোজ ও বৃষ্টি হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য এই বারান্দায় আশ্রয় লইতে পারে। বাসগৃহ হইতে বিদ্যালয়-গৃহ অপেক্ষাকৃত উচ্চ হওয়া আবশ্যিক, কারণ এখানে এক সঙ্গে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। প্রশ্বাসের সহিত যে অক্সিজেন বায়ু নির্গত হয়, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি অনিষ্টজনক। সাধারণতঃ শতভাগ বায়ুতে ০.৪ ভাগ অক্সিজেন বায়ু থাকে। যদি বন্ধগৃহে প্রশ্বাস নির্গমের পথের অভাবে ১ ভাগ অক্সিজেন বায়ু সঞ্চিত হয়, তবে বালকদিগের মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিবে, ২ ভাগ হইলে তাহারা বমি করিতে আরম্ভ করিবে, ৩ ভাগ হইলে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে, আর ৪ ভাগ হইলে মারাত্মক। স্বতরাং বাহ্যতে গৃহাভ্যন্তরে নির্মল বায়ু

চলাচল করিতে পারে তাহার জন্য প্রচুর পরিমাণে দরজা জানালা রাখা কর্তব্য । পাঠশালা যখন প্রায়ই একটী বা দুইটী শিক্ষকের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন এইরূপ পাঠশালা-গৃহের মধ্যে কক্ষ বিভাগ করিয়া কোনরূপ বেড়া বা দেওয়াল দেওয়া সুবিধাজনক নহে । যে বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষকের ব্যবস্থা আছে সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করা উচিত । ছোট বালকেরা প্রায়ই মেজেতে বসিয়া কাজ করিতে ভালবাসে ; এজন্য গৃহের মেজে পাকা হইলে ভাল হয় । যদি গৃহের ভিটা উচ্চ করিয়া আটাল মাটিতে বাঁধান হয়, তবে মাটির হইলেও চলিতে পারে । কিন্তু মাসে মাসে অন্ততঃ দুই বার গোবর মাটির দ্বারা উত্তম করিয়া লেপাইতে হইবে । উচ্চ ভিটা প্রায়ই স্যাঁৎসেঁতে হয় না । আর যদি মেজের উপর গোবর মাটির একটা পুরু স্তর পড়িয়া যায়, তবে নীচের জল, গোবর ভেদ করিয়া উঠিতে পারিবে না । স্যাঁৎসেঁতে গৃহে বাস করিলে জ্বর, কাশি, সর্দি, বাত প্রভৃতি নানারূপ পীড়া হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । এজন্য ঘরের মেজে যাহাতে শুষ্ক হয়, শিক্ষককে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ।

মধ্য প্রদেশের প্রাথমিক পাঠশালার নক্সা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল । ইহাই গ্রাম্য পাঠশালার উত্তম আদর্শ :—

প্রত্যেক বালকের জন্য অন্ততঃ ৬ বর্গ ফুট ও ৬০ ঘন ফুট স্থান আবশ্যক ইহাই মধ্য-প্রদেশের শিক্ষা বিভাগীয় আইনে নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু কার্যতঃ ইহা অপেক্ষা বেশী স্থানেরই ব্যবস্থা হইয়া থাকে । ৫০ জন ছাত্রের উপযোগী একটি বিদ্যালয়ের মাপ সাধারণতঃ এইরূপ :—মধ্যের কামরাটী ২০ ফুট × ১২ ফুট, দেওয়াল ১০ ফুট উচ্চ । ঘন ফুট হিসাবে গৃহের অভ্যন্তর ৩৩৬০ (ছাদ ঢালু ধরিয়া) । আইন অনুসারে এই গৃহে ৪০ জনের বেশী স্থান হয় । কিন্তু কামরায় ২০।৩০ জনের বেশী ছাত্র বসে না । অত্যাশ্চর্য্য সকলে সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া কাজ করে । বারান্দা ৩২ ফুট × ৬ফুট । ঘরের

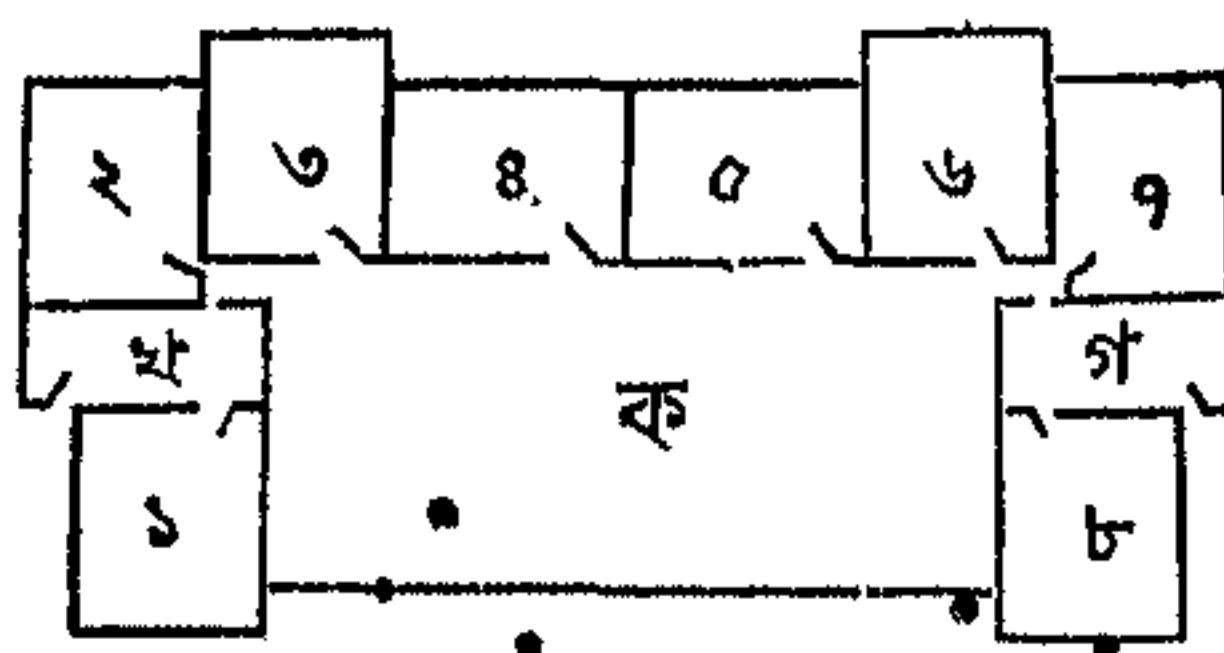


১ম চিত্র ।—মধ্য প্রদেশস্থ পাঠশালার নক্সা ।

গেজে ও দেয়াল পাকা, ছাদ টালীর । ছোট ছোট বালকেরা চটের উপর বসে, বড় ছেলেরা বেঞ্চে বসে । কোন কোন পাঠশালার উচ্চ শ্রেণীতে ডেস্কের ব্যবস্থাও আছে । বাগানের চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে । বিদ্যালয়ের চারি পার্শ্বে প্রায়ই বেড়া থাকে না । প্রায় শিক্ষককেই ডাকের কাজ করিতে হয় ; এইজন্য প্রায় বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি ডাকঘরের কক্ষ থাকে । ১ম চিত্রের দুই পার্শ্বে যে ছোট দুইটুকামরার নক্সা আছে, তাহার একটীতে ডাকঘর, অপরটীতে লাইব্রেরী, অফিস, ভাণ্ডার ইত্যাদি । বিদ্যালয়ের কাজ, ডাকঘরের কাজ ও পাউণ্ড অর্থাৎ পশু-খোঁয়ারের কাজ করিয়া শিক্ষকেরা মাসে বেশ ২০।২৫ টাকা উপার্জন করিয়া থাকেন । ছোট ছোট বিদ্যালয়ে প্রায়ই একজন শিক্ষক ও একজন মনিটার (শিক্ষানবিশ শিক্ষক) থাকে ।

যাঁহারা বড় স্কুল করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নে তাঁহাদের, জন্তও একটা উৎকৃষ্ট নক্স প্রদত্ত হইল । ক চিহ্নিত ঘর বৃহৎ কক্ষ বা হল । ইহাতে সভা সমিতি ও পরীক্ষার কার্য্য নিৰ্ব্বাহিত হইয়া থাকে । খ, গ, চিহ্নিত গৃহ দুইটী, দুই দিকের দরজা ঘর । এই ঘর দিয়া হলে প্রবেশ করিলেই সকল শ্রেণীতে যাওয়া যাইবে । আর ১, ২ প্রভৃতি চিহ্নিত ঘরগুলি যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি শ্রেণী । শ্রেণী কক্ষের মাপ ২৪' ৮" X ২২' ০" ।

সাহেবদিগের স্কুলে ছাত্রেরা সর্বপ্রথমে হলে একত্র হয় এবং শিক্ষকের সঙ্গে একত্রে উপাসনা করিয়া নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করে । এইরূপ গৃহের আর একটা বিশেষ সুবিধা এই যে প্রধান শিক্ষক ইচ্ছা করিলেই অতি অল্প সময়েও সৃষ্টিশালার সহিত সমস্ত ছাত্রকে হলে একত্র করিতে পারেন । আর এই হলে বসিয়া সমস্ত শ্রেণীর কার্য্যও পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন । লাইব্রেরী ও লেবরেটরী (বিজ্ঞান শিক্ষার যন্ত্রাগার) এই হলে । এখানে বসিয়া বালকেরা খবরের কাগজ ও পুস্তকাদি পাঠ করে । বিজ্ঞানের কোন পরীক্ষণ (experiment) দেখিতে হইলে এই হলে একত্র হয় । কেবল এই হলের এক কোণে বসিয়া কাজ করেন । বালকেরা কলের পুতুলেব মত গৃহে প্রবেশ করে, আবার ছুটির সময় কলের পুতুলের, মত বাহির হইয়া যায়—একটুও গোলমাল হয় না । তবে গৃহের বাহিরে গিয়া তাহারা স্বাধীনভাবে লাফালাফী বা গোলমাল করিয়া থাকে । বালকেরা শ্রেণীতে প্রবেশ করিলে, শিক্ষক হলের দিকের দরজা বন্ধ করিয়া দেন । অপর দিকের জানালাগুলি খোলা থাকে । কান্দেই নানা শ্রেণীর গোলমাল হলে প্রবেশ করে না । দরজা জানালা কাচের ।



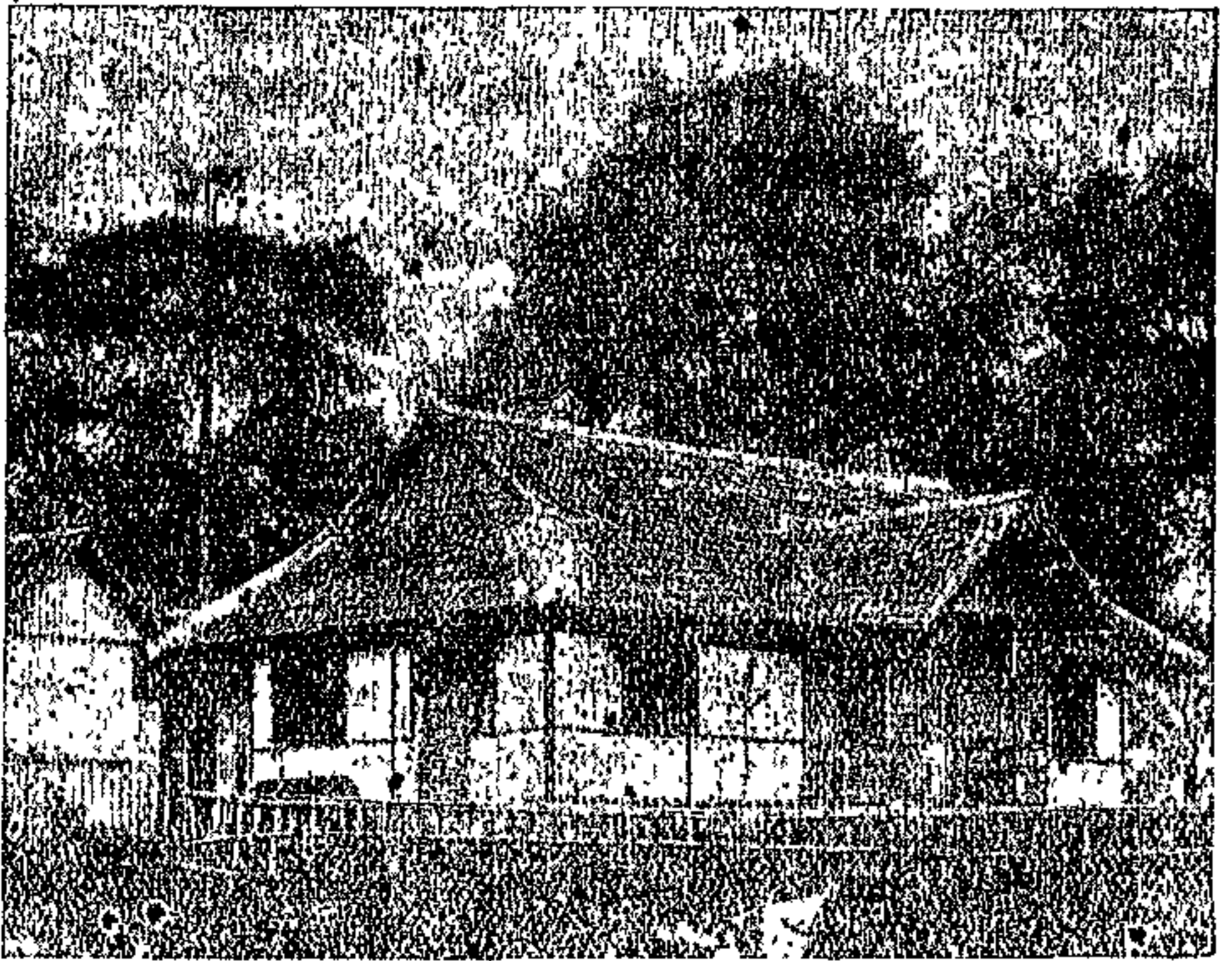
২য় চিত্র ।—হাই স্কুলের নক্সা । ৫০০ ছাত্রের জন্ত ।

(কাউছাম কৃত শিক্ষাপদ্ধতি হইতে) ।

নিম্নে আসাম প্রদেশস্থ পাঠশালাগৃহের চিত্র প্রদত্ত হইল । সকল গৃহের বড় বারান্দা নাই । সম্মুখে একখানি পর'চালা বা পোর্টিকো বারান্দা আছে ।

—বি. বি.

এই পোর্টিকোর সম্মুখে দরজা খোলা । বালকগণ সময়ের পূর্বে বিঠালয়ে আসিলে, রোদ্র বৃষ্টিতে এই চালায় আশ্রয় লইয়া থাকে । একটা লম্বা বারান্দার অপেক্ষা ইহাতে খরচ কম, আর দেখায়ও সুন্দর ।

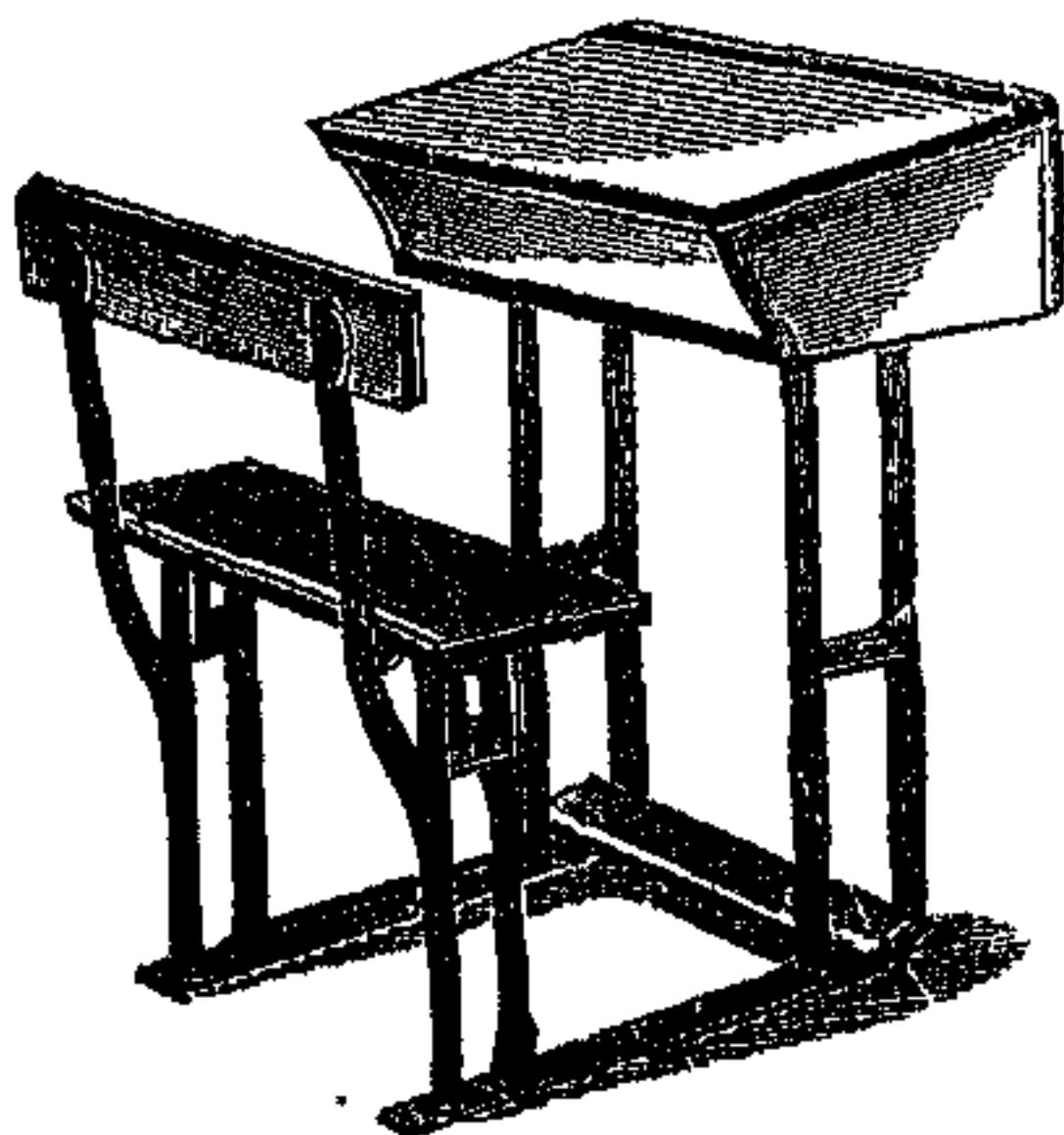


৩য় চিত্র ।—আসাম প্রদেশস্থ পাঠশালাগৃহ ।

আসবাব ও সরঞ্জাম ।—ছোট ছোট ছেলেদের বসিবার জন্ত বেঞ্চ অপেক্ষা চট, চাটাই, মাদুর প্রভৃতি অধিক সুবিধাজনক । ছোট ছোট চাটাই কি মাদুর হইলে, প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন আসন হইতে পারে । তাহা না জুটিলে একটা লম্বা চট কিম্বা মাদুরে অনেক ছেলে একত্রে বসিতে পারে । মধ্য প্রদেশের পাঠশালা সমূহে চট ব্যবহার করে । একথানা বড় (ক্যানভাস) চট কিনিয়া (২০ ইঞ্চি প্রস্থ রাখিয়া) লম্বালম্বি কাটিয়া লয় ও চটের পাশ শক্ত জিন কাপড়

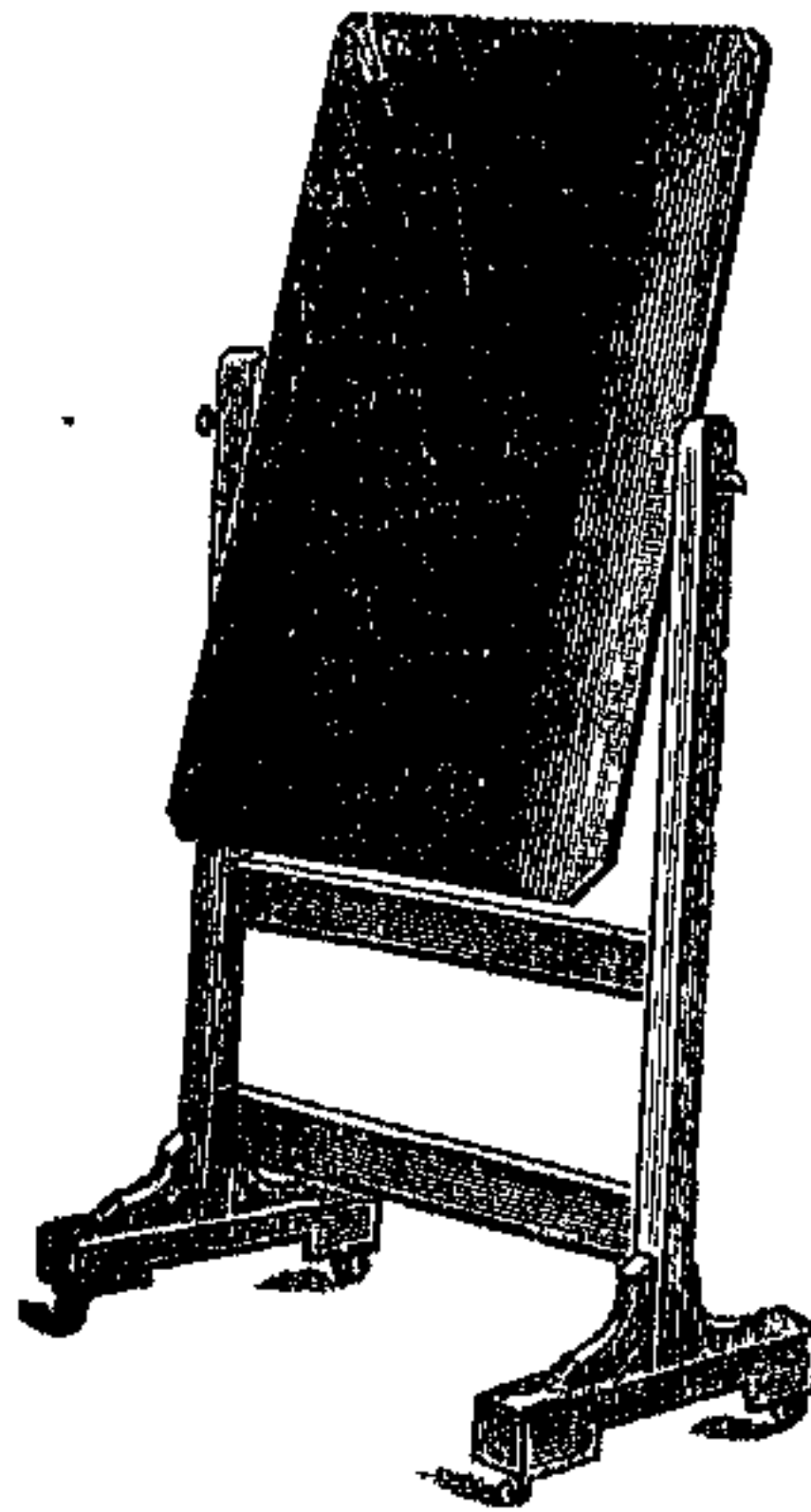
০
 মুড়িয়া সেলাই করিয়া দেয় । নিম্ন শ্রেণীর বালকদিগের জন্ত এই চটের
 দ্বারাই শ্রেণীবিভাগ করে । সহরের বিদ্যালয় সমূহে নিম্ন শ্রেণীতেও
 বেঞ্চ ব্যবহৃত হয় । কিন্তু প্রায়ই সকল শ্রেণীর বেঞ্চ সমানরূপ উচ্চ
 হওয়াতে, নিম্ন শ্রেণীর বালকগণের বসিবার অসুবিধা হয় । বেঞ্চে
 বসিলে পা ঝুলিয়া থাকে । অধিকক্ষণ একরূপে পা ঝুলাইয়া রাখিলে পায়ে
 ব্যথা হয় । এই নিমিত্ত ছোট ছোট ছেলেদের পা রাখিবার জন্ত, উচ্চ
 বেঞ্চের সঙ্গে তক্তা আঁটিয়া দেওয়া কর্তব্য । নিম্ন শ্রেণীর বেঞ্চগুলি নীচু
 করিয়া প্রস্তুত করাইলে আর একরূপ তক্তা আঁটিবার প্রয়োজন হয় না ।
 অবস্থা ভাল হইলে ডেস্কের ব্যবস্থা করা উচিত । নিম্ন শ্রেণীর ডেস্কগুলি
 ছোট ছোট টেবিলের মত হইবে অর্থাৎ ডেস্কের উপরিভাগ ঢালু না
 হইয়া সমতল হইবে । কারণ নিম্ন শ্রেণীতে বালকগণকে কিণ্ডারগার্টেন
 প্রথানুযায়ী অনেক কার্য সম্পাদন করিতে হয় । টেবিল ঢালু হইলে
 তাহাদের গঠিত দ্রব্যাদি গড়াইয়া পড়িয়া যাইবে । এক একটা লম্বা ডেস্ক
 অপেক্ষা, ছোট ছোট ডেস্ক (ছোট ছেলের জন্ত ১৮ ইঞ্চ প্রশস্ত ও বড়
 ছেলের জন্ত ২০।২২।২৪ ইঞ্চ) উত্তম । বেঞ্চগুলির পিঠ থাকা
 আবশ্যিক । অনেকক্ষণ নিরবলম্বভাবে বসিয়া থাকিলে মেরুদণ্ডে বেদনা
 উপস্থিত হয় । মধ্য প্রদেশের কোন কোন স্কুলে বালকদিগের জন্ত
 হাতাবিহীন ছোট ছোট চেয়ারের ব্যবস্থা আছে । কারসিয়ং ভিক্টোরিয়া স্কুলে,
 বালকদিগের জন্ত সকল শ্রেণীতেই পৃথক্ পৃথক্ চেয়ার ও ডেস্কের বন্দোবস্ত
 রহিয়াছে । এ ডেস্কগুলিতে বালকদিগের পুস্তক, খাতা, দোয়াত, কলম
 প্রভৃতি থাকে । ডেস্কগুলি বালকের বয়সানুসারে (সম্মুখের দিকে)
 ২০ ইঞ্চ হইতে ৩৫ ইঞ্চ পর্য্যন্ত উচ্চ হইবে এবং বেঞ্চ ও চেয়ারগুলি
 ১০ ইঞ্চ হইতে ১৫ ইঞ্চ হইবে । বেঞ্চে সোজা হইয়া বসিলে যদি ডেস্কের
 সম্মুখভাগ হাতের কণ্ঠের ঠিক নীচে থাকে, তবেই ডেস্কের মাপ ঠিক হইল;
 আর বেঞ্চ কি চেয়ারে বসিলে যদি পা মাটিতে বেশ আরামের সহিত রাখা

যায়, বেঞ্চের মাগও ঠিক হইল । নিম্নে উক্তম আসনের চিত্র প্রদত্ত হইল—
বেঞ্চ ও ডেস্ক একসঙ্গে যুক্ত ও একজনের (বা দুইজনের একসঙ্গে) বসিবার
উপযোগী ।



৪র্থ চিত্র ।—যুক্ত আসন ।

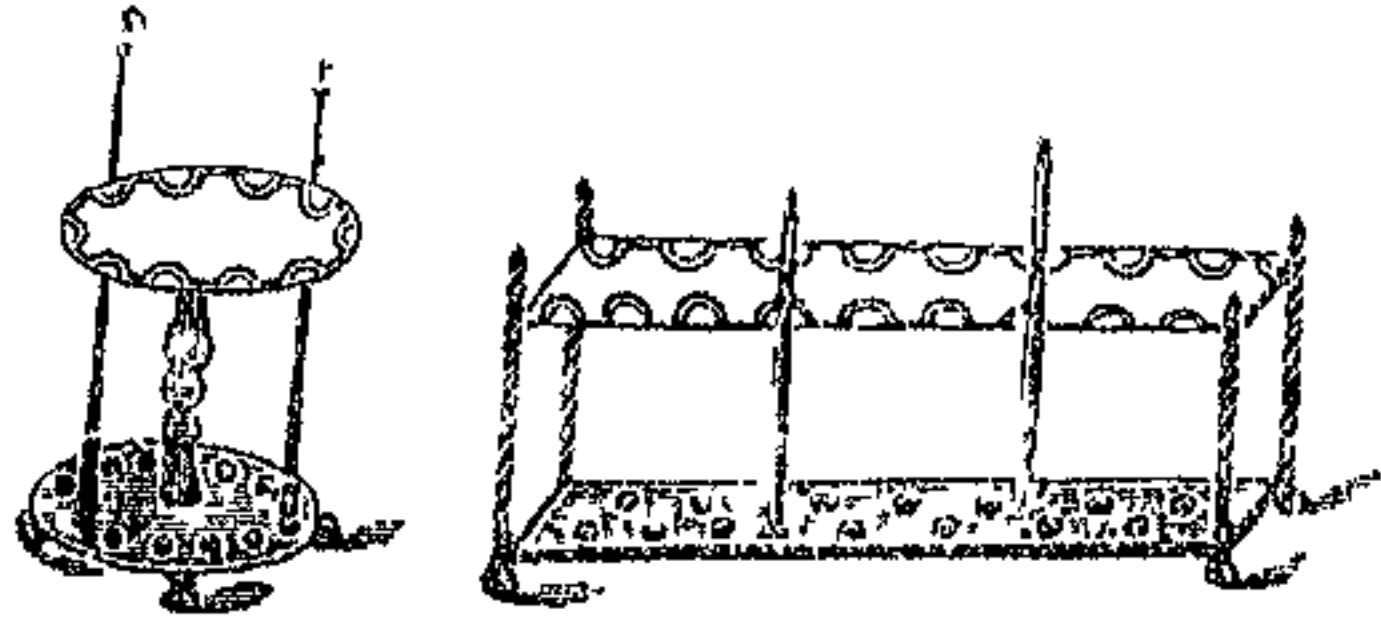
নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণের নিমিত্ত একখানা টেবিল, একখানা
হাতাযুক্ত চেয়ার ও একখানি হাতাবিহীন চেয়ার নিতান্ত পক্ষেই আবশ্যক ।
হাতাযুক্ত চেয়ার প্রধান শিক্ষকের জন্য ও হাতাবিহীন চেয়ার মনিটারের জন্য ।
আর পুস্তক, খাতাপত্র, কাগজ, দোয়াত, কলম প্রভৃতি রাখিবার জন্য একটা
বাক্স বা আলমারী চাই । নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়েও অন্ততঃ দুইখানা
ব্ল্যাক্-বোর্ড রাখা আবশ্যক । একখানি কাঠফলক (লোহার কড়া লাগাইয়া)
দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিলেও কাজ চলিতে পারে, অথবা ফ্রেমের উপর
লাগাইয়া লইলেও হইতে পারে । ব্ল্যাক্-বোর্ডের ধার দিয়া বিট বা কার্গিস
তুসিয়া উচ্চ করিবে না । তাহাতে টিস্কোয়ার চালাইবার অসুবিধা হয় । নিম্নে
ব্ল্যাক্ বোর্ডের আদর্শ প্রদত্ত হইল :—



৫ম চিত্র ।—ব্ল্যাক্-বোর্ডের চিত্র ।

ইহা কেবল গরীব পাঠশালার ব্যবস্থার কথা বলিতেছি । অবস্থা ভাল হইলে এই সকল আসবাব আবশ্যক মত বৃদ্ধি করিতে হইবে । দেশী মিস্ত্রিরা ব্ল্যাক্-বোর্ড প্রস্তুত করে বটে, কিন্তু অনেকেই উপযুক্তরূপে রঙ করিতে জানে না । কেহ আলকাতরা কেহ বা ব্ল্যাকজাপান নামক রঙ দিয়া কাল করিয়া দেয় । ইহাতে চক্ দিয়া লিখিলে বোর্ডের সঙ্গে চক্ লাগিয়া যায় । বোর্ড পুঁছিয়া ফেলিলেও চকের দাগ ভাল করিয়া যায় না । ব্ল্যাক্-বোর্ড রঙ করিবার প্রণালী পরিশিষ্টে লিখিত হইল । মাপ রাখিবার জন্য আলনার মত ব্ল্যাক প্রস্তুত না করিয়া, নিম্নের চিত্রানুযায়ী আসন প্রস্তুত করিয়া লওয়াই সুবিধা । ইহাতে কম স্থান লাগে আর ইহাতে ব্ল্যাকের

মত এক সঙ্গে অনেকগুলি মানচিত্র রাখিতে হয় না। সকলগুলিই পৃথক্ পৃথক্ রাখা যায়।



৬ষ্ঠ চিত্র।—মানচিত্রাদি রাখিবার আসন।

১ম চিত্রের উপরের কাঠফলকে যে সকল ছিদ্র আছে, তাহা কাঠে কতক কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। আর কাঠের চতুর্দিকে একগাছি শক্ত দড়ি প্রেক মারিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দড়ি ও কাঠের ছিদ্র মিলিয়া একটা অর্ধ বৃত্তাকার ছিদ্র হইয়াছে। ইহার মধ্যেই মাপ থাকে।

১ম চিত্রের অনুরূপ আসন করিতে হইলে মিস্ত্রির সাহায্য আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু ২য় চিত্রের মত আসন শিক্ষকেরা নিজেই করিয়া লইতে পারেন। বাঁশ ও বেতের দ্বারা কিম্বা কেবল বাঁশের দ্বারাও ঐরূপ আসন করিতে পারা যায়। শিক্ষক একটু পরিশ্রম স্বীকার ও একটু বুদ্ধি খরচ করিলেই অতি সহজে কৃতকার্য হইবেন।

বিদ্যালয় ও তাহার প্রাঙ্গণের নক্সা, গ্রামের নক্সা, জেলার নক্সা প্রদেশের মাপ, দেশের (ভারতবর্ষের) মাপ ও সেই মহাদেশের (এসিয়ার) মাপ ও পৃথিবীর মাপ রীথা আবশ্যক। লম্বা বঁড় স্কুলে ইহা ছাড়া অন্যান্য মহাদেশ ও বৃটন দ্বীপের মানচিত্র রাখাও আবশ্যক। ইহার সঙ্গে তিন চারিখানি নামবিহীন মানচিত্র রাখা কর্তব্য। এ সকল মানচিত্রে নগরাদির নাম লেখা থাকে না। ইহার দ্বারা বালকদিগের উত্তমরূপ ভূগোল-পরিচয় হইয়া থাকে। ইংরাজী সংস্কৃষ্ট বিদ্যালয় হইলে, প্রাকৃতিক

ভূগোল-পরিচায়ক ও জীবজন্তু এবং উদ্ভিজ্জ সংস্থান-পরিচায়ক মানচিত্র রাখা আবশ্যক ।

প্রদেগের ও জেলার বন্ধুর-মানচিত্র (Raised map) এবং একটি গোলকও আবশ্যক । পরমা খরচ করিয়া এ সমস্ত কিনিতে পারিলে ভাল, আব না পারিলে প্রস্তুত করিয়া লইলেও চলিতে পারে । গোলকের দাম আজকাল বড় বেশী নহে । বাঙ্গালা গোলক একটা ২।৩ টাকা ও ইংরাজী গোলক একটা ৫।৬ টাকা হইলেই পাওয়া যায় । তবে এগুলি বড়ই ছোট । বন্ধুর-মানচিত্র ৪।৫ টাকা দামে বিক্রয় হইয়া থাকে । পরিশিষ্টে বন্ধুর-মানচিত্র ও গোলক প্রস্তুতের প্রণালী লিখিত হইল ।

কতকগুলি ছবির দরকার । যে সকল জীবজন্তু বা পদার্থ আমাদের সংগ্রহ করা অসাধ্য বা কষ্টকর নয়, সে সমস্তের প্রতিকৃতির আবশ্যক করে না । যাহা সচরাচর আমরা দেখিতে পাই না বা সংগ্রহ করিতে পারি না, সেইগুলির ছবি বা পুস্তলিকা সংগ্রহই বিশেষ আবশ্যক । যথা, পুস্তকে বালকেরা ঈগল পাখীর বিষয় পাঠ করে কিন্তু কোন দিন দেখে নাই বা সহজে দেখিবারও কোন সম্ভাবনা নাই । ঈগলের একখানা ছবি এইজন্য বিশেষ আবশ্যক । নিম্নে এইরূপ অল্প কয়েকখানি আবশ্যক ছবির নাম লেখা গেল :—

বন মানুষ, স্টেবোর্ডনার্ড কুকুর, জিরাফ, ব্যাঘ্র, উষ্ট্র, সিন্ধুনোটক, কাঙ্গারু, সিংহ, খেত-ভল্লুক, হস্তী, তিমি, বল্গাহরিণ, জেব্রা, ঈগলপাখী, উটপাখী, ময়ূর, পিরামিড, তাজমহল, বেলুন (বোম্বান), উড়োকল, বাতিঘর ।

বিদ্যালয়ের জন্য এ সকল ব্যতীত ক্লকঘড়ি বা টাইম্পিস্, পেটাঘড়ি, পিতলের ঘটি, গেলাস, দোয়াত, কলম প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক জিনিসের আবশ্যক হইয়া থাকে । হাতুড়ী, বাটালী, করাত, জুপ্যাচ, মার্ভুল প্রভৃতি এক প্রস্ত মিজির যন্ত্র রাখাও প্রয়োজন ।

মিউজিয়ম ।—পদার্থ পরিচয় বা তদ্রূপ কোন বিষয় শিক্ষা দিবার

অন্য বিদ্যালয়ে কতকগুলি দ্রব্যের সংগ্রহ রাখা আবশ্যিক। ছাত্র ও শিক্ষকেরাই এ সমস্ত জিনিষ বিনাব্যয়ে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তবে বস্তুগুলি রক্ষার নিমিত্ত একটী আলমারী আর মুখ বড় সাদাবর্ণের (কুইনাইন শিশির মত) কতকগুলি শিশি আবশ্যিক। কি কি জিনিষ সংগ্রহ করা কর্তব্য, নিয়ে তাহার নাম প্রদত্ত হইল। ধান, চাল, কলাই প্রভৃতি শিশিতে রাখিয়া দ্রব্যের নাম, প্রাপ্তির স্থান ও তাহার অন্য কোন বিশেষ গুণ থাকিলে তাহা, একখানা কাগজে লিখিয়া, শিশির গায়ে আঁটিয়া দিতে হইবে।

কৃষিজাত—সকল প্রকারের ধান, চাল, কলাই, ডাইল, সর্বপ, তিল, তিসি, সোরগোঁজা, যব, গম, ভুট্টা প্রভৃতি ; তুলা, পাট, রেশম, পশুতোম, সূত্রপ্রদ দ্রব্য ইত্যাদি।

শিল্পজাত।—সূতা, দড়ি, কাপড়, মতরঞ্চ, কম্বল, মাদুর, পাটী, কুশাসন, কাগজ, মাটির বাসন, পিতল কাসার বাসন, বোতাম, চিকণী, সাবান, আতব, গোলাপ, হাওেল, নিব পেন্সিল ইত্যাদি।

বনজাত।—নানা প্রকারের কাঠ, বাঁশ, বেত, লতা।

খনিজাত।—নানা প্রকারের প্রস্তর, প্রস্তরীভূত হাড় ও গাছ, পাথুরে কয়লা, ও নানা-রকমের মাটি, টিন, সিসা, লোহা, অক্স।

সমুদ্রজাত।—ঝিনুক, শঙ্খ, শঙ্খা, কড়ি, প্রবাল।

এই প্রকার নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে। যে গ্রামের বিদ্যালয়, সেই গ্রামে, তাহার নিকটবর্তী গ্রামসমূহে ও সেই জেলায় যে সমস্ত জিনিস উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রথমে সেইগুলিই সংগ্রহ করিবে। পরে অন্যান্য দ্রব্য স্রবিশা মত সংগ্রহ হইলে ভাল, না হইলে ক্ষতি নাই। এ সকল দ্রব্য সংগ্রহের বিশেষ আবশ্যিকতা এই যে দেশে কি কি দ্রব্য পাওয়া যায় ও উৎপন্ন হয় এইরূপ সংগ্রহে তাহার জ্ঞানলাভ হয়।

বস্তুগুলি বালকেরা নিজে সংগ্রহ করিলে, সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান আরও উত্তম হয়। শিক্ষকেরাও অনেক সময় এই সকল বস্তুর সাহায্যে পাঠ সরলীকৃত করিতে পারেন। মনে করুন, আপনি পাথুরিয়া কয়লা

বিষয়ে পাঠ দিতেছেন । কাঠ কয়লা, কোঁক কয়লা ও পাথুরিয়া কয়লায় তফাৎ কি, তাহা বুঝিতে হইলে দ্রব্যের সাহায্য ব্যতিরেকে কি.বুঝান সম্ভব ? তিন বকমের কয়লা বালকদিগের সম্মুখে রাখিয়া দিলে, তাহারা চক্ষু ও হস্তের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কয়লা বিষয়ে এত জ্ঞানলাভ করিবে, যাহা শিক্ষক পাঁচ দিনে বক্তৃতা করিয়া দিতে পারিবেন না । সকল জিনিষ সংগ্রহ করা অবশ্য সম্ভবপর নহে, কিন্তু তাই বলিয়া কোন জিনিষই সংগ্রহ করিবার আবশ্যকতা নাই, এ কথাও যুক্তিযুক্ত নয় ।

পুস্তকালয় বা লাইব্রেরী ।—বিদ্যালয় দরিদ্র হইলেও অতি আবশ্যকীয় দশ বারখানি পুস্তক ক্রয় করা প্রয়োজন । নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়েও নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রাখা নিতান্তই আবশ্যক :—(১) অভিধান (সুবল), (২) শুভঙ্করী (৩) শিশুরঞ্জন পাটীগণিত (কালীপদ), (৪) পাটীগণিত (যাদব), ভূগোল (শশিভূষণ), ভারতবর্ষের ইতিহাস (হরপ্রসাদ) বাঙ্গালার ইতিহাস (রাজকৃষ্ণ), ভূচিত্রাবলী (শশিভূষণ), ব্যাকরণ (তারিণী) এবং শিক্ষাপদ্ধতি, পদার্থ পরিচয়, কিণ্ডারগার্টেন বিষয়ক পুস্তক । অবস্থা ভাল হইলে যোগীন্দ্র সরকার, আশুতোষ কৃত শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলিও রাখা আবশ্যক । বালকদিগকে বিদ্যালয়পাঠ্য ব্যতীত অগ্রাণ্ড পুস্তক পড়িতে দিলে তাহারা যথেষ্ট উৎসাহ পাইবে ও আনন্দ উপভোগ করিবে । বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল হইলে যে সকল পুস্তক রাখা আবশ্যক তাহার তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল ।

পুস্তকগুলি আলমারীতে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিতে হইবে । প্রত্যেক পুস্তকে বিদ্যালয়ের নামাক্ষিত মোহরের ছাপ দিবে । একখানি বাঁধা খাতায় পুস্তকের তালিকা রাখা আবশ্যক । পুস্তকগুলি (অনেক পুস্তক হইলে) বিষয় অনুসারে ভাগ করিয়া খাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লিখিতে হইবে । সাধারণতঃ এইরূপ বিভাগ করিলেই চলিবে :—

অভিধান—সাধারণ অভিধান, বিশকোষ, বাঙ্গালা ভাষার লেখক, জীবনীকোষ প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। (টিকিটের উপরে সংক্ষেপে “অ” লিখ)।

সাহিত্য—প্রবন্ধ, উপাখ্যান, নাটক, উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতি। “সা”।

গণিত—পাঠীগণিত, নীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিত, জমিদারী, মহাজনী, জরিপ ইত্যাদি। “গ”।

ভূগোল ইতিহাস—সাধারণ ইতিহাস, ভূগোল। (ইচ্ছা করিলে জীবনচরিত ও ভ্রমণবৃত্তান্ত এ শ্রেণীর মধ্যে দিতে পারা যায় বা এ সকল সাহিত্যশ্রেণীভুক্তও করা যাইতে পারে)। “ভূ”।

বিজ্ঞান—পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূবিজ্ঞান, চিত্রশিল্প, ব্যায়াম, দর্শন ইত্যাদি। “বি”।

শিক্ষা পদ্ধতি—শিক্ষক সহচর, শিক্ষাপ্রণালী, কিণ্ডারগার্টেন, পদার্থ পরিচয় ইত্যাদি। “শি”।

শ্রেণী পাঠ্য—শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক বা তদ্রূপ ছোট ছোট পুস্তক। “শ্রে”।

বিবিধ—খাজানা আইন, পঞ্জিকা, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি। “বিবি”।

শ্রেণীর পাঠ্য গ্রন্থের পৃথক তালিকা না করিলে অসুবিধা হইয়া থাকে। এক অসুবিধা এই হয় যে আলমারীতে সাহিত্যের বিভাগে ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের’ পার্শ্বেই হয় ত “শিশুশিক্ষা”কে স্থান দিতে হয়, কারণ “শিশুশিক্ষা”ও সাহিত্যগ্রন্থ। আর এক অসুবিধা এই হয় যে নিত্য প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তকের জন্ত প্রত্যহই হয়ত অন্যান্য পুস্তক বিশৃঙ্খল করিতে হয়। এই জন্ত বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী-পুস্তক তালিকায় ‘শ্রেণী-পাঠ্যের’ একটা স্বতন্ত্র বিভাগ থাকা আবশ্যিক।

একটা সিকি আকারের কতকগুলি সাদা কাগজের গোল টিকিট কাটিয়া, তাহার উপর $\frac{সা}{১০}, \frac{ভূ}{১০}, \frac{বি}{১০}$ ইত্যাদি রূপ নম্বর লিখিয়া পুস্তকের পার্শ্বে, নিম্ন হইতে এক ইঞ্চি স্থান বাদ দিয়া, উত্তম আটার দ্বারা আঁটিয়া দিতে হইবে। পুস্তক আলমারীতে সাজাইলে টিকিটগুলি যেন এক লাইনে পড়ে। ইহাতে যদি কোন পুস্তকের পার্শ্বক্ষেপে লিখিত লেখা ঢাকিয়া যায় তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। টিকিটগুলি এক লাইনে না হইলে বিক্রী দেখীয়। এক পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড থাকিলে (যথা—অমিয়নিমাইচরিত ১ম ভাগ, অমিয়নিমাইচরিত ২য় ভাগ, অমিয়নিমাইচরিত ৩য় ভাগ

ইত্যাদি) একটী নম্বর দিয়া তাহার নীচে খণ্ড ক্রমে ১, ২, ৩ লিখিতে হইবে যথা (২১, ২২, ২৩ ইত্যাদি) কিন্তু এক পুস্তক একাধিক খণ্ড থাকিলে (যথা যাদবের পাটীগণিত ৩ খান) একটী নম্বরের নীচে ক, খ, গ লিখিতে হইবে যথা $\frac{৪৫}{ক}$ $\frac{৪৫}{খ}$ $\frac{৪৫}{গ}$ ইত্যাদি । পুস্তক কে কবে পড়িতে লয় ও কবে ফেরত দেয় তাহার হিসাব রাখিবার জন্য পৃথক খাতা আবশ্যক । বালকগণকে পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্যান্য ভাল ভাল পুস্তক ও পত্রিকা পড়িতে সর্বদা উৎসাহিত করিতে হইবে ।

বড় বড় লাইব্রেরীতে এখন দশমিক প্রথা য় নম্বর দেওয়া হয় । ১, ২, ৩... ইত্যাদি ক্রমে নম্বর না দিয়া ১০, ১১, ১২ ১৩, ২০, ২১... ইত্যাদি ক্রমে নম্বর দেওয়া সুবিধাজনক, কারণ বিশ পঞ্চাশ হাজার পুস্তক হইলে ছোট টিকিটেরগায় ৫০২৪৯ এতগুলি অঙ্ক বড় বড় অঙ্করে লেখা যায় না । দশমিক প্রথা অনেকদূর পর্যন্ত বড় সংখ্যা না লিখিয়া চলে । কিন্তু ছোট ছোট লাইব্রেরীতে প্রথম হইতেই এই দশমিক প্রথা অনুসরণ করিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না । তবে দশমিক প্রথার যে আরও একটা সুবিধা আছে, সে সুবিধাটা গ্রহণকরা আবশ্যক । সেটা এই :—মনে কখন আপনার লাইব্রেরীর ক্যাটেলগ (পুস্তক তালিকা) প্রস্তুত করিবার সময় আপনার লাইব্রেরীতে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ক, কপাকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর এই তিনখানি মাত্র পুস্তক পাইলেন । আপনার লাইব্রেরীর পুস্তকগুলির ধারাবাহিক নম্বর ক্রমে এই পুস্তকগুলির নম্বর (মনে কখন) ২০৩, ২০৪, ২০৫ হইয়াছে । ইহারপর রবীন্দ্রনাথের চোথেরবালী, নৌকাডুবা দুইখানি পুস্তক রাখিয়াছেন ও তাহার নম্বর ঐ ধারা অনুসারে হইয়াছে ২০৬, ২০৭ । ইহার পর বৎসব আপনি আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও ঘরেরবাইরে এই তিন খানি উৎকৃষ্ট ক্রয় করিলেন । এখন বঙ্কিমবাবুর পুস্তক বঙ্কিমবাবুর পুস্তকের নিকট ও রবীবাবুর পুস্তক রবীবাবুর পুস্তকের নিকট রাখিতে হইলে দশমিক প্রথার আশ্রয় লইতে হইবে । বঙ্কিমবাবুর পুস্তকের শেষ নম্বর দিয়াছিলেন ২০৫, এখন আনন্দমঠের নম্বর দিন ২০৫'১ ও দেবীচৌধুরাণীর নম্বর দিন ২০৫ ২ (অথবা দশমিক সংখ্যা সমস্ত সংখ্যার নীচে লিখিলেও চলে যথা -২৫'১) আর রবীবাবুর 'ঘরেরবাইরে' পুস্তকের নম্বর দিন ২০৭'১ । তবে ক্যাটেলগে এই পুস্তকগুলির নাম বঙ্কিম বাবুর অন্যান্য পুস্তকের কাছেই যে লিখিতে হইবে তাহা নহে কারণ সেখানে লিখিবার যারগা নাই । এই নূতন পুস্তকগুলির নাম ক্যাটেলগের শেষে দিকে

অন্যান্য নূতন পুস্তকের নীচে লিখিয়া রাখিতে হইবে। কেবল নম্বর মাত্র ভিন্ন দিতে হইবে। এইরূপ দশমিক নম্বর দিয়া আলুমারীতে বন্ধিসবাবুর পুস্তক বন্ধিসবাবুর পুস্তকের ধারে ও রবিবাবুর পুস্তক রবিবাবুর পুস্তকের ধারে রাখিয়া দিলে বন্ধিসবাবুর সকল পুস্তক ও রবিবাবুর সকল পুস্তক এক সঙ্গে পাইবার সুবিধা হইবে।

খাতাপত্র।—বালকগণের ভর্তির রেজেষ্ট্রী ও দৈনিক উপস্থিতির রেজেষ্ট্রী, এই দুইখানিই সর্কাপেক্ষা আবশ্যকীয়। ভর্তি রেজেষ্ট্রীতে এইরূপ ঘর করিয়া ক্রল কাটিয়া লইবে। (১) ক্রমিক নম্বর, (২) প্রথম ভর্তির তারিখ, (৩) পুনর্বর্তির ভর্তির তারিখ (Re-admission যাহাদের নাম কাটা যায় তাহাদের জন্য), (৪) বালকের পূর্ণ নাম, (৫) জাতি (হিন্দু—ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, পাটনী ; মুসলমান—সিয়া, সুন্নি ইত্যাদি), (৬) বাসস্থান (গ্রাম, থানা ও জেলা), (৭) পিতার নাম, (৮) অভিভাবকের নাম, (৯) অভিভাবকের ঠিকানা (গ্রাম, ডাকঘর, জেলা), (১০) বালকের বর্তমান বাসস্থান (হোটেল, মেস, আশ্রমের বাসা বা নিজবাড়ী) (১১) বালকের জন্মের তারিখ (সন ও মাস), (১২) বালকের জন্ম তারিখ কি প্রকারে নিশ্চিত জানা গেল (কোষ্ঠী, অভিভাবকের এফিডেবিড, গ্রামের লোকের সাক্ষ্য বা পিতামাতার বর্ণনা), (১৩) পূর্বে কোন বিদ্যালয়ে পড়িয়াছে কি না (সেই বিদ্যালয়ের নাম), (১৪) পূর্বে বিদ্যালয়ের যে শ্রেণীতে পড়িয়াছে তাহার নাম, (১৫) পূর্বে বিদ্যালয়ের প্রদত্ত সার্টিফিকেট নম্বর ও তারিখ, (১৬) বিদ্যালয় পরিত্যাগের তারিখ, (১৭) বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার কারণ, (১৮) মন্তব্য। (বালক যখন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যাইবে সেই সময়েই ১৬।১৭ সংখ্যক ঘর পূরণ করিতে হইবে)।

ডবল ফুলফ্যাপ আড়ীর কাগজে একটা বড় খাতা করিয়া উভয় পৃষ্ঠায় না লিখিলে এতগুলি ঘর ধরিবে না। ভর্তিপুস্তকের কাগজ ও বাইণ্ডিং উত্তম হওয়া আবশ্যক। কারণ, এ পুস্তক অতি যত্নে রক্ষা করিতে হইবে। পর পৃষ্ঠায় দৈনিক-উপস্থিত-রেজেষ্ট্রীর একটা আদর্শ প্রদত্ত হইল।

শিবরামপুর নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালা, জাহ্নবীরি মাস, ১৮৮০.

ক্রমিক নম্বর	বেতন	ভূমির কি	জরিমানা কি*	বকেয়া	মোট	আদায়	আদায়ের তারিখ	আদায়কারীর দস্তখত	ভুক্তি রেজিষ্টারের নম্বর	বিভাগীয় প্রোগ্রাম শিকদার	বয়স
১	১০				১০				৮	শ্রী বিজয়গোবিন্দ শিকদার	১২/৩
২	১০		১০		১০				১৩	শ্রী ইয়াদিন ষাঁ	১১/১
৩	১০			১০	১০	৪১০	ক.স	৩৩		শ্রী প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্তী	১২/৪
৪	১০		১০		১০				১২	শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	১১/৩
৫	১০				১০				২০	শ্রী নগেন্দ্রনাথ দাস	১০/২
৬	১১				০				২২	শ্রী প্রবোধনাথ লাহিড়ী	১১/১
৭	১০	১০			১০				৭৮	শ্রী রামধনদাস দাস	১১/২
৮											
৯											
১০											
১১											
১২											
১৩											
১৪											
১৫											
১৬											
১৭											
১৮											
১৯											
২০											
২১											
২২											
২৩											
২৪											
২৫											
২৬											
২৭											
২৮											
২৯											
৩০											
৩১											
৩২											
৩৩											
৩৪											
৩৫											
৩৬											
৩৭											
৩৮											
৩৯											
৪০											
৪১											
৪২											
৪৩											
৪৪											
৪৫											
৪৬											
৪৭											
৪৮											
৪৯											
৫০											
৫১											
৫২											
৫৩											
৫৪											
৫৫											
৫৬											
৫৭											
৫৮											
৫৯											
৬০											
৬১											
৬২											
৬৩											
৬৪											
৬৫											
৬৬											
৬৭											
৬৮											
৬৯											
৭০											
৭১											
৭২											
৭৩											
৭৪											
৭৫											
৭৬											
৭৭											
৭৮											
৭৯											
৮০											
৮১											
৮২											
৮৩											
৮৪											
৮৫											
৮৬											
৮৭											
৮৮											
৮৯											
৯০											
৯১											
৯২											
৯৩											
৯৪											
৯৫											
৯৬											
৯৭											
৯৮											
৯৯											
১০০											

তারিখ	১	২	৩	৪
১	১	২	৩	৪
২	১	২	৩	৪
৩	১	২	৩	৪
৪	১	২	৩	৪
৫	১	২	৩	৪
৬	১	২	৩	৪
৭	১	২	৩	৪
৮	১	২	৩	৪
৯	১	২	৩	৪
১০	১	২	৩	৪
১১	১	২	৩	৪
১২	১	২	৩	৪
১৩	১	২	৩	৪
১৪	১	২	৩	৪
১৫	১	২	৩	৪
১৬	১	২	৩	৪
১৭	১	২	৩	৪
১৮	১	২	৩	৪
১৯	১	২	৩	৪
২০	১	২	৩	৪
২১	১	২	৩	৪
২২	১	২	৩	৪
২৩	১	২	৩	৪
২৪	১	২	৩	৪
২৫	১	২	৩	৪
২৬	১	২	৩	৪
২৭	১	২	৩	৪
২৮	১	২	৩	৪
২৯	১	২	৩	৪
৩০	১	২	৩	৪
৩১	১	২	৩	৪
৩২	১	২	৩	৪
৩৩	১	২	৩	৪
৩৪	১	২	৩	৪
৩৫	১	২	৩	৪
৩৬	১	২	৩	৪
৩৭	১	২	৩	৪
৩৮	১	২	৩	৪
৩৯	১	২	৩	৪
৪০	১	২	৩	৪
৪১	১	২	৩	৪
৪২	১	২	৩	৪
৪৩	১	২	৩	৪
৪৪	১	২	৩	৪
৪৫	১	২	৩	৪
৪৬	১	২	৩	৪
৪৭	১	২	৩	৪
৪৮	১	২	৩	৪
৪৯	১	২	৩	৪
৫০	১	২	৩	৪
৫১	১	২	৩	৪
৫২	১	২	৩	৪
৫৩	১	২	৩	৪
৫৪	১	২	৩	৪
৫৫	১	২	৩	৪
৫৬	১	২	৩	৪
৫৭	১	২	৩	৪
৫৮	১	২	৩	৪
৫৯	১	২	৩	৪
৬০	১	২	৩	৪
৬১	১	২	৩	৪
৬২	১	২	৩	৪
৬৩	১	২	৩	৪
৬৪	১	২	৩	৪
৬৫	১	২	৩	৪
৬৬	১	২	৩	৪
৬৭	১	২	৩	৪
৬৮	১	২	৩	৪
৬৯	১	২	৩	৪
৭০	১	২	৩	৪
৭১	১	২	৩	৪
৭২	১	২	৩	৪
৭৩	১	২	৩	৪
৭৪	১	২	৩	৪
৭৫	১	২	৩	৪
৭৬	১	২	৩	৪
৭৭	১	২	৩	৪
৭৮	১	২	৩	৪
৭৯	১	২	৩	৪
৮০	১	২	৩	৪
৮১	১	২	৩	৪
৮২	১	২	৩	৪
৮৩	১	২	৩	৪
৮৪	১	২	৩	৪
৮৫	১	২	৩	৪
৮৬	১	২	৩	৪
৮৭	১	২	৩	৪
৮৮	১	২	৩	৪
৮৯	১	২	৩	৪
৯০	১	২	৩	৪
৯১	১	২	৩	৪
৯২	১	২	৩	৪
৯৩	১	২	৩	৪
৯৪	১	২	৩	৪
৯৫	১	২	৩	৪
৯৬	১	২	৩	৪
৯৭	১	২	৩	৪
৯৮	১	২	৩	৪
৯৯	১	২	৩	৪
১০০	১	২	৩	৪

দৈনিক উপস্থিত একটা কর্ণ বেখার দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে। অনুপস্থিত একটা বড় আকারের শূন্য। হাজিরা ডাকিবার পরে কেহ দেৱীতে আসিলে ঐ বড় শূন্যের মধ্য দিয়া উপস্থিতের রেখা টানিয়া শূন্যের পেট কাটিয়া দিবে। কেহ কোন কার্যোপলক্ষে বিদায় লইলে শূন্যের মধ্যে 'বি', গীড়িত হইলে শূন্যের মধ্যে 'পী' লিখিবে। 'খাইয়া আসি নাই, নিগল্গণ আছে, বাড়ীতে কার্য আছে, পেট ব্যথা করিতেছে' ইত্যাদি আপত্তিতে যাহারা সময়ের পূর্বেই চলিয়া যায়, তাহাদিগের উপস্থিত চিহ্নের উপর বিপরীত দিকে আর এক দাগ কাটিয়া দিবে। কোন ছেলে কত দিন এইরূপ আপত্তি দেখাইয়া বাড়ী চলিয়া যায়, ইহাতে তাহা বুঝিতে পাবা যাইবে। মধ্য বা শেষ ঘণ্টায় রেজিষ্টারী করিতে যদি দুই এক জনকে না পাওয়া যায় তাহা হইলে কর্ণ বেখার দুই দিকে পেন্সিল দিয়া দুইটা বিন্দু দিয়া রাখিবে। পরে অনুসন্ধান করিয়া তাহার অপরাধের বিচার করিবে।

আবশ্যক হইলে বেতন আদায়ের অংশে আরও ২।৪টী ঘর বাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। জরিমানার এক ঘর না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন (অনুপস্থিত, বেতন দানে বিলম্ব, অগ্রায় আচরণ) ঘর করা যাইতে পারে। যে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা কম, সেখানে 'ভর্তি রেজিষ্টার নম্বর' না লিখিলেও চলে। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা অধিক হইলে এই ঘর নিতান্ত আবশ্যক। সার্টিফিকেট দিবার সময়, পরীক্ষায় পাঠাইবার সময় ভর্তি রেজিষ্টারের সহিত মিল করিয়া ছাত্রগণের বয়স লিখিতে হয়। একরূপ নম্বর থাকিলে ভর্তি রেজিষ্টার হইতে নাম বাহির করিতে বিলম্ব হয় না। ভর্তি রেজিষ্টারে ক্রমিক নম্বর বৎসর বৎসর বদলান নিষেধ। বিদ্যালয়ের আব্রু ২ ইতেই একাদিক্রমে নম্বর ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। বিদ্যালয়ে কত ছাত্র পড়িল, ইহাতে তাহার সংখ্যা হইবে। যে ছাত্রের নাম কাটা যায়, সে পুনরায় ভর্তি হইলে, তাহার নামে তাহার সেই সাবেক নম্বরই লিখিয়া রাখিতে হইবে।

এই দুই পুস্তক ব্যতীত, শিক্ষকদিগের হাজিরা-বই, আয়-ব্যয়ের হিসাব, বিলের নকল বহি, চিঠির নকল বহি, চিঠি পত্রাদি আঁটিয়া রাখিবার ফাইল, বিজ্ঞাপন-পুস্তক, পরীক্ষার নথির খাতা, বাজে খরচের খাতা, পরিদর্শন-পুস্তক প্রভৃতি আরও কতকগুলি খাতার প্রয়োজন। এ সকল খাতা প্রস্তুত প্রণালী বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ সময় সময় নির্দেশ করিয়া থাকেন। সমস্ত খাতাই যেন এক আকারের হয়। ফুলক্ষ্যাপের আকারই সর্বত্র প্রচলিত।

এ সকল ছাড়া বিলাতি স্কুলে “লগ্‌বুক” (বিবরণী) নামক একখানা অতিরিক্ত পুস্তক ব্যবহৃত হয়। এই লগ্‌বুকে প্রতি শনিবারে বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি অতি সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়। কিন্তু ইহাতে কোন বিষয় সম্বন্ধে ভাল-মন্দ মন্তব্য প্রকাশ করিবার রীতি নাই। নিম্নে এই লগ্‌বুক লিখিত বিবরণের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :—

১২।৭।০৮ শুক্রবার—রথযাত্রা উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ থাকিল।

১৩।৭।০৮ শনিবার—তৃতীয় শ্রেণীর প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্তী কলেরাধ মারা গেল।

১৫।৭।০৮ সোমবার—বাবু চন্দ্রনাথ ঘোষ, ২য় শিক্ষক মাতৃশ্রদ্ধা উপলক্ষে ১ মাসের বিদায় লইলেন। বাবু রমানাথ রায় তাঁহার স্থানে ৩০ টাকা বেতনে এক মাসের জন্য নিযুক্ত হইলেন।

১৮।৭।০৮ বুধসপ্তমবার—অত্যন্ত বৃষ্টির জন্য দৈনিক উপস্থিত সংখ্যা যথেষ্ট কম হইয়াছে।

১৯।৭।০৮ শুক্রবার—ইন্সপেক্টর সাহেব অল্প হিসাবের খাতাপত্র পরীক্ষা করিলেন।

২০।৭।০৮ শনিবার—ইন্সপেক্টর সাহেব প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অঙ্ক পরীক্ষা করিলেন ও ভূগোল শিক্ষা দিবস প্রণালী দেখাইলেন।

২৩।৭।০৮ মঙ্গলবার—বাজারে আগুন লাগায় ১টার সময় বিদ্যালয় বন্ধ হইল। প্রথম শ্রেণীর শ্রীনাথ ঘোষ, দ্বিতীয় শ্রেণীর লালমোহন মুখার্জি আগুন নিবাইবার জন্য খুব পরিশ্রম করিয়াছিল।

১৮।০৭ বৃহস্পতিবার—সন্ধ্যার সময় পুরস্কার বিতরণের সভা হয় । ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত উড়ুসাহেব সভাপতি । রাধাচরণ রায় (উকিল), যদুনাথ দে (ডেঃ মাঃ) ও নগেন্দ্রনাথ (শিক্ষক) বক্তৃতা করেন । ম্যাজিস্ট্রেট 'স্বন্দর আবৃত্তির' জন্য ৩য় শ্রেণীর বিপিনচন্দ্র দাসকে টাকা দিলেন । খাঁ বাহাদুর দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্বোত্তম মুসলমান বালককে প্রতি বৎসর টাকা মূল্যের পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন ।

১৮।০৭ বুধবার—লাট সাহেব বিদ্যালয় পরিদর্শন করিলেন । ড্রিল দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন । প্রথম শ্রেণীতে শ্যামাচরণ দত্ত ও রাজচন্দ্র বহুর পড়া শুনিলেন ।

১৮।০৭ শুক্রবার—৭ম শ্রেণীতে ব্যাকরণের পুস্তক ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল । শিক্ষককে মৌখিক শিক্ষা দিতে উপদেশ দেওয়া গেল ।

১৮।০৭ শনিবার—ব্যায়ামের পরীক্ষা গৃহীত হইল । প্রথম যুন্সেফ বাবু কিশৌবী মোহন সেন, উকীল বাবু গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন ।

১৯।৮।০৭ সোমবার—মাধ্যমিক পরীক্ষা আরম্ভ হইল ।

১৯।৮।০৮ মঙ্গলবার—পুস্তক দেখিয়া নকল করার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর নবদ্বীপচন্দ্র দাসকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল—ইত্যাদি ।

ভর্তি রেজিষ্টার, দৈনিক রেজিষ্টার, শিক্ষকদিকের হাজিরা পুস্তক, বিলের নকল বহি, হিসাব-পুস্তক প্রভৃতি খাতা লিখিবার সময় খুব সাবধানে লিখিতে হইবে । কোনরূপ ভুল হইলে তাহা একটা লাইনের দ্বারা কাটিয়া দিয়া পুনরায় লিখিবে ; কিন্তু কখন ছুরি কিম্বা ইরেজারের দ্বারা টাছিবে না । কোন খাতার কোন পাতা নষ্ট হইয়া গেলে তাহাও লম্বালম্বি টান দিয়া কাটিয়া রাখিলে, কিন্তু কখনও পাতা ছিঁড়িবে না, কি খাতায় নূতন পাতা লাগাইবে না । বালকদের দৈনিক ঐপস্থিতির রেজিষ্ট্রী অন্ততঃ পনের বৎসর রক্ষা করিতে হইবে । ভর্তির রেজিষ্টার, শিক্ষকের হাজিরা-বহি, চিঠির নকল-বহি, লগবুক, চিঠিপত্রাদির ফাইল প্রভৃতি যাহাতে কখনই নষ্ট না হয় সে বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে ।

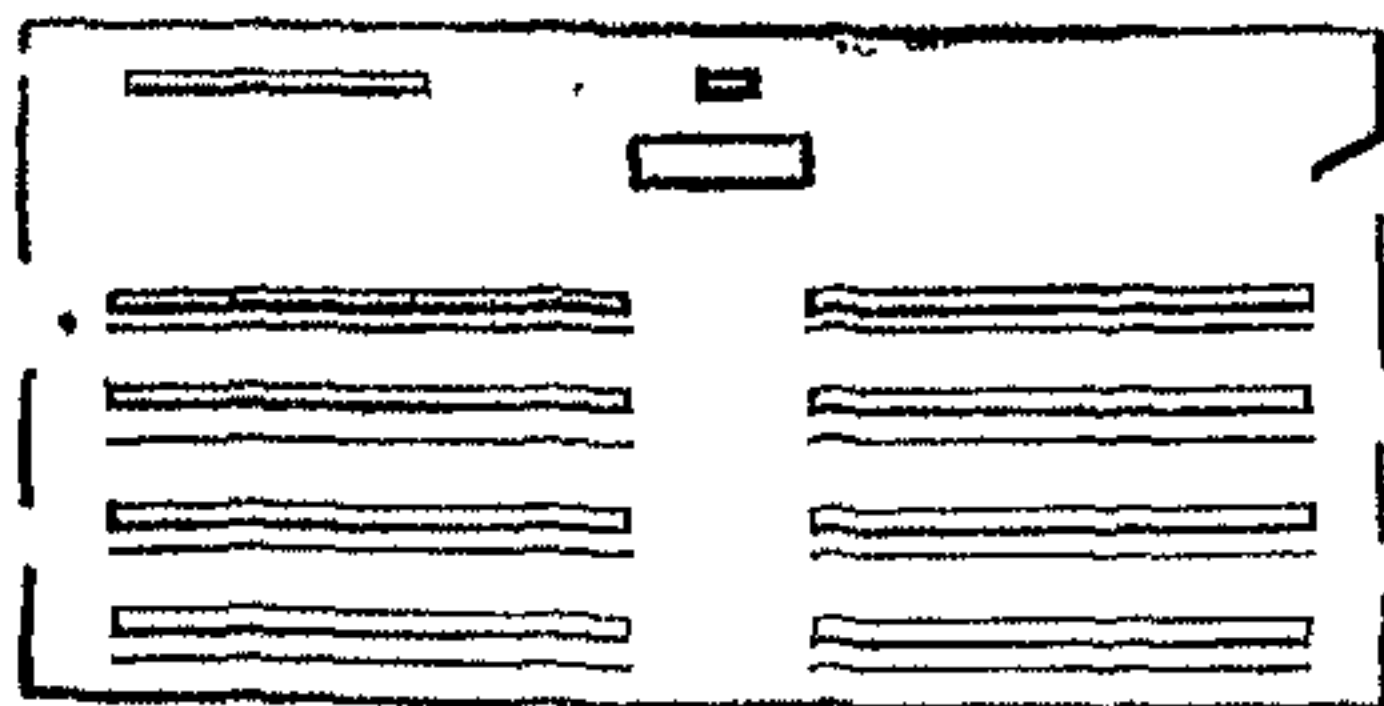
এ সমস্ত বিষয় বিলাতের শিক্ষা বিভাগের প্রকাশিত আইন হইতে গৃহীত হইল। তবে আমাদিগের অবস্থা বিবেচনায় দুই এক স্থানে ১৭-কিঞ্চিৎ মাত্র পরিবর্তন করা হইয়াছে।

শ্রেণীবিভ্যাস।—ছাত্রসংখ্যা, শ্রেণীসংখ্যা, শিক্ষকসংখ্যা ও বিদ্যালয় কক্ষের পরিমাণ দৃষ্টে শ্রেণীবিভ্যাস কবিতো হয়। যে বিদ্যালয়ে শ্রেণীসংখ্যার পরিমাণমত শিক্ষকসংখ্যা আছে সেখানে বড় বিশেষ বুদ্ধি খরচ করিতে হয় না। কেবল নিম্নলিখিত নিয়মানুসরণ কবিলেই চলিতে পারে :—

(১) যে দেওয়ালে জানালা কি দরজা নাই, সেই দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া বালকেরা বসিবে। মানচিত্র, বোর্ড, ছবি প্রভৃতি সেই দেওয়ালে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে।

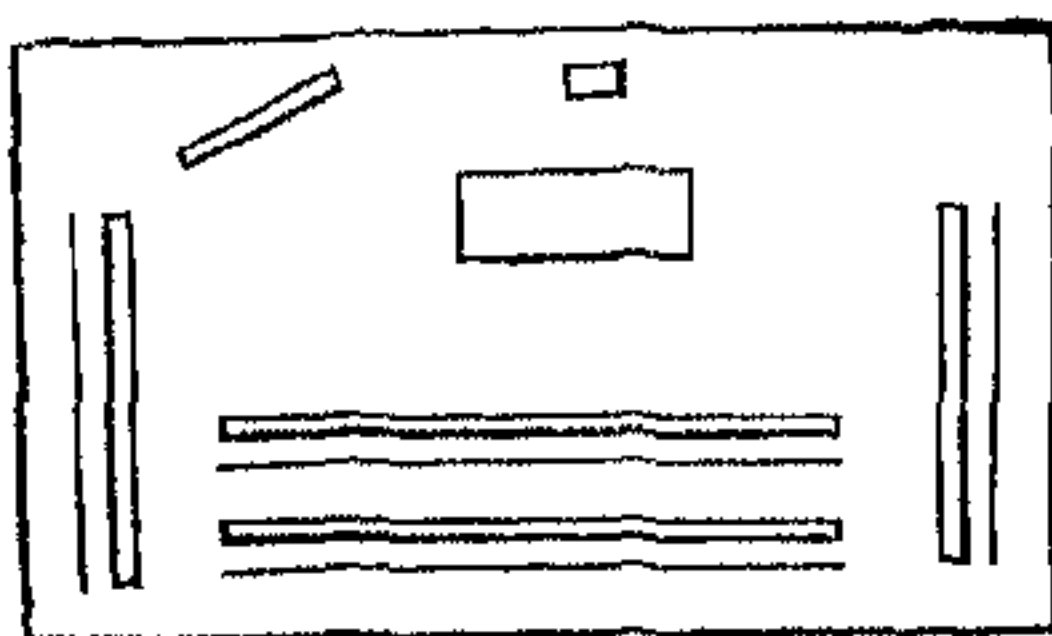
(২) যে দিক হইতে কক্ষে আলোক প্রবেশ করে, সে দিক বালকের বামে থাকিবে। আলোক বাম হইতে আসিলে কাগজে হাতের ছায়া পড়ে না। পশ্চাৎ হইতে আলোক আসিলে নিজের শরীরের ছায়ায় পুস্তকাদি ছায়াযুক্ত হয়। তবে গৃহের দোষে যদি একরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে সুবিধামত যে কোনরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু আলো প্রবেশের পথ কিছুতেই ঘেন সন্মুখে না পড়ে। ইহাতে চক্ষুর যত্ননা উপস্থিত হইতে পারে।

(৩) বেঞ্চ ও ডেস্কগুলি পূর্ব পর অর্থাৎ একখানার পশ্চাতে আর একখানা সাজাইতে পারিলে ভাল হয়। যদি শ্রেণীর শ্রমবালক ৩০ এর অধিক হয়, তবে শিক্ষকের বসিবার আসন ও টেবিল একখানা তক্তপোষের উপর রাখিয়া উচ্চ করিয়া দিতে হইবে। তাহা না হইলে পশ্চাতের ছাত্রগণ শিক্ষকের সহজ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িবে। এক লাইনে দুইখানা বেঞ্চ ও ডেস্ক দিলেই ভাল হয়। যথা—



১ম চিত্র ।—শ্রেণীবিন্যাস (উত্তম ব্যবস্থা) ।

ঘর ছোট হইলে, কি এরূপ ভাবে বেঞ্চ সাজান অসুবিধা হইলে, বালকেরা শিক্ষকের তিন দিকেও বসিতে পারে ; যথা :—



২ম চিত্র ।—শ্রেণীবিন্যাস (মধ্যম ব্যবস্থা) ।

(৪) বালকেরা এরূপ ফাঁকে ফাঁকে বসিবে যে, তাহারা যেন বেশ স্বচ্ছন্দে নড়াচড়া করিতে পারে । লিখিবাসময় যেন তাহাদের হাত নাড়িতে অসুবিধা না হয় । দাঁড়াইলে যেন ডেস্কে বাধা না পায় ।

(৫) ছুইখানি বেঞ্চের মধ্যে একপু স্থান থাকা আবশ্যক যে, শিক্ষক যুরিয়া ফিরিয়া সকল বালকের কার্য্য দেখিতে পারেন ।

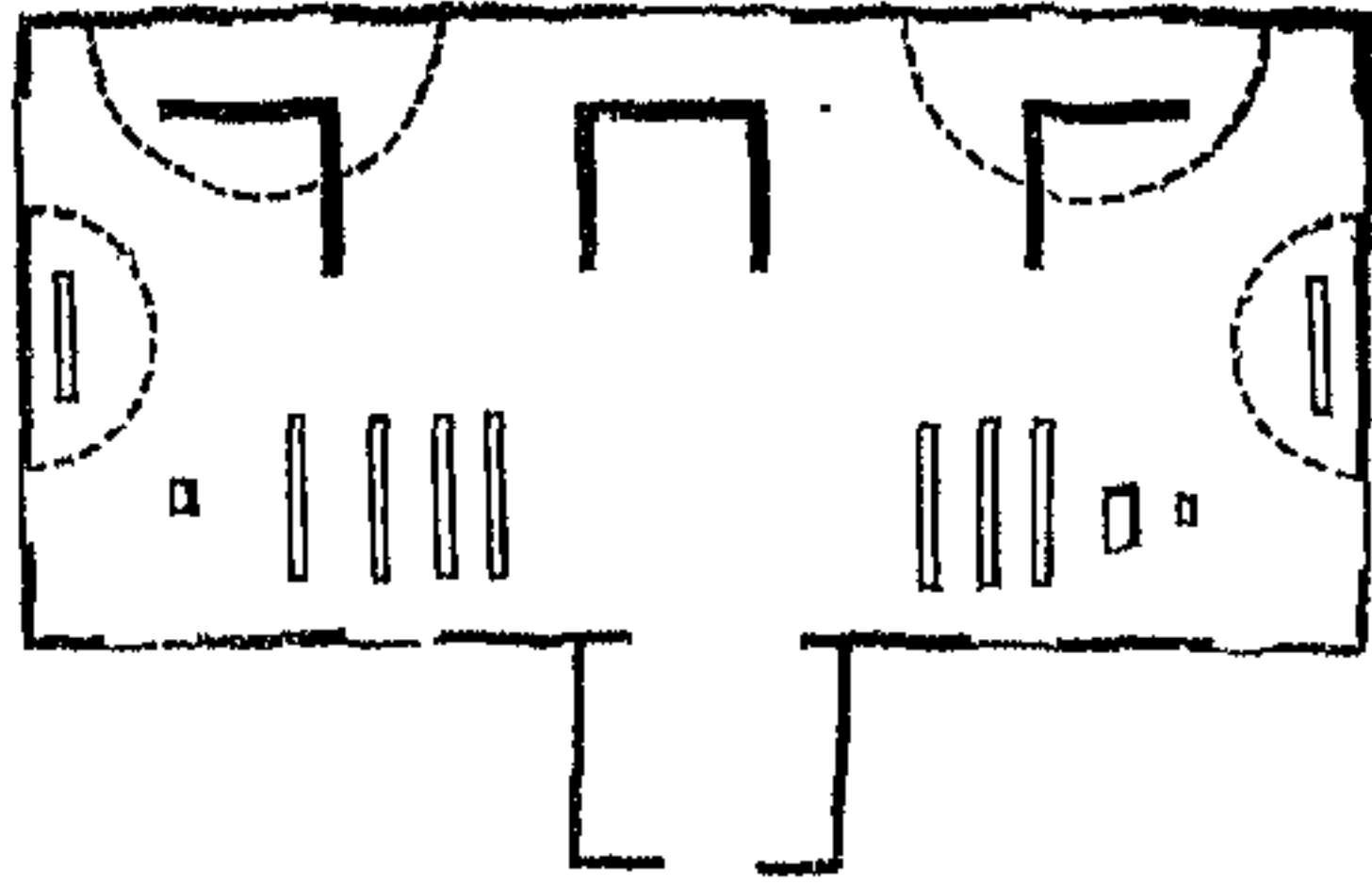
(৬) ব্ল্যাকবোর্ড শিক্ষকের পশ্চাতের দেওয়ালে, দক্ষিণে কি বামে, একধারে (ঠিক মধ্যভাগে নয়) ঝুলান থাকিবে । শিক্ষকের দক্ষিণে হইলেই

উত্তম । বোর্ডগুলি ফ্রেমে বাঁধা বা ইজিনে রক্ষিত হইলে, সেগুলিও এইরূপ স্থানেই রাখিতে হইবে । ঘর ছোট হইলে বোর্ডখানি ঠিক পশ্চাতের দেওয়ালের সহিত সমান্তর না রাখিয়া একটু কাণাচ ভাবে রাখিলে সুবিধা হইবে (৮ চিত্রের বোর্ডের অনুরূপ) । শিক্ষক, বোর্ডে লিখিয়াই তাহার বাম পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইবেন ও সেই স্থান হইতে হাত কিস্বা দর্শনী কাঠির দ্বারা বোর্ডে লিখিত বিষয় ছাত্রগণকে বুঝাইবেন । শিক্ষাদানে বোর্ডেব মত আবশ্যক আসবাব খুব কমই আছে । সুতরাং এই বোর্ডে অন্ততঃ বৎসরে একবার রঙ ফিরাইবার ব্যবস্থা করা কর্তব্য । (পরিশিষ্টে রঙ করিবার প্রণালী লিখিত হইল) ।

(৭) যে স্থান হইতে শ্রেণীর সকল ছাত্র সহজে শাসন করা যাইতে পারে, শিক্ষক একরূপ স্থানে বসিবেন ।

এইরূপ কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পালন করিলেই শ্রেণীবিভাগ সুবিধাজনক হইতে পারে । কিন্তু যে সকল বিদ্যালয়ে শ্রেণীর সংখ্যানুযায়ী শিক্ষক নাই, সে সকল বিদ্যালয়ে শ্রেণীবিভাগে বিশেষ বুদ্ধি খরচ করা আবশ্যক । একটা দৃষ্টান্ত দিলেই এ বিষয়ের কিছু তত্ত্ব বুঝান যাইবে । এ কেবল দৃষ্টান্ত মাত্র, অবস্থা ভেদে ইহার পরিবর্তন করিয়া লইতে হইবে ।

মনে কর, একটা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, অবস্থা মধ্যম, দুইজন শিক্ষক— একজন প্রধান ও একজন সহকারী বা একজন মনিটার । পাঁচটা শ্রেণী— ১ম শ্রেণী (নিম্ন প্রাথমিক পাঠ্য,) ২য় শ্রেণী (বোধোদয়,) ৩য় শ্রেণী (শিশুশিক্ষা ৩য় ভাগ), ৪র্থ শ্রেণী (২য় ভাগ), ৫ম শ্রেণী (১ম ভাগ) । একটা মাত্র ঘর । প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকেরা বেঞ্চে বসে, অগ্র তিন শ্রেণী মাটিতে, চটে বা মাদুরে বসে । এক শিক্ষককে এক সময়ে অন্ততঃ দুইটা শ্রেণীর ভার লইতে হয় । একরূপ স্থলে নিম্নের চিত্রানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ সম্ভবতঃ অনেক স্থলেই সুবিধাজনক হইবে :—



৯ম চিত্র ।—নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালার শ্রেণীবিভাগ ।

(স্থল কালরেখা-চিহ্নিত তিন শ্রেণীতে চট বা মাহুরের আসন ; এই তিন শ্রেণীতে তৃতীয় শ্রেণী এবং চতুর্থের ক, খ শাখা বসে । অপর দুইটি শ্রেণীতে বেক—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্ত) ।

এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হইলে শিক্ষক একস্থানে বসিয়াই ২ কি ৩ শ্রেণীর বালকগণকে সহজে কার্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিবেন ।

যখন উপরের শ্রেণীর ছাত্রেরা কোন লেখার কার্যে নিযুক্ত থাকিবে, তখন শিক্ষক নিম্ন শ্রেণীতে সাহিত্যাদি পড়াইবেন ; আবার নিম্ন শ্রেণী যখন লিখিবে বা কিওয়ারগার্টেন খেলায় ব্যাপ্ত থাকিবে, তখন শিক্ষক উপরের শ্রেণী পড়াইবেন । (এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা পর অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) । বালকদিগকে কেবল সকল সময় বসাইয়া না রাখিয়া, কোন কোন পাঠের সময় দাঁড় করাইয়া পাঠ দিলে ভাল হয় । অনেকগণ একভাবে বসিয়া থাকিলে বালকেরা বিরক্তিবোধ করে ।

কোন কোন বিষয় শিক্ষা দিবার সময়, কি নিম্ন, কি উচ্চ, সকল শ্রেণীর বালককেই বিন্দু দ্বারা (৯নং চিত্রে) চিহ্নিত স্থানে বৃত্তাক্ষের মত লাইনে দাঁড় করাইয়া পাঠ দিবার ব্যবস্থা করা উচিত । অঙ্ক, জ্যামিতি, ভূগোল, সহজ ড্রইং, পদার্থ পরিচয় প্রভৃতি বিষয়গুলি দেওয়ালে মাপ

কি ছবি ঝুলাইয়া বা বোর্ডের নিকট দাঁড় করাইয়া শিক্ষা দেওয়া যায়। ডাক নামতা, শতকিয়া, কড়াকিয়া প্রভৃতি গৃহের বাহিরে, বা বৃষ্টির সময় ভিতরে এক লাইনে দাঁড়াইয়া পড়িবে। উচ্চ শ্রেণীর বালকেরা এইরূপ দাঁড়াইয়া কোন কার্য্য করিবার সময় নিম্ন শ্রেণীর বালকেরা বেঞ্চে বসিয়াও কোন কোন কার্য্য করিতে পারে। এরূপ স্থান পরিবর্তনে বালকগণের বেশ ক্ষুতি হয়।

সময়-নির্দেশক-পত্র বা রুটীন।—যে কার্য্য যে সময়ে নির্বাহ করিতে হইবে তাহা পূর্বে নির্দিষ্ট থাকিলে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না। পরন্তু কোন্ দিন কোন্ সময়ে কাহাকে কোন্ কার্য্য করিতে হইবে তাহা জানা থাকিলে সকলেই স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারে। ইহাই রুটীনের আবশ্যিকতা। শিক্ষকের স্বব্যবস্থাবিষয়ক কৃতিত্ব তাঁহার রুটীনে প্রকাশ। রুটীন প্রস্তুত করিতে বুদ্ধি বিবেচনা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় করিতে হয়। শিক্ষকের সংখ্যা, তাঁহাদিগের বিষয় বিশেষে পারদর্শিতা, শ্রেণীর সংখ্যা, শ্রেণীস্থ বালকদিগের চরিত্র, পাঠদানের সময়, পাঠ্যবিষয়ের আধিক্য ও কাঠিগু, দৈনিক কার্য্যের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয় উত্তমরূপে বিচার করিয়া রুটীন প্রস্তুত করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের ফলাফল এই রুটীনের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। রুটীন প্রস্তুত বিষয়ে বিশেষ কোনরূপ বাঁধাবাধি নিয়ম নাই, সমস্তই অবস্থানুযায়ী করিতে হইবে। তথাপি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে পারিলে ভাল হয় ;—

(১) রুটীন সাধারণতঃ তিন প্রকারে লিখিত হইয়া থাকে :—প্রথম শিক্ষকগণের জন্ত রুটীন অর্থাৎ কোন্ শিক্ষককে, কোন্ ঘণ্টায়, কোন্ শ্রেণীতে কি বিষয় পড়াইতে হইবে। (এই রুটীনের মন্তব্যের ঘরে, প্রত্যেক শিক্ষক সপ্তাহে কত ঘণ্টা কাজ করেন তাহাও লিখিত থাকিবে। দ্বিতীয়, শ্রেণীর জন্ত রুটীন অর্থাৎ কোন্ শ্রেণীতে কোন্ ঘণ্টায় কোন্

শিক্ষক কি পড়াইবেন? (এই রুটীনের মন্তব্যের ঘরে প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রত্যেক বিষয় সপ্তাহে কত ঘণ্টা করিয়া পড়ান হয় তাহাই লিখিত হইবে)। তৃতীয়, ছাত্রদিগের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দৈনিক কার্যের রুটীন। এই রুটীনে সোম, মঙ্গল প্রভৃতি বারক্রমে কোন্ ঘণ্টায় কোন্ শিক্ষক কি বিষয় পড়াইবেন তাহাই লিখিত থাকিবে। ১ম ও ২য় প্রকারের রুটীন আফিস ঘরে থাকিবে, ৩য় প্রকারের রুটীন শ্রেণীতে শ্রেণীতে ঝুলাইয়া দিতে হইবে।

(২) প্রথমেই একটা স্থায়ী রুটীন না করিয়া শিক্ষকগণের জন্ত একটা অস্থায়ী (খসড়া) রকমের রুটীন প্রস্তুত করিয়া লইবে। সেই রুটীন অনুসারে অন্ততঃ এক সপ্তাহ কার্য্য করিয়া যদি বুঝিতে পার যে রুটীন উপযোগী হইয়াছে, তখন স্থায়ী রুটীন প্রস্তুত করিয়া লইবে এবং সেই রুটীন দৃষ্টে ২য় ও ৩য় প্রকারের রুটীন প্রস্তুত করিবে। রুটীন এরূপ সরল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে লিখিতে হইবে যে, পরিদর্শকগণ রুটীন দেখিলেই যেন বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্য্য বুঝিতে পারেন।

(৩) বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত রুটীনের নিয়মের অগ্রথা করিতে নাই। বৎসরের প্রথমে যে শিক্ষক যে শ্রেণীতে যে বিষয় শিক্ষাদান আরম্ভ করেন, বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত তিনি সেই কার্য্যই করিবেন। বৎসরের মধ্যভাগে কোন শিক্ষকের পরিবর্তন হইলে, তাঁহার স্থানীয় নূতন শিক্ষককে পূর্ব্ব শিক্ষকের কার্য্যই করিতে দিতে হইবে। ইহাতে এক আধটুকু অসুবিধা হইলেও তত ক্ষতি হইকেনা। কিন্তু যাহারা বৎসরের প্রথম হইতে এক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের বিষয় বা কার্য্যের পরিবর্তন হইলে শ্রেণীর ক্ষতি হইবে ও তাঁহাদের দায়িত্ব কমিয়া যাইবে।

(৪) যে শিক্ষক যে বিষয় ভাল পড়াইতে পারিবেন, তাঁহাকে সেই বিষয়ই পড়াইতে দেওয়া উচিত। কিন্তু হাই স্কুলের হেড মাষ্টার পর্য্যন্ত

একরূপ ব্যক্তি হওয়া উচিত, বাহারা নিজ নিজ শ্রেণীর সমস্ত বিষয়ই পড়াইতে সক্ষম—এবং আবশ্যক হইলে ড্রিল ড্রইং করাইতেও সমর্থ ।

কারসিয়াং ট্রেনিং কলেজে (দারজিলিংয়ের নিকট) অবস্থিতি কালে দেখিয়াছি, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শ্রেণীর সম্পূর্ণ ভার এক একজন শিক্ষকের হাতে । আমাদিগের স্কুলেও পূর্বে একরূপ নিয়ম ছিল এবং এই নিয়ম হইতেই হেডমাষ্টার, সেকেন্ড মাষ্টার, থার্ড মাষ্টার ইত্যাদি নামকরণ হইয়াছিল । এখন অধ্যাপকী রীতি প্রবেশ করিয়াছে । ইহাতে কার্যের সুবিধা হইতেছে বলিয়া আমাদিগের বোধ হয় না । আমরা সেই সাবেকী প্রথাকেই এখনও ভাল বলিয়া থাকি । উপরের শ্রেণীর তত অনিষ্টকর না হইলেও, এই অধ্যাপকী রীতি নিম্ন শ্রেণীর পক্ষে যে অনিষ্টকর তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।

(৫) যে সকল বিষয় পাঠে অত্যধিক মানসিক ক্লান্তি জন্মে, সে সমুদয় প্রথম ও তৃতীয় ঘণ্টায় পড়াইতে হইবে । শেষ ঘণ্টায় বালকেরা ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়ে ; সেই জন্ত শেষের দিকে সহজ ও সুখকর বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে । কোন্ বিষয় কি পরিমাণ ক্লান্তিজনক, তাহা নিম্নের তালিকা দৃষ্টে মোটামুটি বুঝিতে পারা যাইবে । গণিত (পাটীগণিত ব্যতীত অগ্ৰাণু বিষয়) শাস্ত্রকে সর্বাপেক্ষা কঠিন বিষয় ধরিয়া যদি তাহার কাঠিন্যকে এক শতের দ্বারা নির্দেশ করা যায়, তবে অগ্ৰাণু বিষয়ের কাঠিন্য নিম্নলিখিতরূপে কমিয়া আসিবে :—

গণিত	১০০	পাটীগণিত	৮২
সংস্কৃত	}	উর্দু বা হিন্দী	৮২
আরবী		মাতৃভাষা	৮০
ইংরাজী		পদার্থপরিচয়	৮০
ইতিহাস		চিত্রাঙ্কণ	৭৭
ভূগোল	৮৫	নীতি	৭৭

(জর্মান পণ্ডিত লাহুইগ ওয়াগনারের মতাবলম্বনে)

কিন্তু এ মত সর্ববাদী সম্মত নহে । সংসারে কোন্ মতই বা সর্ববাদী সম্মত হয় ? আমাদের কর্তৃপক্ষগণ নিম্নশ্রেণীতে প্রথমে পাটীগণিত পড়িতে উপদেশ দিয়া থাকেন, তৎপরে ভূগোল ও তৎপরে সাহিত্য । অগ্ৰাণু

বিষয় সর্বশেষে। যাহা হউক, এ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা অনেকটা শিক্ষকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে।

(৬) প্রথম ঘণ্টায়, বা অবকাশের অব্যবহিত পর ঘণ্টায়, লেখা কি চিত্রাক্ষণের কার্য্য করাইবে না। অনেক দূর হইতে হাঁটিয়া আসিলে বা কিছুক্ষণ কোন পরিশ্রমের কাজ করিলে শরীরের যে চাঞ্চল্য জন্মে, তাহা শীঘ্র নিবারিত হয় না। সুতরাং এইরূপ পরিশ্রমের পর কলম কি পেন্সিল ধরিলে, হাতের চাঞ্চল্য বশতঃ লেখা বা রেখা মনোমত হইবে না। বিদ্যালয়ের প্রথম ঘণ্টায় ব্যায়ামাদি করান বাঞ্ছনীয় নহে। বালকেরা আহার করিয়াই বিদ্যালয়ে আইসে, এমন অবস্থায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া ডিল করিলে পেটে ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা।

(৭) ছোট ছোট বালকেরা কোন বিষয়ে এক সঙ্গে অধিকক্ষণ মনোযোগ রাখিতে পারে না। এই নিমিত্ত নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীতে কোন বিষয় এক সঙ্গে ২০ মিনিটের অধিককাল শিক্ষা দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে; উচ্চ শ্রেণীতে ৩০ মিনিট। উচ্চ প্রাইমারীতে ৪০ মিনিট ও মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণীতে ৪৫ মিনিট কাল পর্য্যন্ত এক বিষয় চলিতে পারে। তবে বিষয়ের কাঠিষ্ঠ ভেদে সময়ের তারতম্য হইয়া থাকে।

যদি শ্রেণীসংখ্যা অসুযায়ী শিক্ষকসংখ্যা না থাকে, বা যদি এক শ্রেণীর সমস্ত ভার একজনের উপর না থাকে, বা যদি শিক্ষককে ঘণ্টায় ঘণ্টায় শ্রেণী বদলাইতে হয়, তাহা হইলে এক বিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ সময়বিভাগ অসুবিধাজনক হইয়া উঠে। যে নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয়ে দুইজন মাত্র শিক্ষক, কিন্তু শ্রেণী ৫টী, সে স্কুলের কিরূপ রুটীন করিলে চলিতে পারে, অপর পৃষ্ঠায় তাহার একখানি আদর্শ দেওয়া গেল। কিন্তু যে বিদ্যালয়ে একজন মাত্র শিক্ষক, সে বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনায় উচ্চ শ্রেণীর বালকগণের অনেকটা সাহায্য লওয়া দরকার হয়। এ কার্য্যের রুটীন করা শক্ত। শিক্ষকের শক্তি সামর্থ্য ও বুদ্ধি বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ



নির্ভর । যাহাকে “পড়ান” বলে, একজন শিক্ষকের দ্বারা পাঁচ শ্রেণীর সে কার্য চলে না । তবে বাড়ী হইতে বালকেরা যাহা শিখিয়া আইসে, তাহার পরীক্ষা লওয়ার কার্য চলিতে পারে । অতি নিম্ন সংখ্যায়, ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ৩ জন শিক্ষক, একজন মনিটর ; উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে ২ জন শিক্ষক, এক জন মনিটর ; এবং নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে এক জন শিক্ষক ও এক জন মনিটর থাকা আবশ্যক ।

(৮) কোন্ পুস্তকের কতদূর এক বৎসরে পড়াইতে হইবে, প্রথমে তাহা নির্ধারণ করিবে । প্রত্যেক মাসে কতদূর পড়াইলে সেই কার্য শেষ হইবে তাহার হিসাব করিবে । তারপর প্রত্যহ কোন্ বিষয়ের কি পরিমাণ আলোচনা আবশ্যক তাহা বিবেচনা করিয়া রুটীন প্রস্তুত করিতে হইবে ।

(৯) একটা নির্দ্ধারিত সময়ের অন্তরে, প্রত্যেক বিষয়ই যাহাতে রুটীন-নিবিষ্ট হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অর্থাৎ ক্রমাগত সাহিত্যই পড়ান হইতেছে বা অঙ্কই কসান হইতেছে, সেরূপ ব্যবস্থা করা সুবিধাজনক নয় । বিষয়ের পরিবর্তনে কার্যে আনন্দ ও উৎসাহ বৃদ্ধি হয় । এই জন্য রুটীনে এক বিষয়ই প্রত্যহ বা সমস্ত ঘণ্টায় না পড়াইয়া একটা নির্দ্ধারিত সময়ের অন্তর, প্রতি সপ্তাহে সমস্ত বিষয়ের আলোচনার ব্যবস্থা করা আবশ্যক ।

রাধানগর নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালা ।

১৯০৭ সনের সময়-নির্দেশ-পত্র ।

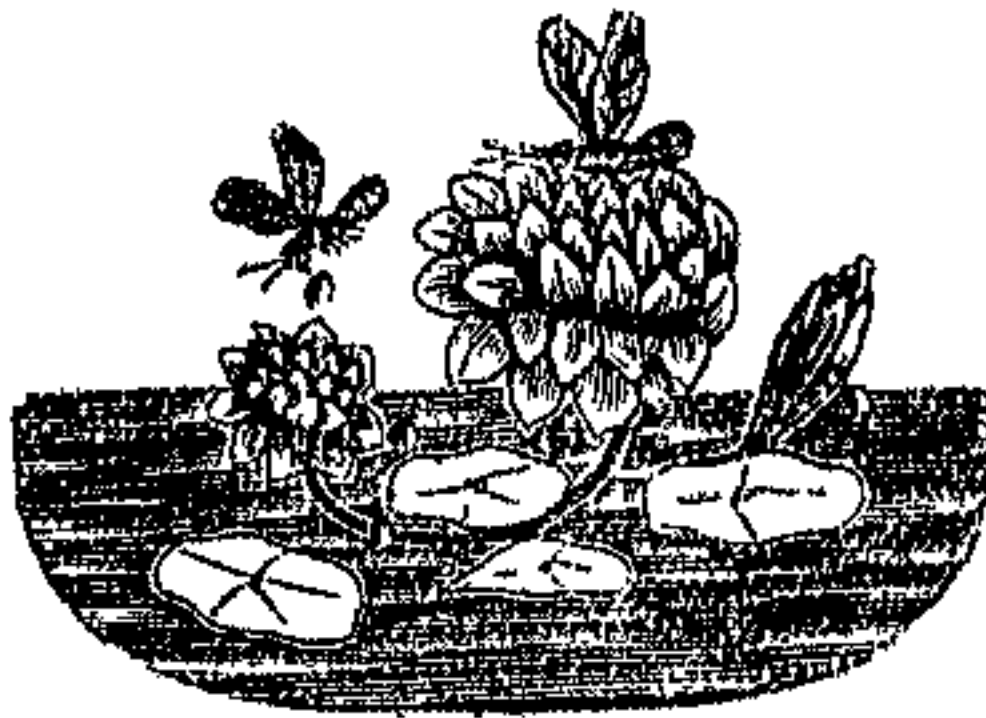
সময়	প্রথম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী (ক)	৪র্থ শ্রেণী (খ)
১—১১	সাহিত্য (প্রথম শিক্ষক)	দলিল বা চিঠি দেখিয়া লেখা	সাহিত্য (দ্বিতীয় শিক্ষক)	পুস্তক দেখিয়া লেখা	বীজ মাজান
১২	পূর্বঘণ্টার সাহিত্য পাঠের সারাংশ লেখা বা দলিল ও চিঠি লেখা	সাহিত্য (প্রথম শিক্ষক)	পুস্তক দেখিয়া লেখা	বর্ণপরিচয় (২য় শিক্ষক)	কাঠি মাজান

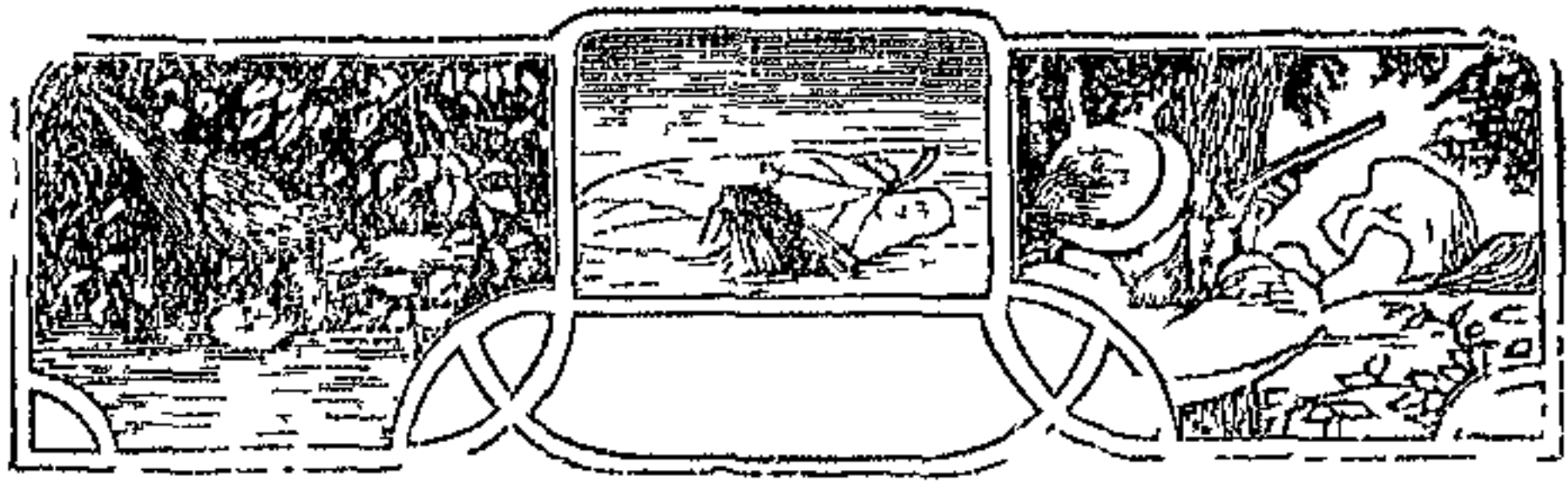
সময়	প্রথম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী (ক)	৪র্থ শ্রেণী (খ)
১২—১২½	পাঠীগণিত (১ম)	ক্রতলিপি (ছাত্রের সাহায্যে)	বীজ বা কাঠি সাজান।	বীজ কাঠি সাজান।	বর্ণপরিচয় (২য়)
১২½—১	অঙ্কন।	অঙ্কন।	পাঠীগণিত (১ম)	পাঠীগণিত (১ম)	লেখা (২য়)
১—১½	ক্রতলিপি (ছাত্রের সাহায্যে)	পাঠীগণিত। (২য়)	অঙ্কন।	অঙ্কন। (১ম)	অঙ্কন। (১ম)
১½—২	পত্র আবৃত্তি ১৫ মিনিট ড্রিল ১৫ মিনিট (১ম)	পত্র আবৃত্তি ১৫ মিনিট ড্রিল ১৫ মিনিট (১ম)	পত্র আবৃত্তি ১৫ মিনিট ড্রিল ১৫ মিনিট (২য়)	পত্র আবৃত্তি ১৫ মিনিট ড্রিল ১০ মিনিট (২য়)	পত্র আবৃত্তি ১৫ মিনিট ড্রিল ১০ মিনিট (২য়)
২—২½	বিশ্রাম বা খেলা	বিশ্রাম বা খেলা	বিশ্রাম বা খেলা	বিশ্রাম বা খেলা	বিশ্রাম বা খেলা
২½—৩	ডাকনামতা সও- রাইয়া দেড়িয়া ম, ও বু, মানসাক্ষ সো, বু, শু, (১ম)	ডাকনামতা সও- রাইয়া দেড়িয়া ম, ও বু, মানসাক্ষ সো, বু, শু,	ডাকনামতা বা কড়াকিয়া বুড়ি পণ চৌক সের কাঠা ইত্যাদি (২য়)	ডাকনামতা বা কড়াকিয়া গুণ্ডা বুড়ি পণ চৌক ইত্যাদি।	ডাকনামতা বা কড়াকিয়া গুণ্ডা বুড়ি পণ - ইত্যাদি।
৩—৩½	পরিমিতি ম, বু, জমিদারী মহাজনী সো, বু, শু, (১ম)	পরিমিতি ম, বু, জমিদারী মহাজনী সো, বু, শু,	ক্রতলিপি (২য়)	০	০
৩½—৪	ভূগোল সো, বু, শু, পদার্থপরিচয় ম, বু (১ম)	ভূগোল ম, বু, পদার্থপরিচয় সো, বু, শু, (২য়)	০	০	০
৪—৪½	কৃষি সো, বু, শু, ঐতিহাসিক গল্প ম, বু, (১ম শিক্ষক)	০	০	০	০

উপরেণ কটানে যে স্থানে শিক্ষকের নাম লেখা হইল না, সে স্থানে বুলিতে হইবে যে, শ্রেণীর নিকটস্থ শিক্ষকই তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

প্রত্যেক শিক্ষককেই অন্ততঃ নিরূপিত সময়ের ১০ মিনিট পূর্বে বিদ্যালয়ে আসিতে হইবে । ৫ মিনিট পূর্বে শ্রেণীতে উপস্থিত হইয়া রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে ও হাজিরী লইতে হইবে । বালকেরাও ১ম ঘণ্টা বাজিবার ৫ মিনিট পূর্বেই (ওয়ানিং বা সতর্ক কারবার জন্ত যে ঘণ্টা দেওয়া হয় সেই সঙ্গে) শ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিবে । ঠিক ১০ বা ১১টার সময় (অর্থাৎ স্কুল বসিবার নির্দিষ্ট সময়) হইতে কার্য আরম্ভ হইবে ।

গ্রাম্য পাঠশালায় প্রায়ই ঘড়ি থাকে না । সুতরাং ঘণ্টাভাগ করিয়া কাজ করা অসম্ভব । তারপর যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকসংখ্যা কম, সেখানে ঘণ্টা ভাগ করিয়া কাজ করা আরও অসম্ভব । তবে ছোট ছোট ছেলেদের পাঠশালায় ঘণ্টা ভাগ করিয়া কাজ করাইবার তেমন আবশ্যকতাও নাই । একটা ঘণ্টা-ভাগ-করা রুটীন থাকিবে বটে, কিন্তু তাহাই যে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা নহে । অবস্থাভেদে কোন বিষয়ে কম, কোন বিষয়ে বেশী সময় দেওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে । কেবল ইহাই দেখিতে হইবে যে দৈনিক পাঠের বিষয়গুলি, দৈনিক পরিমাণ মত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে ।





দ্বিতীয় অধ্যায়—শুশাসন বিষয়ক ।

শুশাসন বলিলে প্রধানতঃ ছাত্রশাসনই বুঝিতে হইবে। তবে বিদ্যালয়ের চাকর চাকরাণী ও সময়ে সময়ে কোন কোন সহকারী শিক্ষককেও শাসন করা আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু সকল শাসন অপেক্ষা বড় শাসন 'আত্মশাসন'। যিনি নিজকে শাসন করিতে জানেন না, তিনি অত্মকে শাসন করিবেন কিরূপে? অত্মকে যাহা করিতে উপদেশ দিবে বলিয়া মনে কর, সর্বাগ্রে তাহা নিজে প্রাণপণ যত্নে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। কার্য্যে ও মুখে এক না হইলে তোগ্যর শিক্ষায় বা শাসনে কোন ফলোদয় হইবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে সর্বপ্রধান গুণ 'সময়নিষ্ঠা'। সময়নিষ্ঠ শিক্ষক অতি মুর্থ হইলেও বালকদিগের যে পরিমাণ উপকার করিতে পারেন, সময়াপহারী বিদ্বান্ শিক্ষক তাহার শতাংশের এক অংশও কবিত্তে পারেন কি না সন্দেহ। "নিরূপিত সময়ে নিরূপিত কাজ করিতে হইবে"—বিদ্যালয়ের কার্য্যে সুফল লাভ করিবার ইহাই মূলমন্ত্র। যে শিক্ষক তাত্যহ নিরূপিত সময়ের কিছু পূর্বেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া থাকেন, "শিক্ষকের হাজিরা" বইতে বাহার নাম কোন দিন বিলম্বে আসিবার অপরাধে 'ক্রস' * চিহ্ন দ্বারা কলঙ্কিত হয়

* শিক্ষক যে সময়ে বিদ্যালয়ে আসিয়া থাকেন তাহা শিক্ষকগণের হাজিরা বইতে লিখিত হয়। যদি কেহ বিলম্বে আসেন তবে তাঁহার আগমনের সময় প্রধান শিক্ষক লাল কাকির দ্বারা (+) চিহ্নিত করিয়া রাখেন। পরিদর্শকগণের সহজেই সেই দিকে দৃষ্টি পড়ে।

না, যিনি ঘণ্টা বাজিবাগাত্র শ্রেণীতে গিয়া উপস্থিত হন—বিশ্রামগৃহে বসিয়া ধূমপানে বা লাইব্রেরীতে বসিয়া বৃথা গল্পে কালহরণ করেন না, যিনি শ্রেণীতে গিয়াই কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন—বালকদিগের সঙ্গে বাজে গল্প বা কোতুক করিয়া সময়াপহরণ করেন না—তিনিই, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি কিছু কম হইলেও—‘উত্তম শিক্ষক’ পদবাচ্য । যদি বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষকের সমস্ত গুণ একসঙ্গে প্রকাশের উপযোগী কোন কথা থাকে, তবে সে কথা ‘সময়নিষ্ঠ’ ।

(১) সময়নিষ্ঠা ।—সুশাসনের দ্বারা সফল লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথমে নিজে সময়নিষ্ঠ হইবে ও বালকদিগকে, সহকারী শিক্ষকগণকে এবং ভূতাবর্গকে সময়নিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিবে । মহরের বালকগণ আজকাল কিছু পরিমাণ সময়নিষ্ঠ হইয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয় পল্লীগামের অবস্থা এখনও অপরিবর্তিত রহিয়াছে । গ্রামের হাই স্কুলে যদিও কিছু উন্নতি বৃদ্ধিতে পারা যায় কিন্তু মধ্য বাঙ্গালা, উচ্চ প্রাইমারী ও নিম্ন প্রাইমারী স্কুলের অবস্থা শোচনীয় । বেলা ১০টা হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ২টা পর্য্যন্ত ছাত্র আসিতেই থাকে । শিক্ষকগণের অবস্থাও তদ্রূপ । প্রধান আপত্তি “রাগ্না হইয়াছিল না” । এ অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে শিক্ষকগণকে যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে, আব ছাত্রের জন্ত অপেক্ষা না করিয়া যথাসময়ে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে । যদি বালকগণের বিশ্বাস থাকে যে, শিক্ষকগণও দেরী করিয়া স্কুলে বাইয়া থাকেন, আর অংহাদিগের স্কুলে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করেন না, তখন তাহারা কেন দেরী করিবে না ? যদি দুই তিন দিন একরূপ বৃদ্ধিতে পারে যে, শিক্ষক তাহাদের জন্ত অপেক্ষা করেন না, তখন তাহারাও যথাসময়ে উপস্থিত হইতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করিবে । কিন্তু ইহার সঙ্গে আরও একটা কথা আছে, বালকেরা যে বিদ্যালয়ে আসিবে তাহার একটা বিশেষ আকর্ষণ চাই । অধ্যাপনায়

যদি বালকেরা আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, যদি তাহারা বুঝিয়া থাকে যে বিদ্যালয়ে গেলেই নূতন নূতন আনন্দদায়ক জ্ঞানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কত নূতন জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়, কত রকমের নূতন খেলা খেলিতে পারা যায়, শিক্ষকদিগের নিকট কত আমোদের গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, কত আদর, কত যত্ন, ভালবাসা পাওয়া যায়, তবে তাহারা সমস্ত ফেলিয়া, এমন কি না খাইয়া পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে চলিয়া আসিবে। বালকের আগ্রহ ও সময়নিষ্ঠা দেখিলে পিতামাতাও তাহার জন্য উপযুক্ত সময়ে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। অনেক সময় অভিভাবকেরা শিক্ষকদিগের বিশৃঙ্খল কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া তাঁহাদিগের নিজ নিজ বালকগণের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হন না। শিক্ষক গ্রামের আদর্শ—জ্ঞান-রাজ্যের রাজা। যদি শিক্ষক নিজের গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তবে তাঁহার দ্বারা কেবল যে ছাত্রগণের কল্যাণ হইবে এমন নহে, ছাত্রগণের পিতামাতার—এমন কি সমস্ত গ্রামেরই প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

বালক দেৱী করিয়া বিদ্যালয়ে আসিলে তাহার বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান করিবে; সে কারণ প্রকৃত কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিবে; ৩ দিনের অধিক এই অপরাধ করিলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে দিবে না। সময় নাই, অসময় নাই, যখন ইচ্ছা তখন যদি বালকেরা শ্রেণীতে প্রবেশ করে, তবে শ্রেণীর অত্যাচার বালকগণেরও মনোযোগে বাধা পড়িবে। বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়া বালকগণের এই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করাইতে হইবে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা।—শিক্ষক নিজে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে বিদ্যালয়ে আসিবেন। বিদ্যালয়ের জন্য এক প্রস্থ পোষাক পৃথক রাখা উচিত। গরীবও ইহা পারেন—একখানা পরিষ্কার ধুতি, একটা পরিষ্কার জামা ও একখানা পরিষ্কার চাদর। বিদ্যালয়ের দ্রব্য-গুলি যথাস্থানে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কি না, প্রত্যহ তাহার অনুসন্ধান

করিবেন । ঘরের দরজা, টেবিল, চেয়ার, ডেস্ক, ঘরের মেজে উপযুক্তরূপে পরিষ্কার করা হইয়াছে কি না তাহা দেখিয়া লইবেন । রেজেষ্টারী পুস্তক, দোয়াত, কলম, চক, বাঁড়ন প্রভৃতি শ্রেণীতে শ্রেণীতে দেওয়া হইতেছে কি না তাহাও দেখিবেন । তারপর বালকেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কি না তাহার তত্ত্ব লইবেন । 'ছেলেদের দাঁত, হাত, হাতের নখ, পা পরিষ্কার কি না ; ধুতি জামা, চাদর প্রভৃতি পরিষ্কার কি না ; পুস্তক, খাতাপত্র, সুট পরিষ্কার কি না, এই সকল পরীক্ষা করিবেন ও তাহার প্রতিবিধানের উপায় দেখিবেন । বালকেরা এ সমস্ত বিষয়ে অণ্ণের বিনা সাহায্যে, সাহায্য বা বিনা ব্যয়ে, নিজেরাই মনোযোগী হইতে পারে ও এ সমস্ত মলিনত্ব পরিত্যাগ করিতে পারে । বালকদিগের মাথায় চুল খুব ছোট করিয়া কাটা উচিত । যে সকল বালকের মাথায় বড় বড় চুল, তাহারা চুলগুলি হাত দিয়াই হউক, কি চিরুণী দিয়াই হউক, পরিপাটী করিয়া রাখা কি না ; তাহাদের জামার বোতাম আছে কি না, আর সেগুলি আঁটে কি না তাহাও দেখিবেন ।

কারসিয়ং ভিক্টোরিয়া স্কুলে সাহেবের ছেলেরা পড়ে । স্কুলের সঙ্গে ছাত্রনিবাস আছে, বালকেরা সেইখানে থাকে । তাহাদের মাথায় চুল খুব ছোট করিয়া কাটা ; পোষাক পরিচ্ছন্ন এক রকমের, সামান্য থাকী কাপড়ের ; ইহাই ব্রহ্মচর্য্য । আমাদেরও সেকালে ইহাই ছিল । আর এখন আমাদের কি হইয়াছে ? আমাদের স্কুলের ছাত্রগণ সিঁথির উপর এলবাট কাটিয়া, ডবল প্লেট মাটের উপর হাই কলার জাঁটিয়া, চাদর খানি নানা রকমের চুনট করিয়া, বাঁশবেড়ের কার্তিক মাজিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় । আবার কেহ হয় ত দুই পায়ে দুইরকমের জুতা পরিয়া, লজ্জা নিবারণ হওয়া স্বকঠিন—এইরূপ ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া, ধোয়া জামার উপর ময়লা চাদর গায়ে দিয়া, বড় বড় চুলগুলি পাগলের মত এলো থেলো করিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় । দুইই দোষের, কিন্তু বিলাসিতায় বালকগণ যত অধঃপাতে যায়, নোংরাগীতে তত নয় । বিলাসিতার অন্তরালে কত যে কুৎসিত ভাব লুক্কায়িত থাকে, তাহা বলাবাহুল্য । অতএব সর্বপ্রথমে এই বিলাসিতার ভাব বিকাশ করিতে চেষ্টা করিবেন । ছাত্রগণের জন্য একটা বিশেষ পোষাকের ব্যবস্থা করিলে কেমন হয় ?

তার পর বিছালয়ে আসিয়া পুস্তকগুলি গুছাইয়া রাখে কি না ; ছাতা-
গুলি ঠিক স্থানে রাখে কি না ; গায়ে চাদর দিয়া বেশ ফাঁকে ফাঁকে বেঞ্চে
বসিয়া থাকে কি না ; পা নাচান, মাথা চুলকান, পান কি কাপড় চিবান,
পেন্সিল কামড়ান প্রভৃতি কু-অভ্যাসে আসক্ত কি না, ইহাও লক্ষ্য করিতে
হইবে। ছুরি দিয়া বেঞ্চ ও ডেস্ক কাটা, দেওয়ালে পেন্সিল দিয়া লেখা,
ঘরে থুথু ফেলা, কলম বাড়িয়া কালি ফেলা প্রভৃতি আরও অনেক রোগ
আছে। শিক্ষক খুব সতর্ক না থাকিলে বিছালয়ের কার্য চালাইতে পারিবেন
না। যখন যে কোন জটী চোকে পড়িবে, তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসন্ধান
করিয়া বিচার করিতে হইবে। যদি ছাত্রেরা একবার বুঝিতে পারে যে,
শিক্ষকের চক্ষু খুব তীক্ষ্ণ, তাহা হইলে তাহারা আর নিজ নিজ বদ্ অভ্যাসকে
প্রশ্রয় দিতে সাহস করিবে না।

(৪) নকল করা।—রোগের প্রতিকার অপেক্ষা রোগ না হইতে
দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। নকল করিলে বালককে শাস্তি দিতে হইবে—ইহার
ব্যবস্থা না করিয়া, যাহাতে নকল করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই
সঙ্গত। পরীক্ষার সময় বালকগণকে যতদূর ফাঁকে ফাঁকে বসান যাইতে
পারে তাহার বিধান করা কর্তব্য। সম্মুখে পুস্তক, খাতা বা কোনরূপ
কাগজ থাকিলে তাহা অল্প স্থানে সরাইয়া রাখিতে হইবে। আর যাহারা
তত্ত্বাবধান করিবেন, তাঁহারা খবরের কাগজ না পড়িয়া যাহাতে বালকগণের
দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, সেরূপ ব্যবস্থা করা কর্তব্য। এইরূপ উপায়
অবলম্বন করিলে নকল করিতে পারিবে না বলিয়া বোধ হয়। নীচের
শ্রেণীর অর্থাৎ ১০, ১১ বৎসর বয়সের বালকের পকেট পরীক্ষা করা যাইতে
পারে। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর বালকগণ ইহাতে একটু অপমানিত মনে করে।
পরীক্ষায় তত্ত্বাবধান ভাল হইলে, পকেটে কাগজ থাকিলেও বাহির করিতে
সাহস পাইবে না। বালকদিগের শয়তানী নানা রকমে দেখিতে পাওয়া
যায়; পায়ের নীচে জুতার মধ্যে কাগজ রাখে, কাছার সঙ্গে পুস্তকের পাতা

বাঁধিয়া রাখে, কোটের আস্তিন বা শার্টের কাফের নীচের পিঠে ইতিহাসের তারিখ লিখিয়া আনে, হাতে অতি সূক্ষ্মভাবে পেন্সিল দিয়া কত কথ লিখিয়া রাখে । যদি চোরের মত সমস্ত বালকের সমস্ত কাপড়চোপড় ও হাত পা পরীক্ষা করিতে হয়, তবে সে এক বিরাট ব্যাপার হইয়া পড়ে । আবার ততদূর করিলেও অনেক সময় ধরিতে পারা যায় না । আর ভদ্র সন্তানদিগকে একটা সাধারণ পরীক্ষাগৃহে একরূপ ভাবে খানাতল্লাসীর অধীন করা ভদ্রোচিতও নহে । একটু সতর্ক দৃষ্টি থাকিলেই পরীক্ষাস্থলে কেহ কোনরূপ অশ্রায় কার্য্য করিতে সাহস করিবে না । নিতান্তই যে বালক এইরূপ অশ্রায় উপায়ে পরীক্ষা পাস করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাহাকে পরীক্ষা দানে বঞ্চিত করিবে । অন্য শ্রেণীতে উঠিবার জন্য সে যে অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার ফল সে এইরূপে হাতে হাতেই ভোগ করিবে ।

শ্রেণীতেও একজনের অঙ্ক দেখিয়া অন্তে নকল করিতে চেষ্টা করে । ইহা নিবারণের জন্ত কেহ কেহ একটা অঙ্ক না দিয়া এক সময়ে এক রকমের দুইটা অঙ্ক কসিতে দিয়া থাকেন, প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম প্রভৃতি বিজোড়সংখ্যক বালকেরা একটা অঙ্ক কসে ; দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি জোড়সংখ্যক বালকেরা অন্য অঙ্ক কসে । কাজেই কেহ কাহারও নকল করিতে সুবিধা পায় না । কেহ কেহ আবার বেঞ্চের এদিক ওদিক করাইয়া অর্থাৎ প্রথম বালক উত্তর মুখে, দ্বিতীয় বালক দক্ষিণ, তৃতীয় উত্তর, এইরূপ ভাবে বসাইয়া দেন । ইহাতেও নকল করার অসুবিধা হয় ।

শ্রেণীতে ও পরীক্ষাস্থলে এক বালক অন্যকে ফুসু ফুসু করিয়া নানা কথা বলিয়া সাহায্য করিতে বা পাইতে চেষ্টা করে । শ্রেণীতে দুই এক দিন খুব কড়া শাসন করিলে ও পরীক্ষাস্থান হইতে একবার ২১ জনকে বাহির করিয়া দিলে, আর কেহ একরূপ করিতে সাহস করিবে না । ফলকথা শিক্ষককে সর্বদাই চক্ষু কর্ণ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে ।

এ সমস্ত ত প্রতিকারের কথা । কিন্তু এ রোগের মূল কোথায় ? প্রায়ই দেখা যায় যে বালক নিজের অজ্ঞতা লুকাইবার জন্তই এরূপ করিয়া থাকে । এরূপ অজ্ঞতা লুকাইবারই বা কারণ কি ? শিক্ষকের কঠোর শাসন বা পিতামাতার ভৎসনার ভয় বা অন্তের জ্ঞানের সহিত নিজের জ্ঞান যোগ করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক বাহাদুরী লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা । এই সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকার করা সুশিক্ষকের কর্তব্য । যে না জানে, তাহাকে শিখাইয়া দিতে হইবে । শাসনের আধিক্যে বালককে ভীত করিয়া না তুলিলেই, সে সরল ভাবে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিবে । বালক যদি বুঝিতে পারে যে শিক্ষক তাহাকে স্নেহে সর্বদা সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তবে সে নিজের অজ্ঞতা গোপন করিবে না ।

বালকদিগের মনে এই সকল অশ্রায় কার্যের প্রতি একটা বীতশ্রদ্ধা উৎপন্ন করাইয়া দিতে পারিলে, সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ হয় । উচ্চশ্রেণীতে এইরূপে অনেক সময় বালকদিগের সাধুতার উপর নির্ভর করিয়া শ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া গিয়া, দেখা গিয়াছে যে বাস্তবিক কেহ নকল করে নাই । যদি প্রত্যেক শ্রেণীতে অন্ততঃ একটা ছাত্রকে একপ ভাবে গঠিত করা যায় যে, সে এ সকল কার্য সর্বাস্তঃকরণে ঘৃণা করে, তবে তাহার সম্মুখে কোন বালক কোনরূপ অশ্রায় কার্য করিতে সাহস করিবে না ।

(৬) সাধারণ দুষ্কামী ।—বালকেবা মিথ্যা কথাও অনেক সময় ভয়বশতঃ বলিয়া থাকে । কোন একটা অশ্রায় কার্য করিয়াছে, কিন্তু পাছে স্বীকার করিলে শাস্তি পাইতে হয়, এই ভয়ে, মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলে । আমরা ক্রমশঃ বালককে ভাগ্য করিবার জন্তই কঠোর শাসন করিয়া থাকি ; কিন্তু কঠোর শাসনে সকল সময়ে সুফল পাওয়া যায় না । যদি কঠোর শাস্তির ভয় না থাকিত, তবে বালক তাহার অশ্রায় কার্য গোপন করিতে চেষ্টা করিত না । আবার অন্য পক্ষে, কঠোর শাসনের ভয় না থাকিলেও বালক অশ্রায় কার্য করিতে ভয় করিবে

না । কি প্রণালী অবলম্বন করিলে যে দুই দিক রক্ষা হয় তাহা নির্দেশ করা শক্ত ।

সত্যানুরাগ অনেক পরিমাণে পিতামাতার দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে । যদি বালক আত্মায়, বন্ধু বান্ধব ও শিক্ষককে সত্যনিষ্ঠ দেখে, তবে সেও সত্যনিষ্ঠ হইতে যত্ন করিবে । কোন কোন বিষয়ে শিক্ষক একটু সাবধান হইলে, মিথ্যা কথনের প্রবৃত্তি কিছু কমাইতে পারেন । বালক পড়া অভ্যাস করে নাই, কি বাড়ী হইতে অঙ্ক কষিয়া আনে নাই, কি বিদ্যালয়ে বৃথা কারণে অনুপস্থিত হইয়াছে, এ সমস্ত বিষয়ে কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা না করিয়া, প্রথম প্রথম তাহার কার্য্যে অবহেলার কারণ অনুসন্ধান করাই কর্তব্য । শাস্তির ভয় না থাকিলে বালক সরল মনে কারণ বলিয়া ফেলিবে । সত্য কথা বলার অভ্যাস হইয়া গেলে আর মিথ্যা বলার দিকে সহসা তাহাদের প্রবৃত্তি যাইবে না । সত্য বলায় যে পরকালে সদ্গতি হইয়া থাকে বা মিথ্যা বলায় যে নরকগামী হইতে হয়, ইহা বালকেরা বুঝিবে না । যাহাতে তাহাদের সত্য কথা বলার অভ্যাস হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে । অভ্যাসেই মানুষের প্রকৃতি গঠিত হয় ।

বালকদিগের মধ্যে কখন কখন একে অন্নের জিনিস চুরি করিয়া থাকে । কিন্তু সাধারণতঃ আমরা দণ্ডবিধি আইনের সংজ্ঞা অনুসারে যে “চুরি” বুঝিয়া থাকি, এ ‘চুরি’ সেরূপ চুরি নহে । অন্নের কোন জিনিস নিজের পছন্দ হইলে, সে সেটী সরাইয়া ফেলিল । এইরূপ সরল ভাবেই অনেক চুরি হইয়া থাকে । ইহাতে যে একটা ভীষণ স্মার্ত্তের ভাব আছে, কি অপরের অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা আছে, তাহা তত নহে । বাল্যকালে সামান্য সামান্য চুরি বোধ হয় আত্মদিগের মধ্যে ৯৯ জনে করিয়া থাকিবেন ; কিন্তু তাহাতে কি তাঁহারা, জীবনে অধঃপাতে গিয়াছেন ? আগ চুরি, কুল চুরি, পেয়ারা চুরি, ফুল চুরি,—অর্থাৎ না বলিয়া মইলেই যদি চুরি করা হয় তবে ৯৯ কেন ১০০ জন এই অপরাধে অপরাধী । অবশ্য আমি এই

কথা বলিতেছি না যে, এই সমস্ত উপেক্ষা করিতে হইবে। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ ‘না বলিয়া পরের দ্রব্য লওয়া’কে ভীষণ ‘চুরি’ নামে অভিহিত করিয়া ও সেই বালককে ‘চোর’ নামে অভিহিত করিয়া তাহাকে যে পরিমাণ নির্যাতন করা হইয়া থাকে, তাহা সকল সময়ে সঙ্গত হয় না। অপরাধকে ঘৃণা করা কর্তব্য, কিন্তু অপরাধীকে ঘৃণা করিলে তাহার অপরাধের সংশোধন হয় না। “তুমি চোর, তুমি কাহারও সহিত মিশিও না, তোমার সহিত কেহ কথা কহিবে না, তোমাকে জেলে দিবে” ইত্যাদি তিরস্কারে বালক মানসিক কষ্ট পায়, তার শিক্ষকের প্রতি বিরক্ত হয়। সম্মুখে তাহার দোষ বুঝাইয়া দিতে হইবে, আর যাহাতে সে এরূপ কাজ ভবিষ্যতে না করে সে বিষয়েও সাবধান করিয়া দিতে হইবে। বালক যে কার্য্যই করুক না কেন—মিথ্যা কথাই হউক, চুরি করাই হউক বা অন্য কোন অপরাধই হউক, তাহার মনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া বিচার করিতে হইবে। তবে যেখানে এরূপ দেখা যায় যে, বালক নিষেধ-সত্ত্বেও আবার চুরি করিতেছে, অপরের দ্রব্য বিক্রয় করিয়া চুরট কিনিয়া খাইতেছে বা অন্য কোন অপকর্ম্ম করিতেছে, সেখানে বেতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাতে না পারিলে বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে। তবে কথা এই যে ‘বালক সর্বদাই বালক’, এই বিবেচনায় তাহার সকল অপরাধই তত গুরুতর বলিয়া মনে করা উচিত নহে।

বালকেরা মারামারি করিতে ভালবাসে। অন্যের উপর আধিপত্য করিবার একটা ইচ্ছা তাহাদের যেন স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। একে অন্যের সহিত মারামারি করিয়া তাহাদের মধ্যে কে বড়, তাহা নির্ধারণ করিতেছে—এরূপ ব্যাপারে বাধা না দেওয়াই যুক্তি। ইহাতে বালকেরা নিজের শক্তি পরিমাণ করিতে শিক্ষা করে, অন্যকে দমন করিয়া নিজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের চেষ্টা করে। এরূপ শিক্ষা ও চেষ্টা সংসারযাত্রা নির্বাহের পক্ষে বিশেষ উপকারী। তবে দেখিতে হইবে যে একটা বড় ছেলে একটা

ছোট ছেলের উপর অত্যাচার না করে ; আর এরূপ মারামারিতে একে
অন্যের বিশেষরূপ শারীরিক অনিষ্ট করিতে চেষ্টা না করে । প্রতিযোগিতা
লইয়াই সংসার । সুতরাং বাল্যে মানসিক জ্ঞানে ও শারীরিক বলে যাহাতে
বালকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে, সে বিষয়ে বরং উৎসাহই দিতে
হইবে । অন্তায় আচরণ দেখিলে অবশ্য তাহার তৎক্ষণাৎ নিবারণ করা
উচিত । পিছন হইতে আসিয়া ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেওয়া, পশ্চাৎ হইতে
লাঠী মারিয়া পলায়ন করা, অন্ধকারে টিল মারা প্রভৃতি কাপুরুষের
কাজ ;—এরূপ ব্যবহার কঠোর শাসনের দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে ।

চিম্টি কাটা, চুল ধরিয়া টানা, এক জনের কাপড়ের সহিত অপরের
কাপড় অজ্ঞাতসারে বাঁধিয়া দেওয়া, বসিবার আসনের উপর কাদা বা কালি
দিয়া রাখা, দেওয়ালে নাম বা কুকথা লেখা প্রভৃতি ছুঁ ছুঁ বালকের কার্য্য ।
এ সকল প্রথমে গিষ্ট বাক্য দ্বারা ছাড়াইতে চেষ্টা করিবে ; না পারিলে
বেত । অনেক বালক অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিয়া থাকে । প্রায়ই
নীচ পরিবারের ছেলেকে অথবা 'সঙ্গ-দোষে নষ্ট' ভাল পরিবারের ছেলেকে
এই দোষে দোষী হইতে দেখা যায় । নীচ পরিবারের ছেলেদের এই অশ্লীল
ভাষায় গালাগালি করা বাল্যকাল হইতেই স্বভাবগত হইয়া পড়ে । সুতরাং
তাহাদিগের এই অভ্যাস অল্প চেষ্টায় ছাড়াইতে পারা যাইবে না । তবে
প্রথম হইতেই শাসন করিতে হইবে । সে সকল যে ভদ্রোচিত ভাষা নয়,
তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে । এ সকল দোষে বেত মারা অন্তায় ; কিন্তু
যদি অনেক দিনের চেষ্টাতেও না পারে, তবে অন্তায় বালকের কল্যাণের
জন্ত এইরূপ বালকের নাম 'কার্টিয়া' দিতে হইবে ।* অশিক্ষিত বা অভদ্র
পরিবারের ছেলেদিগকে লইয়া নানারূপ বিপদে পড়িতে হয় । একটা
কুকুরের লেজ কাটিয়া দিল, না হয় একটা কাক ধরিয়া তাহার ডানা ছিঁড়িয়া
ফেলিল, না হয় একটা গরুর লেজে খেজুরের ডাল বাঁধিয়া দিল, কি একটা
বিড়াল জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিল । এই সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া

অন্যান্য বালকদিগেরও মতিগতি মন্দ হইয়া উঠে। নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবিধানে, বালকের প্রতিও কিঞ্চিৎ তদ্রূপ আচরণ না করিলে, সে নিষ্ঠুরতার মর্শ্ব বৃদ্ধিতে পারিবে না। গায় কাঁটা ফুটিলে কেমন ব্যথা লাগে, তাহা প্রকৃত কার্য্য দ্বারা কিঞ্চিৎ বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে গরুর লেজে কাঁটা বাধার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে।

যদি বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া কোন প্রকারে একটী বালককে সর্ব-বিষয়ে সচ্চরিত্র করিয়া তুলিতে পারা যায়, তবে তাহার দৃষ্টান্তে সমস্ত বালকের ছাত্র, সম্পূর্ণ না হউক, অনেক পরিমাণে যে সংশোধিত হইয়া যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সং দৃষ্টান্তের নিস্তরু শাসন সর্বপ্রকার আড়ম্বরবৃত্ত শাসন অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ।

(৬) মানসিক বা দৈহিক অপূর্ণতা।—যে বালক স্বভাবতঃ একটু নির্লক্ষি, তাহাকে একটু বেশী যত্ন করিতে হইবে; তাহার দিকে একটু বেশী মনোযোগ দিতে হইবে। যে বালকের চক্ষুর দৃষ্টি দূরে যায় না তাহাকে বোর্ডের নিকটে বসাইবে। যাহার শ্রবণশক্তি কিছু কম, তাহাকে শিক্ষকের নিকট বসাইবে। এরূপ যাহাকে বেরূপ সাহায্য করা যাইতে পারে, তাহাকে সেইরূপ সাহায্যই করিতে হইবে। শিক্ষক এক বৃহৎ পরিবারের পিতা স্বরূপ। পিতা মাতা যেমন তাঁহাদিগের বিকলাঙ্গ সন্তানের প্রতি অধিকতর মেহনীর হইয়া থাকেন, শিক্ষককেও সেইরূপ বিকলাঙ্গ ছাত্রদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ অধিক মেহ প্রকাশ করিতে হইবে।

(৭) শাস্তির ব্যবস্থা।—বিদ্যালয়ের দণ্ডবিধিতে এখন শাস্তি দানের নিম্নলিখিত ধারা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় :—(১) চক্ষু ঢালনা বা জ্বকুটী, (২) তিরস্কার, (৩) ঠাট্টা বা বিদ্রূপ, (৪) ভিন্ন স্থানে বসান, (৫) মাটিতে বসান, (৬) বিদ্যালয়ের ছুটির পর আবদ্ধ করা, (৭) পরিমাণের অধিক কার্য্য করিতে দেওয়া, (৮) খেলা বন্ধ করিয়া দেওয়া, (৯) অল্প

বালকের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দেওয়া, (১০) চুল ধরিয়া টানা, (১১) কাণ মলিয়া দেওয়া, (১২) কিল মারা, (১৩) ঘুঁসি মারা, (১৪) চপেটাঘাত করা, (১৫) মাটিতে বা বেঞ্চে দাঁড় করান, (১৬) হাঁটু গাড়িয়া (নীল ডাউন) বসান, (১৭) চেয়ারে বসার মত করিয়া বসান, (১৮) বেঞ্চ বা টেবিলের নীচে মাথা রাখিয়া দাঁড় করিয়া রাখা, (১৯) এক ঠেঙ্গে হয়ে দাঁড়ান, (২০) গাধার টুপি মাথায় দেওয়ান, (২১) চৌদ্দ পোয়া (ছই পা সম্পূর্ণরূপে ফাঁক করিয়া) হইয়া দাঁড়ান, (২২) ছই হাতে ছই কাণ ধরিয়া দাঁড়ান, (২৩) ডন করার মত অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া থাকা, (২৪) বেত মারা, (২৫) জরিমানা করা, (২৬) কিছু দিনের জন্য বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়া, (২৭) বিদ্যালয় হইতে একেবারে বিতাড়িত করা। (কোন দেশের দণ্ডবিধি আইনেও বোধ হয় শাস্তির এত ধারা নাই)। গল্প শুনিয়াছি যে পূর্বে নাকি এ সকল অপেক্ষা আরও অনেক ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। গায় বিছুটি (ছুতরা) নামক লতার পাতা ধসিয়া দেওয়া হইত, কাণে তোতা (চিম্‌টে) লাগান হইত। চৌদ্দপোয়া হইয়া ছই হাতে ছই হাঁটু ধরিয়া, সূর্যের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইত। পা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ঘরের আড়ার সহিত বুলাইয়া দেওয়া হইত। মাথা নীচের দিকে বুলিত, এই অবস্থায়, পাছার কাপড় তুলিয়া বেত মারা হইত। পাঠশালায় তামাক খাইবার জন্য আগুনের হাঁড়ি থাকিত, তাহাতেই চিম্‌টা পোড়াইয়া বা উত্তপ্ত কলিকা ঘরা, পাছায়, পিঠে বা গালে দাগ দিয়া দেওয়া হইত।।।

এরূপ একদল লোক আছেন যাহারা প্রত্যেক নূতন বিধির বিপক্ষ। তাঁহারা সমস্ত পুরাতন বিধিকেই সর্বকালে উত্তম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা ভাবেন না যে সেই পুরাতন বিধিও এক সময় নূতন ছিল, আবার এই নূতন বিধিও সময়ে পুরাতন হইবে। নূতন পুরাতনের কথা নহে, কার্য দেখিয়া ফলাফল বিচার করিতে হইবে।

যাঁহারা বেত-মারা প্রথার পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন যে, বেত বন্ধ করিলেই ছেলের লেখাপড়াও বন্ধ হইবে। কিন্তু ফলে কি হইয়াছে, তাহাই দেখা যাউক। দিন দিন ত শাস্তিদানের ধারা কমিয়াই যাইতেছে, কিন্তু ইহাতে দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে না কমিতেছে? অবশ্য কেবল যে শাস্তিদানের ধারা কমিয়া গিয়াছে বলিয়াই শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহা আমরা বলি না। তবে শাস্তির প্রথা অনেক পরিমাণে উঠাইয়া দিয়াও যে কোন ক্ষতি হয় নাই, ইহাই আমাদের বলার উদ্দেশ্য।

ভাল ভাল স্কুল হইতে শাস্তিদানের প্রথা ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে। যে সমস্ত শাস্তির প্রথা লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল কতকগুলি গোমূর্খ পণ্ডিত কর্তৃক পরিচালিত পল্লীগ্রামের পাঠশালাতেই দেখিতে পাওয়া যায় ‘চক্ষু পরিচালনার’ দ্বারা যে শাসন তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট। বালকের দিকে একবার তেজপ্রকাশক দৃষ্টিতে চাহিলেই সে মাটি হইয়া যাইবে। কিন্তু শিক্ষকের নিজের এরূপ তেজ চাই। এ তেজ লাভ করিতে হইলে দুইটী বিষয়ের অনুশীলন আবশ্যক—বিদ্যা আর চরিত্র।

সময় সময় তিরস্কার করার আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু যে শিক্ষক সকল সময় ও সকল বিষয়েই তিরস্কার করেন, তাঁহার তিরস্কারে কোন ফল হয় না। একটু কথা বলিলেই তিরস্কার, একটু নড়িলেই তিরস্কার, হাই ভুলিলেই তিরস্কার, পুস্তক লইতে দেরি হইলেই তিরস্কার, এইরূপ সামান্য সামান্য বিষয়ে তিরস্কার করিলে বালকগণের এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে শিক্ষকের স্বভাবই চীৎকার করা। তিরস্কার কেন, সকল শাস্তিদানেরই এই নিয়ম। খুব হিসাব করিয়া রূপণের মত ব্যয় করিতে হইবে। যে সকল রোগ স্বভাবের উপর নির্ভর করিলে আপনিই সারিয়া যায়, তাহার জল ঔষধ ব্যবহার করিতে নাই। কেবল একটু সাবধান থাকিতে হয়। কঠিন রোগে ঔষধের ব্যবস্থা আবশ্যক বটে।

ঠাট্টা বিদ্রোপের দ্বারা অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট সাধিত হয় না। বালকের মনে

এরূপ আঘাত লাগে, আর সে এরূপ অপমানিত মনে করে যে শিক্ষকের প্রতি তাহার একটা ঘৃণা জন্মিয়া যায়। ভিন্ন স্থানে বা মাটিতে বসানও অপমানজনক, তবে ঠাট্টা বিদ্রূপের মত তত অনিষ্টজনক নহে। আর এক কথা, ছোট ছোট বালকদিগকে এরূপ শাস্তি দেওয়ার কোন ফল নাই; কারণ তাহাদের মান অপমানের কোনরূপ জ্ঞান নাই। বড় বড় বালকেরা অপমান বুঝিতে পারে। এ শাস্তি তাহাদের জন্যই প্রশস্ত। কিন্তু খুব সাবধান—অপমানে বালকেরা সময় সময় এতদূর মানসিক কষ্ট পায় যে, তাহাতে তাহারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে। অতের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দেওয়াতে ও খেলা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে ছোট ছোট বালক-গণের উপকার হয়। যখন খুব ছুটামী করে বা অত্যাচারে মারামারি করে বা কাহার কোন অনিষ্ট করে, তখন এই শাস্তির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গাধার টুপী মাথায় পরান সর্কাপেক্ষা অপমানজনক। ছোট ছেলেদের ইহাতে বড় অপমান বোধ হয় না, কিন্তু বড় ছেলেরা বড়ই অপমানিত মনে করে।

পাঠে অবহেলা করিলে, বাড়ী হইতে নির্দিষ্ট পাঠ অভ্যাস করিয়া না আসিলে, বিত্তালয়ে ছুটির পর কিছুক্ষণ আবদ্ধ রাখিয়া তাহার দ্বারা সেই কাজ করাইয়া লওয়া উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু একজন শিক্ষককে সেই বালকের সঙ্গে আবদ্ধ হইয়া থাকা দরকার। স্কুলের দ্বারবানের উপর ভার দিয়া চলিয়া গেলে কোনই ফল হয় না। বাড়ী হইতে অতিরিক্ত পাঠাভ্যাস করিয়া আনিতে দেওয়ার প্রথাও উত্তম। কিন্তু সেই অতিরিক্তের পরিমাণ যেন আবার অতিরিক্ত না হয়, অর্থাৎ বালক যাহা সম্ভবতঃ পারিবে সেই পরিমাণ পাঠই দিতে হইবে। • "কাল বাড়ী হইতে ৪৯টা অঙ্ক কষিয়া আনিবে" এইরূপ আদেশের কোন ফল নাই। বালক ৩টা অঙ্ক কষিতেও চেষ্টা করিবে না, কারণ সে জানে যে, সে ৪৯টা অঙ্ক কিছুতেই কষিতে পারিবে না। সকল বিষয়েই খুব হিসাবী হওয়া কর্তব্য।

অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়া বাঁথা, হাটু গাড়িয়া বসান, চৌদপোয়া করান প্রভৃতি শাস্তি, স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর । বিচক্ষণ শিক্ষকেরা এ সকল প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন । চুল ধরিয়া টানা, কাণ মলিয়া দেওয়া, চপেটাঘাত প্রভৃতি শাস্তিও উঠিয়া গিয়াছে । কারণ ইহাতে তেমন বিশেষ শাস্তি হয় না । একটু চুল ধরিয়া টানিলে, কি একটা ছোট করিয়া চড় মারিলে বালকদের কিছুই হইল না । যদি অপমান করার উদ্দেশ্যে এই সকলের ব্যবস্থা হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না ; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, ছোট ছোট বালকদের মান অপমান বোধ নাই । আর বড় বড় বালকদিগকেও কিছু কাণমলা দেওয়া বা চপেটাঘাত করা সম্মত হয় না । শারীরিক শাস্তি দিবার উদ্দেশ্য বেদনা দেওয়া বটে, কিন্তু একটু চুল ধরিয়া টানিলে বা ছোট করিয়া কিল মারিলে কিছুই ব্যথা পায় না । আবার যদি জোরে চপেটাঘাত বা কিল মারা যায়, তবে বালকের মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটতে পারে । আর এরূপ ঘটতেও শুনা গিয়াছে । সুতরাং এরূপ শাস্তি বর্জনীয় । শারীরিক দণ্ডবিধানের উত্তম প্রথা বেত মারা । হাতে ভিন্ন অঙ্গ স্থানে বেত মারিতে নাই ।

যখন বেত মারিবে, তখন বেশ জোরে ছুঁঘা লাগাইয়া দিবে । যাহাকে মারিবে, সে বালক যেন বুঝিতে পারে যে ইহার নাম শাস্তি ; আর অঙ্গ বালকেরাও যেন বুঝিতে পারে যে এই কার্যের এই ফল । কিন্তু এইরূপ বেত মারিবার আবশ্যিকতা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় । লেখাপড়ায় অমনোযোগিতা বা অপারগতার জন্য বেত মারা কৰ্ত্তব্য নহে । বিশেষরূপ চরিত্র সংশোধনের নিমিত্তই বেতের ব্যবহার আবশ্যিক । এইরূপ বেত মারা প্রকাশ্যে কি গোপনে হওয়া উচিত, সে বিষয়ে মতভেদ আছে । আমাদের মতে, প্রকাশ্যে ও গোপনে দুইই আবশ্যিক । দৃষ্টান্ত—কোন বালক যদি শিক্ষককে বা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অপমান করে তবে তাহাকে প্রকাশ্যে বেত মারা উচিত, কিন্তু কোনরূপ অশ্লীল ব্যবহার করিলে তাহাকে গোপনে

বেত মারা উচিত; কারণ সে অশ্লীল ব্যাপার প্রচার হইলে এই কুফল হইবে যে, যে সকল বালক সেই সমস্ত অশ্লীল ব্যবহার জানিত না তাহারাও কৌতূহলপরবশ হইয়া গোপনে সে সকল শিথিতে চেষ্টা করিবে।

জরিমানা করার উদ্দেশ্য, অভিভাবককে শাস্তি দেওয়া বা বিষয়বিশেষে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করা। বালক দেরিতে আসিলে, অনুপস্থিত হইলে, বেতন দিতে দেরি করিলে, বা সময় মত পাঠ্য পুস্তকাদি সংগ্রহ না করিলে জরিমানা করা যাইতে পারে। কারণ এ সকল বালকের অভিভাবকের ত্রুটি। কোন বালক কুসঙ্গে মিশিয়াছে, কি কুকাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এক্ষণ অবস্থায়, আবশ্যক হইলে জরিমানা করিয়া অভিভাবকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে অভিভাবকের সহিত শিক্ষকের প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হয়, সেখানে জরিমানা করিবার আবশ্যকতা নাই, বরং সমস্ত কথা অভিভাবকের গোচর করিতে পারিলেই অধিকতর উপকার হইবে।

পানদোষ ও তাহার আনুষঙ্গিক চরিত্রদোষে যাহারা অপরাধী তাহাদিগকে বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই যুক্তি। কিন্তু যদি বুঝা যায় যে কুসঙ্গ পরিত্যাগ করাইলে তাহাদের চরিত্র সংশোধন হইতে পারে, তবে ছুই একবার চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। কথা এই যে, বালককে ভাল করিবার জন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াও যখন কোন ফল হইবে না, তখন অন্ত্যন্ত বালকের উপকারার্থে ছুই একটা বালকের মমতা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শাস্তি বিধানে শিক্ষককে নিরপেক্ষ ও চ্যাম্পরায়ণ হইতে হইবে। স্কুলের সম্পাদকের পুত্র কি নিজের শ্যালকের জন্য যেন শাস্তির ভিন্ন বিধান না হয়। তবে এক রকম অপরাধের জন্য, সকল সময়ে এক রকম শাস্তির বিধান যুক্তিসঙ্গত নয়। বালকের বয়স এবং শারীরিক ও মানসিক দৃন্থা বিবেচনা করিতে হইবে। যাহারা সাধারণতঃ ভাল ছেলে, তাহারা

কোন অপরাধ করিলে অল্প শাস্তিতেই কাজ হইবে ; কিন্তু সেই অপরাধে, অতি 'দুষ্ট' বালককে একটু বেশী শাস্তি দিতে হইবে । বালকের নৈতিক অবস্থা, মন্দ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্য, আর যে প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া সে সেই কার্য্য করিয়াছে সেই প্রলোভন—এই কয়টি বিষয়ই শাস্তি বিধানের সময় বিশেষরূপ বিবেচনা করা শিক্ষকের কর্তব্য । প্রলোভন অত্যন্ত প্রবল হইলে বালকেরা নিজকে সংযত করিতে পারে না । শাস্তি বিধানে বালকের এই স্বাভাবিক দুর্বলতার কথা মনে করিতে হইবে । মন্দ কার্য্যের প্রলোভন হইতে বালকগণকে যতই দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল ।

মন্দ কার্য্য করিলে শাস্তি দিতে হইবে, কিন্তু 'ভাল কার্য্য কেন করে না' বলিয়া শাস্তি দেওয়া যুক্তিবিহীন । শাস্তির ভয়ে ভাল কার্য্য করিতে পারে বটে, কিন্তু যেই শাস্তির ভয় যাইবে, অমনি সেও ভাল কার্য্য হইতে বিরত হইবে । মন্দ কার্য্য করিয়া বালক যদি প্রকৃতই অনুতপ্ত হয়, তবে তাহাকে শাস্তি না দিলে বা অবস্থানুসারে কিঞ্চিৎ কম শাস্তি দিলেও চলিবে । যে বালক কোন সত্য গোপন না করিয়া সমস্ত অপরাধ সরল মনে স্বীকার করে, তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেই ভাল হয় । হাসিয়া হাসিয়া কি খুব রাগ করিয়া শাস্তি দিলে কোন ফল হয় না । শাস্তি বিধানে শাস্তিদাতাকে খুব ধীর, স্থির ও গভীর হইতে হইবে । শাস্তি দানের যে দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য—অপরাধীকে সংশোধন করা ও এই দৃষ্টান্তে অগ্র বালককে সেই অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করা—তাহাই যাহাতে সাধিত হয়, শাস্তি দানের সময় সেই কথাই মনে রাখিতে হইবে । বেশী শাস্তি দিলে বালকেরা ঘ্যাঁচড়া হইয়া যায়, আর শাস্তিকে বড় ভয় করে না । সুতরাং যত কম শাস্তি দেওয়া যায় ততই ভাল । এক সঙ্গে শ্রেণীর সমস্ত বালককে শাস্তি দেওয়া উচিত নহে, কারণ তাহাতে তাহারা আমোদ মনে করে । খুব রাগের সময় শাস্তি দিতে নাই, আর বালক যে মুহূর্ত্তে

কোন অন্তায় কার্য্য করিয়াছে, ঠিক সেই দণ্ডেই তাহাকে শাস্তি দিতে নাই। শিক্ষকের নিজের মন খুব শান্ত হওয়া আবশ্যক, আর বালকের মনও খুব শান্ত হওয়া আবশ্যক। মন শান্ত না হইলে কিরূপ অপরাধে কিরূপ শাস্তি বিধান আবশ্যক, শিক্ষক তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবেন না। আর বালকের মন শান্ত না হইলে সেও তাহার অপরাধ বুঝিতে পারিবে না। শাস্তি বিধানের কিছু পরে বালককে ডাকিয়া স্নেহের সহিত তাহার অপরাধ বুঝাইয়া দিতে হইবে ও তাহাকে শাস্তি দিতে হইয়াছে বলিয়া যে শিক্ষকও দুঃখিত, এ ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের ভাল ভাল কতকগুলি বালককে সমস্ত বালকের চরিত্র সংশোধনের ভার দিলে, অনেক সময় সফল পাওয়া যায়।

বালকদিগের সঙ্গে যদি বেশ আত্মীয়তা হইয়া যায়, যদি তাহারা শিক্ষককে নিজের পিতামাতার মত ভালবাসিতে শিক্ষা করে, তবে শিক্ষকের অতি সামান্য অভিমানেই তাহারা মর্ম্মাহত হইয়া পড়িবে। অতঃপর কোনই শাস্তির আবশ্যক হইবে না।

শাস্তি বিধান বিষয়ে আদালতের নজীর।—আজ কাল বালকগণের শাস্তি বিধান লইয়া সময় সময় ঘটনা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়া থাকে। কাজেই সে বিষয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকের কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক বিবেচনায়, কয়েকটি মোকদ্দমার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পিতামাতার ও শিক্ষকের অধিকার।—সন্তানের শাসনার্থ তাহাদিগকে শাস্তি দানে পিতামাতার অধিকার আছে। পুরাতন রোমক শাসনে, এই অধিকারের কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। পিতামাতা পুত্রকন্যার জীবন বিনাশ পর্য্যন্ত করিতে অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বর্তমান ইংরাজের আইন, এই সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিলাতের জজ ফিল্ড সাহেব এক মোকদ্দমার (হাট্‌ বঃ হেইলিবার্গ কলেজ অধ্যক্ষগণ) এইরূপ রায় দিয়াছেন, "পিতামাতা সন্তানের দোষ সংশোধনের নিমিত্ত যুক্তিযুক্ত ও উপযুক্তরূপে প্রহার করিতে পারেন ও আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে গৃহে আবদ্ধ করিয়াও রাখিতে পারেন।" শিক্ষকের অধিকার সম্বন্ধে অতঃপর এক মোকদ্দমায় (ফ্লিয়ারী বঃ বুথ) এইরূপ রায় প্রকাশিত

হয়, “পিতামাতার যে সন্তানকে শাস্তি দিবার অধিকার আছে, সে বিষয়ে আইনে স্পষ্ট ব্যবস্থা আছে ; তাব বহুকাল প্রচলিত প্রথা অনুসারে এ বিষয়ও নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, পিতা মাতা সন্তানকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিবাব সময় স্পষ্টতঃ ভাবেই হউক বা অস্পষ্ট ভাবেই হউক, শিক্ষকের হস্তে শাস্তি দানের ভারও প্রদান করিয়া থাকেন ।” তবে যদি শিক্ষকের সহিত লিখিত কোনরূপ চুক্তি থাকে (অর্থাৎ শাস্তি দিতে পারিবে, কি পারিবে না) তবে সে কথা ভিন্ন ।

১৮৯৯ সনে “বালকগণের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণ বিষয়ক আইন” প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার একটি ধারায় এইরূপ লিখিত আছে, “পিতামাতা, শিক্ষক বা অভিভাবকের শাস্তিদানের যে গ্রায্য অধিকার আছে, এই আইন সে অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছে না ।” শাস্তি সঙ্গত ও পরিমিত হওয়া আবশ্যিক । পরিমিত শাস্তির একটা সূত্র নির্ধারণ করা কঠিন । অবস্থাবিশেষে পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে । এক মোকদ্দমায় (রাণা বঃ হপ্লী) জজ সাহেব এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—“ইংলণ্ডের আইন অনুসারে পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক সঙ্গত ও পরিমিত শাস্তি দান করিতে পারেন । কিন্তু যদি কোনরূপ ক্রোধের তৃপ্তি সাধনার্থ শাস্তি দান করা হয়, অথবা শাস্তি বালকের সহ্য করিবার শক্তির বহির্ভূত হয়, তাহা হইলে সেসকল শাস্তি আইনবিরুদ্ধ । যদি এই শাস্তি দ্বারা বালকেব কোন অঙ্গের ক্ষতি হয়, তাহা হইলে সে শাস্তিদাতা আইন অনুসারে দোষী । আর যদি বালকের মৃত্যু ঘটে, তবে শাস্তিদাতা নরহত্যার জন্য অভিযুক্ত হইবেন ।” আমেরিকার স্টেট রিপোর্টে শাস্তি বিধান বিষয়ক প্রস্তাবের এক অংশে এইরূপ লিখিত আছে :—“শাস্তি সঙ্গত কি অসঙ্গত ও পরিমিত কি অপরিমিত, তাহা বিশেষ বিশেষ ঘটনা দৃষ্টে বিচার করিতে হইবে । শাস্তিদান যে অসঙ্গত হইয়াছে তাহা বাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে, কারণ শিক্ষক তাহার কর্তব্য বোধে উপযুক্ত শাস্তিই দিয়াছেন, ইহাই বিধাস করা বিচারকের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত । বালক বেমনা বোধ করিয়াছে বা তাহার চক্ষু প্রহারের দাগ বসিয়াছে বলিয়াই যে সেই শাস্তিকে নিষ্ঠুর মনে করা হইবে তাহা ঠিক নয় ।”

শাস্তিদানের স্থান ও কাল ।—এক বালক ছুটির পর বিদ্যালয়ের বাহিরে পথের উপর সেই স্কুলের অগ্র বালককে ধরিয়া প্রহার করে । শেষোক্ত বালক পরদিন শিক্ষকের নিকটে নালিশ করায়, শিক্ষক প্রথমোক্ত বালককে শাস্তি প্রদান করেন । এই শাস্তিপ্রাপ্ত বালকের মাতা শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাউথহামটনের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে নালিশ করেন । বিচারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এইরূপ রায় দেন—“বিদ্যালয়ের বহির্ভাগে পথের উপর যে

ঘটনা ঘটয়াছে, আর যে ঘটনার সহিত বিদ্যালয়ের কার্যের কোন সংশ্লিষ্ট নাই, এরূপ ঘটনার বিচার ও তাহা উপলক্ষ করিয়া শাস্তিদান করিবার অধিকার শিক্ষকের নাই।” শিক্ষক এই বিচারের বিরুদ্ধে আপিল করেন। জজ লরেন্স শিক্ষকের সাপক্ষে নিষ্পত্তি করিয়া এইরূপ রায় দেন :—“শিক্ষকের অধিকারের একটা সীমা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে আমার মতে বিদ্যালয়ের বহির্ভাগেও শিক্ষকের অধিকার আছে ; অন্ততঃ পক্ষে, বিদ্যালয় হইতে বাড়ী বাইবার সময় বা বাড়ী হইতে বিদ্যালয়ে আসিবার সময় যে তাহার অধিকার আছে তাহা নিশ্চয় বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ যখন এই ক্ষেত্রে এক বিদ্যালয়েরই দুই বালক সংশ্লিষ্ট, তখন শিক্ষককে দোষী সাব্যস্ত করা নিম্ন আদালতের ঠিক হয় নাই।” এই মোকদ্দমায় অপর জজ কলিন্স সাহেব আবার এইরূপ মত প্রকাশ করেন :—“আমারও সেই মত……। একথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না যে, বালক বিদ্যালয়ের সীমা পার হইলেই সে শিক্ষকের শাসন হইতে মুক্ত হইল। যতক্ষণ বালক বিদ্যালয়ে থাকে, ততক্ষণ সে পড়াশুনার ব্যাপ্ত থাকে। তাহার নৈতিক চরিত্রের ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। চরিত্রের ক্রিয়া খেলার মাঠে বা পথে ঘাটেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যদি শিক্ষকের অধিকার কেবল বিদ্যালয়-গৃহের চার প্রাচীরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তবে শিক্ষকের উপর বালকের চরিত্র সংগঠনের কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু যখন শিক্ষাবিভাগের আইনে শিক্ষককে বালকের চরিত্র বিষয়েও দায়ী করা হইয়াছে, তখন শিক্ষকের অধিকার, প্রাচীরের বহির্ভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্বীকার করিতে হইবে। তবে এই দেখিতে হইবে যে শিক্ষক যেন শিক্ষাবিভাগ নির্দিষ্ট শাস্তি বিধানের নিয়মাদির উল্লঙ্ঘন না করেন।” এই সমস্ত বিচার দৃষ্টে ইহাই নির্ধারিত হইতেছে যে, বালক যে সময়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগের সময় পর্য্যন্ত, সে সকল সময়েই শিক্ষকের শাসনাধীন।

কে শাস্তিদান করিতে পারে ?—বাসিংষ্টোক নগরে “কুইনস্ গ্রামার স্কুল” নামক বিদ্যালয়ের এক বালক খেলার মাঠে অবাধ্যতা (বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ) প্রকাশ করে। বিদ্যালয়ের মনিটার (সদ্যর ছাত্র) তাহাকে শাস্তি প্রদান করে। শাস্তিপ্ৰাপ্ত বালকের পিতা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করেন, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন। তখন উক্ত ব্যক্তি হাইকোর্টে মোসন করে। হাইকোর্টের জজেরা ম্যাজিস্ট্রেটের কৈফিয়ত তলব করায় ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নলিখিত কৈফিয়ত দেন :—“কুইনস্ গ্রামার স্কুলে, ‘সদ্যর ছাত্র’ নিযুক্ত করা ও তাহাকে শাসন বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়ম বহুদিন হইতে চলিয়া

আসিতেছে। স্কুলের হেডমাষ্টার যে প্রতিবাদীকে সর্দার ছাত্র নিযুক্ত করিয়া তাহার হস্তে শাসনের কিছু কিছু ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা হেডমাষ্টারের সাক্ষ্যে প্রকাশ। এই মোকদ্দমার ঘটনা হেডমাষ্টার অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং তাহার ধারণা এই যে সর্দার ছাত্র স্থায়মঙ্গলরূপেই বাদীকে শাস্তি দিয়াছে। তার পর প্রহারের পরিমাণ বিষয়ে ডাক্তার যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, প্রহার যদিও খুব কঠিন রকমের হইয়াছিল, কিন্তু মাত্রায় অধিক হয় নাই। উভয় পক্ষের সাক্ষীর বিবরণ শুনিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি, (১) বাদী বিদ্যালয়ের নিয়মভঙ্গ দোষে দোষী, (২) বাদীকে যে উক্ত নিয়মভঙ্গের জন্য শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল তাহা বাদীও সেই সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিল, (৩) প্রতিবাদী যে হেডমাষ্টার কর্তৃক নিযুক্ত সর্দার ছাত্ররূপে ও বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে শাস্তি প্রদান করিয়াছে তাহাও বাদী অবগত ছিল, (৪) বাদীর ও ডাক্তারের সাক্ষ্য হইতে আশংকা ইহাও বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, শাস্তি পরিমাণের অতিরিক্ত হয় নাই সুতরাং আমরা দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছি।”

হাইকোর্টের জজেরা ম্যাজিস্ট্রেটের কৈফিয়ত শুনিয়া মোসন অগ্রাহ্য করেন ও লাশ নামক একজন জজ উক্ত বিচারে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :—“আবহমান কাল হইতে সর্বত্রই শিক্ষকগণ বালকদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তবে এস্থলে সেই শাস্তি একজন সর্দার ছাত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়াই কি ইহাকে বে-আইনী মনে করিতে হইবে।” অপর জজ মেলর সাহেবের মন্তব্য এইরূপ :—“তাহা হইলে এরূপ এক প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গৃহে পিতামাতা ভিন্ন বালককে শাস্তি দিবার অধিকার আর কাহারও নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও শাস্তি দিতে পারেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সর্বত্র বিরাজমান থাকিতে পারেন না, বা নিজ হস্তেও তাহার সমস্ত কার্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং এস্থলে সর্দার ছাত্র কর্তৃক পরিমিত শাস্তি প্রদান অবৈধ হয় নাই।”

শাস্তি দানের ধারা।—রাসেল কৃত “ক্রাইম্‌স্” (অপরাধ) নামক পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে :—“যদি পিতামাতা বা শিক্ষক দোষ শোধনার্থ বালককে শাস্তি দান করেন তবে এরূপ পদার্থের দ্বারা শাস্তি প্রদান করিবেন যে, যেন তাহার দ্বারা দোষ সংশোধন সম্ভবপর হয়। অস্ত্রাদির আঘাতে বালককে বিকল করিয়া না হয়।” আর শাস্তি দিবার সময় বালকের বয়স এবং শক্তিও যেন বিশেষরূপ বিবেচনা করা হয়। বিদ্যালয়ের শাস্তি দানে যত প্রকার অস্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে বেতই উত্তম। শরীরের সকল স্থান অপেক্ষা হস্ততলই বেজাঘাতের নিরাপদ স্থান। মস্তক, কর্ণ, বক্ষঃ, উদর প্রভৃতি স্থানে বেত

প্রহার কখনও কর্তব্য নহে । ইহাতে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে । এক মোকদ্দমায় হস্ত বেত্রাঘাতের নিমিত্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্কুলের হেড্‌মাষ্টারকে দোষী সাব্যস্ত করেন (গার্ডেনার বঃ বাইগ্রেড) । ঐ মোকদ্দমার আপিল হয় । আপিলে জজ ম্যাথু সাহেব এই রূপ রায় দেন :—“হেড্‌মাষ্টার দোষী নহেন । ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিতেছেন যে, হস্ত বেত্রাঘাত করিলেও বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেরূপ কোন বিপদ ঘটে নাই । হস্ত বেত্রাঘাত করাতে বিপদ ঘটতে পারিত, ইহাই মনে করিয়া হেড্‌মাষ্টারকে দোষী সাব্যস্ত করা সঙ্গত হয় নাই ।” তবে এই সমস্ত বিচারে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, আবশ্যক হইলে বালকের বয়স ও শক্তি বুঝিয়া তাহার হস্ততলে পরিমিত রূপ বেত্রাঘাত করা যাইতে পারে কিন্তু ইহাতেও যদি কোন বিশেষ অনিষ্ট ঘটে, তবে সে জন্য শিক্ষক দায়ী ।

বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করা ।—এই শাস্তিই সর্বাপেক্ষা গুরুতর । বালকের ভবিষ্যৎ একবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হয় । সুতরাং এই শাস্তি বিধানের সময় বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক । যদি বিভাগের কর্তৃপক্ষ কোন ছাত্রকে বহিষ্কৃত করিয়াই দেন, তবে বালকের অভিভাবক আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন । উক্ত বালককে বহিষ্কৃত না করিলে যে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছাত্রের অসঙ্গলের আশঙ্কা ছিল, তাহা প্রতিবাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে । পূর্বে যে (হাট বঃ হেইলিবারী কলেজের অধ্যক্ষগণ) মোকদ্দমার উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে হাট নামক এক বালককে কলেজের অধ্যক্ষগণ বহিষ্কৃত করিয়া দেন । হাটের পিতা অধ্যক্ষগণের নামে হাটের প্রতি অত্যাচার, অবমাননা ও কলঙ্করোপণ প্রভৃতির অভিযোগ করিয়া ড্যামেজেব দাবীতে নালিশ করেন । আর ঐ নালিশের আর একটা ছেতু এই লেখা হইয়াছিল যে, হাটের পিতার সঙ্গে (হাটের শিক্ষাবানত) বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের যে ধর্ম্মতঃ চুক্তি ছিল, সে চুক্তিও ভঙ্গ হইয়াছে । কারণ অধ্যক্ষগণ বালকের শিক্ষার ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন । জজ ফিল্ড সাহেব সে মোকদ্দমায় যে রায় দেন, তাহাতে এই সকল বিষয় সন্ধক্ষে নিম্নলিখিতরূপে মন্তব্য প্রকাশ করেন :—“অধ্যক্ষগণ যে মর্মে জবাব দিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, এই ক্ষেত্রে তাহাদের নিজ বিবেচনা পরিচালনা সঙ্গত হয় নাই । একজন শিক্ষক—তিনি যত বিদ্বান্ বা বহুদর্শী হউন না কেন—কোন বালককে বহিষ্কৃত করা আবশ্যক মনে করিয়াই যদি তদ্রূপ কার্য করিতে ‘অধিকারী’ হইবেন, তবে সেকণ ক্ষমতা বিশেষ বিপদজনক সন্দেহ নাই । একটা বালকের ভবিষ্যৎ একবারে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া গুয়ানক কথা । এরূপ ক্ষমতা পরিচালনের অনুমতি

কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না । অবশ্য সময় সময় সাধারণের মঙ্গল কল্পে একপ কার্যের আবশ্যক হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার কোন আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না ।” ‘ফিটস জর্জ বার্নার্ড বঃ নর্থ কোর্ট’ মোকদ্দমায় এই বিষয় লইয়া তর্ক হয় । জজ সাহেব তাহাতে একপ মত প্রকাশ করেন :—“যদি কোন বালকের চরিত্র একপ মন্দ হইয়া পড়ে যে, তাহাকে বিদ্যালয়ে রাখিলে অশান্ত বালকের অনিষ্টের সম্ভাবনা হইতে পারে, তবে হেডমাষ্টার বিশেষ বিবেচনাপূর্বক তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারেন—এ ক্ষমতা তাহার একরূপ আছে । কিন্তু এই ক্ষমতা পরিচালনায় কেবল নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করা সম্ভব নহে । এই ক্ষমতার অপব্যবহার প্রমাণিত হইলে, প্রতিবাদীর পক্ষ দুর্বল স্বীকার করিতে হইবে ।”

আবদ্ধ করিয়া রাখা ।—এক প্রাথমিক বিদ্যালয়েব শিক্ষক কোন বালককে বাটীতে পাঠ প্রস্তুত করিবার জন্ত আদেশ করেন । কিন্তু উক্ত বালকের মাতা বালককে গৃহকাষে নিযুক্ত করায় সে পড়িতে সময় পায় না । বালক পাঠ দিতে না পারায় শিক্ষক তাহাকে বিদ্যালয়ের ছুটির পর আবদ্ধ করিয়া রাখেন । মাতা শিক্ষকের বিরুদ্ধে বে-আইনী কয়েদের অভিযোগ করিয়া নালিশ করেন । এই মোকদ্দমায় (হানটার বঃ জনসন) নিম্ন আদালত প্রতিবাদীর সাপক্ষে নিচার করেন । মাতা উক্ত বিচারেব বিরুদ্ধে আপিল করায় জজ ম্যাথু এইরূপ রায় দেন :—“আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, এই মোকদ্দমা বিদ্যালয়ের সাধারণ শাসন প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বিচার করা চলিবে । আর বিশেষ বাড়ীতে পাঠাভ্যাস কবাও বিদ্যালয়ের বালকগণের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটনা অশুভ হইয়া পড়িয়াছে । শিক্ষাবিভাগের নিয়মাবলীতে আছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বালকেরা বাড়ীতে কোনরূপ পাঠাভ্যাস করিবে না । একপ অবস্থায় বাড়ীতে পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়াই শিক্ষকের পক্ষে অবৈধ হইয়াছে, সুতরাং মোকদ্দমা ম্যাজিস্ট্রেটের মিকট পুনর্বিচারের জন্ত পাঠান হইল ।”

ছুটির পর আবদ্ধ করিয়া রাখা যে আইন-বিরুদ্ধ, তাহা কিন্তু এ মোকদ্দমায় স্থিরীকৃত হইল না । কেবলমাত্র ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে বাড়ীতে পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়া অবৈধ ।

গোপনমাল ও বিশৃঙ্খলা ।—শিক্ষক নিজে কখনও চীৎকার করিবেন না বা খুব বড় করিয়া কথা কহিবেন না । বিনা আবশ্যকেও

বেশী কথা বলিবেন না । অতি শান্তভাবে স্বাভাবিক স্বরে মিষ্ট করিয়া কথা বলিতে অভ্যাস করিবেন । তাহা হইলে বালকদিগের গোলযোগ নিবারণে কৃতকার্য্য হইবেন । বালকেরা স্বভাবতঃই গোল করিতে ভালবাসে । অবসর পাইলেই গোল করিবে । তাহারা যাহাতে এই অবসর না পায়, সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে । বালকদিগকে যদি কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপ্ত রাখা যায়, তবে আর তাহারা গোল করিতে পারিবে না । গোল নিবারণ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় । বালকদিগের চঞ্চল প্রকৃতি—সর্বদা কোন না কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকাই তাহাদের স্বভাব । শিক্ষক কোন কার্য্যে নিযুক্ত না রাখিলে, কাজেই তাহারা গোলমালরূপ কার্য্যে ব্যাপ্ত হইবে । “যাহারা গোল করিবে তাহাদের নাম সেটে লিখিয়া রাখিবে”—এই শাসনে গোল থামান যায় না ; বরং সময় সময় বৃদ্ধি পায় । নিজ শ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া অন্য শ্রেণীতে যাওয়া, ঘন ঘন বাহিরে যাওয়া, শ্রেণীর মধ্যেও ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করা প্রভৃতি কার্য্যে গোলমাল উপস্থিত হয় । এ সমস্ত অভ্যাস শাসনের দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে । অনেকে এক সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর করাতে বা যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে ব্যতীত অন্য কেহ অনাহুত উত্তর দিতে গিয়াও অনেক সময় গোলমালের সৃষ্টি করে । এইরূপ গোল নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে :—

(ক) শিক্ষক যখন পড়াইবেন, তখন বালকেরা মনোযোগপূর্ব্বক তাহার কথা শুনিবে । নিজেরা কোন কথা বলিবে না ।

(খ) শিক্ষক সাধারণতঃ কোন বিশেষ বালককে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন না । প্রশ্ন সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন ; কে তাহার উত্তর দিবে, প্রথমে তাহার নির্দেশ করিবার আবশ্যকতা নাই । যাহারা সেই প্রশ্নের উত্তর জানে, তাহারা হাত বাড়াইয়া দিবে—(চিত্রের অমুরূপ) । যাহারা জানে না, তাহারা হাত বাড়াইবে না ।



১০ম চিত্র—প্রশ্নের উত্তরে হাত বাঁধান।

এই সকল ছাত্রের মধ্য হইতে শিক্ষক ইচ্ছামত যে কোন ছাত্রকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিলেন। এই শোযুক্ত বালক প্রশ্নের উত্তর দিতে দাঁড়াইলেই অন্য সকল বালক হাত সরাইয়া লইবে। কিন্তু যদি সে বালক প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুল করে, তবে অন্যান্য বালকেরা পুনরায় হাত বাহির করিবে। শিক্ষক সবার তাহাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিবেন। এরূপ করিতে আর এক উপকার এই হইবে যে, কত বালক উক্ত প্রশ্নের উত্তর জানে, তাহার একটা পরিচয় হইবে। তবে কোন কোন ছেলে বালক না জানিয়াও হাত বাহির করিতে পারে, আর কোন কোন নির্বোধ বালক একটা ভুল উত্তরকে শুদ্ধ মনে করিয়াও হাত বাহির

করিতে পারে । কিন্তু বিচক্ষণ শিক্ষক এরূপ ছুইএকটা ছুই ও নির্বোধ বালককে সহজেই চিনিতে পারিবেন ।

(গ) আর এক কথা—প্রায় সমস্ত কার্যাই ড্রিলের মত করিয়া করাইতে পারিলে উত্তম হয় । গোলমালের সম্ভাবনা খুবই কম হয় । পড়াইবার সময় বিলাতী স্কুলসমূহে এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়া থাকে :— “পুস্তক লও—(বালকেরা পুস্তক হাতে করিল), অমুক পৃষ্ঠা খোল—(বালকেরা সেই পৃষ্ঠা খুলিল), অমুকে দাঁড়াইয়া পড়—(সে পড়িতে আরম্ভ করিল), পুস্তক বন্ধ কর—(সকলে এক সঙ্গে বন্ধ করিল), পুস্তক যথাস্থানে রাখিয়া দাও—(তাহারা রাখিয়া দিল)” । এইরূপ স্টুট লও, লেখ, খাতা লও, একে একে বাড়ী যাও প্রভৃতি সমস্ত কার্যই ড্রিলের প্রণালীতে নির্বাহিত হইয়া থাকে । নিজের ইচ্ছামত গোলমাল করিয়া পুস্তক কি স্টুট লইয়া টানাটানি করে না ও এইরূপ একটা গোলমালে বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি করিতে পারে না ।

বাঙ্গালাদেশের যে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা এই প্রথা প্রচলন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই ইহার সাপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন । কাহারও কাহারও বিরুদ্ধ মত আছে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুবই অল্প । আমাদিগের বিশ্বাস, ইহাতে বালকগণের আজ্ঞা-প্রতিপালন-বৃত্তির অনুশীলন হইবে, তাহারা শৃঙ্খলা শিথিতে পারিবে, আর গোলমালও যথেষ্ট কমিয়া যাইবে । অনেক শিক্ষক গোল থামাইতে গিয়া নিজেই অধিকতর গোল করিয়া বসেন । টেবিলের উপর ঘন ঘন বেতের আঘাত বা কিল, চাপড় প্রভৃতির দ্বারা গোলমাল একটু আঁশু নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তেমন ফল হয় না । চোখের শাসনই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাসন । যে দিকে একটু গোল হইতেছে, শিক্ষক কেবলমাত্র একবার সেই দিকে চাহিবেন, আর সব গোল থামিয়া যাইবে । কিন্তু সকল শিক্ষকের দ্বারা এ কার্য চলিবে না । তাহারা নিজে

গভীরপ্রকৃতি, বেশী বাজে কথা বলেন না, শ্রেণীতে বসিয়াই কার্য্য আরম্ভ করেন, বাজে গল্প করেন না, সেইরূপ শিক্ষকই চোখের শাসনের উপযুক্ত।

আলস্য ও অমনোযোগিতা।—উপদেশের দ্বারা বালকগণের কর্তব্য প্রতিপালনের ইচ্ছাকে বলবতী করিয়া তাহাদেব নিকট হইতে কার্য্য আদায় করিবার চেষ্টা করা বৃথা। আমরা ত অনেক উপদেশবাক্য শুনিয়াছি, আর অনেক উপদেশ দিয়াও থাকি, কিন্তু আমরা কয়জনে কর্তব্যনিষ্ঠ? এইরূপ ভবিষ্যতের ছবি দেখাইয়াও তাহাদিগকে কার্য্যবিশেষে অনুরক্ত বা কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা বৃথা। “তোমার পিতা মরিয়া গেলে কি করিয়া থাকিবে?—অতএব লেখা পড়া কর; উপর শ্রেণীতে উঠিতে পারিবে না, অতএব মনোযোগ দিয়া পড়; লেখা পড়া না শিখিলে ঘোড়ার ঘাস কাটিতে হইবে” ইত্যাদি বাক্যেরও কোন ফল নাই। আমাদের কয়জনের এরূপ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে? আমরা ভবিষ্যতের ফলাফল জানিয়া শুনিয়া কত সময়ই না বৃথা কালক্ষেপণ করিয়া থাকি? সরলমতি বালক, সে ভবিষ্যতের বুঝে কি? সে উপস্থিত সুখ লইয়া ব্যস্ত। তাহার জ্ঞান তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধ্যাপনাকে তাহার মনোমত করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। অধ্যাপনায় যাহাতে সে সুখ পায় তাহাই করিতে হইবে। তাহা হইলে সে আপনা আপনিই সেই সুখের দিকে ধাবিত হইবে। সময় সময় একটু কড়া শাসন আবশ্যক হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মিষ্ট কথা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারেব দ্বারা যে পরিমার্জন ফলোদয় হয়, কড়া শাসনে তাহা হয় না।

আলস্য, অমনোযোগিতা ও অবাধ্যতা পরিত্যাগ করাইতে পারিলে বালকদিগকে কর্তব্যপথে পরিচালিত করা যাইতে পারে। আলস্য দুই রকমে উৎপন্ন হইয়া থাকে—এক শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ, আর এক অভ্যাস বশতঃ। শারীরিক দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার চিকিৎসা

করা, কি উত্তম আহারের ব্যবস্থা করা অভিভাবকের কার্য। কিন্তু যদি অভ্যাসবশতঃ আলস্য জন্মিয়া থাকে তবে তাহাব প্রতিকারের ভার অনেক পরিমাণে শিক্ষকের হাতে। অলস বালককে এক দিনেই অলস বালকের মত পরিশ্রমী করিতে চেষ্টা করিবে না। অলস বালককে যখন চারিটী অঙ্ক কসিয়া আনিতে বলিবে, অলস বালককে তখন একটী অঙ্ক কসিতে দিবে। এইরূপে একটু একটু করিয়া মাত্রা বাড়াইতে হইবে। মধ্য মধ্য আবশ্যক হইলে একটু কঠোর শাসন করাও মন্দ নহে। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক সে বালকের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর ধীরে ধীরে তাহাকে পরিশ্রমী করিয়া তুলিতে হইবে। অমনোযোগিতার প্রধান কারণ পাঠ্য বিষয়ে সুখানুভব করিতে না পাবা। জ্যামিতির ৩৪টী প্রতিজ্ঞা পড়া হইয়া গিয়াছে, এমন সময় এক বালক ভর্তি হইল। সে জ্যামিতির সামান্য সংজ্ঞা মাত্র শিখিয়া আসিয়াছে। এরূপ অবস্থায় পঞ্চম প্রতিজ্ঞা পড়াইতে গেলে অন্যান্য বালকেরা ধেরূপ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিবে, নূতন বালকটী তাহা করিবে না। এক বিষয়ে এইরূপ অমনোযোগী হইলে, সে ধীরে ধীরে অন্যান্য বিষয়েও তদ্রূপ অমনোযোগী হইয়া পড়িবে। এরূপ অবস্থায়, হয় নূতন ছেলে ভর্তি করা উচিত নয়, না হয় তাহার জন্ত পৃথক বন্দোবস্ত করা উচিত। শিক্ষক নিজের বিশ্রাম-ঘণ্টায় বা বিছালার পরে ১৫/২০ মিনিট তাহার জন্ত পরিশ্রম করিয়া তাহাকে শ্রেণীর সমান করিয়া লইতে পারেন। যে বালক খেলায় কি অন্য কোন কাজে অনুরক্ত, তাহাকে আগরা অমনোযোগী বলিয়া থাকি। কিন্তু সেটী ভুল। যে অমনোযোগী, সে সব কার্যেই অমনোযোগী। যে খেলায় খুব মনোযোগ দেয়, তাহার যে মনোযোগের শক্তি আছে, তাহা নিশ্চয়। খেলায় সে সুখ পায়—লেখাপড়ায় তাহা পায় না। লেখাপড়ার কার্য খেলার মত সুখকর করিতে পারিলে সে আপনিই সে দিকে মনোনিবেশ করিবে। অবাধ্যতা নানা কারণে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে শিক্ষকের কঠোর ব্যবহার

প্রধান । একটু স্নেহ কি সহানুভূতির ভাব না দেখাইয়া, যদি দিন রাত কেবল কঠোর শাসনের অধীন রাখিতে চেষ্টা করা যায়, তবে বালকেরা অবাধ্য হইয়া পড়িবে । বালকদিগকে পরিমিত স্বাধীনতা দিতে হইবে—আবার সেই স্বাধীনতা বিপথে না যায়, ইহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে ।

মুখভঙ্গী করিয়া ঠাট্টা করা, কঠোর ভাষায় ভৎসনা করা, সামান্য ত্রুটিতেই শাস্তি দেওয়া, অপরিমিত পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়া প্রভৃতি কারণে বালকেরা অবাধ্য হইয়া উঠে । এ সমস্তের প্রতিকার শিক্ষকের হাতে । তবে এক রকমের বালক আছে, যাহারা স্বভাবতঃই বদ মেজাজের । যে বালক ইতর সমাজে বাস করে বা যে নীচ পরিবারে পালিত, সে বালক সেই সমাজ বা পরিবারের দোষে বিকৃষ্টচিত্ত হইয়া থাকে । এ সকল বালক শিক্ষককে উপেক্ষা করিতেই ভালবাসে ও তাহাতেই গৌরব মনে করে । ইহাদের দৃষ্টান্তে অত্যাচার বালকেরাও শিক্ষকের আজ্ঞা অমান্য করিতে শিক্ষা করে । ইহাদের শাসনে, অগ্রে বেত, পরে অর্ধচন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন ব্যবস্থা নাই । প্রথমে অবশ্য অত্যাচার উপায়ে ইহাদিগের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে । বেত ও অর্ধচন্দ্র শেষ উপায় । অনেক বালক বাড়ী হইতে পুস্তক লইয়া রওনা হয়, কিন্তু বিদ্যালয়ে না আসিয়া কোন খেলার আড্ডায় প্রবেশ করে ও চারিটা বাজিলে বাড়ী ফিরিয়া যায় । কেহ কেহ বিদ্যালয় হইতে পলায়নও করিয়া থাকে । এরূপ উপস্থিত হইবার বা পলায়ন করিবার কারণ দুইটি—(১) পাঠ অভ্যাস না করা, (২) কোনরূপ খেলায় বা খেলালে অগ্নিরক্ত হওয়া । বালকের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে । অভিভাবককে জানাইতে হইবে । তার পর প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । অনুপস্থিতির জরিমানা করিয়াও এ বিষয়ে অভিভাবকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে । যদি পাঠাভ্যাস না করাই কারণ হয়, তবে পাঠাভ্যাস করিতে তাহার কি কি অভাব বা

অভিযোগ আছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। পাঠ অধিক হইলে কমানিয়া দিতে হইবে, পুস্তকের অভাব থাকিলে পূরণ করিতে হইবে, পাঠ কঠিন হইলে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। যদি কোন খেলার মত্ত হইয়া থাকে তবে সে খেলা (উত্তম হইলে) বিদ্যালয়ে প্রচলন করিতে হইবে। কিন্তু যদি কোন বদ্‌ খেলা বা খেলায় আসক্ত হইয়া থাকে তবে অভিভাবকের সাহায্যে তাহা ছাড়াইতে হইবে। অনেক বালক তাহাদের আড্ডায়, তাহাদের আড্ডায়, এমন কি ইহা অপেক্ষা বড় বড় বদ্‌ খেলার আড্ডায় মিশিয়া মাটি হইয়া যায়। অভিভাবকের অমনোযোগিতাই ইহার প্রধান কারণ। তবে শিক্ষকেরও যে কিছু দোষ নাই, তাহা বলি না। শিক্ষকেরও সর্বদা অনুসন্ধান করিতে হইবে, কে কি করে, না করে। বদ্‌ খেলায় মিশিলে, তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করা সময় সময় বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। এ সকল ক্ষেত্রে উত্তমরূপে বেতের ব্যবস্থা (অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া) করাই সম্ভব। বাচনিক উপদেশে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না।

কর্মচারী শাসন—সহকারী শিক্ষক ও চাকর চাকরাদিগকেও সময় সময় শাসন করিতে হয়। সহকারী শিক্ষকদিগের সহিত কখনও অভদ্র ব্যবহার করিবে না। তুমি তাঁহাদের মান রক্ষা না করিলে তাঁহারা তোমার সম্মান রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন না। বাহিরে কোন শিক্ষকের নিন্দার কি অপারগতার বিষয় গল্প করিবে না। বিশেষ, তুমি তাঁহাদিগের যতই সম্মান করিবে, তাঁহাদের প্রীতি ততই বালকের ভক্তি বৃদ্ধি পাইবে। যদি তুমি নিজে সময়নিষ্ঠ হও, পরিশ্রমী হও, তাঁহারাও সময়নিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিবেন। যে সকল শিক্ষকের বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সময়ের পরে আসা অথবা শ্রেণীতে বসিয়া নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস, প্রধান শিক্ষক তাঁহাদের বিশেষ তত্ত্বাবধান করিবেন। যে শিক্ষক সাধারণতঃ বিলম্বে আসিয়া থাকেন, ঘণ্টা বাজিবামাত্র তাঁহার শ্রেণীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে

হইবে, আর তিনি আসিলে অসন্তোষ প্রকাশের সহিত এই কথা বলিলেই চলিবে যে, আজ আপনার “এত মিনিট বিলম্ব হইয়াছে।” এইরূপ শ্রেণীর বালকদিগের সম্মুখে ২৩ দিন তাঁহাকে একটু লজ্জা দিলে সম্ভবতঃ তাঁহার দোষ সংশোধিত হইবে। যিনি শ্রেণীতে নিদ্রা যান, তাঁহার শ্রেণীতে ঘন ঘন যাওয়া উচিত। যদি তাঁহার মনে থাকে যে, প্রধান শিক্ষক যে কোন সময় আসিয়া পড়িতে পারেন, তবে বোধ হয় তিনি আর ঘুমাইতে সাহস করিবেন না। কিন্তু যে সকল শিক্ষক নিতান্তই নির্লজ্জ ও কর্তব্যজ্ঞান-রহিত, তাঁহাদিগকে গোপনে ডাকিয়া একটু সাবধান করিয়া দিতে হইবে। শিক্ষকেবা প্রত্যহ নোট লিখিয়া আনেন কি না, পড়াইবার জন্য সকল প্রকারে প্রস্তুত হইয়া আসেন কি না, বালকদিগের লিখিত উত্তরসমূহ উত্তমরূপে শুদ্ধ করিয়া সময় মত ফিরাইয়া দেন কি না, শিক্ষার জন্য উপযুক্তরূপ পরিশ্রম করেন কি না, প্রধান শিক্ষক প্রতিনিয়তই এ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিবেন।

যাঁহার যাহা কর্তব্য, তাঁহার নিকট হইতে সে সমস্ত পূর্ণমাত্রায় আদায় করিতে হইবে। ইহাতে যদি কেহ অসন্তুষ্ট হন, তবে তাহার আর উপায় নাই। চাকর চাকরানী রীতিমত তাহাদিগের কর্তব্য করে কি না, তাহাও দেখিতে হইবে। প্রত্যহ প্রত্যেক কার্যের সন্ধান করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু যদি প্রতিদিন একটী করিয়া কার্যেরও তত্ত্বাবধান করা যায় তবে সকলেই তাহাদিগের নিজ নিজ কার্য সম্বন্ধে সাবধান হইবে।

সভ্য ব্যবহার।—শিক্ষক শ্রেণীতে আসিলে সকল বালক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবে। যত বার তিনি শ্রেণীতে আসিবেন তত বারই এরূপ করিতে হইবে না। কেবল সর্বপ্রথম সাক্ষাতেই এরূপ করা নিয়ম। পাঠের সময় বালকদিগকে বাহিরে যাইতে দিবে না। প্রত্যেক পাঠের শেষে ছোট ছোট বালকদিগকে ৫৬ মিনিটের জন্য ছুটী

দেওয়া মন্দ নহে । বড় ছেলেদিগের স্ববিধার নিমিত্ত প্রত্যেক বিদ্যালয়েই অর্ধ ঘণ্টা বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য । এই বিশ্রাম-ঘণ্টার সময় প্রথম তিন ঘণ্টা ও শেষ দুই ঘণ্টার মধ্য সময় । ত্রিভঙ্গি হইয়া বসা, বেঞ্চের উপর পা তুলিয়া বসা, ডেস্কের উপর মাথা নোয়াইয়া থাকা, একজনের গায়ের উপরে আর একজন হেলিয়া থাকা প্রভৃতি অসভ্য আচরণ নিবারণ করিতে যত্ন করিবে । যে সমস্ত আজ্ঞা প্রতিপালন বালকের পক্ষে অসাধ্য, এরূপ আজ্ঞা দিবে না । বালকদিগকে খুব বিশ্বাস করিবে ; অবিশ্বাস করিলে অধিকতর অবিশ্বাসী হইতে চেষ্টা করিবে । বালকদিগের নিকট আনন্দপ্রদ গল্প করিতে পার, কিন্তু তাহাদের সহিত কোনরূপ রহস্য করিবে না বা অশ্লীল বাক্যালাপ করিবে না । কাহারও প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব বা অপরিমিত অনুরাগ দেখাইবে না । সকলকে সমানভাবে মেহ করিবে । বিদ্যালয় পরিচালনার জন্ত যদি নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে হয় তবে তাহার ভাষা সরল, ভাব বিশদ ও সংখ্যা স্বল্প হওয়া উচিত । নিয়মগুলি উত্তমরূপে প্রতিপালিত হয় কি না, সে বিষয় অনুসন্ধান করিবে । কেহ নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম করিলে তখনই তাহার প্রতিবিধান করিবে । অনেক শিক্ষকের অভ্যাস আছে, প্রত্যাহই নূতন নিয়ম প্রচার করা বা নূতন আদেশ প্রচার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া । আদেশের সংখ্যা অধিক হইয়া গেলে বালকদিগের সমস্ত পালন করিতে মনে থাকে না, আর শিক্ষকও তাঁহার সমস্ত নিয়ম প্রতিপালিত হয় কিনা, দেখিতে অবসর পান না । এরূপ আদেশে সফল না হইয়া বরং কুফলই হয় । বালকেরা মনে করে যে প্রত্যাহ নূতন আদেশ প্রবণই বর্ধিতে হয়, কিন্তু তাহা পালন না করিলেও চলে । কারণ পালন না করার দীকণ যে শাস্তি, তাহা ত তাহাদিগের ভোগ করিতে হয় না ।

পুরস্কার ।—শিক্ষকের মুখ-নিঃসৃত সামান্য দুই একটি উৎসাহ-সূচক বাক্য, বালকের যে পরিমাণ উপকার করিতে পারে, শত ভৎসনায়

তাহা করিতে পারে না। নিরুৎসাহের কথা কখনই বলা উচিত নয়। “তুমি মূর্থ, তোমার কিছুই হইবে না, তোমার মাথা নাই, তুমি ঘাস কাট গিয়া, কেন মিছে চেষ্টা কর” ইত্যাদি বাক্য অনেক বালকের সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। বালককে সর্বদাই উৎসাহিত করিতে হইবে। অঙ্গ কসিতে পারিতেছে না—শিখাইয়া দাও; তার পর এমন সহজ অঙ্গ দাও যে, সে বেশ কসিতে পারে। সমস্ত শুদ্ধ না হইলেও যে সামান্য অংশ শুদ্ধ হইয়াছে, তাহাই উপলক্ষ করিয়া বল, “এ পর্য্যন্ত বেশ হইয়াছে, এই থানে অল্প ভুল হইয়াছে; তা আর একবার চেষ্টা করিলে সব ঠিক হইয়া যাইবে।” ছবি আঁকিতে দিয়াছ, হয় ত কিছুই হইতেছে না, কিন্তু নিরুৎসাহ করিও না। “হাঁ, এই রকম করিয়াই করিতে হয়, তোমার বুদ্ধি আছে, আর ২৩ বাব চেষ্টা করিলেই চমৎকার হইবে” এইরূপে উৎসাহিত করিবে। তবে ‘এইটা এই রকমে করিতে হয়, এইটা এই রকমে করিতে হয়’ এই কথা বলিয়া শুদ্ধ করিয়া দিবে। রচনা করিতে দিয়াছ, অনেক ভুল করিয়াছে, গালি দিও না। যে সমস্ত অংশ উত্তম হইয়াছে, তাহার স্তুতি করিয়া অল্প অংশের ভুল দেখাইয়া দাও। কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেছে, (প্রায়ই দুর্বল বালকদিগকেই অধিক উৎসাহিত করিতে হয়), যেটুকু ঠিক হইতেছে, তাহাতেই “বা! বেশ হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে” এই সকল বাক্য তাহাকে উৎসাহিত করিয়া ভুল অংশ সংশোধন করিয়া দিবে। প্রাত্যহিক পাঠের সময় উপর নীচ কবাইবার প্রথা আছে। এ প্রথার দোষ গুণ উভয়ই আছে। ইহাতে বালকগণের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দোষ এই যে বালকগণ প্রকৃত বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া কেবল উপরে বাইবার কৌশলই চিন্তা করে। যাহা হউক নিম্নশ্রেণীতে এ প্রথার দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। উপরের শ্রেণীতে অন্য প্রথার আচরণ করা যাইতে পারে। শ্রদ্ধাঙ্গদ বাবু গৌরমোহন বসাক যখন চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তখন তিনি এন্ট্রেন্স

ক্রমে প্রত্যহ তাঁহার খাতায় নিম্নলিখিতরূপে বালকদিগের গুণাগুণের (সাক্ষেতিক) চিহ্ন দিয়া রাখিতেন :—

নম্বর	নাম	৩।৪।৮২ সাহিত্য	৩।৪।৮২ জ্যামিতি	৪।৪।৮২ পাটীগণিত	৪।৪।৮২ ব্যাকরণ
১	উপেন্দ্রলাল মজুমদার	উ		ম	ম
২	অতুলচন্দ্র দত্ত	উ	অ	ম	
৩	অন্নদাচরণ চৌধুরী		ম	উ	

উ = উত্তম, ম = মধ্যম, অ = অধম ।

শ্রেণীতে অনেক বালক হইলে প্রত্যহ সকল বিষয়ে সকলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সম্ভবপর নহে । কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই বলিয়া, কাহারও ঘর মধ্যে মধ্যে খালি আছে । মাসেব শেষে কে কয়টা উ, অ, ম পাইয়াছে, ইহার হিসাব হইত । সকল বালকেই যাহাতে অধিক সংখ্যক উ পাষ সেজন্ত চেষ্টা করিত । গৌরমোহন বাবু এই প্রথার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । তাঁহার হাতে অনেক রত্ন ছাত্র প্রস্তুত হইয়াছে । দৈনিক নম্বর দিবার ইহাই রীতি । কেহ ইচ্ছা করিলে ১০ নম্বরকে উত্তম ধরিয়া ৬ নম্বর মধ্যম ও ৩ নম্বর ও তাহার নীচ অধম, এরূপও করিতে পারেন । কেহ কেহ মনে করেন যে দৈনিক নম্বর দিবার প্রথা মতে প্রত্যহ প্রত্যেক বালককে প্রত্যেক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ও প্রত্যেক বালককেই প্রত্যেক বিষয়ে নম্বর দিতে হইবে । এটি ভুল ধারণা । এইরূপ নম্বর দিবার উদ্দেশ্যই দুর্বল ছাত্রের উন্নতি লক্ষ্য করা । সুতরাং দুর্বল ছাত্রগণকেই অধিক প্রশ্ন করিতে হইবে ও তাহার নম্বর দিতে হইবে । প্রত্যহ যে প্রত্যেক বিষয়েই প্রত্যেককে নম্বর দিতে হইবে তাহা নহে ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরস্কার দিয়াও অনেক সময় ছাত্রগণকে উৎসাহিত করা যায় । প্রতিযোগিতায় একটি পেন্সিল কি একখানা খাতা পাইলেই বালকেরা তাহাকে যথেষ্ট মূল্যবান মনে করে । পরীক্ষার ফল দৃষ্টেও পুরস্কার

দিবার রীতি আছে। কিন্তু প্রায় স্কুলেই ছাত্রসংখ্যা অনুসারে পুরস্কারের সংখ্যা অতি কম হইয়া থাকে। পুস্তকের দামের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহার সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখাই কর্তব্য। পুরস্কারের সংখ্যা অতি অল্প হইলে অনেক বালকেরই তাহার জন্ত চেষ্টা করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু সংখ্যা বেশী হইলে অনেকেই আশাবিত্ত হইয়া চেষ্টা করিয়া থাকে। কোন স্বাভাবিক গুণের জন্ত কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া উচিত নহে। একজনের গলার স্বর স্বভাবতঃই মিষ্ট। সে সেই জন্ত গানের পুরস্কার পাইতে পারে না। চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া বালকেরা বাহা শিক্ষা করে তাহার জন্তই তাহার পুরস্কার পাইবে। যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা ও যত্ন করিয়া গান অভ্যাস করিয়াছে, তাহার গলার স্বর অপেক্ষাকৃত মন্দ হইলেও সেই পুরস্কারের পাত্র। পাবনা জিলা স্কুলের একজন শিক্ষক ২৪টা গোলাপ ফুল, আম্র, কদলী কি কমলা লেবু দিয়া বালকগণকে এত উৎসাহিত করিতেন যে, তাঁহার শিক্ষা-কৌশল দেখিয়া সকলেই মোহিত হইতেন।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরস্কারের দ্বারা অভিভাবকেরও মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তিরস্কার অপেক্ষা পুরস্কার অধিকতর ফলপ্রসূ। তিরস্কারে কষ্ট, পুরস্কারে আনন্দ। আমরা যে কার্য্যই করি না কেন, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্যই আনন্দলাভ। সুতরাং সেই আনন্দ সম্মুখে ধারণ করিলে বালকগণ কার্য্যে অগ্রসর হইতে যতদূর উৎসাহিত ও প্রলোভিত হইবে শাস্তির ভয়ে তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণও হইবে কিনা সন্দেহ। একথাও আবার মনে রাখা কর্তব্য যে, অধিক সূখ্যাতি বা পুরস্কারে অনেক বালক আত্মলাভে ও গর্ব্বিত হইয়া অধঃপাতে যায়।

যে রূপ শাসনে বালকগণ কর্তব্যনিষ্ঠ, কার্য্যকুশল, মনোযোগী ও সচ্চরিত্র হয় সেইরূপ শাসনকেই সুশাসন বলে। শিক্ষা-কার্য্য পরিচালনের পক্ষে এরূপ সুশাসন অত্যাৱশ্যক। শিক্ষকের শক্তির উপর সুশাসনের ফলাফল

নির্ভর করে। শিক্ষক নিজে সুপণ্ডিত ও সচ্চরিত্র না হইলে শাসনে কোনরূপ ফলোদয় হইবে না। বিশেষতঃ সৎ দৃষ্টান্তের নির্দোষ শাসন যেরূপ কার্য্যকরী, শত সহস্র গগনভেদী বক্তৃতা তাহার তুলনায় কিছুই নয়। আর একটা কথা বলিয়াই আমরা এ পরিচ্ছেদ শেষ করিব। বিলাতের রাগবী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক স্বনামধন্য আরনল্ড সাহেব একবার তাঁহার বিদ্যালয় হইতে বহুসংখ্যক ছাত্রকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ছাত্রেরা তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়াছিল ও সত্যের অপলাপ করিয়াছিল। বিদায়কালে তিনি ছাত্রগণকে ইহাই বলিয়া দিলেন যে, “আমি ছাত্রগণের সংখ্যা চাই না, চরিত্র চাই। ইহাতে আমার স্কুল ছাত্র-শূন্য হইলেও আমি তাহা গ্রাহ্য করিব না।” বিদ্যাসাগর মহাশয়ও একবার তাঁহার মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে অনেক বালককে অবাধ্যতার অপরাধে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। উচ্চ লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে ছাত্রসংখ্যা সংস্ফুট অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলে সুশাসন চলা অসম্ভব। সুশাসনে ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যায় বলিয়া কোন কোন শিক্ষকের ধারণা থাকিতে পারে, কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।





তৃতীয় অধ্যায়—সুশিক্ষা বিষয়ক ।

সুশিক্ষা কাকে বলে ?—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, তাহার আলোচনা করা আবশ্যিক । যে শিক্ষায় সেই উদ্দেশ্য সাধন হয়, সেইরূপ শিক্ষাই যে সুশিক্ষা, তাহা স্বীকার করিতে আমাদের আর আপত্তি থাকিবে না ।

যে রূপ শিক্ষালাভে আমরা সর্বতোভাবে সুখসন্তোষ করিতে সমর্থ হই তাহাই সুশিক্ষা । কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক শান্তি সন্তোষ করিতে পারি, কি উপায়ে সাংসারিক দুঃখ কষ্টাদি এবং অভাবের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, কি উপায়ে পরিবারবর্গ পালন করিতে পারি, ইত্যাদি বিষয়ক কার্য্যকরী প্রশালী শিক্ষা করাই সুশিক্ষা ।

তবে শিক্ষা দ্বারা ঐ সকল সুখসন্তোষের বিধান কতদূর সুসাধিত হইতে পারে তাহাই বিবেচনা করা কর্তব্য । এ বিষয়ে বিচার করিতে হইলে প্রথমে আমাদের অবশ্যকরীয় সাংসারিক কর্তব্য কর্ম্মগুলি নির্ণয় করা আবশ্যিক । এই কার্য্যনিচয়কে স্বাভাবিক পর্য্যায়ক্রমে এইরূপে বিভাগ করা যাইতে পারে—[১] আত্মসংরক্ষণ, —[২] জীবিকা অর্জন,—[৩] সন্তান প্রতিপালন,—[৪] রাজ্যশাসন ও সমাজের শক্তিবর্ধন,—[৫] চিত্তরঞ্জন ।

১ । আত্মরক্ষার সজুপায় সকল স্বতঃই মানবের মনে সমুদ্ভূত হইয়া

থাকে । বালক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রকৃতিই তাহার মনে আত্মরক্ষার জ্ঞান দান করিয়া থাকেন । কোন অদৃষ্টপূর্ব জীব কি বস্তু দেখিলে বিপদের আশঙ্কায় শিশু মাতৃ-কোলে লুকায়িত হইয়া থাকে । কিছু বড় হইলে, তাহার বস্তুর গুণাগুণ জানিবার জন্য প্রত্যেক বস্তুই মুখে দিয়া থাকে ; অথবা বস্তুটী কঠিন কি কোমল তাহা হাতের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকে । দ্রব্যাদির গুণাগুণ বিষয়ক এইরূপ জ্ঞান বর্জন করিয়া আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা করে ।

যখন দাঁড়াইতে বা একটু হাঁটিতে শিখে, তখন ছুটাছুটি করিয়া পেশী-সমূহের দৃঢ়তা সম্পাদন করে । কিন্তু কেবল প্রকৃতির এইরূপ শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের বাঞ্ছিত ফললাভ হয় না । রোগ হইতে শরীরকে দূরে রাখা অথবা রোগ হইলে তাহার প্রতীকার করা, শরীরকে ব্যায়ামাদির দ্বারা দৃঢ়তর করাও আমাদিগের কর্তব্য । এই নিমিত্ত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদির প্রতিপালন ও ব্যায়ামাদির অনুশীলন আবশ্যিক । স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক নিয়মাদি ও কিরূপ ব্যায়ামের দ্বারা কোন্ পেশী কি পরিমাণ সবল হইয়া থাকে, তাহার বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত না হইলে আমরা নিজের শরীর রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না । আর নিজের শরীর রক্ষা না হইলে কেই বা অর্থোপার্জন করিবে, কেই বা সন্তান পালন করিবে, কেই বা আগোদ প্রমোদ উপভোগ করিবে ? আজকাল বিদ্যালয়ে নানাবিধ ব্যায়ামের বিধান হওয়াতে শারীরিক উন্নতির কথঞ্চিৎ সুব্যবস্থা হইয়াছে ।

২ । আত্মরক্ষার পরেই জীবনরক্ষার্থ জীবিকা নির্বাহের উপায় শিক্ষা করা আবশ্যিক । কেবল লিখিতে পড়িতে বা ছুই চারিটা অঙ্ক করিতে শিখিলেই জীবিকা উপার্জন করিতে পারা যায় না । কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞানের চর্চাই অর্থোপার্জনের প্রধান উপায় । সেই জন্য বাল্যকালেই বালকগণকে নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকার্যে উৎসাহিত করা হইয়া থাকে । কাগজ কাটা, মাটির পুতুল প্রস্তুত করা, কাঠি

সাজান, বীজ সাজান প্রভৃতির দ্বারা কোনও বিশেষ শিল্পের অনুশীলন হয় না বটে কিন্তু শিল্পের অনুশীলন যে লঘুহস্ততা ও সহজ অঙ্গুলিসঞ্চালনের উপর নির্ভর করে, কাগজ কাটা প্রভৃতির শিক্ষার দ্বারা সেই ফললাভ হইয়া থাকে।

বিদ্যালয়-সংলগ্ন উদ্যানে কার্য্য করাতে কৃষি বিষয়ে অনুরাগ জন্মে। স্বহস্তরোপিত বৃক্ষটী বড় হইয়া ফলপুষ্পে শোভিত হইতে দেখিলে, বালকের মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়। আর বিদ্যালয়ে ধনী দরিদ্র সকলকেই এই সমস্ত কাজ করিতে দেখিলে, শারীরিক পরিশ্রম যে লজ্জা বা অপমানজনক কার্য্য নহে, ইহাও তাহারা বুঝিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীতে আজকাল বিজ্ঞানাদির অনুশীলন হইয়া থাকে। কৃষি শিল্পের উন্নতি বিজ্ঞান শাস্ত্রালোচনা সাপেক্ষ।

চাকরীর দ্বারা যে অর্থোপার্জন হইতে পারে তাহা সত্য। বড় বড় চাকরী ভিন্ন সামান্য চাকরী দ্বারা যে অর্থোপার্জন হইয়া থাকে, তাহাতে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন। আর মানুষ-সংখ্যার তুলনায়, চাকরীর সংখ্যাই বা কয়টি? তারপর সে চাকরীর অবস্থাও দিন দিন যেরূপ হইয়া পড়িয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা পুনরায় রায় যতুনাথ রায় বাহাদুরের “শিক্ষা বিচার” গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা গেল :—এতদেশীয় ধনবান ব্যক্তিগণ স্ব স্ব সম্মান-দিগকে স্কুল কলেজে দিয়া থাকেন, তদর্শনে সেই প্রকার অনুবর্তী হইয়া মধ্যবিত্ত ও সামান্য লোকেও স্বীয় তনয়গণকে এ সকল বিদ্যালয়ে নিয়োজিত করেন। এই সকল স্কুল কলেজে যাদৃশ বিজ্ঞা উপার্জন হয় তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ওকালতী কর্ম্মের আয় যৎসামান্য হইয়া উঠিয়াছে। হাইকোর্টের অধুনাতন যুবক উকীলদিগের কৃষ্যবর্ণ সাগলা ও চিরবাবস্থিত লোমবজ্জিত চাপকান তাঁহাদিগের ঊপার্জনের যেরূপ পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে মোকদ্দমাবাজ বাঙ্গালাদেশ “ব্যবহারাজীবী মহাশয়দিগের আর আহাৰ দিতে পারিবে না বলিয়া” যে শয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, বিবেচনা করিলে ইহা কে না বুঝিতে পারিবে? দেশে ম্যালেরিয়া, জ্বর ও ওলাউঠার এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও ডাক্তার বাবুদিগের যে ছুর্দশা, তাহাতে তাঁহাদিগের বিচার অর্থোপার্জনী শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। কেবল ইঞ্জিনিয়ার বাবুদের উদর এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অবাধে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অনেকে এক বিষয়ের প্রত্যাণী হইলে যেরূপ দুঃস্বপ্ন হয়, অচিরে

এ ব্যবসায়ে সেই দশা ঘটিবে । এতদ্বির শুল-মাষ্টার ও কেরানীদিগের ত দুর্দশার কথাই নাই । তাঁহারা উপায়ান্তর রহিত বলিয়াই, মৃত্যুশয্যাশায়ী রোগীর স্থায় নিতান্ত নিরাশাস হইয়া আছেন । ঐদৃশ ছরবছা দর্শন করিয়াও যে আমরা ঐরূপ বিভ্রা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি ও প্রচলিত প্রথা ছাড়িতে চাহি না, ইহা অপেক্ষা অবিলেচনার কার্য্য কি হইতে পারে ? যে বিভ্রা শিক্ষা করিলে স্বথসেবা দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারা যায়, যদ্বারা স্বথে কালান্তিপাত হয় এবং যাহার অভাবে দেশের কোনরূপ উন্নতির সম্ভাবনা নাই, এরূপ হিতকরী শিক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক নব্যসম্প্রদায়ীরা অবিলেচকের স্থায় একটু ইংরেজী শিথিয়া একুল ওকুল ছুকুল হারাইয়া বসেন ।

৩। পরিবার-পরিজন প্রতিপালন করিতে হইবে ও সন্তানকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে । সাংসারিক সুখের ইহা প্রধান উপকরণ । কিন্তু যে সন্তান সন্ততির সুশিক্ষার উপর আমাদের পারিবারিক মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে, যে সন্তানগণ ভবিষ্যৎ আশার স্থল, তাহাদের শিক্ষার নিমিত্ত আমরা কি ব্যবস্থা করিয়া থাকি ? যে রূপ আহার দিলে বালকের শরীর সুস্থ ও সবল হইতে পারে, যে রূপ নীতিশিক্ষায় তাহাদিগের মানসিক বৃত্তিগুলি বিকশিত হইতে পারে, তাহা আমরা কয়জনে জানি ? শারীর-বিধান ও মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে অধিকার না জন্মাইলে, বালকের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না । কি পিতা, কি মাতা, কি শিক্ষক, সকলেই এ বিষয়ে অজ্ঞ অথবা উদাসীন । বাঙ্গালাদেশে বালিকা বয়স শেষ না হইতেই রমণীগণ মাতা হইয়া বসেন । যিনি নিজেই বয়সে ও জ্ঞানে বালিকা মাত্র, যিনি সংসারে ভালমন্দবিষয়ক জ্ঞানশূন্য, তিনি অপরকে শিখাইবেন কি ? এই জন্ত যে মাতৃশিক্ষার গুণে অন্যান্য দেশে মহৎ লৌকের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা এদেশে হইবার নয় ।

বালকেরা প্রকৃতি হইতে যে জ্ঞান ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহার প্রতিবন্ধকতা না করাই উচিত । ভয়প্রদর্শন, উৎকোচ বা প্রশংসা দ্বারা সন্তানকে বশীভূত করিয়া মাতা পুত্র ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাইয়া

থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, ছেলের মনে যাহা হউক আর না হউক, কোন মতে কার্য্য উদ্ধার হইলেই হইল। কিন্তু ইহা চিন্তা করেন না যে, এ ব্যবহারে অকারণ শিশুর মনে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং জুয়াচুরি ও স্বার্থপরতা অভ্যাস পাইয়া যায়। “সর্বদা সত্য কহিবে; মিথ্যা কহিবে না, কহিলে মার খাইবে” এই বলিয়া শিক্ষা দেন। কিন্তু উহা শিক্ষা দিবার পর মিথ্যা কথা কহিতে দেখিয়াও দণ্ড না করিলে প্রকারান্তরে যে মিথ্যা কহার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, বোধ হয় ইহা তাঁহাদের মনে উদ্ভিত হয় না। গল্প-জাতির স্বাভাবিক যুগ্ম-জ্ঞান-ভ্রম আছে তাহা উত্তেজিত করিতে পারিলেই শিশুরা অনায়াসে জ্ঞানোপার্জন করিতে থাকে। পুরোবর্তী জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞান না জন্মিতেই, দূরস্থ বস্তু জানাইবার চেষ্টা করা বৃথা। বালকেরা ইতস্ততঃ দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান উপার্জন করিতে পারে, তাহা সমাপ্ত না হইতেই পুস্তক হাতে দেওয়া বিফল। পঞ্চম বর্ষ গত না হইতেই পিতা ছেলেকে কাপড় পরাইয়া, একখানি বর্ণপরিচয় হাতে দিয়া, স্কুলে প্রেরণ করেন। এদিকে ছেলে অবশ্যজ্ঞেয় বিষয়সকল কিছুই শিখে নাই। সে পথে যাইয়া যাহা কিছু দেখে, তাহাই নূতন ভাবিয়া তাহার পিছু পিছু দৌড়িতে থাকে, অথবা তাহার অনুসন্ধিৎসায় একাগ্রচিত্তে হাঁ করিয়া থাকে। কেহ বা পাঠশালায় গমনপূর্বক বহিখানি খুলিয়া রাখিয়া এদিকে ওদিকে চাহিতে থাকে। ওদিকে বিজ্ঞতম গুরু মহাশয় “পড় পড়” বলিয়া চীৎকারপূর্বক ভয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। ছেলেও ভয়ে ভয়ে রাস্তায় মন ও পুস্তকে দৃষ্টি রাখিয়া চমৎকার চাতুরী শিখিতে থাকে। ক্রমে এইরূপে কৌশল অভ্যাস হওয়াতে, অবশ্যজ্ঞেয় বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া উঠে। সুতরাং বয়োবৃদ্ধ হইয়াও নিতান্ত অজ্ঞ থাকিয়া যায় এবং স্বাভাবিক জ্ঞানোপার্জনে পথভ্রান্ত হইয়া চিরকালের মত অমনোযোগী হইয়া পড়ে। উর্বরতা সম্পাদন না করিয়া ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন অভিলষিত শস্ত্রোৎপত্তি হয় না, তেমনি অসময়ে বিচারান্ত করিলেও ফলোদয় হয় না।

“কিলাইয়া কাঁটাল পাকান আর বর্তমান শিক্ষা-প্রণালী উভয়ই তুল্যা”
(শিক্ষা-বিচার) ।

তবে এখন পূর্ব পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । যাহাতে বালকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানা বিষয়ে শিক্ষা করিতে পারে, বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে সেরূপ বিধান করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে । পদার্থ-পরিচয় শিক্ষাদানে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞান দান হইতেছে । আর এই রূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীতে যাহাতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার জন্ত সর্বত্রই শিক্ষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে ।

৪ । রাজ্যশাসন ও সমাজসংস্কার আশাদিগের অবশ্য করণীয় বিষয় । যে রাজ্যে বা সমাজে আমরা বসবাস করি, সে রাজ্য বা সমাজ উন্নত না হইলে আশাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে । সুতরাং যে সকল বিষয় আশাদিগের সাংসারিক সুখের অন্তরায়, তাহার উচ্ছেদসাধন আবশ্যক ।

রাজ্যশাসন ও সমাজসংস্কার বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান ইতিহাস পাঠের দ্বারা লাভ করা যায় । পূর্বে যে রূপ ভাবে ইতিহাস লিখিত হইত, তাহাতে কেবল রাজার নাম, যুদ্ধের বিবরণ, কতকগুলি সন তারিখ মাত্র থাকিত । কিন্তু বর্তমান প্রণালীতে রচিত গ্রন্থে “কি রূপে একজাতি অন্যজাতি অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, কীদৃশ গুণ প্রভাবে সেই জাতি সর্বাপেক্ষা মাণ্ডগল্য ও ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন, তদেশবাসীদিগের তৎকালীন আচার ব্যবহার কি রূপ ছিল, প্রধান ও নিকৃষ্টদিগের কি রূপ সম্বন্ধ ছিল, বাণিজ্য কার্য কি রূপ প্রণালীতে সম্পন্ন হইত, প্লগ্যাডুয়াসমূহ একদেশ হইতে অন্যদেশে কি প্রকারে প্রেরিত হইত, কৃষিকার্যের প্রথা কি রূপ ছিল, দেশের শাসনকার্য কি প্রণালীতে সম্পন্ন হইত, কি কি উপায়ে সেই প্রণালী অবলম্বিত হইত ও প্রচলিত হইয়াছিল, মনুষ্য কি কি অবস্থায় উপস্থিত হইলে কি রূপ ব্যবহার হইয়াছিল, কোন্ কোন্ দুষ্কর্ম নিবারণের

জ্ঞাত কি কি রাজ-নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল, সেই নিয়মগুলিই বা কি পরিমাণে ফলপ্রসূ হইয়াছিল” ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে প্রণালী অবলম্বন করিলে আমাদের সর্গ ও রাজ্যাশাসন বিষয়ক সম্যক জ্ঞান জন্মিতে পারে, শিক্ষাপ্রণালীতে এখনও তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। তবে পণ্ডিতগণ যখন অভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন শীঘ্রই যে সে অভাব দূর করিবার উপায় আবিষ্কার করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৫। আমোদে স্পৃহা মানব-মনের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু সাংসারিক নানাপ্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতা না থাকিলে আমোদে মন ধাবিত হয় না। সেই জন্ত প্রথমে শারীরিক, আর্থিক প্রভৃতি বিষয়ক সুখের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সঙ্গীত-বিদ্যা, চিত্র-বিদ্যা ও ভাস্কর-বিদ্যা চিত্তরঞ্জনের প্রধান উপকরণ।

নিজের চিত্তবিনোদনের জন্ত গুণ গুণ করিয়া গান না করিয়া থাকেন, একরূপ ব্যক্তি বোধ হয় খুব কমই আছেন। কিন্তু আমরা এত দিন পর্যন্ত এই প্রকৃতিগত একটা স্পৃহাকে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না। বিদ্যাপীঠে সঙ্গীতের আলোচনা পাঠ্য তালিকাভুক্ত। কিন্তু আমরা অনেকেই সঙ্গীতকে দূষণীয় বিদ্যা মনে করিয়া থাকি। পুত্র পিতার সাক্ষাতে, কি ছাত্র শিক্ষকের সাক্ষাতে গান করিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকে। বাড়ীতেও সঙ্গীতের চর্চা অনেকে নীতিবিগর্হিত মনে করেন। স্বাভাবিক বৃত্তির বশীভূত হইয়া যে সকল সঙ্গীতাভিলাষী ব্যক্তি-গণ এ বিদ্যার আলোচনা করিতে ইচ্ছুক, তাহারা অনন্তোপায় হইয়া নানাক্রমে অপবিত্র স্থানে গমন করতঃ জীবনের সর্বনাশ সাধন করেন। চিত্রবিদ্যাকেও আমরা এতদিন যথেষ্ট হতাশ করিয়া আসিয়াছি। চিত্রাঙ্কনও একটা স্বাভাবিক স্পৃহা। ছোট ছোট ছেলেরা বিনা শিক্ষায় নানাক্রমে অঙ্কন ও গঠন করিতে পারে। চিত্তরঞ্জন ছাড়া অঙ্কন-বিদ্যা বিজ্ঞান

আলোচনার প্রধান সহায়। সুতরাং এতদিন এরূপ আবশ্যক বিজ্ঞাকে অনাদর করিয়া বিশেষ অত্যাচার করিয়াছি। আজকাল পাঠশালার নিম্নশ্রেণী হইতে মেট্রিকিউলেশন শ্রেণী পর্য্যন্ত এই বিজ্ঞার আলোচনা হইতেছে।

শুশিক্ষা কাকে বলে, এখন আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। যে শিক্ষা দ্বারা উক্ত পঞ্চ বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞানলাভ করতঃ সেই জ্ঞানের ব্যবহার দ্বারা আমাদের পাবিবারিক ও সাংসারিক জীবনকে প্রচুর পরিমাণে সুখী করিতে পারি, তাহাকেই শুশিক্ষা কহে। কিন্তু এই পঞ্চ বিষয়ের অনুশীলন প্রকারান্তরে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের ফল মাত্র। সুতরাং সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির সমবায় ও সম্যক অনুশীলনই শুশিক্ষা। এখন এই বৃত্তিসমূহের কিরূপে উন্মেষ হইতে পারে, নিম্নে সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত হইতেছে :—

১। শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন।—“শরীরমাণ্ডং খলু ধর্মসাধনম্”—ধর্ম সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শরীর রক্ষা করা কর্তব্য—ইহা হিন্দু শাস্ত্রকারগণের উপদেশ। গৃহ-ধর্ম, সন্তান-পালন-ধর্ম, অহিংসা-ধর্ম, অর্থোপার্জন-ধর্ম ইত্যাদি হইতে মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত মনুষ্যের অবশ্য করণীয় কর্তব্যাকর্ম সমুদায়ই তাহার ‘ধর্ম’। যদি শরীর ক্ষুধ ও সবল না হইল, তবে সংসারের এই নানারূপ ধর্ম বা কর্তব্য কে সম্পন্ন করিবে? এইজন্য সর্ব্বাগ্রে শরীর রক্ষা করিতে হইবে। শরীর কেবল রোগমুক্ত করিলে হইবে না, ভবিষ্যতে যাহাতে রোগ স্পর্শ করিতে না পারে তাহারও বিধান করিতে হইবে। ঋণমুক্ত হইলে চুলিবে না, ভবিষ্যতে যাহাতে পুনরায় ঋণজালে জড়িত না হইতে হয়, তাহার প্রতিবিধানার্থ শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। এই নিমিত্ত ব্যায়ামাদির আবশ্যকতা। ব্যায়ামে শরীরের অস্থি, শিরা ও মাংসপেশীসমূহকে দৃঢ় ও উন্নত করিয়া দেহ সবল করে। যেমন মূর্খের চিত্ত বিগত হইলেও সে জ্ঞানের সুখ বৃদ্ধিতে পারে না, সেইরূপ ক্ষুধ

ব্যক্তির দেহ রোগশূন্য হইলেও সে শক্তি সঞ্চয়ের সুখ উপলব্ধি করিতে পারে না। যেমন মনের পক্ষে জ্ঞানার্জন, সেইরূপ দেহের পক্ষে শক্তি সঞ্চয়। দুইই আবশ্যক।

মনুষ্য-দেহে ছোট বড় প্রায় চারি শত ভিন্ন ভিন্ন মাংসপেশী আছে। এই সমস্তগুলি পেশীরই বিশেষ অনুশীলন আবশ্যক হয় না। প্রধান প্রধান কতকগুলি পেশীর অনুশীলন হইলেই অপরগুলি তাহাদের সাহায্যে উন্নত হইয়া থাকে। পেশীগুলি সূত্রাকার মাংসের গুচ্ছ মাত্র। এক অস্থির সহিত অগ্র অস্থি সংযুক্ত করিয়া রাখে। অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে পেশীগুলি আবশ্যক মত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। হাত মুখের নিকট আনিলে বাহুর উপরিভাগের (প্রগণ্ডের) এক অংশ ফুলিয়া উঠে। এই অংশের পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হওয়াতে এইরূপ ঘটে। এই পেশীকে দ্বিশির পেশী কহে, কারণ ইহা দুইটা শিরে বিভক্ত। এই পেশীর দ্বিশির প্রান্ত উর্দ্ধে স্বকদেশের অস্থির সহিত ও অপর প্রান্ত বাহুর নিম্নার্দ্ধের (প্রকোষ্ঠের) অস্থির সহিত (কনুইএর নিকট) সংযুক্ত। হস্ত বুলিয়া থাকিলে এই পেশী ১২ ইঞ্চির মত লম্বা হয় ও সঙ্কুচিত হইলে ৪ ইঞ্চি হইয়া ফুলিয়া উঠে। সাধারণতঃ এইগুলি কূপের দড়ির মত মোটা। কার্য্যতঃও ইহারা দড়ির মত কার্য্য করে। বাহুর উর্দ্ধার্দ্ধের সহিত নিম্নার্দ্ধের সংযোগ করিয়া রাখাই দ্বিশির পেশীর কার্য্য। বাহুর উর্দ্ধার্দ্ধের নীচে, ঠিক দ্বিশিরের বিপরীত দিকে, ত্রিশির পেশীর দ্বারাও বাহুর দুই অংশ আবদ্ধ আছে। দ্বিশির সঙ্কুচিত হইলে ত্রিশির প্রসারিত হয়, আর দ্বিশির প্রসারিত হইলে, ত্রিশির সঙ্কুচিত হইয়া, কিঞ্চিৎ ফুলিয়া উঠে। এইরূপ পাদদ্বয়ের অংশসমূহও নানারূপ পেশী দ্বারা আবদ্ধ। তন্মধ্যে যে পেশী গুল্ফ ও জজ্যাকে আবদ্ধ করিয়া জামুর পশ্চাত্তাগে অবস্থিত, সেই পেশীই শরীরস্থ সমস্ত পেশীর মধ্যে বৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী ও বলশালী। এই পেশীর নাম বৃহৎ যবোদর পেশী। বুকে পিঠেও নানারূপ পেশী আছে।

এই সমস্ত পেশীর বিধিগত সঞ্চালন দ্বারা আমরা তাহাদিগের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে পারি । যখন পেশীর বলের উপরেই অঙ্গ সঞ্চালনের বল নির্ভর করে, তখন সেই পেশীগুলির উন্নতি সাধনে সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্তব্য । শরীরে পেশীগুলি যেরূপ ভাবে বিস্তৃত আছে, তাহা দেখিলেই আমরা পেশীর উন্নতি সম্বন্ধে আমাদিগের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারি :—

(ক) প্রত্যেক পেশীর রীতিগত সঞ্চালন আবশ্যিক । যে পেশীর কোন-রূপ সঞ্চালন হয় না, সে পেশী শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । অনেক স্থলকায় অলস ব্যক্তিকে দেখিলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় । যাহারা গ্রাসো-ত্বোলন ভিন্ন বাহুর অন্য ব্যবহার করেন না, তাহাদের পেশী এত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায় যে, হস্ত সজ্জুচিত করিলে দ্বিশির আর ফুলিয়া উঠে না । ইহারা হাতের দ্বারা কোনরূপ ভারি পদার্থ তুলিতে সক্ষম হয় না । বাহুর রীতিগত সঞ্চালনে পেশী ফুলিয়া উঠে ও সবল হয়, যেমন কর্মকারের বাহু পেশী । যে সকল ব্যক্তি পাহাড় পর্বতে যাতায়াত করে তাহাদিগের বৃহৎ ববোদর পেশী সমধিক স্থূল ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে । পেশী সজ্জুচিত হইলে তথায় অনেক পরিমাণে রক্ত বিধাবিত হয়, আর পেশীর সঞ্চালনে ও প্রসারণে ইহার যে শক্তি ব্যয়িত হয়, বিশ্রামকালে ইহাতে তদপেক্ষা অধিক শক্তি সঞ্চিত হইয়া থাকে । ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম ।

(খ) বয়স, স্বাস্থ্য ও অভ্যাস বিবেচনায় অঙ্গসঞ্চালনাদি করিতে হইবে । অতিরিক্ত সঞ্চালন হইলে পেশীসমূহ অধিক ক্লান্ত হইয়া পড়ে ও তাহাদের স্বাভাবিক সঙ্কোচন ও প্রসারণের শক্তি পর্য্যন্ত ক্ষণিকের জন্ত নষ্ট হইয়া যায় । একরূপ সঞ্চালন বাঞ্ছনীয় নহে ।

(গ) . ‘আমাদের শরীরের কোন বস্তু যখন কার্যে নিযুক্ত হয় তখন উহার ধমনীগুলি প্রসারিত হয়, সুতরাং ঐ বস্তুর মধ্যে পূর্বাগেক্ষা অধিক রক্ত গমন করে । অধিক রক্ত গমন করার অর্থ—অধিকতর পরিমাণে

পরিপোষক পদার্থ ও অক্সিজেন (Oxygen) গমন করে। ইহার ফলে যন্ত্রটির পরিণতি ও পরিপোষণ সুচারুভাবে সম্পাদিত হইতে থাকে। মাংসপেশীই বল, আর মস্তিষ্কই বল, শরীরের সকল অংশই পরিশ্রম দ্বারা এইরূপে উন্নতি প্রাপ্ত হয়। ব্যায়ামে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর কাজ হয়। মাংসপেশীগুলির সঙ্কুচন কালে পেশীস্থিত ধমনীসকলের মধ্যে অধিকতর পরিমাণে রক্ত প্রবেশ করে। আর পেশীগুলির চাপ লাগিয়া শিরাগুলির কাল রক্ত হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে দ্রুততর বেগে গমন করে। হৃৎপিণ্ডে এইরূপে অধিক রক্ত যাওয়ায় হৃৎপিণ্ডের সঙ্কুচন পূর্বাপেক্ষা দ্রুততর ও প্রবলতর ভাবে সম্পাদিত হইতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের যেমন ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়, সেই সঙ্গে ফুস্ফুসগুলিরও ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়। প্রথমতঃ শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। স্থিরভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় একজন সুস্থকায় যুবক প্রতি মিনিটে ১৮ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস করিয়া থাকে, দ্রুত ভ্রমণে ২৫ বার, দৌড়াইলে ৩৬৩৭ বার পর্যন্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ শ্বাসের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। শয়ন অবস্থায় একজন সুস্থকায় ব্যক্তি নিশ্বাসের দ্বারা যে পরিমাণ বায়ু গ্রহণ করেন, তাঁহাকে যদিও আমরা ১ দ্বারা নির্দেশ করি, তবে দণ্ডায়মান অবস্থায় যে বায়ু গ্রহীত হয় তাহার পরিমাণ ১'৩, আর ঘণ্টায় ৪ মাইল করিয়া হাঁটিবার সময় যে বায়ু শ্বাসের সহিত গ্রহণ করা হয়, তাহার পরিমাণ ৫ কি ৬ দ্বারা সূচিত হইতে পারে। এইরূপ শ্বাসের সহিত অধিক বায়ু গ্রহণের সঙ্গে আমরা অধিক পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া থাকি। শ্বাস প্রশ্বাসের সহিতও অধিক পরিমাণ অঙ্গারায়ু পবিত্যাগ করিয়া থাকি। সুতরাং শরীরে দহন কার্য্য বৃদ্ধি পায়। রক্তাধার হৃৎপিণ্ডের কার্য্যও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় বলিয়া হৃৎপিণ্ডের বিট (ধুকধুকি) ১০ হইতে ৩০ বার পর্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং রক্তসঞ্চালন কার্য্যও অধিকতর দ্রুত সম্পাদিত হইতে থাকে। হৃৎপিণ্ড হইতে বিগত রক্ত অধিকতর দ্রুতবেগে চতুর্দিকে প্রেরিত হয় ও

অশুদ্ধ রক্ত অধিকতর বেগে ছৎপিণ্ডে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিয়া শুদ্ধ প্রাপ্ত হয় ।

(ঘ) বৃহৎ পেশীসমূহ দেখে তুলান্বেষণ কার্য্য করিয়া থাকে ; দ্রব্য উত্তোলন, ভার-বহন-শক্তির প্রতিরোধ প্রভৃতি কার্য্য এই সকল পেশীর সাহায্যেই সম্পাদিত হয় । কিন্তু এই সকল তুলান্বেষণ বিজ্ঞানবিভক্ত তুলান্বেষণ তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত—অর্থাৎ “বলমধ্য” । এইরূপ ‘বলমধ্য’ হওয়াতে আমাদিগের ব্যায়াম-চর্চার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । হস্ত পদাদির পেশীর অনুশীলন, আমরা কোনও লঘুদ্রব্য হাতে রাখিয়া বা পায়ের দ্বারা আঘাত করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক ভারের সৃষ্টি করতঃ সম্পন্ন করিতে পারি । সেই জন্য সামান্য একখানা কাঠ বা লাঠি বা হাল্কা ডাম্বলের সাহায্যে আমরা যে সকল ব্যায়ামাদি সম্পাদন করি, তাহার অনুশীলন প্রযুক্ত আমাদিগের গুরুতর ভারবস্ত্র বহন করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে । হাল্কা ফুটবল লইয়া খেলা করায় পায়ের বৃহৎ যবোদর পেশী বিশেষ শক্ত হইয়া উঠে ।

(ঙ) নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় বক্ষঃস্থলের পেশী সঞ্চালিত হইয়া থাকে । প্রত্যেক পার্শ্বের দুই দুইখানি পঞ্জরাস্থির মধ্যে দুই প্রশ্ব করিয়া পেশী আছে । এই পেশীকে পঞ্জর পেশী কহে । যখন ইহার এক প্রশ্ব পেশী প্রসারিত হয়, তখন বক্ষঃস্থল ফুলিয়া উঠে, আবার অন্য প্রশ্বের প্রসারণে বক্ষঃস্থল নামিয়া পড়ে । উত্তমরূপ পরিচালনা দ্বারা এই সকল পেশী স্থূল ও সূক্ষ্ম হইয়া থাকে । বলবান ব্যক্তির বক্ষঃস্থল কেমন সুন্দর ও উন্নত, আর দুর্বল ব্যক্তির বক্ষঃস্থল কেমন বিস্তীর্ণ ও অল্পন্নত ।

(চ) কেবল একটা বা এক শ্রেণীর পেশী সঞ্চালন করিলে অন্য যে সকল পেশী কার্য্যতঃ দুর্বল হইয়া পড়িতে পারে, তাহা নির্দারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যায়ামের চর্চা করা আবশ্যক ।

(ছ) মাংসপেশীর সঞ্চালনে স্নায়ু, শিরা, ধমনি, অস্থি, ক্রমে সবল হইয়া উঠে ।

(জ) চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির উপযুক্তরূপে ব্যবহারে শারীরিক ও মানসিক উভয় বৃত্তিরই অনুশীলন হইয়া থাকে ।

২। মানসিক বৃত্তির অনুশীলন ।—বালকগণের কতকগুলি মানসিক বৃত্তির বিকাশের সহায়তা না করিতে পারিলে শিক্ষাদানের চেষ্টা বৃথা । বিষয়াদির ধারণা করিতে হইলে স্মৃতি, কল্পনা, মনোনিবেশ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সাহায্য আবশ্যক । সুতরাং কিরূপে এই সমস্ত বৃত্তির উন্নতি করা যাইতে পারে তাহা প্রত্যেক শিক্ষকেরই কিঞ্চিৎ জানা উচিত ।

মানব-মনের তিনটি প্রধান বৃত্তি । [১] বুদ্ধি—যাহার সাহায্যে আশাদিগের পদার্থের জ্ঞান জন্মে । [২] অনুভব—যাহার শক্তিতে আশাদিগের দয়া, মমতা, ভালবাসা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতির বোধ জন্মে । [৩] ইচ্ছা—যাহা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই । বালকের মনে এই সমস্ত এবং ইহাদের আনুষঙ্গিক বৃত্তিসমূহ অপরিণত অবস্থায় থাকে । এই সমস্ত বৃত্তির সম্যক বিকাশ করাই শিক্ষাদানের প্রধান কার্য্য । এই সমস্ত বৃত্তির একটীর কার্য্যের সঙ্গে অন্য বৃত্তির কার্য্য প্রায়ই সংশ্লিষ্ট । যথা—বালক পাখী ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিতেছে—এইটী তাহার ‘বুদ্ধিবৃত্তির’ কার্য্য; কিন্তু এই কার্য্য করিবার পূর্বে তাহার ঐ কাজ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, সুতরাং ‘ইচ্ছাই’ তাহাকে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছে । আবার পাখী ধরিতে পারিমা বা না পারিমা তাহাঙ্গ যে সুখ বা দুঃখানুভব হয়, তাহা ‘অনুভব’ বৃত্তির কার্য্য । কিন্তু যেমন কোন একটা দ্রব্যনিহিত কৃষ্ণত্ব, লঘুত্ব, কঠিনত্ব প্রভৃতি গুণ আমরা ভিন্ন ভিন্ন করিয়াও বিচার করিতে পারি, তেমনি মানব-মনের বৃত্তিগুলির কার্য্য অনেক সময় পরস্পর সাপেক্ষ হইলেও আমরা পৃথকরূপে তাহাদিগের আলোচনা করিতে পারি । অনুশীলনের দ্বারা

যেমন মাংসপেশীসমূহকে যথেষ্টরূপে সজল করিতে পারা যায়, অনুশীলনের দ্বারা সেইরূপ মনের বৃত্তিসমূহকেও যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করা যায় । কিন্তু এই উভয় অনুশীলনেই এক কথা মনে রাখিতে হইবে, বালকের বয়স ও সামর্থ্য বুঝিয়া তাহার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের পরিমাণ নির্ণয় করিবে । যে ব্যক্তি আধ মণ বোঝা বহিতে পারে না, তাহার ঘাড়ে দুই মণ বোঝা চাপাইয়া দিলে যেমন তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে ; সেইরূপ যে বালক বালচাপল্য প্রযুক্ত কোন বিষয়ে অর্ধ ঘণ্টার অধিক মনোনিবেশ করিতে পারে না, তাহাকে কোন বিষয়ে দুই ঘণ্টা মনোনিবেশ করিতে হইলে তাহার অভিনিবেশের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যাইবে । একটু একটু করিয়া সব কার্য্য সহ্য করাইয়া লইতে হইবে । তাড়াতাড়ি করিতে গেলে সব নষ্ট হইবে ।

মনের দুইটা গুণ প্রধান—একটা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, অপরটা প্রদান করিবার ক্ষমতা । মন প্রথম ক্ষমতা দ্বারা বাহিরের জ্ঞান ও স্মৃতি প্রভৃতি গ্রহণ করে, দ্বিতীয় ক্ষমতা দ্বারা সে উপার্জিত জ্ঞান অন্তরে প্রদান করে । প্রধানতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা এই বাহিরের জ্ঞান লাভ করি ও কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্তরে প্রদান করি । এখন কি কি পর্যায় অনুসারে আমরা এই বাহিরের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে । প্রথম ‘ইন্দ্রিয়বোধ’ (Sensation)—ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর চক্ষু আলোকের তেজে, কর্ণ শব্দের তরঙ্গে, ত্বক্ স্পর্শের আঘাতে, জিহ্বা রসের আশ্বাদে, নাসিকা গন্ধের তীব্রতায় বিচলিত হইয়া উঠে । এইরূপে প্রথমে তাহার কেবল ইন্দ্রিয়ে একটা অনুভূতি বা বোধের সঞ্চার হয় । কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির উপর কোন্ কোন্ শক্তি এইরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহা সে তখন বুঝিয়া উঠিতে পারে না । ক্রমে যখন চক্ষুর দ্বারা আলোক, কর্ণের দ্বারা শব্দ, ত্বকের দ্বারা স্পর্শের অনুভূতি পৃথক রূপে বুঝিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার ‘বস্তুজ্ঞান’ (Perception) বিকশিত হইতে থাকে ।

তখন ইন্দ্রিয় প্রয়োগ করিয়া বস্তুর নানাবিধ গুণ বুঝিতে আরম্ভ করে। একটী বালকের হাতে একটা সন্দেশ দিলে, সে হস্তের দ্বারা তাহার কঠিনত্ব, চক্ষুর দ্বারা তাহার আকার ও বর্ণ, জিহ্বার দ্বারা তাহার রসের পরীক্ষা করিতে থাকে, ও এইরূপ মিষ্ট, গোলাকার, স্বেতবর্ণ এবং কোমল পদার্থকে সন্দেশ বলিয়া চিনিয়া রাখে। এইরূপে ‘স্মৃতির’ (Memory) সাহায্যে একটী একটী করিয়া নানা বস্তুর গুণ পৃথক পৃথক ভাবে মনে রাখিয়া তাহার বস্তুজ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়া থাকে। স্মৃতির সাহায্য না পাইলে বালককে প্রত্যেকবারই প্রত্যেক জিনিষ পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে হইত। এক দিন নানা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সন্দেশের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া বালক সে বিষয়ের যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহা তাহার স্মৃতিতে আছে বলিয়া দ্বিতীয় দিন সে সন্দেশ দেখিয়াই তাহাকে সন্দেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার পর বালকের ‘কল্পনা’ (Imagination) শক্তির বিকাশ হইতে থাকে। বালক তখন পরিচিত বস্তু ও বিষয়ের সাহায্যে অদৃষ্ট বস্তু ও বিষয়ের কল্পনা করিতে শিক্ষা করে। দৃষ্ট মনুষ্য ও গ্রামের সাহায্যে অদৃষ্ট জাতি ও নগরাদির কল্পনা করা বালকের পক্ষে ক্রমে সহজ হইয়া পড়ে। পঞ্চম ‘চিন্তা’ (Thought)—বালক স্মৃতি কল্পনাদির সাহায্যে যে সকল বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান পৃথক পৃথক রূপে সংগ্ৰহ করিয়াছে, চিন্তার দ্বারা সে সকলের শৃঙ্খলা করিয়া একটা ধারাবাহিক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা—পত্র, পুষ্প, ফল, শাখা, প্রশাখা, কাণ্ড, মূল প্রভৃতির জ্ঞান একত্র করিয়া তালুক চিন্তাশক্তির দ্বারা বৃক্ষের সমস্ত জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। প্রধানতঃ এই পাঁচটি উপায়ের দ্বারাই আমাদের স্বভাবদত্ত জ্ঞানের উন্নতি হইয়া থাকে। আবার ঐ সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়ার উন্নতি অল্প কয়েকটি মানসিক ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। (১) মনোযোগ বা অভিনিবেশ, (২) বিচারশক্তি, (৩) কার্যকারণানুসারিণী বুদ্ধি। বালক-মন-নিহিত এই

সকল অক্ষুট বৃত্তির বিকাশসাধন কিরূপে করা যাইতে পারে, একে একে তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে :—

বস্তুজ্ঞান (প্রত্যক্ষ-জ্ঞান) ।—আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহি-
র্জগতের জ্ঞানলাভ করি, সেই জগতই ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ বলা
হইয়া থাকে । চক্ষু ইন্দ্রিয়গণের রাজা । চক্ষুর সাহায্যে আমরা সর্বাপেক্ষা
অধিক জ্ঞানলাভ করি । চক্ষুর পরে কণ, তারপর শ্রবণ, তারপর নাসিকা
ও জিহ্বা । চক্ষু কর্ণাদির সহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্ক সংযুক্ত ।
মস্তিষ্কই জ্ঞান উৎপত্তির কেন্দ্রস্থান । আমরা যখন কোন দ্রব্য দেখি,
তখন আমাদের চক্ষুর সন্মুখস্থ পদার্থ হইতে আলোক-তরঙ্গ উৎখিত হইয়া
আমাদের চক্ষুর পশ্চাৎভাগে অবস্থিত ও মস্তিষ্কের সহিত সংলগ্ন স্নায়ুসমূহকে
সঞ্চালিত করে । এই সঞ্চালনেই আমাদের প্রথমে ইন্দ্রিয়গোচ-
র হয় ও তৎপর সেই বস্তু কি পদার্থ, তাহা বুঝিতে পারি । মস্তিষ্কের
বিকার হইলে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি সত্ত্বেও দর্শনে কোনই জ্ঞান লাভ হয় না ।
এইরূপ কর্ণের মধ্যস্থিত পটহে যখন বাহিরের শব্দ-তরঙ্গ প্রতিঘাত করে,
তখন সেই আঘাত কর্ণ ও মস্তিষ্ক-সংলগ্ন স্নায়ুসমূহ সঞ্চালিত হইয়া,
কিরূপ বা কোন বস্তু হইতে উৎখিত শব্দ তাহার জ্ঞান জন্মাইয়া
দেয় । কিন্তু যদি আমরা তৎতৎ পদার্থের প্রতি মনোনিবেশ না করি,
তবে চক্ষুর সন্মুখে বস্তু ধরিলেও আমাদের তাহার জ্ঞান জন্মে না বা কর্ণের
নিকট শব্দ করিলেও আমরা তাহার উপলব্ধি করিতে পারি না । বালকের
চক্ষুর সন্মুখে ঘরের দেয়াল, দেয়াল-সংলগ্ন চিত্রাদি ও বোর্ড রহিয়াছে ।
কিন্তু যখন বালক বোর্ডস্থিত কোন জ্যামিতিক চিত্রের প্রতি অভিনিবেশ
করে, তখন বোর্ডেরও সমস্ত অংশ তাহার জ্ঞানের সীমায় আইসে না,
দেয়াল ও চিত্রাদির কথা দূরে থাকুক । এইরূপ নানা পৃথিবী গান, মনুষ্য-
কলরব, বৃক্ষাদির শ্রবণ প্রতিনিয়ত কর্ণকূহরে প্রবেশ করিয়া কর্ণের পটহে
আঘাত করিতেছে, কিন্তু বালকেরা যখন অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষকের

কথা শ্রবণ করিতে থাকে, তখন অল্প শব্দ তাহাদিগের কাণে প্রবেশ করিলেও কোন জ্ঞানের উদয় করিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানলাভ অভিনিবেশ সাপেক্ষ। যখন আমরা মনকে পদার্থবিশেষে অভিনিবেশ করি, তখনই আমরা চক্ষুর সাহায্যে দেখিতে পাই। যখন সেই পদার্থ কোন বস্তু, ইহা বুঝিতে পারি, তখনই আমাদের সেই পদার্থ বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে; ইহাই বস্তুজ্ঞান। কোন কোন জন্মান্ত ব্যক্তি অল্প-চিকিৎসায় দর্শনশক্তি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রথম প্রথম তাহারা দেখিয়াও বুঝিতে পারে না। কোনটী তাহার পিতা, কোনটী বা হাতী ও কোনটী বা বৃক্ষ—দর্শনশক্তি দ্বারা ইহার কিছুই ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না, যদিও সে সব জিনিষই দেখিতে পায়। তাহার ইন্দ্রিয়বোধ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বস্তুজ্ঞান লাভে সক্ষম হয় না। শিশুদিগের ঠিক এই অবস্থা। তাহারা সকলই দেখিতে পায় কিন্তু তাহাতে বস্তুর জ্ঞান হয় না। ক্রমে দেখিতে দেখিতে ও অত্যাশ্রয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিতে করিতে একটু একটু করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হয়।

বাল্যকালে প্রাকৃতিক প্রণালী অনুসারে ইন্দ্রিয়বোধ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিকশিত হইতে আরম্ভ করে। বালকগণ নিজের বাসজনমূলভ ঔৎসুক্য ও চেষ্টায় অনেক বিষয়ের জ্ঞানলাভ করে। কিন্তু যখন সে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন শিক্ষকের কর্তব্য, এ জ্ঞান উপার্জনে তাহাকে যথাবিধি সাহায্য করা। কিংবদন্তিগাটেন প্রণালীর ইহাই উদ্দেশ্য—এই প্রণালীমত কার্য করিলে ইন্দ্রিয়গুলির সম্যক বিকাশ হইয়া থাকে। আর ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যেই যখন আমরা জ্ঞান উপার্জন করি, তখন ইহাদিগের শক্তি বৃদ্ধি করা আমাদের প্রধান কর্তব্য।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পুষ্টি সাধন।—বিদ্যালয়ের লিখন, অঙ্কন, বীজ বা কাঠি সাজান, ব্যাক্হারিক জ্যামিতির অনুশীলন প্রভৃতির সাহায্যে

দর্শনেন্দ্రిয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় । তারপর নিম্নলিখিত প্রথা অবলম্বন করিয়া ও এই সর্বপ্রধান ইন্দ্రిয়ের শক্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে :— .

(ক) ভিন্ন ভিন্ন রঙ শিক্ষা দিলে চক্ষুর শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

(খ) কোন বৃক্ষপত্র দেখিয়া একটী পত্রের চিত্র অঙ্কিত করিতে দাও, পরে না দেখিয়া তদ্রূপ পত্র অঙ্কিত করিতে পারে কি না, পরীক্ষা কর । স্বপ্নদৃষ্টি ও স্মৃতির পরিচালনা না করিলে অঙ্কন করিতে পারিবে না ।

(গ) মানচিত্রের বিশেষ কোন অংশ লক্ষ্য করিতে বল । মানচিত্রের সেই অংশস্থিত যে যে বিষয় বালককে না দেখিয়া নিজ মানচিত্রে চিহ্নিত করিতে হইবে তাহা নির্দেশ কর । পরে মানচিত্র জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখ এবং বালককে চিত্র অঙ্কিত করিতে বল ও সেই সকল বিষয় চিহ্নিত করিতে বল ।

(ঘ) বোর্ডের উপর ১২০৫৭৬৩৯ এইরূপ বা ইহা অপেক্ষা বড় কি ছোট সংখ্যা লিখিয়া দেও । বালকগণ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করুক । পুঁছিয়া দেও । বালকগণকে আবার লিখিতে বল ।

(ঙ) ৩৫, ৪৮, ১৭, ২৯, ৮৭ এইরূপ কতকগুলি সংখ্যা পর পব লিখিয়া দেও । পরে পুঁছিয়া দিয়া বালকগণকে ঐগুলি লিখিতে বল । এইরূপ ১৮, ২৯ ও ৩৭কে মনে মনে যোগ করিতেও বলিতে পারে ।

এ সমস্ত অভ্যাসে কেবল যে দর্শনশক্তিরই অনুশীলন হইবে তাহা নহে ; ইহাতে স্মৃতি ও অভিনিবেশরও যথেষ্ট অনুশীলন হইবে । কারণ বালককে এই সমস্ত চিত্র বা সংখ্যা চক্ষু দ্বারা মনোযোগপূর্বক দেখিয়া মনে করিয়া রাখিতে হইবে ।

প্রথমে শব্দাদির উচ্চারণ শিক্ষা করিতেই কর্ণের ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকে । কথাবার্তা বা উদ্ভূত আবৃত্তি শিক্ষা করিতে অন্ত্রের অনুকরণ আবশ্যক । এই কার্য কর্ণের সাহায্যেই সম্পাদিত হয় । সঙ্গীত শিক্ষায় শ্রবণশক্তির যে পরিমাণ অনুশীলন হয়, এত আর কিছুতেই হয় না ।

আমাদিগের বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার পদ্ধতি নাই, কিন্তু বিলাতী বিদ্যালয়ে সঙ্গীতও একটা বিদ্যালয়-পাঠ্য বিষয়। তবে স্মৃতির বিষয় এই যে আজকাল আমাদিগের বালিকা-বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার ক্রমশঃ প্রচলন হইতেছে। বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশের নর্মাল বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

লিখনে, চিত্রাঙ্কনে, মূর্তিকার দ্বারা দ্রব্যাদি গঠনে স্পর্শশক্তির অনুশীলন হয়। কোন বস্তু উপলক্ষে শিক্ষা দিতে হইলে সেই বস্তু (যতদূর সম্ভব) সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক বালকের হাতে দেওয়া উচিত। স্পর্শ প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভে যথেষ্ট সহায়তা করে। কঠিন, কোমল, মৃদু, বন্ধুর প্রভৃতি দ্রব্যগুণ শিক্ষায় স্পর্শজ্ঞানের শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

স্মৃগন্ধ ও ছুর্গন্ধ দ্বারা নাসিকার ও কটুতিক্তাদির দ্বারা জিহ্বার বোধ শক্তির বৃদ্ধি সাধন করা যাইতে পারে। (পদার্থ-পরিচয় গ্রন্থে এ সমস্ত বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে)। কিন্তু যখন মনোযোগ ব্যতীত কোন জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নহে, তখন মনোযোগ বৃদ্ধি করাও বিশেষ আবশ্যক।

মনোযোগ বা অভিনিবেশ।—কোন বস্তু বা ভাবের প্রতি একাগ্রচিত্তে মন নিবিষ্ট করাকে মনোযোগ বা অভিনিবেশ বলে। শিক্ষায় মনোযোগ অতি আবশ্যক। বালকগণকে অভিনিবিষ্ট হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। অভিনিবেশই কার্য সম্পাদনের বিশেষ সহায়। বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে সেই জ্ঞান স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া যায়।

মনোযোগ দ্বিবিধ—স্বতঃ উৎপন্ন ও পুরতঃ উৎপন্ন। আমরা নিজে ইচ্ছা করিয়া যে কার্যে বিশেষ মনোনিবেশ করি, তাহা স্বতঃ উৎপন্ন মনোযোগ। বালক খেলাতে নিজ ইচ্ছায় মনোনিবেশ করে, কিন্তু পড়াতে সে নিজ ইচ্ছায় মনোনিবেশ করিতে চাহে না। তাহাকে পড়াতে মনোনিবেশ করাইবার জন্য

আমরা নানা উপায় অবলম্বন করি—যথা, পুস্তকে নানাক্রপ মনোহর ছবির ব্যবস্থা করি, বিজ্ঞানের পরীক্ষা প্রদর্শন করি, মানচিত্র বা উত্তম পুস্তলিকা প্রদর্শন করি ইত্যাদি । খেলাতে তাহার মনোযোগ স্বতঃ প্রবর্তিত, কিন্তু পাঠে পরতঃ প্রবর্তিত—অর্থাৎ পাঠে অল্প বস্তুর সাহায্যে তাহার মন আকর্ষণ করিতে হইতেছে । উচ্চশ্রেণীর বালকগণ স্বতঃ উৎপন্ন মনোযোগ সহকারেই পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । কিন্তু নিম্নশ্রেণীর ছোট ছোট বালকগণের পাঠে স্বতঃ উৎপন্ন প্রবৃত্তি জন্মে না বলিয়া নানাক্রপ বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করিতে হয় ।

যুবকই হউক বা শিশুই হউক, বালককে তাহার কার্যো মনোনিবেশ করাইতেই হইবে । মনোযোগ ভিন্ন কোন কার্যো সিদ্ধি লাভ করা যায় না । বালকগণের মনোযোগবৃদ্ধির অল্পশীলনে নিম্নলিখিতরূপ প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে :—

- (ক) চিত্র, পুস্তলিকা বা দ্রব্য প্রদর্শন ।
- (খ) বোর্ডে মানচিত্র বা অল্পবিধ চিত্রাঙ্কন ।
- (গ) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রদর্শন ।

এই সমস্ত পরতঃ উপায়ের দ্বারা বালকের মন আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে । পাঠের অন্তর্গত বিষয় চিত্রের সাহায্যে বুঝাইতে হইবে । বোর্ডে উত্তম চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে । অনেক শিক্ষক বোর্ডের চিত্রাদি (সাধারণ কি জ্যামিতিক) বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী নহেন । তাঁহারা যেমন তেমন একটা ক্ষেত্র অঙ্কন করিয়া জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করেন । কিন্তু এরূপ করা সঙ্গত নহে । বেশ স্পষ্ট ও সুন্দর চিত্রের দ্বারা মন যেরূপ আকৃষ্ট হয়, নিরুপ্ত চিত্রাদিতে তাহা হয় না—বরং বিপরীত ফল হওয়া আশ্চর্য্য নহে ।

(ঘ) এমন অনেক গুরু বিষয় আছে, যাহাতে এরূপ চিত্রাদি বা অল্প কোন বাহ্যিক উপায়ে মন আকর্ষণ করা যায় না । উপসর্গের ফর্দ, গ, ঘ,

ব্যবহারেব নিয়ম, উপক্রমণিকার শব্দরূপ, ধাতুরূপ, ইংরাজী ব্যাকরণের লিঙ্গ-প্রকরণের তালিকা প্রভৃতি মনোনিবেশ সহকারে মুখস্থ করিতে হইবে—এ সমস্ত শ্রুত প্রদ করা দুঃসাধ্য। এইরূপ বিষয়ে বালকগণকে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য করিতে হইবে। সময় সময় একটু শাসনেরও আবশ্যক। শাস্তির ভয়ে মনোনিবেশ করিতে করিতে শেষে গভ্যাস হইয়া পড়িবে। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণের স্বতঃ উৎপন্ন অভিনিবেশবৃত্তি প্রবল করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাদানে যে সকল পরতঃ উৎপন্ন উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা কখনই পরিত্যজ্য নহে।

(ঙ) কোন প্রশ্ন একবারের অধিক জিজ্ঞাসা করিবে না। শ্রুতলিপির ব্যাখ্যা একবারের অধিক আবৃত্তি করিবে না। বাধা হইয়া বালকগণ মনোযোগী হইতে চেষ্টা করিবে। (শ্রুতলিপির অধ্যায় দেখ)

(চ) কোন বিষয় বুঝাইয়া দিবার সময় সুস্পষ্টস্বরে উচ্চারণ করিবে ও হাত মুখের ভঙ্গী দ্বারা বিষয় বিশদ করিতে যত্ন করিবে। বালকগণ নিস্তব্ধ হইয়া তোনার কথা শ্রবণ করিবে ও ভঙ্গী দর্শন করিবে। দর্শন অভিনিবেশের বিশেষ সহায়। বালকেরা থিয়েটার বা যাত্রা শুনিতে গিয়া বিষয়টী উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আসে। কেন? অভিনেতৃবর্গের উত্তম বক্তৃতা ও সমস্ত ভঙ্গীর দ্বারা তাহাদিগের মন আকৃষ্ট হয় বলিয়া।

(ছ) যাহাতে বালকেরা শিক্ষায় আগ্রহ পায়, সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বালকই হউক আর যুবকই হউক, যে কার্যে আনন্দ অনুভব করিবে না বা যে কার্যে কোন লাভের প্রত্যাশা দেখিবে না, সে কার্যে মনোনিবেশ করিতে ইচ্ছা করিবে না।

(জ) এক বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ অসম্ভব। এক বিষয়ে অনেকক্ষণ পাঠ দিলে তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে। ইহাই বিবেচনা করিয়া বিষয় পরিবর্তন ও সময় নিরূপণ করিতে হইবে। কোন কোন শিক্ষক এক বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বালকদিগের সমক্ষে কথা কহিতে থাকেন,

এবং শিশুরা তচ্ছুবণে অমনোযোগী হইলেই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন । তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, এককথা একশত বার শুনিতে শিশুগণের বিরক্তি জন্মে । * * * “যেমন মধুমক্ষিকাগণ একেবারে একটি পুষ্পের সমুদয় মধু শোষণ করিয়া লয় না, কখন এ ফুলে, কখন ও ফুলে বসিয়া মধু পান করে, সুকুমারমতি শিশুগণও সেইরূপ শীঘ্র শীঘ্র বিবিধ বিচার রসাস্বাদন করিতে চায় । অতি বৃহদাকার মৎশ্রেয়সী অগাধ জলে নিবাস করে, সফরী অগভীর অশুপারি আনন্দ সহকারে সন্তরণ করিয়া বেড়ায় ।” (ভূদেব)

‘বিষয় বিশেষে ও স্থান বিশেষে অভিনিবেশের নামভেদ হয় । এক সময়ে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ও অভিনিবেশের কার্য্য হইলে সেই অভিনিবেশকে ‘পর্য্যবেক্ষণ’ কহে । কোন বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ একৈক্যক্রমে সকল অংশের প্রতি যে মনঃসংযোগ তাহাকে ‘গবেষণা’ কহে । বাহ্য পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মনোগত ভাব সকলের প্রতি যে অভিনিবেশ তাহাকে ‘অনুধ্যান’ কহে । একাধিক বিষয়ের সাদৃশ্য বা বেসাদৃশ্য নির্ণয়ার্থ ক্রমশঃ এক এক বিষয়ের প্রতি যে অভিনিবেশ তাহাকে ‘উপগতি’ কহে ।” (গোপাল বাবু) ।

স্মৃতি ।—কোন এক বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় যদি অল্প বিষয়ের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয় তবে প্রথম চিন্তার বিষয় অন্তর্হিত হইয়া দ্বিতীয় চিন্তার স্থান করিয়া দেয় । কিন্তু প্রথম চিন্তা লুক্কায়িত অবস্থাতে মনোমধ্যেই অবস্থিতি করে । আমরা যখন ইচ্ছা করি, তখন আবার সেই পূর্ববিষয় আমাদের মনে জাগরিত করিয়া তুলিতে পারি । এইরূপ স্মৃতি চিন্তাকে ইচ্ছামত জাগরিত করার নামই স্মৃতি । ঘটনা বিশেষের সংঘটনেও সময় সময় পূর্ববিষয় স্মৃতিপটে জাগরক হয় । ৬ বৎসর হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত স্মৃতিশক্তির কার্য্য অত্যন্ত প্রখর থাকে । ইহার পর যতই তর্ক ও বিচারশক্তির উন্নতি হইতে থাকে, ততই স্মৃতির শক্তি কমিয়া আসিতে থাকে ।

বাল্যকালে তর্ক ও বিচারের শক্তি খুব কম থাকে বলিয়াই স্মৃতি এত

প্রবল। স্মৃতরাং বালা বয়সেই মুখস্থ করিবার বিষয়গুলি আরম্ভ করিতে হইবে। কড়া, গণ্ডা, নামতা প্রভৃতির ধারা, ব্যাকরণ ও ভূগোলের সূত্র ও নামাবলী বাল্যকালে শিক্ষা না করিলে, আর অধিক বয়সে শিক্ষা হয় না। যে সকল বালক শিশুকাল হইতে ইংবাজী বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে ওকালতী প্রভৃতি ব্যবসায়ের অনুরোধে অধিক বয়সে কড়া গণ্ডা শিক্ষা করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের এই বিষয়ে তেমন ক্ষিপ্ৰকারিতা দেখা যায় না। ইহারা ৪, ৫ দিয়া ভাগ করিয়া যতক্ষণে কত কড়া বা কত গণ্ডা ঠিক করিয়া থাকেন, তাহার বহু পূর্বেই, পাঠশালার বালকেরা উত্তর করিয়া বসে। কিন্তু তাই বলিয়া ছালাকালেও এই স্মৃতিশক্তির অপরিমিত পরিচালনা সম্ভব নয়। কারণ তাহা হইলে তর্ক ও বিচারের শক্তি একেবারে চাপা পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। স্মৃতির পাশে পাশে তর্ক ও বিচার শক্তির বৃদ্ধি করিবার জন্ত স্থান বাখিতে হইবে। যে শক্তি বশতঃ পরিচ্ছন্ন বিষয় বহুদিবস পর্য্যন্ত মনে থাকে, তাহাকে “ধারণা”-শক্তি বলে। কাহারও ধারণাশক্তি কম, কাহারও বেশী। স্মৃতির প্রখরতা এই ধারণাশক্তির উপর নির্ভর করে। স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি নিম্নলিখিত বিষয় সাপেক্ষ, (ক) অভ্যাস বা অনুশীলন (খ) মনোযোগ, (গ) পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি, (ঘ) সময় ও পরিমাণ, (ঙ) স্বাস্থ্য ও আরাম, (চ) ভাবপ্রসঙ্গ, (ছ) শৃঙ্খলা।

(ক) অভ্যাস বা অনুশীলন।—কোন বিষয়ের অনুশীলন করিলে যে, সে বিষয় প্রকৃতিগত হইয়া যায় তাহা পবীকৃত সত্য। অনুশীলনের দ্বারা স্মৃতি, মনোযোগ, ইন্দ্রিয়বোধ, প্রভৃতি বুদ্ধির শক্তি বৃদ্ধি পায়। বালকেরা অনেক সময় তাহাদের স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাকে প্রকৃতিগত অসম্পূর্ণতা বলিয়া পাঠাভ্যাসে বিরত থাকে। কিন্তু এরূপ ধারণা অনেক স্থলেই ভুল। অনভ্যাস হেতু স্মৃতিশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে; একটু চর্চা করিলেই আবার তাহা শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে।

যে বালকের স্মৃতিশক্তি এইরূপ দুর্বল, তাহাকে সকল বালকের সমান পাঠ দিতে নাই। এক লাইন কি দুই লাইন মুখস্থ করিতে বা তাহার ভাব মনে করিয়া রাখিতে দিবে। তাব পর ক্রমে ক্রমে মাত্রা বাড়াইবে। যাহাবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্মৃতিশক্তিকে বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে, তাহারা সময় ও পরিমাণ এই দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। প্রথম কিছু দিন হয় ত অর্ধ ঘণ্টায় ৫ লাইন মুখস্থ করিতে চেষ্টা করে; তার পর অর্ধ ঘণ্টায় ৭ লাইন, তার পর ১০ লাইন, এইরূপ করিয়া ক্রমে ক্রমে পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। যে বালক অতি কষ্টে ২ ঘণ্টায় ৩৪ লাইনের অধিক মুখস্থ করিতে পারিত না, তাহাকে অর্ধ ঘণ্টায় এক পৃষ্ঠা মুখস্থ করিতে দেখিয়াছি। বেশী দিনের চেষ্টায় নহে, ৮৯ মাসের মাত্র। তবে এই চেষ্টা নিয়মিত হওয়া আবশ্যিক। একবার যদি গ্রীষ্মের কি পূজার ছুটির সময় অনুশীলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তবে অবকাশের পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতেই আবার অনেক সময় লাগিবে। ১০।১২ বৎসরের বালকের পক্ষে প্রতিদিন অর্ধ ঘণ্টা মনোনিবেশপূর্বক স্মৃতিশক্তির অনুশীলনই যথেষ্ট।

(খ) মনোযোগ—স্মৃতিশক্তির অনুশীলনে মনোযোগ বিশেষ আবশ্যিক, তবে বিনা মনোযোগেও ক্রমাগত আবৃত্তি করিতে করিতে অনেক বিষয় মুখস্থ হইয়া যায়। মনঃসংযোগপূর্বক মুখস্থ করিতে চেষ্টা করিলে অল্প সময়ে অধিক কার্য্য হয়। অনেক বালক প্রাতে ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত পড়িয়া পাঠাভ্যাস করিতে পারে না। মনোযোগের অভাবই তাহার কারণ। মুখে তাহারা পাঠের আবৃত্তি করে বটে, কিন্তু মনে মনে নানা বিষয় চিন্তা করে। অবশ্য একরূপ এক পাঠ লইয়া যদি বহুদিন ৪।৫ ঘণ্টা অভ্যাস করা যায়, তবে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিবশতঃ মুখস্থ হইতে পারে। কিন্তু অল্প সময়ে মুখস্থ করিতে হইলে, বিনা মনঃসংযোগে সেরূপ হওয়া অসম্ভব। যেখানে গোলমাল হইতেছে বা যেখানে ভ্রামসা হইতেছে

এরূপ স্থানে, বালকের পক্ষে মনঃসংযোগ করা সুকঠিন। রাস্তার ধারে কি কোন কারখানার নিকট পাঠের গৃহ হওয়া উচিত নহে। যেখানে বালকেরা বসিয়া পড়া শুনা করে সেখানে গল্প করা উচিত নয়। তার পর পাঠের সময় “ওরে গরুটা বাঁধত, ওরে মেয়েটা কাঁদে কেন দেখত” ইত্যাদি রূপ আদেশ করিয়াও পিতামাতা বালকদিগের মনঃসংযোগের বাধা দিয়া থাকেন। বরং ‘অর্ধ ঘণ্টায় তোমাকে এই পরিমাণ মুখস্থ করিতে হইবে’,—এইরূপ কড়াকড়ি আদেশ করিলে বালকেরা অনেক সময় ভয়-ভক্তিতে পাঠাভ্যাস করিয়া দেয়। এইরূপ ভয়ে ভয়ে কাজ করিতে করিতে মনঃসংযোগের অভ্যাস হইয়া যায়।

(গ) পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি।—কড়া, গাণ্ডা, নামতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা, সঙ্গীত, সন্ধ্যা বন্দনা প্রভৃতি বালকেরা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া শিক্ষা করে। যাহা একবার মুখস্থ করা যায়, যদি তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা না যায়, তবে তাহা কিছুতেই মনে থাকিতে পারে না। এই জন্য পাঠের শেষে পুনরালোচনা করা আবশ্যিক (পাঠনার নোট লিখিবার পদ্ধতি দেখ)। যাহা একবার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহার আর পুনরালোচনার আবশ্যিক নাই—যে শিক্ষক এইরূপ মনে করেন, তিনি সফলভাবে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। যতই আলোচনা করিবে, ততই বিষয়টি স্থিতিতে গাঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া যাইবে। এই আলোচনা আবার খুব ঘন ঘন হওয়া, কি বহুদিন অন্তরে হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। বালকদিগের বয়স ও বিষয় দৃষ্টে ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বালকগণ বাড়ীতে সন্ধ্যা কি প্রাতে তাহাদিগের দৈনিক মুখস্থের পাঠ, যদি পুস্তক বদ্ধ করিয়া দুই তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর, তিনবার আবৃত্তি করে তাহা হইলেই হইল। বিদ্যালয়েও নিম্ন-প্রাথমিক শ্রেণী পর্য্যন্ত নামুতা প্রভৃতি সপ্তাহে চারিবার, ভূগোল ব্যাকরণ তিনবার ও সাহিত্যের একবার পুনরালোচনা হওয়া আবশ্যিক।

অধীত বিষয় পুস্তক দেখিয়া লিখিতে দিলেও পুনরালোচনার কার্য্য হয়। আর যদি পাঠের সারাংশ নিজের ভাষায় বালকগণকে লিখিতে দেওয়া হয়, তবে পুনরালোচনার সঙ্গে রচনার কার্য্যও হইয়া যায়।

(ঘ) সময় ও পরিমাণ।—অনেক বালক প্রায় সমস্ত বৎসর আলস্তে নষ্ট করিয়া পরীক্ষার সময় পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করে। অল্প সময়ে অনেকগুলি বিষয় অতিকষ্টে মনে রাখিয়া শেষে পরীক্ষার কাগজে সেগুলি ঢালিয়া দিয়া আসে। এক্ষণে অনেক বালক পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয় বটে, কিন্তু পরীক্ষার ২৪ দিন পরে তাহাদিগকে সে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। যে বিষয় অভ্যাসে অল্প সময় নিয়োজিত হয়, তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই মনে হইতে সরিয়া পড়ে। এ বিষয়ের একটা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কোন বালককে একটা সামান্য অংশ মুখস্থ করিতে দাও, মুখস্থের পরেই তাহাকে সেই অংশ পুস্তক বন্ধ করিয়া ৪ বার আবৃত্তি করিতে বল। তার পর অল্প আর একটা বিষয় মুখস্থ করিতে দাও। এবারে তাহাকে ঐ বিষয়টি পুস্তক বন্ধ করিয়া ১ ঘণ্টা পর পর ৪ বার আবৃত্তি করিতে বল। পরদিন বালককে দুইটা বিষয়েই পরীক্ষা কর। বালকের মনে যে দ্বিতীয় অংশটি প্রথমোক্ত অংশের অধিকতর দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহার বেশ প্রমাণ পাইবে। এই জন্ত বৎসরের প্রথম হইতে যাহাতে বালকেরা সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিয়া মনে করিয়া রাখিতে যত্ন করে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শিক্ষকেরও উচিত নয় যে তিনি অর্ধ ঘণ্টায় ঝুড়ি ঝুড়ি বিষয় বালকের গলাধঃকরণ করাইয়া দেন। তাহার শাসনে বা ভয়ে বালকেরা হয় ত সমস্ত বিষয় আল্লা আল্লা ভাবে মনে করিয়া রাখিতে পারে; কিন্তু তাহা বেশী দিন মনে থাকিবে না।

(ঙ) স্বাস্থ্য ও আরাম।—স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে মনোযোগের শক্তি নষ্ট

হইয়া যায় ও স্মৃতিশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। বালকের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিদ্যালয়ের শেষ ঘণ্টায় বালকেরা সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এ সময় কোন আবশ্যিক বিষয় শিক্ষা দিলে, তাহাদের মনে না থাকিবারই কথা। বসিবার অসুবিধা হইলে, কাণের কাছে গোলমাল হইলে, শীত বা গ্রীষ্মাধিক্য হইলে, বালকগণের মনো-নিবেশের ব্যাঘাত জন্মে বলিয়া স্মরণশক্তির অনুশীলনের যথেষ্ট অসুবিধা হইয়া থাকে।

(চ) ভাবপ্রসঙ্গ।—ভাবপ্রসঙ্গে স্মৃতিশক্তির সহায়তা হয়। একটা পদার্থ দেখিয়া, একটা কথা শুনিয়া বা একটা বিষয় চিন্তা করিয়া, তাহাদের প্রসঙ্গে আমাদের মনে যে আরও অনেক ভাবের উদয় হয়, তাহাকেই ভাব-প্রসঙ্গ বলে। ঘোড়দৌড়ের মাঠ দেখিলেই, ঘোড়ার কথা মনে আসে; পাঠশালা দেখিলেই, নিজের বালাজাবনের কথা মনে আসে। একটা পদার্থ আর একটা পদার্থের স্মৃতিকে টানিয়া আনে। একটা ভাবের সহিত যদি অন্য ভাব যুক্ত না হয়, তবে কোন ভাবই আমাদের স্মৃতিতে থাকিতে পারে না। একটা ভাবকে যতই অন্যান্য ভাবের সহিত সংযোগ করা যায়, ততই তাহা মনে রাখিবার সুবিধা হয়। ইতিহাস শিক্ষায় মানচিত্রের সাহায্য লওয়া হয়—পাণিপথ দেখিলেই সেই স্থানের সমস্ত কথা মনে আসে। চিত্র দেখান হয়—তাজমহল দেখিলেই সাজাহানের কথা মনে পড়ে, বৃদ্ধবয়সে তাঁহার দুর্দশার কথাও মনে পড়ে। এই জন্ত চিত্র, পুস্তক, মানচিত্র প্রভৃতির দ্বারা বালকগণের স্মৃতিশক্তির যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে।

শিক্ষাদানে জ্ঞাত ঘটনার সহিত যুক্ত করিয়া অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা দিলে ভাবপ্রসঙ্গের স্বাভাবিক গতিতে, জ্ঞাত বিষয় স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত বিষয়াদিও মনে আসিয়া পড়িবে। গ্রামে হয় ত কোন ধনী পরিবারে সম্পত্তির অধিকার লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছে ও গ্রামের সকলেই এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছে। শিক্ষক এই জ্ঞাত বিষয়ের

সহিত যোগ করিয়া 'রাজানোভে আওবেঙ্গজেবের ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে বিবাদ হইয়াছিল' তাহা বর্ণনা করিতে পারেন। গ্রামের এই বৃহৎ ঘটনা (ছোট ছোট ঘটনা হইলে বালকদের মনে থাকিবে না) মনে হইলেই, আরওঙ্গজেবের রাজ্যপ্রাপ্তির বিবরণ মনে আসিবে, সেই সঙ্গে মোগল রাজত্বের অধঃপতনের কথাও মনে আসিবে।

(ছ) শৃঙ্খলা।—বিধিবদ্ধ একটা শৃঙ্খলা অবলম্বন করা উচিত। কাহার জীবনী বর্ণনাতে তাহার শৈশব, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, এই সাধারণ প্রকৃতিসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিলে বালকগণের অনুধাবন করিতে সুবিধা হইবে। আর যে প্রণালী একদিন অবলম্বন করা হইবে, সে বিষয়ের পুনরালোচনা ঠিক সেই প্রণালী অনুসারেই করিতে হইবে। তবে উত্তম-রূপ অভ্যাস হইয়া গেলে কোন পরিবর্তনে ক্ষতি হইবে না।

ভূগোল ও ব্যাকরণের নাম বা শব্দের তালিকা অভ্যাস করিতেও একটা ধারা অবলম্বন করিতে হইবে। রাজসাহী বিভাগের জেলাগুলির নাম অভ্যাস করাইবার সময় একদিন "রাজসাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা" অন্ত্যদিন আবার "পাবনা, দিনাজপুর, রাজসাহী, রংপুর" ইত্যাদিরূপ বিশৃঙ্খল প্রণালী অবলম্বন করা উচিত নহে। একদিন প্রা, পরা, অপ, সম অন্ত্যদিন আবার পরা, সম, অপ, প্রা ইত্যাদি ক্রম অবলম্বন করিলে সহজ শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিবে। পণ্ডিত মুখস্থ করিতে হইলে ঠিক যাহার পর যে লাইন, প্রত্যাহ সেইরূপ আবৃত্তি না করাইয়া লাইনগুলি বিশৃঙ্খল করিয়া দিলে, পণ্ডিত মুখস্থ করা কঠিন হইবে। ঠিক এক প্রণালী অবলম্বন করিলে, ভাবপ্রসঙ্গে একের পর অন্য বিষয় বা শব্দ সহজেই মনোমধ্যে উপস্থিত হইবে।

দ্রব্য, প্রতিক্রিয়া ও ক্রিয়া দর্শন করিয়া মনে যে সকল ভাবের উদয় হয়, তাহা বহুকাল স্মরণ থাকে। "একবার লেখা পাঁচবার পড়ার সমান"—কথা যথার্থ।

কল্পনা।—শিক্ষায় এই বৃত্তির অনুশীলন বিশেষ আবশ্যিক। • জ্ঞাত

বিষয়াদির সাহায্যে মনোমধ্যে যে একটা অজ্ঞাত বিষয়ের চিত্র অঙ্কিত করা হয় তাহাকেই কল্পনা বলে। ইতিহাস, ভূগোলের বিষয়গুলি বালকগণকে কল্পনার সাহায্যেই উপলব্ধি করিতে হয়। বাল্যকাল হইতেই এ বৃত্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে। “মা, আমি একখানা আঙা কাপল নব”—ইহার মধ্যেও সেই ক্ষুদ্র শিশুর কল্পনাশক্তির বেষণ পরিচয় পাওয়া যায়। “পূজার সময় আমার মথমলের জামা হবে”—পাঁচ বৎসরের বালকের এই বাক্যে যথেষ্ট কল্পনা লুক্কায়িত আছে। তাব পর একটু বড় হইলে, বালকেরা যখন বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করে, তখন শিক্ষকের নিকট কত অদ্ভুত জন্তু, বৃক্ষ, জনপদ, মনুষ্য প্রভৃতির গল্প শুনিয়া কল্পনা দ্বারা হৃদয়পটে তাহার চিত্র অঙ্কিত করে।

“একটা নদীর বা পর্বতের বর্ণনা কর, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইবার পথের বর্ণনা কর, কোন বাজারের বর্ণনা কর” ইত্যাদি প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষকগণ বালকের কল্পনাশক্তির বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকেন।

“স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও শিল্পসম্পন্ন অদ্ভুত পদার্থের আলোচনা দ্বারা এবং মহৎ ব্যক্তিগণের অপারিসীম দয়া ও মহত্বসূচক কার্যের বর্ণনা, সুবিখ্যাত মহানুভবদিগের জীবনচরিত, ইতিহাস, কাব্য ও কাল্পনিক উপন্যাসাদির পাঠ দ্বারা কল্পনাশক্তির আলোচনা হয় এবং তদ্বারা তাহার তেজস্বিতার বৃদ্ধি হয়।” (গোপাল বাবু)।

চিন্তা ও বিচার।—ছই বা বহু বিষয়ের তুলনা করিয়া তাহা-দিগের গুণাগুণ প্রভৃতি নির্ণয় করাকে বিচার বলে। আর সেই বিচার করিয়া যে সাধারণ জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই-সিদ্ধান্ত। ভালমন্দ বিচারের শক্তি অতি শৈশবাবস্থা হইতে বিকশিত হয়। “এ সন্দেশটা ছোট—এটা চাই না, ঐটা চাই; এ খেলনা চাই না, ঐ ভালটা”—ইত্যাদি বিচারের শক্তি, বাক্য স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গেই ফুটিয়া উঠে। কিন্তু বাল্যে এই শক্তির তেমন বৃদ্ধি হয় না। যৌবনকাল হইতেই ইহার প্রকৃত শক্তি প্রকাশিত

হইতে আরম্ভ হয় । এই জন্ত তর্ক-বিচার-পরিপূর্ণ শাস্ত্রাদি (জ্যামিতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি) অপরিণতবয়স্ক বালককে পড়াইলে কোন ফল পাওয়া যায় না ।

বিচারের যে সমস্ত প্রণালী আছে, তাহার মধ্যে আরোহী ও অবরোহী প্রণালী শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়—(১) বৃক্ষ হইতে আপেল ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, উর্দ্ধদিকে চলিয়া গেল না ; আকাশে চিল ছুড়িলে তাহা ক্রমাগত আকাশে চলিয়া গেল না, মাটিতেই ফিরিয়া আসিল ; যে পাখী ক্রমাগত উর্দ্ধে উঠিতেছে, তাহাকে গুলি করিয়া মারিলে সে মাটিতে পড়িল । আর এই সমস্ত ঘটনা রাত্রি, দিনে, শীতে, গ্রীষ্মে, সর্বকালে এবং নরভূমিতে, সাগরে, ইউরোপে, আফ্রিকায়, সর্বদেশে একরূপ ভাবেই সংঘটিত হইয়া থাকে । অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে ‘সমস্ত দ্রব্যই পৃথিবী কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে ।’ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষা করিয়া একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত (মাধ্যাকর্ষণ) নির্ধারণ করাকে, অর্থাৎ ছোট ছোট তত্ত্ব হইতে ধীরে ধীরে বৃহৎ তত্ত্বে আরোহণ করাকে “আরোহী প্রণালী” বলে । বিজ্ঞানের প্রায় তত্ত্বই এই প্রণালী অনুসারে নির্ধারিত হইয়া থাকে । (২) “যে যে বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান, তাহার পরস্পর সমান”—এটা সাধারণ সত্য সিদ্ধান্ত । আমরা ইহার সাহায্যে প্রথম প্রতিজ্ঞান্তর্গত ‘ত্রিভুজের তিন বাহু যে পরস্পর সমান’ ইহা প্রমাণ করিয়া থাকি । সমবাহু ত্রিভুজের ‘তিন কোণ যে পরস্পর সমান’ (এম প্রতিজ্ঞার অনুমান) ইহাও এই সত্য সিদ্ধান্তের দ্বারা আমরা সপ্রমাণ করি । এইরূপ একটা সাধারণ সত্য সিদ্ধান্তের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রমাণ করাকে অর্থাৎ একটা বৃহৎ সাধারণ তত্ত্ব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তত্ত্বে নামিয়া আসাকে “অবরোহী প্রণালী” বলে । গণিতের তত্ত্বগুলি প্রায়ই এই প্রণালীতে প্রমাণিত হইয়া থাকে । ব্যাকরণেরও ঐ প্রণালী ।

বালকদিগের বিচারশক্তির বৃদ্ধি সাধনে প্রথম হইতেই বদ্ব করিতে হইবে। কাহার গানচিত্র ভাল হইয়াছে, কাহার মন্দ হইয়াছে; কাহার তন্তুনিপি সর্বাঙ্গাৎ উত্তম ইত্যাদি বিষয়ে বিচারের ভার মধ্যে মধ্যে বালকদের হাতে দিয়া বিচারকার্য শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপে অঙ্কন, আবৃত্তি, ব্যায়াম প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাহারা 'উত্তম, মধ্যম, অধম' নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিলে যে তাহাদিগের কেবল বিচারশক্তি বৃদ্ধি হইবে এমন নহে, নিজেরাও 'উত্তম' অবস্থা কাহাকে বলে, তাহা বুঝিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে।

অনুভব বৃত্তি।—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্য্য প্রভৃতি অনুভববৃত্তিতে স্বার্থভাব প্রবল। আর দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি বৃত্তিতে পরার্থভাব প্রবল। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি বৃত্তিরও আবশ্যকতা আছে, কিন্তু ইহাদের মাত্রাধিক্য না হয় বা ইহারা বিপথগামী না হয় ইহাই দেখিতে হইবে। আর দয়া, মায়া প্রভৃতি বৃত্তি যাহাতে উন্নত হয়, তাহার চেষ্টাও করিতে হইবে। বক্তৃতা শ্রবণ বা উত্তম পুস্তকাদি পাঠ এ কার্যের কতক সহায়তা করে বটে, কিন্তু সৎদৃষ্টান্তের অনুকরণ দ্বারাই সৎবৃত্তির সম্যক পরিপুষ্টি সাধিত হয়।

কতকগুলি অনুভববৃত্তির অনুশীলন বিষয়ে শিক্ষককে একটু সতর্ক হইতে হইবে। যেমন—

(ক) লজ্জা ও ভয়।—পড়া দিতে না পারিলে লজ্জিত হইতে হইবে বা শিক্ষক তিরস্কার করিবেন, এরূপ কিছু লজ্জা বা ভয় থাকা আবশ্যক। যদি বালকের মনে এরূপ বিশ্বাস হয় যে, 'সামান্য' ত্রুটি হইলেই শিক্ষক বেত্র প্রহারে রক্তনদী প্রবাহিত করিবেন, তবে সে পাঠে মনোনিবেশ না করিয়া, বিড়ালয় হইতে পলায়ন করিবার পন্থা চিন্তা করিবে। ভক্তিসংযুক্ত ভয় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বিভীষিকাসংযুক্ত ভয় পরিত্যজ্য।

(খ) আত্মক্ষমতা বোধ।—কোন কঠিন অঙ্ক কসিতে পারিলে বা কোন

একটা কঠিন কাজ সম্পাদন করিলে, বালকের মনে একটা আত্মপ্রসাদ জন্মে । এ বাস্তব অনুশীলন নিতান্তই আবশ্যিক । দুর্বল বালককে ভাল করিতে হইলে, তাহাকে সহজ সহজ অঙ্ক কসিতে দিয়া তাহার আপন শক্তিব বোধ জন্মাইয়া দিতে হইবে । সে যখন দেখিবে যে সে নিরবোধ নহে, সেও অল্পের মত অঙ্ক কসিতে পারে, তখন সে নিজের ক্ষমতা দৃষ্টে আনন্দিত হইবে ও কার্য্যে উৎসাহিত হইবে ।

(গ) কার্য্যানুরাগ ।—বালকগণ সর্বদাই কার্য্যপ্রিয় । অলসের মত উপবেশন বা শয়ন করিয়া বৃথা চিন্তায় সময়োতিপাত করিতে জানে না । শিক্ষকের কর্তব্য যে তাহাদিগকে সকল সময়ই ভিন্ন ভিন্ন সংকার্য্য দিয়া ব্যাপ্ত রাখেন । শিক্ষক বা অভিভাবক তাহার জন্ত কোন কার্য্যের ব্যবস্থা না করিলে, সে নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইবে । কিন্তু বালকেরা ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারে না বলিয়া, তাহাদিগের নিজের ব্যবস্থার কার্য্য অনেক সময় অসৎ হইয়া পড়ে ।

(ঘ) প্রতিযোগিতা ।—যেখানে এক সঙ্গে অনেক ব্যক্তি এক বিষয় এক রকমে শিক্ষা করে, সেখানে প্রতিযোগিতায় সফল হইয়া থাকে । অল্পের অপেক্ষা আমি অধিক পরিমাণ উন্নতি করিব, এইরূপ ভাব উত্তম । কিন্তু ইহার সঙ্গে যেন অল্পকে অত্যাশ্রুতপে পরাস্ত করিবার ভাব না জন্মে । অল্পের পতনে যেন আনন্দানুভব করিতে না শিখে । শ্রেণীতে এই প্রতিযোগিতার ফলে যদি কেবল দুই একটা ছাত্র উত্তম হইয়া উঠে, তবে তাহাদিগের অহঙ্কারবৃত্তি বৃদ্ধি হইতে পারে । সেই জন্ত প্রতিযোগিতার ইচ্ছা সকল বালকের প্রাণেই বলবতী করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে । অল্পের চেয়ে বেশী নম্বর রাখিবার জন্ত বালকেরা চেষ্টা করে—এও প্রতিযোগিতা । কিন্তু অল্প বালকের নম্বরের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া যদি ‘পূর্ণ নম্বরের সংখ্যার’ সহিত প্রতিযোগিতা করিতে শিক্ষা দেওয়া যায় তবে যথেষ্ট সফললাভ হয় (পরীক্ষা প্রশ্নালীর অধ্যায় দেখ) ।

(ঙ) যশোনিপা ।—সুখ্যাতি দ্বারা বালকেরা উৎসাহিত হইয়া থাকে । কিন্তু অধিক সুখ্যাতি লাভে আবার সময় সময় গর্বিবত হইয়া পড়ে । সুতরাং সুখ্যাতির পরিমাণও ঠিক রাখা আবশ্যিক । কোন কোন শিক্ষক আবার এরূপ ক্ষুদ্রচেতা যে তাঁহারা সুখ্যাতি দানে বিশেষ কৃপণতা করিয়া থাকেন । বালক সাধামত কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেছে, শিক্ষক সে দিকে দৃষ্টি করিলেন না । কিন্তু তাঁহার মনোমত কার্য্য না হওয়াতেই, তিনি চটিয়া উঠিলেন । ইহাতে বালকেরা উৎসাহশূন্য হইয়া পড়ে । সুখ্যাতি লাভের ইচ্ছা স্বাভাবিক—অতি বাল্যকাল হইতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায় । শিশু যখন হাঁটিতে আরম্ভ করে তখন দুই এক পা হাঁটিয়া “বা, বেশ” শুনিলে জন্তু, বা উৎসাহসূচক হাসি দেখিলে জন্তু, মা’র মুখের দিকে চাহিয়া থাকে । শিক্ষক এইরূপ দুই একটি ‘বা, বেশ,’ বলিয়া অনেক বালককে কর্ম্মক্ষেত্রে হাঁটিবার জন্ত প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন ।

বিবিধ ।—এমন কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে বাহা সকল সময় আমাদের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না । মনে কর, বালক গালাগালি কি মার খাইয়া কাঁদিতেছে । ক্রন্দন স্বাভাবিক ; ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সে ইহাকে নিবারণ করিতে পারে না । “কাঁদবি ত আবার মার খাবি, চৈঁচাবি ত গলা কাটিয়া ফেল্‌ব” ইত্যাদি প্রকার ভয় দেখাইলে সে থামিল না বা নিজকে থামাইতে পারিল না । এখন এইরূপ অবাধ্যতার জন্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রহার করা নিষ্ঠুর ও নির্কোষের কার্য্য । বালকেরা কোন হান্তজনক কার্য্য ॥ কোন হান্তজনক ঘটনা দেখিয়া হাসিয়া উঠেন । এটা স্বাভাবিক বৃত্তি ; নিবারণের কোন আবশ্যকতা নাই, (অবশ্য অন্তায় কারণে না হইলে) বরং এইরূপ হাসিলে বালকগণের হৃদয়ের আবেগ থামিয়া যায় ।

মানসিক বৃত্তিসমূহের স্বাভাবিক প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে না শিখিলে বালককে সুশিক্ষিত করিতে পারা যায় না । এইজন্য শিক্ষাকার্য্য দানায় কিঞ্চিৎ মনোবিজ্ঞানের আলোচনা আবশ্যিক ।

ইচ্ছাশক্তি ।—মনের যে শক্তি আমাদের কার্যে প্রবৃত্ত করে তাহাকে ইচ্ছা বলে । নানা উদ্দেশ্যে আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি ; কতক উদ্দেশ্য সং আর কতক অসং । বালকেরা যাহাতে সং উদ্দেশ্যে কার্যে প্রবৃত্ত হয়, একরূপ ভাবে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা শিক্ষকের কর্তব্য । আবার কোন উদ্দেশ্য ‘সাক্ষাৎ’ আর কোনটী ‘সুদূর’ । ‘খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠিলেই মা’র নিকট একটা পয়সা পাওয়া যাইবে’—এ অনেকটা সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য ; ‘আর এখন থেকে পরিশ্রম করিলে বৎসরের শেষে পরীক্ষায় পুরস্কার পাওয়া যাইবে’—এটা সুদূর উদ্দেশ্য । বালকেরা এই সুদূর উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কার্য করিতে ইচ্ছা করে না । কিন্তু ইহাই শিক্ষা দিতে হইবে । বালক কেন, অনেক পরিণত বয়সের লোক ও দূর উদ্দেশ্য ধরিয়া কাজ করিতে পারেন না । এমন কি জ্ঞানাতিমানী ব্যক্তিদের মধ্যেও একরূপ ধৈর্য্যহীন ব্যক্তি অনেক দেখিতে পাওয়া যায় । একজনের সংস্কৃত পড়া দেখিয়া আর একজন ‘মুগ্ধবোধ’ ক্রয় করিলেন । চারি পাঁচ দিন পণ্ডিতের বাড়ীতে গিয়া পাঠও করিলেন, কিন্তু আয়াসসাধ্য দেখিয়া পরিত্যাগ করিলেন । একজন বেশ চিত্রাঙ্কন করিতে পারে দেখিয়া আর একজন পেন্সিল, রবার, কাগজ সংগ্রহ করিলেন ; ২ দিনের পর আর উৎসাহ থাকিল না । একজন বেশ বেহালা বাজায় দেখিয়া আর একজন বেহালা আনাইল, কিন্তু ৫৭ দিন পর আর বাজাইতে ইচ্ছা হইল না । একরূপ যখন আমাদের দশা, তখন বালকেরা কি করিবে ?

ইচ্ছার সঙ্গে অধ্যবসায়ের সংযোগ না থাকিলে মহৎ কার্য সম্পাদিত হয় না । অধ্যবসায়ও অভ্যাসের ফল । বালকদিগকে ধৈর্য্যসম্পন্ন করিতে হইবে । কোন কার্য অর্দ্ধ সম্পন্ন করিয়া রাখা অধৈর্য্যের লক্ষণ ।

মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বাবতীয় কথা কথা উদ্দেশ্য নহে । কেবল পাঠকের মনে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা করিবার ইচ্ছা প্রদীপিত করিয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য ।

মনোবৃত্তি বিকাশে লক্ষ্য।—বৃত্তিসকলের বিকাশ সম্বন্ধে যে কয়েকটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক তাহা এখানে বিবৃত হইতেছে—

- (১) বৃত্তিসকল ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়।
- (২) অনুকূল বিষয়ে, বীতি অনুসারে পরিচালিত হইলে তাহাদিগের তেজ বৃদ্ধি পায়।
- (৩) প্রতিকূল বিষয়ে চালিত কিসা এককালে অত্যন্ত চালিত অথবা একেবারে চালনা-বিরহিত হইলে বৃত্তিসকলের তেজ হ্রাস হয়।
- (৪) বৃত্তিসকল অনায়াসেই কুপথগামী হয়।
- (৫) ইন্দ্রিয়সকল জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। জড় পদার্থ ও জড় পদার্থের কার্য প্রত্যক্ষ করিয়া বৃত্তিসকলের প্রথম চালনা আরম্ভ হয়।
- (৬) বৃত্তিসকলের নিয়মিত চালনা হইলে অপূর্ব আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। শিষ্কার সঙ্গে সঙ্গে আমোদ বাথিলে বালকেবা সহজেই পাঠে মনোযোগী হয়।
- (৭) যে কর্ম পুনঃ পুনঃ করা যায় তাহাই অভ্যাস হয়।
- (৮) যদি বালকেরা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বৃত্তিসকলকে স্ব স্ব বিষয়ে চালনা করে তবে নীচুই বৃত্তিসকল তেজস্বী হয়।
- (৯) বিকাশ বিষয়ে বৃত্তিসকলের পরস্পর সাপেক্ষতা আছে।
- (১০) বৃত্তিসকলের বিকাশার্থ মনুষ্যের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। যে সময় বৃত্তি বিকশিত হইতে আরম্ভ করে সেই সময় হইতেই তাহার চালনা বিষয়ে সহায়তা আবশ্যিক। (গ্লোপাল শাবু)।

জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কাযে তৎপরতা, চিন্তে ধর্মাত্মতা এবং স্ববসে রসিকতা এই সকল হইলে তবে মানসিক সর্বোচ্চ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্বোচ্চ পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ এবং সর্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই। (বন্ধিম)

শিশুশিক্ষার স্বাভাবিক প্রণালী ।—পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামতি হাববার্ট স্পেন্সার শিশুশিক্ষার যে স্বাভাবিক প্রণালী নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাই নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে :—

১। বস্তু মাত্রেরই বুদ্ধির যে নিয়ম আছে সেই অনুসারে বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া উচিত । বুদ্ধির সাধারণ নিয়ম এই যে বস্তু মাত্রেরই ক্রমে সরল অবস্থা হইতে জটিল অবস্থায় পরিণত হয় ।

পরীরুদ্ধিতে ইহা আমরা বেশ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি । ইন্দ্রিয়াদি বিহীন ক্ষুদ্র দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গযুক্ত বৃহৎ জটিল দেহে পরিণত হয় । বুদ্ধিবৃদ্ধিরও রীতি এই প্রকার । এক সামান্য বুদ্ধি হইতে ক্রমে ক্রমে নানা বিষয়িনী বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে । সুতরাং বুদ্ধির এই ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয় । যেকোন অল্প অগ্নিতে মাত্রাধিক কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে তাহা নির্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ উদয়োন্মুখী ধী শক্তির প্রথম উত্তমেই যুগপৎ নানা বিষয় চাপাইয়া দিলে সহজেই তাহা প্রতিভাশূন্য হইয়া যায় । অতএব সর্বদা সাবধান থাকা আবশ্যক যে, শিশুরা যাহা গ্রহণ করিতে পারে তদপেক্ষা যেন অধিক শিক্ষা দেওয়া না হয় ।

২। ধী-শক্তি উদয়ের দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, কতিপয় বৃত্তি প্রথমতঃ অন্তর্গূঢ় ভাবে থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে উদ্ভিত ও লক্ষিত হয় । বিজ্ঞাচর্চা ও জ্ঞানোপদেশ তদনুসারে হওয়াই বিধেয় । মস্তিষ্কের প্রকৃতি এই যে, উহা জ্ঞাত মাত্র পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় না । অগ্ৰাণু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত মস্তিষ্কের বৃদ্ধি হয় ।, অতএব সর্বতোন্মুখী বুদ্ধি একদাই উৎপন্ন হয় না । সুতরাং কোন বিষয়ে বোধ জন্মিবার সময় এক উত্তমেই তাহার নিগূঢ়তত্ত্বগ্রহ হওয়া অসম্ভাবিত । প্রথমে সামান্যাকারে জ্ঞান জন্মে, অনন্তর সর্বিশেষ মর্ম উপলব্ধি হইতে থাকে । যে শিশুর দৃষ্টি আলোক ও অন্ধকারের ভেদ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারে কি না সন্দেহ, সেই আবার পরে দৃষ্টিমাত্র নানাবিধ

বর্ণের তারতম্য জ্ঞানে সক্ষম হয় । অতএব শিক্ষার সময় প্রথমতঃ দূরবগাহ শৃঙ্গ নিয়ম সকল মনোনিীত না করিয়া স্থূল স্থূল বিষয় শিথিতে দেওয়া উচিত ।

৩। নানা পদার্থের কি নানা বিষয়ের একবিধ ভাব ও গুণানুসারে তাহারা যে এক শ্রেণী-নিবিষ্ট হইতে পারে, তাহা বয়সের পরিণতি না হইলে বুঝিতে পারা দুর্ঘট । কোমারকালে বালকগণ গুণ অবগত হইয়া দ্রব্যাদির শ্রেণী নির্দেশ করিতে সমর্থ হয় না । সুতরাং অল্পবয়সে শূত্রাদি শিক্ষা দেওয়া অবৈধ । প্রথমে নানা পদার্থ পরীক্ষা করিয়া তাহার গুণ অবগত করান আবশ্যক । অনন্তর বয়োবৃদ্ধি হইলে, তাহারা যে শূত্রানুসারে শ্রেণী বিশেষের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে, তৎসমুদায় উপদেশ দেওয়া উচিত । অল্প বয়সে শূত্রশিক্ষার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি না করিলে, অনেক স্থলে শূত্রোপদেশের আবশ্যকতাই হয় না । শিশুরা স্বয়ংই শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা করিতে করিতে, বিনা উপদেশে শ্রেণী নির্দেশ করিতে পারে ।

৪। মনুষ্যজাতি আদিম অসভ্যাবস্থা হইতে বর্তমান সভ্যাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত যে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইয়া তদনুসারে শিক্ষাপ্রণালী স্থির করা কর্তব্য । যখন পূর্বতন পুরুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাভাবিক গুণসমূহ অধস্তন পুরুষে বর্তে, তখন যে যে পথ অবলম্বনপূর্বক মানবজাতি কোমারকাল অতিক্রম করিয়া বর্তমান দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, বালকেরাও তত্তৎ পথের পথিক হইলেই অবশ্যই জ্ঞানসম্পন্ন হইবে । আদিম অবস্থায় মনুষ্যজাতি সকল বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন । পরে ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ষ, উপমিতি ও গবেষণা প্রভৃতির দ্বারা এই বর্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছেন । বালকেরাও যে সেই প্রণালী অনুসারে প্রত্যক্ষ, উপমিতি ও গবেষণা প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞানসঞ্চয় করিবে তাহাতে সন্দেহ কি ? সুতরাং মানবজাতির উন্নতি বিষয়ক ইতিবৃত্ত জানিয়া, শিশুদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রণালী নির্ধারণ করা উচিত ।

৫। উত্তমরূপে ইতিবৃত্ত জ্ঞাত হইয়া প্রণালী স্থির করিতে হইলে অবধারিত হইবে যে, অগ্রে কোন ব্যবস্থাপন শৃঙ্খলাবলীসারে উপদেশ না দিয়া অব্যবস্থিতভাবে সামান্যাকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত। মনুষ্যজাতি কোন বিষয়ক বিজ্ঞানশাস্ত্র জানিবার পূর্বে, তত্ত্ববিষয়ক শিল্প অবগত হন। ক্রমে সেই শিল্পের চর্চা হইতে হইতে বিজ্ঞান আরম্ভ হয়। তুল্যমান-বিজ্ঞান প্রকাশিত হওয়ার বহু পূর্বে ঢেঁকী ও দাঁড়ি পাল্লার ব্যবহার হইত। রসায়ন শাস্ত্র প্রচারের পূর্বেই লোকে বস্তুরঞ্জন ও রঞ্জন করিতে পারিত। ফলতঃ কিছুকাল বিশৃঙ্খলভাবে ও অব্যবস্থিতরূপে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, তত্ত্ববিষয়ের প্রকৃত নিয়ম প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত কোন বিষয় শিখাইতে হইলে অগ্রে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধিৎসা জন্মাইতে এবং স্থূল স্থূল বৃত্তান্তের উপদেশ দিতে হইবে।

৬। শিশুগণ যাহাতে স্বয়ং শিখিতে চেষ্টা করে তাহার উপায় করা কর্তব্য। উপদেশ যত অল্প হয় ততই ভাল। যাহাতে শিশু স্বীয় যত্নে জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনুসন্ধান করে, কি জিজ্ঞাসা করিয়া লয়, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উপদেশ ব্যতীত শিশুরা কিছুই শিখিতে পারে না, এই ধারণা ভুল। পাঠশালার শিক্ষিত বিষয় ব্যতীত সহস্র সহস্র ব্যাপার বাহিরে স্বয়ং শিখিয়া থাকে এবং স্বীয় যত্নে সুশিক্ষিত বালকেরা অন্ত্র যন্ত্রোপদিষ্টদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হয়। বারম্বার ‘পড় পড়’ বলিয়া যে তাড়না করিতে হয়, তাহা শিশুদিগের দোষ নহে, আমাদের অদূরদর্শিতার ফল। তাহাদিগের বাসনার বিরোধী হইলে ও কেবল আমাদের মনোনীত বিষয়গুলি অধ্যয়ন করাইতে গেলেই ঐরূপ অমনোযোগিতা জন্মিবে। স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করিলে এই অযত্ন ও অমনোযোগিতা কখনই প্রাপ্তভূত হয় না।

৭। শিক্ষাপ্রণালী উত্তম হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিতে হইলে, শিক্ষাদান কালে যে প্রণালী অনুসরণ করা হইয়াছে বা যে সকল

বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শিশুর মনে আনন্দ জন্মিয়াছে কি. না তাহাই লক্ষ্য করিতে হইবে। যদি তাহাতে তাহার আনন্দ না হইয়া থাকে তবে সে বিষয় বা প্রণালী অপকারী। ইহা পরিত্যাগ করিয়া শিশুর হৃদয়গ্রাহিণী অন্য কোন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা যতই বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হই না কেন, স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ করিয়া অনৈসর্গিক মার্গে ধাবিত হইলে কদাচ অভীষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হইব না। বালকেরা বস্তুতঃ অলস নহে। প্রকৃতিগত কোন দোষ না থাকিলে, কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারে না এবং নূতন নূতন বিষয় অবগত না হইয়া ক্ষান্ত থাকে না। অতএব এই স্বাভাবিক ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া জ্ঞানোপদেশ দেওয়াই সর্বতোভাবে বিধেয়। বালকগণের শক্তিসাধ্য বিষয় শিক্ষা দিলে আনন্দ ভিন্ন কখনই ক্লেশ হয় না। (যহু বাবুর “শিক্ষা-বিচার” হইতে গৃহীত)।

মৌখিক শিক্ষাদানের বিশেষ ধারা।—মৌখিক শিক্ষা দানের নিমিত্ত সাধারণতঃ চারিটী ধারা অবলম্বিত হইয়া থাকে; যথা :—

(১)	আদানের ধারা (প্রশ্নোত্তর)	এই ধারা প্রকাণ্ডের সাক্ষাতিক চিত্র—	?
(২)	প্রদানের ধারা (বর্ণনাত্মক)	”	”
(৩)	পূরণের ধারা (সম্পূরণ)	”	”
(৪)	তুলনের ধারা (উপমিতি)	”	”

(১) শিক্ষার যে ধারানুসারে আমরা বালকগণের নিকট হইতে তাহাদিগের স্বেপার্জিত জ্ঞানের ফলফল আদায় করিয়া তাহাদিগকে অধিকতর জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকি, তাহাকে ‘আদানের ধারা’ বলে।

(২) শিক্ষার যে ধারানুসারে নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে যাহা যাহা জ্ঞাতবা, সে সমুদায় বিষয়ই আমরা বালকগণকে বলিয়া দিয়া (প্রদান করিয়া) শিক্ষাদান করি, তাহাকেই “প্রদানের ধারা” বলে।

শিক্ষাকার্য্যে এই দুইটী ধারাই যথেষ্ট পরিমাণে অনুমৃত হইয়া থাকে, কেবল বালকগণের বয়স অনুসারে মাত্রার কম বেশী করিতে হয়। নিম্ন শ্রেণীতে খুব কম বলিয়া দিতে হইবে, কিন্তু অধিক পরিমাণে আদায় করিতে হইবে। বালক যতই উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবে, আদানের ভাগ কমাইয়া প্রদানের ভাগ বাড়াইতে হইবে। অনেক শিক্ষক কেবল বক্তৃতা করিয়াই শিক্ষার কার্য্য শেষ করেন। কিন্তু কেবল বলিয়া দেওয়া বা বক্তৃতা করাকেই প্রকৃত পাঠনা বলে না। বালকগণকে সঙ্গে করিয়া জ্ঞানোত্তানে লইয়া যাও, কোন্ ফলগুলি ভাল আর কোন্গুলি মন্দ— বলিয়া দাও, কিন্তু সেই ফলগুলি তুমি নিজে পাড়িয়া দিও না আর বালকগণের উপকারার্থে সেইগুলি তুমি নিজে খাইয়া ও জীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে কেবল জীর্ণাবশিষ্ট খাইতে দিও না। ‘আদান’ অপেক্ষা ‘প্রদান’ সহজ। ‘প্রদানে’ বালকের বয়স ও পূর্ব জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে যাহা ধারণা করিতে পারে ও মনে রাখিতে পারে তাহাকে সেইরূপ ও সেই পরিমাণ বিষয় বলিয়া দিতে হইবে। আদানের প্রণালী অপেক্ষাকৃত কঠিন বটে, কিন্তু ইহাতে যেরূপ শিক্ষাদান হইয়া থাকে অল্প কোন প্রণালীতে তাহা হয় না। এ বিষয় বিশদীকরণার্থ দুইটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :—

(ক) মনে কর, কোন বালক “বেণী বড় ছুঁট বালক” এই লাইন পড়িতে যাইয়া “বেণী বড়” পর্য্যন্ত পড়িয়াই থামিয়া গেল। ‘ছুঁট’ কথা পড়িতে পারিল না। যে শিক্ষক বলিয়া দেওয়ার প্রথানুসরণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ছুঁট শব্দটী বলিয়া দিলেন। বালক তাহার অনুকরণ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে শিক্ষক আদায় করিবার প্রথানুযায়ী শিক্ষা দেন, তিনি প্রথমে বালককে ‘ছু’ পড়িতে বলিলেন। ‘দ’ এ হ্রস্ব উকার দিলে যে তাহার আকৃতির সামান্য পরিবর্তন হয়, তাহা সে জানে কি না তাহা এইরূপে পরীক্ষা করিলেন। তার পর ‘ট’

কি কি অক্ষরযুক্ত, তাহাও তাহার নিকট হইতে আদায় করিলেন। হয় ত বোর্ডে ‘কষ্ট’, ‘নষ্ট’ প্রভৃতি দুই একটী কথা লিখিয়া দিয়া তাহাকে পড়িতে বলিলেন। একপ করিয়া যিনি শিখাইলেন, তাঁহাব বালক ‘দুষ্ট’ কি তদ্রূপ অল্প কোন শব্দ পড়িতে আর কষ্ট বোধ করিবে না।

(খ) কেমন করিয়া মেঘ হয়, তাহা বুঝাইতে হইবে। আঁঙনের উপরে জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া শিক্ষক বুঝাইতেছেন যে আঁঙনের তাপে জল ক্রমাগত বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইতেছে ও পাত্রের জল কমিয়া যাইতেছে। এখন যিনি দ্বিতীয় প্রথার সেবক, তিনি ইহার পরেই বলিয়া দিলেন যে এইরূপে সূর্য্যের তাপে নদী, হ্রদ, সমুদ্র হইতে জল বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়া মেঘ হয়। কিন্তু যিনি প্রথম প্রথার সেবক, তিনি বালকের নিকট হইতে আদায় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আঁঙনের যেকপ তাপ আছে সেকপ তাপ আব কোন জিনিষের আছে? একখানি থালায় জল রাখিয়া অনেকক্ষণ রোদ্রে রাখিলে থালার জল সমান থাকে, কি কম বেশী হয়? কম হইবার কারণ কি? তবে নদী, হ্রদ ও সমুদ্রের উপর সূর্য্যতাপ কিরূপ কাজ করে? ইত্যাদি নানারূপ প্রশ্ন করিয়া করিয়া সূর্য্যতাপে যে সমুদ্রাদির জল বাষ্পে পরিণত হয় ইহা আদায় করিয়া লইবেন। ‘আদান’ বলিলে কতকগুলি উদ্দেশ্যবিহীন অসংলগ্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা মাত্র, একথা যেন কেহ না বুঝেন। অসংলগ্ন ও উদ্দেশ্য প্রতিপাদক প্রশ্ন করিতে বিশেষরূপ চিন্তা করিতে হয়। কাজ তত সহজসাধ্য নয়। তবে অভ্যাসের নিকট সকলই সহজ হইয়া থাকে।

প্রশ্নের লক্ষণ।—প্রশ্ন করিবার কৌশল শিক্ষা করিতে হয়। উত্তম প্রশ্নই মৌখিক শিক্ষা দানের প্রাণ। পণ্ডিতগণ উত্তম প্রশ্নের নিম্নলিখিত নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন :—

১। প্রশ্ন সবল এবং সহজ বোধগম্য হওয়া আবশ্যিক।

(ক) সহজভাষায় ও অল্প কথায় প্রশ্ন গঠন করিবে। “কে বলিতে

পারে, কেমন বুদ্ধি জানা যাবে” ইত্যাদি বাজে কথায় প্রশ্ন দীর্ঘ করিবে না ।

(খ) পুস্তকের কথা ব্যবহার না করিয়া, নিজের কথায় প্রশ্ন রচনা করিবে । পুস্তকের কথা ব্যবহার করিলে বালকেরাও পুস্তকেই ভাষায় উত্তর দিতে চেষ্টা করিবে । তাহাদের নিজের চিন্তা ও বচনশক্তির আলোচনা হইবে না ।

(গ) একপ বিশদভাবে প্রশ্ন করিবে যে, সেই প্রশ্নেই যেন একটী মাত্র উত্তরই সম্ভবপর হয় । “ভারতবর্ষের উত্তরে কি ?” শিক্ষকের মনের ভাব, বালক “হিমালয়” বলে ; কিন্তু তিব্বত বা গঙ্গা বলিলে দোষ কি ? পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে কি হইয়াছিল ? এ প্রশ্নের বহু প্রকার উত্তর হইতে পারে ।

(ঘ) বালক যেরূপ প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ সেইরূপ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিবে । “গঙ্গার দৈর্ঘ্য কত ?”—একপ প্রশ্নেই উত্তর (পূর্বে জানা থাকিলে পৃথক কথা) বালকেরা আন্দাজেও ঠিক করিতে পারে না ।

২ । প্রশ্নের উত্তরে যেন চিন্তাশক্তির অনুশীলন আবশ্যক হয় ।

(ক) আন্দাজে একটা বা তা উত্তর দেওয়া অনেক বালকের অভ্যাস আছে । এরূপ অভ্যাসেই কখনই প্রশ্ন দিবে না ।

(খ) “হ্যাঁ, না”—একপ এক কথায় যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, সেইরূপ প্রশ্নের সংখ্যা খুব কম হওয়াই বাঞ্ছনীয় । তবে সময় সময় এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আবশ্যকতা হইয়া থাকে, যাহার উত্তর এক কথাতেই দিতে হয় ; যথা—ইতিহাসের তারিখ, ভূগোলের কোন নাম, ব্যাকরণের কোন শব্দরূপ ।

৩ । প্রশ্নের গঠনপ্রণালী এক রকম না হওয়াই উচিত । “কারসিয়ং কোথায়, জব্বলপুর কোথায়, শিলচর কোথায়” এরূপ একঘেয়ে ‘কোথায়, কোথায়’ প্রশ্নে বালকের মনোযোগ নষ্ট হইয়া যায় ।

৪ । বিষয়ের অংশানুসারে প্রশ্নগুলি শৃঙ্খলের গ্রন্থির মত পর পর

সজ্জিত হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ প্রথম প্রশ্নের উত্তরের সহিত যেন দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর যুক্ত হইতে পারে, দ্বিতীয়ের সহিত তৃতীয় ইত্যাদি। আর প্রশ্নের উত্তরগুলি একত্র করিলে যেন বিষয়টির প্রধান প্রধান অংশগুলি শৃঙ্খলাক্রমে পাওয়া যায়।

৫। পাদপূরণার্থ যে সকল প্রশ্ন করা হয়, তাহাতে শিক্ষক প্রশ্নের বাক্য আরম্ভ করিয়া তাহার অংশ মাত্র উল্লেখ করেন; অবশিষ্টাংশ বালক পূর্ণ করে। যথা, “রামচন্দ্র চৌদ বৎসরের জন্ম—?” তারপর বালকেরা পূরণ করিল “বনে গেলেন”। একরূপ প্রশ্ন ও উত্তর নিম্ন শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু তাই বলিয়া সকল সময়ে নয়। উচ্চ শ্রেণীতে একরূপ প্রশ্নের ব্যবহার সম্ভব নহে। (একরূপ প্রশ্নোত্তরকেই পূরণের ধারা বলে।)

প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ?—(ক) পুনরালোচনা, (খ) পরীক্ষা, (গ) শিক্ষাদান।

(ক) পুনরালোচনার দ্বারা বালকের স্মৃতিশক্তির সাহায্য করা হয়। যত আলোচনা করা যায়, ততই সে বিষয়টি মনোমধ্যে দৃঢ়তর ভাবে আঁকিত হইয়া থাকে। এইজন্য কোন বিষয় বালকের মনে থাকিলেও তাহাকে সে বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। আলোচনা না থাকিলে ভুলিয়া যাইবে। প্রতিদিন পাঠের শেষে পুনরালোচনার রীতি আছে। (পাঠনার নোটের পরিচ্ছেদ দেখ)।

(খ) পরীক্ষার নিমিত্ত প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য—বালকের উপার্জিত জ্ঞানের পরিমাণ নির্দেশ করা অর্থাৎ কতদূর নিখিয়াছে তাহাই জানা। অধীত বিষয় সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা জন্মিয়াছে কি না তাহা জানা। অধীত বিষয়েরও কোন অংশ তাহার অজ্ঞাত আছে কি না তাহা জানা।

(গ) শিক্ষাদানের নিমিত্ত যে প্রশ্ন করা হয়, তাহা দ্বারা বালকের চিন্তাশক্তির পরিচালনা হয়, আর প্রশ্নের উত্তর দিতে অভ্যাস করিলে, মনের

ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায় । কারণ এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমে তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে, পরে উত্তরটি শুছাইয়া নিজের ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে ।

সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত মহাত্মা সক্রেটিস কেবল প্রশ্নের দ্বারা শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেন বলিয়া ইহার নাম কেহ কেহ সক্রেটিক প্রথা ও বলিয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, এই প্রণালীকে ‘সক্রেটিক প্রথা’ বলা সম্ভব নহে । কারণ সক্রেটিস প্রথমতঃ পরিণতবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন যুবকদিগকে শিক্ষা দিতেন । আর দ্বিতীয়তঃ শিষ্যগণের মনের ভ্রান্তি প্রদর্শন করাই তাঁহার শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল । কিন্তু শিশুশিক্ষায় সেরূপ ভ্রান্তি প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য নহে । শিক্ষক যে বিষয় বালককে বুঝাইয়া দিবেন মনে করিয়াছেন, সুকৌশলসম্পন্ন ধারাবাহিক প্রশ্ন করিয়া বালকের নিকট হইতে তাহাই আদায় করিবেন, এই মাত্র কথা । এ প্রথাকে ‘কথোপকথনের প্রথা’ বলাই যুক্তিযুক্ত । মনে কর, বালক বলিল “৪ আর ৭এ ১২” । বালককে একবার ৪টা গুঁটী গণিয়া যাইতে বল ; তারপর ৭টা । শেষে ৪টা আর ৭টা গুঁটী একত্র করিয়া গণিতে বল । নিজের ভুল নিজেই বুঝিবে । এখানে ভ্রান্তি প্রদর্শিত হইল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সক্রেটিসের সেই দার্শনিক প্রথানুযায়ী প্রশ্নাদির সঙ্গে এই শিশুশিক্ষার সামান্য ব্যাপার যুক্ত করা সম্ভব নয় । নিম্নে কথোপকথন প্রণালীসম্মত শিক্ষার একটা দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :—

শিক্ষক । তোমরা কল্পতরুর কথা শুনেছ ?

ছাত্র । শুনেছি, এক রকম গাছ ; সে গাছে যে ফল চাওয়া যায়, তাই নাকি পাওয়া যায় ।

শি । আচ্ছা, এমন গাছের একটা চারা পেতে ইচ্ছা করে না ?

ছা । ইচ্ছা ত করে ।

শি । তা চেষ্টা করিলেই ত পাওয়া যায় ।

ছা। তাও কি পাওয়া যায় ? ও একটা বাজে কথা ?

শি। তবে কি তুমি ও গাছের কথা বিশ্বাস কর না ?

ছা। এ কথাও কি কেউ বিশ্বাস করে ? ও একটা মনগড়া কথা।

শি। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি। কল্পতরু কোথায় জন্মে, জান ?

ছা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) উঁহ !

শি। নন্দনকাননে জন্মে ; আমার একটা এই গাছ আছে।

ছা। (অবিশ্বাসের ভাবে) আপনি বলেন কি ?

শি। বাস্তবিক কথা। (পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া) এই টাকাটা সে গাছের ফল।

ছা। (খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) আপনি কি ঠিক কথা বলছেন ?

শি। ঠিক কথা বই কি, তা না হ'লে এ টাকাটা পেলাম কোথায় ?

ছা। ও ত আপনার টাকা।

শি। ঠিক কথা। আমি ত চুরি করে আনি নাই—তবে আমি পেলাম কোথায় ?

ছা। আপনি ত স্কুলে কাজ করার জন্য টাকা পান—সেই টাকা।

শি। তুমি স্কুলে কাজ কর না কেন—তা হইলে তুমিও ত টাকা পাবে।

ছা। আমি যে পারি না।

শি। কেন পার না ?

ছা। আমি আপনার মত অত লেখা পড়া জানি না।

শি। তাহে কি ?

ছা। আপনি অনেক জানেন বলিয়াই ত আপনাকে টাকা দেয়।

শি। ঠিক ত তাই ? তা হ'লে আমার বিদ্যাই কি টাকা জন্মায় ?

ছা। এক রকম তাই বই কি।

শি। কি ?—তা হ'লে কি 'ভগ্নাংশ' ও 'মর্কনাগ' টাকার মা ?

ছা। (হাসিয়া) সেই রকমই বটে।

শি। আচ্ছা, তোমরা এখানে কি কাজে এসেছ ?

ছা। আমরা শিখতে এসেছি।

শি। কি ফল লাভ হবে ?

ছা। বিদ্যা ফল লাভ হবে।

শি । আচ্ছা, যখন আমরা আম পাড়তে হ'লে আম গাছে উঠি, তখন কি বিজ্ঞাপেতে হ'লে বিজ্ঞার গাছে উঠতে হবে ?

ছা । (একটু চিন্তা করিয়া) এক রকম তাই বই কি ।

শি । আমাদের আদত কথা ভুলে গেছি,—কল্লতরু কোথায় জন্মে ?

ছা । আপনি বলেছেন, নন্দনকাননে ।

শি । আর আমি যে সে গাছে চড়েছিলাম তাও ত বলেছি ।

ছা । উ'হু ! তবে কি সেটা বিজ্ঞার গাছ ?

শি । তা না হ'লে, আমার টাকা এল কেমন করে ?

ছা । আপনার বিজ্ঞা আছে ব'লে ।

শি । আচ্ছা, কল্লতরুতে বা চাওয়া যায় তাই যদি পাওয়া যায়, তবে ত টাকাও পাওয়া যায় ?

ছা । যদি তেমন গাছ থাকে তবে তাতে টাকা পাওয়া যায় বই কি ।

শি । আমি সেই গাছ থেকেই এই টাকা পেয়েছি ।

ছা । আপনি বিজ্ঞার গাছে পেয়েছেন ।

শি । তবে বিজ্ঞার গাছও বা, কল্লতরু গাছও তাই, কেমন ?

ছা । যখন ছুই গাছেই টাকা ফলে, তখন ছুইই এক গাছ বটে ।

শি । আর কল্লতরু কোথায় জন্মে, মনে আছে ?

ছা । (হাসিয়া) নন্দনকাননে ।

শি । সে নন্দনকানন কই ?

ছা । (প্রফুল্ল চিত্তে) এই স্কুল ।

(পিং মাহেবের অনুকরণে)

বুদ্ধিমান যুবকের শিক্ষার্থে সক্রৈটিক প্রথা অবলম্বন করা যাইতে পারে । বঙ্কিম বাবুর “অনুশীলন তত্ত্ব” কতকটা সক্রৈটিক প্রথাতে রচিত । নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল । উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্য কেবল সক্রৈটিক প্রণালীই প্রদর্শন করা নহে । ইহাতে “প্রাকৃত ধর্ম কাহাকে বলে,” এ প্রশ্নেরও একটা উত্তর পাওয়া যাইবে । আর দরিদ্র শিক্ষকগণ দরিদ্রতার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া মনকে একটু প্রবোধ দিতে পারিবে ।

গুরু । বাচস্পতি মহাশয়ের সংবাদ কি ? তাঁহার গীড়া সারিয়াছে ?

শি । তিনি ত কামী গেলেন ।

গু । কবে আসিবেন ?

শি । আর আসিবেন না, দেশত্যাগী হইলেন ।

গু । কেন ?

শি । কি সুখে আর থাকিবেন ?

গু । দুঃখ কি ?

শি । সবই দুঃখ—দুঃখের বাক্য কি ? আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি ধর্মোই সুখ । কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় পরম ধার্মিক, ইহা সর্ববাদিসম্মত । আর তাঁহার মত দুঃখীও যে কেহ নাই, ইহাও সর্ববাদিসম্মত ।

গু । হয় তাঁহার দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্মিক নন ।

শি । তাঁহার কোন দুঃখ নাই ? সে কি কথা ? তিনি চিরদুঃখী ; আর চলে না । তার পর কঠিন রোগে ক্লিষ্ট । আবার গৃহদাহ হইয়া গেল । আবার দুঃখ কাহাকে বলে ?

গু । তবে তিনি ধার্মিক নন ।

শি । সে কি ? আপনি কি বলেন যে এই দারিদ্র্য, গৃহদাহ, রোগ, সকলই কি অধর্মের ফল ?

গু । তাই বলি ।

শি । পূর্ব জন্মের ?

গু । পূর্ব জন্মের কথায় কাজ কি ? এই জন্মেই অধর্মের ফল ।

শি । আপনি কি মানেন যে এজন্মে আমি অধর্ম করিয়াছি বলিয়াই আমার রোগ হয় ?

গু । আমিও মানি, তুমিও মান । তুমি কি জান না যে হিম লাগাইলে সর্দি হয়, কি গুরু ভোজন করিলে অজীর্ণ হয় ?

শি । হিম লাগান কি অধর্ম ?

গু । অথ ধর্মের মত নারীরিক একটা ধর্ম আছে । হিম লাগান তাহার বিরোধী, এই জন্মে হিম লাগান অধর্ম । * * *

শি । তাহা না হয় হইল, বাচস্পতির এই দারিদ্র্য ও রোগ কোন অধর্মের ফল ?

শু । দারিদ্র্য ছুঃখটা আগে ভাল কবিয়া বুঝা যাউক । ছুঃখটা কি ?

শি । খাইতে পার না ।

শু । বাচস্পতির সে কষ্ট হয় নাই ইহা নিশ্চিত, কারণ বাচস্পতি খাইতে না পাইলে এত দিনে মরিয়া যাইত ।

শি । মনে করুন, ২ পরিবারে মোটা চালের ভাত আর কাঁচা কলা ভাতে খায় ।

শু । তাহা যদি শরীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে ছুঃখ বটে ; কিন্তু উহা যদি শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না খাইলে ছুঃখ বোধ করা ধার্মিকের লক্ষণ নহে, পেটুকের লক্ষণ । পেটুক অধার্মিক ।

শি । ছেঁড়া কাপড় পরে ।

শু । বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ হইলেই ধার্মিকের পক্ষে যথেষ্ট । শীতকালে শীত নিবারণও চাই, তাহা মোটা কম্বলেও হয় । তাহা বাচস্পতির জুটে না কি ?

শি । জুটিতে পারে কিন্তু তাহার আপনারা জল তুলে, বানন মাজে, ঘর কাঁট দেয় ।

শু । শারীরিক পবিত্রম ঈশ্বরের নিয়ম । যে তাহাতে অনিচ্ছুক, সে অধার্মিক । আমি এমন বলিতেছি না যে, ধনে কোন প্রয়োজন নাই, অথবা যে ধনোপার্জনে যত্নবান সে অধার্মিক । বরং যে সমাজে থাকিয়া ধনোপার্জনে যথাবিহিত যত্ন না করে, সে অধার্মিক । আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সচরাচর যাহারা আপনাদিগকে দারিদ্র্যপীড়িত মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষা ও কুসামনা—অর্থাৎ অধর্মের সংস্কার, তাহাদের কষ্টের কারণ ।

শি । পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই যাহার পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ ছুঃখ ?

শু । অনেক—কোটি কোটি । যাহারা শরীর রক্ষার জন্য অন্ন বস্ত্র পায় না, আশ্রয় পায় না, তাহারা যথার্থ দরিদ্র । তাহাদের দারিদ্র্য ছুঃখ বটে ।

শি । এ দারিদ্র্য কি তাহাদের এই জন্মকৃত অধর্মের ভোগ ?

শু । অবশ্য ।

শি । কোন্ অধর্মের ভোগ দারিদ্র্য ?

শু । যাহা ধনোপার্জনে উপযোগী, অথবা গ্রামাচ্ছাদন আশ্রয়াদির উপযোগী, তাহা সংগ্রহের উপযোগী আমাদিগের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে । যাহারা তাহার সম্যক অনুশীলন করে নাই বা সম্যকরূপে পরিচালনা করে না, তাহারা ই দরিদ্র ।

শি । তবে বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির

অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম। তাহার অভাব অধর্ম। (বহুসত্তীর সংস্করণ, বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাবলী পৃঃ ৪৫৫)।

বাচস্পতি যে আধার্মিক ইহাই প্রতিপন্ন করা গুরু উদ্দেশ্য ছিল। এবং একান্তরূপে শিষ্টের দ্বারা তাহা সিদ্ধান্ত করাইয়া লইনেন।

উত্তরের লক্ষণ।—কেবল উত্তম প্রশ্নের লক্ষণ জানিলেই চলিবে না, উত্তম উত্তরেরও লক্ষণ জানা চাই। বালক নিজের চিন্তা-শক্তির পরিচালনা করিয়া যে উত্তর দেয়, তাহাই উত্তম উত্তর। কিন্তু প্রশ্ন উত্তম না হইলে উত্তম উত্তর আশা করা বৃথা। উত্তর গ্রহণে নিয়মিত বিষয়-গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক :—

(ক) নিরুত্তর।—তুমি বালককে প্রশ্ন করিলে, কিন্তু সে কোন উত্তর করিল না। কোন উত্তর দিলে না? হয় সে শ্রেণীর উপযুক্ত নয়, বা সে প্রশ্ন বুঝিতে পারে নাই, নয় যে দিন সে বিষয় শিখান হইয়াছিল সে দিন সে বিছালয়ে আসে নাই, বা সে অমনোযোগী। এই সকল কিন্তু শিক্ষকের দোষে ঘটে। নিরুত্তরের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে শিখাইবার ব্যবস্থা করিবে।

(খ) ভুল উত্তর।—এক বিষয়গত ভুল, আর ভাষাগত ভুল—যেদুপাই হউক তাহা শুদ্ধ করিয়া দিবে। অজ্ঞতাপ্রযুক্ত অশুদ্ধ উত্তর দিলে ছেলেকে তিরস্কার করিবে না। বালকের ভুল বুঝাইয়া দিবে। যদি বালকের একরূপ বিশ্বাস হয় যে, উত্তর ভুল হইলে শিক্ষক ঠাট্টা বা তিরস্কার করিবেন, তবে ভুল কেন, সে শুদ্ধ উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিবে।

(গ) আংশিক উত্তর।—যখন উত্তর আংশিক শুদ্ধ হইয়াছে দেখিবে, অথবা যখন ভাষা অভাবে উত্তর সরল করিতে পারিতেছে না দেখিবে, তখন সে প্রশ্ন পরিত্যাগপূর্বক অগ্রান্ত প্রশ্ন দ্বারা তাহার অশুদ্ধ অংশ সংশোধনের চেষ্টা করিবে। পরে আবার পূর্ব প্রশ্নের উত্তর

উত্থাপন করিবে । উত্তর ভুল হইলেই “তোমার হ’ল না, আর একজন বল” এরূপ করায় শিক্ষকের দুর্বলতা প্রকাশ পায় । বালক যেটুকু শুদ্ধ করিয়া বলিয়াছে, তাহাতেই তাহাকে উৎসাহিত করিয়া অশুদ্ধ অংশের ভুল সংশোধন করিয়া দিবে ।

(ঘ) শুদ্ধ উত্তর ।—ঠিক উত্তর দিলে বালককে উৎসাহিত করিবার জন্য ‘বেশ, ঠিক কথা, হাঁ, ইত্যাদি উৎসাহসূচক বাক্য ব্যবহার করায় বেশ উপকার হইয়া থাকে । তবে সকল সময় এইরূপ ‘বাঃ বেশ’ না বলিয়াও কেবল চক্ষু দ্বারাও উৎসাহিত করা যায় । শ্রেণীর সকল বালকই যখন জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম বুঝিতে পারিবে, তখন সেই প্রশ্ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে ।

(ঙ) নির্বোধের মত উত্তর ।—‘চিন্তা’ কি পদ ? উত্তর—বিশেষণ, পণ্ডিত মহাশয় । দ্বিতীয় বালক (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) ক্রিয়াপদ, পণ্ডিত মহাশয় । তৃতীয় বালক, গোম্পদ ইত্যাদি । ‘কোন্ খুঁটাকে আকবরের জন্ম হয় ?’ উত্তর—‘১৫৪৩ সনে, যখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র’ । এরূপ উত্তর দেওয়ার কারণ কি ? যদি বালক আন্দাজী উত্তর দিয়া থাকে, অথবা শয়তানী করিয়াই বলিয়া থাকে, তবে সেই অনাবিষ্ট বালককে বিশেষ করিয়া শাসন করিবে । আর যদি ‘পদ,’ ‘খুঁটাক’ প্রভৃতি কথার অর্থ না জানার দরুণ এরূপ উত্তর দিয়া থাকে, কি কোন ইতিহাসের প্রণোক্তর মুখস্থ করিতে গিয়া গোলমাল করিয়া থাকে, তবে তাহার বিধান করিবে ।

(চ) পূর্ণ বাক্যে উত্তর ।—ইহাই সাধারণ রীতি । ‘দ্বীপ’ কাহাকে বলে ? “চতুর্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত স্থলভাগকে”—এরূপ উত্তর উত্তম নহে । “চতুর্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত স্থলভাগকে দ্বীপ বলে”—ইহাই পূর্ণ উত্তর । নদী ক্রমশঃ মুখের দিকে প্রশস্ত হয় কেন ? “কারণ অত্যাশ্রয় নদী ইহার সহিত গমনপথে মিলিত হয়”—এরূপ উত্তর

ঠিক নহে । “নদী ক্রমশঃ মুখের দিকে প্রশস্ত হইয়া থাকে, কারণ ইহার গমনপথে অন্যান্য নদী আসিয়া মিলিত হয়”—এইরূপ উত্তরই উত্তম ।

তবে শিবাজীর জন্ম তারিখ বল, ভারতবর্ষের রাজধানীর নাম কব, একটা বিশেষ্য পদের উল্লেখ কব, সাধু শব্দের জ্ঞীলিঙ্গে কি হয় বল, ইত্যাদি রূপ প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণ বাক্যেব বিশেষ প্রয়োজন নাই ।

(ছ) উত্তর সুসঙ্গত হওয়া আবশ্যক ।—‘কেরানী বাবু তাড়াতাড়ি লিখিয়াছেন । “তাড়াতাড়ি” কি পদ ? বিশেষণ পদ । এখানে ‘ক্রিয়ার বিশেষণ’ বলাই অধিকতর সঙ্গত উত্তর । আকবরের ধর্মমত উল্লেখ কর । ইহার উত্তরে বালক আবন্ত করিল, “আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র” ইত্যাদি বলিয়া শেষে ধর্মমতের উল্লেখ কবিল । এরূপ উত্তরে কি অসঙ্গত দোষ হইল, তাহা বালককে বুঝাইয়া দিয়া, উত্তরের কোন্ অংশ বলিতে হইবে নিখাইয়া দিবে ।

তুলনের ধারা (বা সাদৃশ্য পদ্ধতি বা উপমিতি) ।—জ্ঞাত পদার্থের সহিত তুলনা করিয়া আমরা অজ্ঞাত পদার্থের বিষয় অবগত হই । বিড়ালেব গুণাগুণ জানিয়া আমরা ব্যাঘ্রের গুণাগুণ নির্ধারণ করি । ছবি দেখিয়াও আমরা অনেক দ্রব্যের আকার অবগত হই—কারণ ছবি বস্তুর সাদৃশ্য । অনেক জিনিষ মনে রাখিবাব জন্য আমরা এই প্রথা অবলম্বন করি ; যথা, ভারতবর্ষ ত্রিভুজের সদৃশ, ইটালী বুটজুতার সদৃশ, আসামের মানচিত্র বেঙের সদৃশ । ‘৯ কার যেন ডিগ্বাজী খায়’ ।—এইরূপে অনেক কথার প্রথম অক্ষর মনে রাখিবার কৌশল করিয়া আমরা এই সাদৃশ্যপ্রথা অবলম্বন করি । রামধনুর রঙগুলি পর পর কিরূপ ভাবে সাজান থাকে তাহা মনে রাখিবার জন্য “বেণী আসহ কলা” (অর্থ, বেণী আসিয়া কলা খাও)—এই বাক্য আমরা মনে রাখি । ইহাতে ‘বেণী’

প্রভৃতি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সদৃশ স্বরযুক্ত শব্দগুলি আমাদের মনে আসিয়া পড়ে । যথা—

বে=বেগুণে Violet নী=নীল Indigo. আ=আসমানী Blue. ম=সবুজ Green হ=হলুদ Yellow ক=কমলা Orange. ল=লাল Red

বোডে'বে আমরা চিত্রাদি অঙ্কিত করি তাহা এই সাদৃশ্য প্রথার দৃষ্টান্ত । “একটা চোখ দুইটা কাণের সমান” ইহা পরীক্ষিত সত্য । চোখের দ্বারাই আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্যজ্ঞান লাভ করি । আগাছ কলাগাছ, দূরশব্দ নিকটশব্দ, কোমল কঠিন, স্নগন্ধ দুর্গন্ধ, কটু কষায় প্রভৃতি সাদৃশ্যজ্ঞান সাপেক্ষ । বিসদৃশ করিয়া দেখাইতেও এই প্রথানুযায়ী কার্য্য হয় । হিমালয় পর্বত ৫ মাইল উচ্চ ; বঙ্গোপসাগরের গভীরতা ২৥ মাইল । হিমালয়কে বঙ্গোপসাগরে ডুবাইয়া দিলেও হিমালয়ের মাথা জলের উপরে থাকিবে । কিংডারগার্টেন ও পদার্থ-পরিচয় শিক্ষায় এই প্রথা যথেষ্ট পরিমাণ অনুসৃত হইয়া থাকে । ইহাও প্রকারান্তরে “জ্ঞাত পদার্থের সহিত অজ্ঞাতের তুলনা ।”

ইহারই আবার প্রকারভেদে ‘বিশ্লেষণ’ ও ‘সংশ্লেষণ’ নামে দুই প্রথা আছে । কাপড়ের বিষয় বুঝাইতে গিয়া যখন আমরা তাঁতি, মাকু, নলি, তাঁত, সূতা, তুলা, প্রভৃতির উল্লেখ করি, তখন বিশ্লেষণ প্রথা (অর্থাৎ কাপড় ছিন্ন করিয়া তাহার পরীক্ষা) অবলম্বন করি । কিন্তু যখন কাপড়ের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া,—তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া তাঁত দ্বারা কাপড় বয়ন হয়—এইরূপ বুঝাই, তখন সংশ্লেষণ প্রথা (অর্থাৎ সংযোগ করা) অবলম্বন করি । ইহাও প্রকারান্তরে আরোহী ও অবরোহী প্রথা (১০৮ পৃঃ দেখ) ।

জ্ঞানোপার্জনের ক্রম ।—(১) আমাদের চিত্ত সর্বদাই নব নব জ্ঞান লাভের জন্য উন্মুখ । (২) এই উন্মুখীভূতি লইয়া আমরা নূতন জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি । (৩) পরে এই

সমস্ত নূতন জ্ঞান তুলনা করিয়া বিচার করি। (৪) এইরূপ বিচার করিয়া একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। (৫) শেষে এই সিদ্ধান্তের সত্য কার্য্য বিশেষে প্রয়োগ করিয়া জ্ঞান লাভের উপকারিতা উপলব্ধি করি। জ্ঞানোপার্জনের এই ক্রম দৃষ্টে পণ্ডিতগণ শিক্ষাদানের যে “অষ্ট বিধান” নির্দেশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইল :—

১। বিচার।—কোন বিষয়ে প্রবেশ করিতে হইলেই বিচার আবশ্যিক। পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা বিচারকার্য্যের সহায়তা হয়। আবোহী অবরোহী প্রণালী ও সংশ্লেষণ বিশ্লেষণের প্রথা বিচারের অঙ্গস্বরূপ।

সুপ্রসিদ্ধ হক্‌সলী সাহেব বিচারের নিম্নলিখিত প্রণালী নির্ধারণ করিয়াছেন :—

(১) কার্য্যকারণ পর্য্যবেক্ষণ করা। (পরীক্ষণও এক প্রকার পর্য্যবেক্ষণ।)

(২) সমধর্ম্মাক্রান্ত দ্রব্যসমূহকে এক শ্রেণীভুক্ত করা।

(৩) এক শ্রেণীভুক্ত বস্তুকে সমধর্ম্মাক্রান্ত অনুমান করা।

(৪) আর আবাদিগের এইরূপ অনুমান সত্য কি না, তাহা প্রমাণ করিয়া নির্ধারণ করা। Huxley—Lay Sermons.

২। অন্তর্বোধ। জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্য ভিন্ন অজ্ঞাত বিষয়ের অন্তর্বোধ জন্মিতে পারে না। এইরূপ বর্তমান ভিন্ন ভূত ভবিষ্যৎ, সরল ভিন্ন জটিল ও সহজের সাহায্য ভিন্ন কঠিন বিষয় বুঝিতে পারা যায় না। বালককে ‘ম্যামথ’ বুঝাইবার সময় যদি বলা যায় যে ‘ম্যামথ’ ম্যাস্টোডনের মত জীব, তবে বালকের কোনরূপ অন্তর্বোধ হইবে না। কিন্তু যদি পরিচিত হস্তীর সহিত তুলনা করিয়া ম্যামথের বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করা যায়, তবে বালকের একটা ধারণা হইতে পারে।

যখন অজ্ঞ ব্যক্তিকে জ্ঞানবান করিতে হইলে, অজ্ঞাত বিষয়াদি জ্ঞাত বিষয়াদির সাহায্য ব্যতীত তাহাকে বুঝাইতে পারা যায় না, তখন

জ্ঞানদান বিষয়ে আমাদের দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য :—

(১) সেই অজ্ঞাত বিষয় আর (২) যাহাকে সেই বিষয়ক জ্ঞান দান করিতে হইবে, তাহার তৎতুল্য বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিমাণ । যেমন বিদেশী ভাষার অপরিচিত কথাগুলি আমরা আমাদের পবিচিত দেশী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝিয়া থাকি, সেইরূপ অপরিচিত বিষয়কেও পরিচিত বিষয়ে অনুবাদ করিয়া তাহার মর্ম গ্রহণ করি । সুতরাং বালকের জ্ঞানের সীমা ও তাহার পরিচিত বিষয়ের পরিমাণ শিক্ষকের নিতান্তই জানা আবশ্যক ; কারণ তাহা না হইলে শিক্ষক হয় ত এক অজ্ঞাত বিষয় বুঝাইতে গিয়া অথ অজ্ঞাত বিষয়ের অবতারণা করিয়া বসিবেন । যে প্রথাতে এক শব্দের অর্থ বোধের নিমিত্ত অথ আর একটা প্রতিশব্দ মাত্র দিয়া শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে, তাহাকে প্রকৃত শিক্ষানামে অভিহিত করা যায় না—অথ যে কোন নামে ইচ্ছা অভিহিত করিতে পার। (Dr. W. T. Harris—Philosophy of Education.)

৩। উদ্দেশ্য ।—একটা নির্দিষ্ট ও সুখকর উদ্দেশ্য সম্মুখে ধরিয়া শিক্ষাদান করিতে হইবে । আর বালকগণকেও সেই উদ্দেশ্যের আভাস প্রদান করিতে হইবে ।

শেষে কি হইবে, ইহা না জানিলে, বালক তাহার সমস্ত সামর্থ্য নিয়োগ করিতে পারিবে না । যদি শেষ ফলের আভাস পায়, তবে সে তদনুরূপ সামর্থ্য প্রয়োগ করিতে যত্ন করিবে । অপরিচিত স্থানে, অজ্ঞাত রাস্তা দিয়া বালককে লইয়া যাইতেছ—তাহা হাতে ধরিয়া •কোন প্রকৃত স্থানেই হউক বা প্রশ্ন করিয়া কোন কল্পিত বিষয়েই হউক ; সেই স্থান বা বিষয়ের কথা তাহাকে না বলিয়া দিলে সে কিছুতেই আগ্রহ হইতে ইচ্ছা করিবে না । তুমি জোর করিয়া গন্তব্য পথে লইয়া যাইতে পার কিন্তু সে সেখানে গিয়াই দিশেহারা হইয়া পড়িবে । কোন্ রাস্তায়

আসিয়াছে, তাহা আর সে তখন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিবে না। কার্যের ফলের সহিত তাহার পরিশ্রমের যে কি সম্বন্ধ, তাহাও সে পরিমাণ করিতে পারিবে না। কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করিয়া কার্য করিলে, সেই লক্ষ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত যে আনন্দ ও উৎসাহ হয়, এই অনির্দিষ্ট ব্যাপারে তাহার সেরূপ কোন সুখোদয়ও হইবে না। Dr. Rein—Theoric and Praxis.)

৪। আত্মনির্ভর।—বালকগণ নিজের চেষ্টায় যত শিক্ষা করিতে পারে, ততই ভাল। আত্মনির্ভরের শক্তি বৃদ্ধিতেই ইন্দ্রিয়াদির পূর্ণবিকাশ সম্ভব। আর এই ইন্দ্রিয়াদির সম্যক বিকাশেই মনুষ্যত্ব।

শিক্ষাকার্য্যে বালকের মনে আত্মাবলম্বনের ভাব পূর্ণমাত্রায় প্রদীপিত করিয়া দিতে হইবে। বালকগণ যাহাতে স্বয়ং সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিয়া সাধারণ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে পারে, সে বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। তাহাদিগকে সম্ভবমত কম কথা বলিয়া দিতে হইবে; কিন্তু যাহাতে তাহারা স্বয়ং জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, সে বিষয়ে বিশেষরূপ উৎসাহিত করিতে হইবে। মনুষ্য সমাজ নিজে নিজের শিক্ষাগুরু হইয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। সুফল লাভ করিতে হইলে সমাজের প্রত্যেক লোককেই সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। স্বয়ং সিদ্ধ মহাপুরুষেরা সকল কার্য্যই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। (H. Spencer, Education)

৫। পরিগ্রহ বা পরিবীক্ষণ।—আমরা একটা একটা ভাব পরিগ্রহ বা সংগ্রহ করি, আর সেই সমস্ত ভাব একত্র করিয়া অন্তরমধ্যে পরিবীক্ষণ বা প চিন্তা করি। ইহাতেই আমরা শৃঙ্খলাক্রমে একটা বিষয়ের সমস্ত দৃশ্য করিতে সমর্থ হই।

ও পরিবীক্ষণ যেন মানসিক নিশ্বাস প্রশ্বাস—বাহিরে বেরত নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতেছে, মনোমধ্যে সেইরূপ

পরিগ্রহ ও পরিবীক্ষণের কার্য চালাইতে হইবে। ভাবগুলিকে একটী একটী করিয়া সুস্পষ্টরূপে মনোগধ্যে উপলব্ধি করাকেই পরিগ্রহ কহে, আর সেই সকল ভাব সংগ্রহ করিয়া শৃঙ্খলাক্রমে চিন্তা করাকেই পরিবীক্ষণ কহে। বালকগণের এই দুই বৃত্তির অক্লান্তীলনে যত সাহায্য করিবে, তত সফল পাইবে। (Herbart—Paedagogische Schriften.)

৬। কার্য্যাত্মিক বৃত্তি।—আমরা যাহা চিন্তা করি, কি কল্পনা করি, তাহা যদি আমরা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারি, তবে সেই চিন্তা ও কল্পনার বিষয়ের প্রকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে কাষ্ঠখণ্ড, কাগজ, মৃত্তিকাদির দ্বারা গঠনের এত ব্যবস্থা এই জন্ত। বালক ঘরের বিষয় চিন্তা করিল, আর তখনই কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা ঘর নির্মাণ করিল। চিন্তাতে তাহার যে ভ্রম বা ত্রুটি ছিল, কার্য্যে প্রয়োগ করিলে সে ভ্রম ও ত্রুটি সারিয়া গেল। এই জন্ত বালকের কার্য্যাত্মিক বৃত্তিকে সর্বদা জাগরিত রাখা আবশ্যক।

অনেক শিক্ষক ও পিতা মাতা বালকগণের কার্য্যাত্মিক বৃত্তিকে বৃথা চাঞ্চল্য মনে করিয়া, বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। যে বৃত্তিকে প্রধান অবলম্বন করিয়া বালককে শিক্ষা দান করিতে হইবে, যে বৃত্তির ক্রমবৃদ্ধির জন্ত যত্ন করিতে হইবে, সেই বৃত্তির উচ্ছেদ-সাধনে চেষ্টা, কি ভীষণ ভুল। (Froebel—The Education of Man.)

৭। অনুরাগ।—অনুরাগ ভিন্ন কোন বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। আবার স্বার্থের সংশ্রব ভিন্ন অনুরাগ জন্মে না।

বালকদিগকে কোন কিছু শিক্ষা করাইয়া সেই বিষয়টী জানিবার প্রয়োজন বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ বুঝাইয়া দিলে পাঠ গ্রহণে সমধিক অনুরাগ হয় এবং নিশ্চয়প্রয়োজনীয় কর্ম্মে সময়োপাত্তি করা অনুচিত বোধ হইয়া থাকে। যাহাতে আপনার বা অন্নের উপকার দর্শে, এমনত সকল বিষয়েতেই কি শিশু, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, মনুষ্য

মাত্রেরই বিশিষ্ট মনোযোগ হইয়া থাকে। (ভূদেব—শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব।)

৮। অনুবন্ধ।—শিক্ষার বিষয়সমূহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট না হইলে এবং অতি বিশদরূপে তাহা বুঝাইয়া না দিলে বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করে না। নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত শিক্ষার বিষয়গুলি কিরূপে সংশ্লিষ্ট, ইহা বুঝিতে পারিলে, তবে সেই বিষয়গুলির প্রতি আমাদিগেব অনুরাগ জন্মিতে পারে। অতএব শিক্ষার বিষয়গুলিকে জালের সূত্রের মত একটীর সহিত অল্পটীকে গ্রহি দ্বারা যুক্ত করিতে হইবে। বিষয়গুলিকে পরস্পর যুক্ত করিতে হইবে ও সেই সমস্তকে বালকের প্রকৃতির সহিত একেবারে মিশাইয়া দিতে হইবে। বিষয়ই আমাদিগের লক্ষ্য—বিষয়ই শিখাইতে হইবে, শব্দ নয়। (Pestalozzi)

এ সকল ছাড়া শিক্ষার আরও বহু বিধান আছে। তবে এই কয়টি বিধান যে বিশেষ আবশ্যকীয় ও সর্ববাদীসম্মত, তাহাতে আর ভুল নাই। এই আট বিধানকে প্রথম পথপ্রদর্শক মনে করিয়া শিক্ষক শিক্ষাকার্য্যে ত্রুতী হইবেন।

শিক্ষাদানের উপকরণাদির ব্যবহার।—শিক্ষাদানের উপকরণের মধ্যে ব্ল্যাকবোর্ডের মত আবশ্যক দ্রব্য আর কিছুই নহে। ব্ল্যাকবোর্ড ব্যতীত সুশিক্ষাদান অসম্ভব। ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিত বিষয় বা অঙ্কিত চিত্রাদি বালকদিগের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সহায়তা করে। চক্ষুতে যাহা দেখে, তাহাই মনোমধ্যে বিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

পাঠনা কালে কঠিন শব্দ, জ্যামিতির চিত্র, মানচিত্র প্রভৃতি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়াই শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্ল্যাকবোর্ডে ভিন্ন অঙ্ক শিখাইবার উপায় নাই। ব্যাকরণ, রচনা, ভূগোলশিক্ষা দানেও ব্ল্যাকবোর্ডের আবশ্যক। পাঠনার সারাংশ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া না দিলে চলে না। কোন প্রয়োজনীয় নিয়ম, সিদ্ধান্ত বা অনুমানের প্রতি বিশেষভাবে

বালকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে হইলে, ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে । দুইটী দ্রব্য তুলনা করিতে হইলে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া বা চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিলে যেমন সুবিধা হয়, আর কিছুতেই তেমন হয় না । পদার্থ-পরিচয় ও বিজ্ঞান পাঠনায় বোর্ডেই অর্ধেক কাজ করিতে হয় । ব্ল্যাক বোর্ডের উপর লিখিবার সময় উত্তম অক্ষরে পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে । পাঠনার সঙ্গে সঙ্গেই আবশ্যকীয় বিবরণ (সংক্ষেপে), কঠিন শব্দ, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ব্ল্যাকবোর্ডে একপভাবে লিখিয়া যাইতে হইবে যেন পাঠনার শেষে বোর্ডে পাঠের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় ।

বালকগণের দ্বারাও বোর্ডে অনেক সময় লিখাইতে হয় । কোন অক্ষ কঠিন বোধ হইলে, বালকের দ্বারা বোর্ডে সেই অক্ষ কসাইতে হইবে । তাহা হইলে কোথায় তাহার ভ্রুটি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে । বালকের দ্বারা বোর্ডে মানচিত্র এবং চিত্রাদি অঙ্কন করানও বিশেষ আবশ্যক ।

যাঁহারা চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পটু নহেন তাঁহারা পূর্বেই (যদি সুবিধা থাকে) বোর্ডে আবশ্যকীয় চিত্র অঙ্কন করিয়া রাখিবেন । কিন্তু শিক্ষক পাঠনার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল চিত্র বা মানচিত্র অঙ্কিত করেন তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট । বালকেরা চিত্রের প্রত্যেক অংশ অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করে । পূর্বাঙ্কিত চিত্রের সমস্ত অংশগুলি এক সঙ্গে সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে অংশগুলি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিবার সুবিধা হয় না । তাহা হইলেও সুরঞ্জিত মুদ্রিত চিত্র* অপেক্ষা এরূপ পূর্বাঙ্কিত চিত্র অধিকতর ফলপ্রদ ।

চিত্র বা মানচিত্রের দাগগুলি একটু মোটা করিয়া না দিলে দূরের বালকেরা ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে না । আর বোর্ডখানিও এমন স্থানে রাখিতে হইবে যে, সকল বালক যেন স্থানে বসিয়াই বোর্ডে লিখিত

বিবরণ অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। বোর্ডের উপর বাহিরের আলো পড়িলে দেখার অসুবিধা হয়।

ভূগোল ইতিহাসের পাঠদানকালে মানচিত্র, পদার্থ-পরিচয় শিক্ষায় বস্তু বা তাহার কোন প্রতিকৃতি এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় যন্ত্রাদির ব্যবহার নিতান্তই কর্তব্য। এ সম্বন্ধে ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থ-পরিচয় ও বিজ্ঞানের পরিচ্ছেদে বিশেষ করিয়া লিখিত হইল।

শ্রেণী পাঠনা।—পূর্বে সংস্কৃত শিক্ষার প্রথায় বিশেষ কোন শ্রেণী ভাগের ব্যবস্থা ছিল না। এখনও টোলে কোন শ্রেণী নাই। যে, যে পরিমাণ পারে, সে সেই পরিমাণ অভ্যাস করে। যতগুলি শিক্ষার্থী, ততগুলি শ্রেণী। এই প্রথাতে বালকগণ নিজ নিজ শক্তি অনুসারে অল্প কি অধিক সময়ে পাঠ সমাপন করিয়া থাকে। প্রমোদন পাইল না বলিয়া কাহাকেও তাড়াইয়া দিতে হয় না। সকলেই শিক্ষা লাভ করে, তবে কেহ অল্প সময়ে, কেহ অধিক সময়ে। বর্তমান (ইউরোপীয়) প্রণালী অনুসারে এক সঙ্গে অনেক ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে। সুবিধার মধ্যে এই যে, এই প্রথায় অল্প সময়ে অনেক ছাত্রকে পড়ান যায়, আর ছাত্রেরাও প্রতিযোগিতায় উন্নতি করিতে বিশেষ যত্ন করে। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এতদূর শিক্ষা করিতে হইবে, ইহা মনে থাকে বলিয়া, সময়ের সদ্যবহার করিতে শিক্ষা করে। আর অসুবিধা এই যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন বালকগণকে এক সঙ্গে মিথাইতে গিয়া উভয়েরই কিছু অনিষ্ট করা হয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বাণীক শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি করিতে পারে না, কারণ তাহাকে সকলের সঙ্গে চলিতে হয়। আর স্থূলবুদ্ধি বালকও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বালককে অনুসরণ করিতে পারে না; হয় ত তাহাকে শেষে স্কুল পরিত্যাগ করিতে হয়। কেবল মাঝারী ছেলেদের কোন অসুবিধা হয় না। আমরাদিগের সাবেক প্রথাতেও দোষ আছে, বর্তমান প্রথাতেও দোষ

আছে । তবে বর্তমান প্রথাকে উন্নত করিবার জন্য পণ্ডিতগণ চেষ্টা করিতেছেন ।

ডাল্টন প্রথা ।—মিস্ হেলেন পার্কহাউস নামিকা একটি আমেরিকান বিদ্বানী ব্যক্তি ও সমষ্টি শিক্ষার একটি মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়াছেন । তাঁহার এই প্রথা ডাল্টন প্রথা নামে এখন সুপরিচিত । বর্তমান যুগ স্বাধীনতার যুগ । ধর্মমতে, সামাজিক আচার ব্যবহারে, রাজনৈতিক বিচারে সকলেই এখন স্বাধীনতা চাহিতেছে । কিন্তু এই স্বাধীনতা পাইতে হইলে প্রথমে বিদ্যালয়ের নিয়মে পরিবর্তন আবশ্যিক । আমরা বিদ্যালয়ে একপাশে কঠোর শাসনে বালকবালিকাগণকে নিয়মের অধীন করিয়া রাখি যে, তাহাতে তাহাদিগের হৃদয়ে স্বাধীনতার স্বাভাবিক ভাবটি বিনষ্ট হইয়া যায় । সর্বত্র স্বাধীনতা পাইতে হইলে, বিদ্যালয় হইতে উহা কাব্য আরম্ভ করিতে হইবে । ক্রমবিলম্বের প্রণালী এই কার্যের প্রথম পথ প্রদর্শক কিন্তু তাঁহার শৃঙ্খলা ও নিয়মগুলিও বালকবালিকাগণকে প্রচুর স্বাধীনতা দেয় নাই । মন্টেনসরী প্রথাতে এই স্বাধীনতার মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে । বর্তমান ডাল্টন প্রথার প্রধান উদ্দেশ্যই বালকবালিকাগণকে শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান । এই প্রথার একটু আভাস প্রদত্ত হইতেছে ।

শিক্ষকগণ প্রত্যেক শ্রেণীপাঠ্য বিষয়ের একটা বাৎসরিক পরিমাণ নির্দেশ করিয়া তাহাকে মাস হিসাবে ভাগ করিয়া লয় (Scheme of lesson) । প্রত্যেক ছাত্রকে প্রত্যেক মাসে ঐ পরিমাণ কাজ করিতে হইবে । ছাত্রগণ নিজের যোগ্যতানুসারে একমাসে বা তাহার কম কি বেশী সময়ে সেই কার্য সমাধা করে । শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না । ছাত্রগণই শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগের সন্দেহভঞ্জন করিয়া লয় । একটা বিশেষ শ্রেণী নাই । ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ আছে । যথা—ভূগোল শিক্ষার জন্য একটি কক্ষ—তাহাতে ম্যাপ, গ্লোব, ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার প্রভৃতি ভূগোল শিক্ষার আসনাব থাকে । বালকবালিকাগণ এই কক্ষে বসিয়া নিজের চেষ্টায় ভূগোলের বিষয় শিক্ষা করে । শিক্ষক মৃদু মৃদু এই ঘরে আসিয়া থাকেন ও কোন বালকের কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে তাহার সন্ধান করিয়া দেন । এইকপট ইতিহাস, গণিত, সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ । ইহাতে কক্ষ সংখ্যা যে বেশী আবশ্যক হয়, তাহা নহে—কাবণ সকল শ্রেণীর ছাত্রই ঐ এক ভূগোলের কক্ষে বসিয়া নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুশীলন করে । ইহাতে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণ উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের নিকটেও যথেষ্ট সাহায্য পাইয়া থাকে । এই প্রধান গুণ এই যে,

স্বাধীনভাবে কাজ করায় বালকবালিকাগণের স্বাধীনতা বৃদ্ধির স্মরণ হয় । মেধার বিভিন্নতা অনুসারে কোন ছাত্র আগে ও কোন ছাত্র পশ্চাতে চলে—এক সঙ্গে চলিবার যে দোষ, ইহাতে তাহা ঘটে না । জ্ঞান উপার্জনের ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হয় কাবণ স্বাধীনতা সকল কার্যকেই উন্নতির পথে লইয়া চলে ।

এক সঙ্গে অনেক ছাত্র পড়াইতে হইলে রিডা ছাড়া আরও গুণ চাই । ছাত্রগণকে শাসনে রাখিতে হইবে । কিন্তু যাহাতে তাহারা বিনা শাসনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য করে তাহাই করিতে হইবে । শাসনের ভয়েও কার্য করে বটে, কিন্তু শাসন একটু টিলা পড়িলেই বালক আবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করে । আর ক্রমাগত শাসনে শাসনে বালকেরা ঘ্যাচ্ড়াও হইয়া পড়ে ।

“কি করিতে হইবে, বলিয়া দাও । কেমন করিয়া করিতে হইবে, বুঝাইয়া দাও । তার পর বালক তাহা করে কি না, দেখিয়া লও ।”—এই তিনটি ক্ষুদ্র বাক্য শিক্ষাদানের সংক্ষিপ্ত সার ।

সকল বালকের দিকেই দৃষ্টি রাখিবে । ভাল ছেলেকে লইয়াই বাস্তব থাকিবে না । বরং দুর্বল ছেলেটীব দিকেই একটু বেশী দৃষ্টি রাখিবে । পাঠনার সময় সকলেই যেন বুঝিতে পারে যে, সকলের প্রতিই শিক্ষকের সমদৃষ্টি আছে ।

যে বালকটী অধিক দুর্বল, তাহার জন্য একটু স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইতে পারে । সকলের সঙ্গে সমান অঙ্ক না দিয়া তাহাকে একটা সহজ অঙ্ক দাও, সকলকে যে পরিমাণ মুখস্থ করিতে দিবে তাহাকে তার চেয়ে একটু কম দাও । এইরূপে তাহাকেও এক বৎসরে না হউক দুই বৎসরে শ্রেণীর উপযোগী করা যাইতে পারে* ।

অধ্যাপনা বেশ সুখপ্রদ করিতে চেষ্টা করিবে । তাহা হইলেই বালকগণ গোলমাল না করিয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়া শুনিবে ।

পাঠনার সময় বালকগণকে বাহিরে যাইতে না দেওয়াই উচিত । এক শ্রেণীর বালক অন্য শ্রেণীতে স্লেট বা পেন্সিল আনিতে গিয়া

অনেক সময় উৎপাত করে। এরূপ অভ্যাসের প্রায় দেওয়া কর্তব্য নহে। অন্য কোন লোককে পাঠনার সময় শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে দিবে না। একে ছেলের চঞ্চল মন, তাহাতে এরূপ বাধা পাইলে তাহাদের মনঃসংযমের বাধাত ঘটিবে।

পড়াইতে পড়াইতে উঠিয়া যাওয়া বড়াই দোষের বিষয়। যে সকল পুস্তক বা উপকরণের আবশ্যক, তাহা পূর্বেই ঠিক করিয়া রাখা কর্তব্য।

গৃহে পাঠাভ্যাস।—সময়ের স্বল্পতা ও বিষয়ের আধিক্যবশতঃ বালকগণকে সময় সময় বাড়ীতেও পাঠাভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু এরূপ পাঠনির্দেশ করিতে হইলে, বালকগণের বয়স ও গৃহপাঠ বিষয়ের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের বয়স বিবেচনায় তাহাদিগের গৃহে পাঠের নিমিত্ত কোনরূপ বিষয় নির্ধারণ না করাই উচিত। তাহারা যে সামান্য বিষয় পাঠ করে তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে বিদ্যালয়ের ৫ ঘণ্টা সময়ই যথেষ্ট। বাড়ীতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাহারা খেলা করিবে। অপরিশ্রুত মস্তিষ্ক অপরিশ্রুত সঞ্চালনে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত ডিরেক্টার পণ্ডিত স্যর এলফ্রেড ক্রফ্ট সাহেব বয়স হিসাবে বালকগণের পাঠের সময় নির্ধারণ করিয়া এক আদেশ প্রচার করেন। আমার বতদূর মনে হইতেছে, বালকগণের মানসিক পরিশ্রম বিষয়ে তিনি নিম্নলিখিতরূপ সময় নির্দেশ করিয়াছেন :—

৫ হইতে ৭ বৎসর	..	...	...	২ ঘণ্টার অধিক নয়।
৭ হইতে ১০ বৎসর	.	...	..	৩ " "
১০ হইতে ১২ বৎসর	.	.	..	৫ " "
১২ হইতে ১৪ বৎসর	..	.	.	৭ " "
১৪ হইতে ১৭ বৎসর	..	.	..	৯ " "
১৭ হইতে ২১ বৎসর	...	.	...	১১ " "
২১ হইতে ২৫ বৎসর	.	.	.	১২ " "

আমি এই বিষয়ে শিক্ষকগণকে একটি সংক্ষেপ উপদেশ দিয়া থাকি ।
“যত বয়স তাহার অর্ধেক ঘণ্টা”—অর্থাৎ বালকের বয়স ১৪ হইলে
৭ ঘণ্টা, ১৭ হইলে ৮½ ঘণ্টা, ২০ হইলে ১০ ঘণ্টার বেশী পড়িবে না ।

বিদ্যালয়েই সমস্ত বিষয় পড়াইয়া দিতে পারিলে আর বাড়ীতে পাঠের
আদেশ করিবার আবশ্যকতা হয় না । কারসিয়াং ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে
অবস্থানকালে দেখিয়াছি যে অনেক ছাত্র (আমাদিগের মধ্য শ্রেণীর
সমান শ্রেণীভুক্ত) বাড়ীতে পাঠাভ্যাস করে না । যত কিছু পড়াশুনার
কাজ সমস্ত বিদ্যালয়ের ৫ ঘণ্টায় শেষ হয় । এমন কি বালকগণের সাহিত্য
পুস্তক ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকও থাকে না । ব্যাকরণ, ভূগোল, বিজ্ঞান,
জ্যামিতি, পাটীগণিত, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় শিক্ষক মুখে মুখে শিখাইয়া
দেন । তবে এক কথা এই যে, এরূপ বন্দোবস্ত বোর্ডিং স্কুলেই (অর্থাৎ
যেখানে বালকেরা বিদ্যালয়-সংলগ্ন ছাত্রাবাসে থাকে) সম্ভবপর । ডে-স্কুলের
(অর্থাৎ যেখানে বালকেরা নির্দিষ্ট সময়ে আসে এবং ছুটি হইলেই বাড়ী
চলিয়া যায়) কার্য্যে বাড়ীতে কিছু কিছু পড়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইতে
পারে । শিক্ষক বালকগণকে বিদ্যালয়ে কি পরিমাণ শিখাইয়া দিবেন ও
বালকেরা নিজ চেষ্টায় গৃহে কি পরিমাণ পাঠাভ্যাস কারবে, তাহা নিম্নের
চিত্র দৃষ্টে বুঝিতে পারা যাইবে ।

নিম্ন প্রাথমিক	
১	উচ্চ প্রাথমিক
২	মধ্য ইংরাজী
৩	মোট কিউ জে এ
৪	ইন্টারমিডিয়েট
৫	ব্যাচেলর ডিগ্রী
৬	মাস্টার্স ডিগ্রী

১১ চিত্র । বিদ্যালয়ে ও গৃহে পাঠের পরিমাণ ।

গৃহে পাঠের আদেশ করিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক :—

(১) প্রত্যেক বালকের অভিভাবক এরূপ উপযুক্ত নহেন যে বালককে সমস্ত বিষয়ে উপযুক্তরূপ সাহায্য করিতে পারেন । ইহাই মনে রাখিয়া কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে ।

(২) বালকের খেলার সময়ের প্রতি হস্তক্ষেপ করিলে তাহাদিগের স্বাভাবিক বৃত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা হয় । খেলার সময় বাদ রাখিয়া কার্যের হিসাব করিবে ।

(৩) কঠিন বিষয়ে পাঠ দিলে হয় ত বালকেরা অভ্যাস করিবে না, অথবা অন্তের নকল করিয়া আনিবে । সুতরাং সুফল না হইয়া কুফল হইবে । অতএব কঠিন বিষয়ে পাঠ দেওয়া উচিত নহে ।

(৪) বাড়ী হইতে বালকেরা যে সকল কাজ করিয়া আনিবে তাহা শিক্ষক উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবেন, নচেৎ বালকেরা বাড়ীর কাজে উপযুক্তরূপ মনোযোগ করিবে না ।

(৫) বাড়ী হইতে কোন কাজ না করিয়া আসিলে তাহাকে ছুটির পর বিছালয় আবদ্ধ করিয়া সেই কাজ করাইয়া লইবে । মূলতবী পড়িলে বালক আর সারিয়া উঠিতে পারিবে না । যে বালক ছুটির দিনের জন্য কাজ মূলতবী রাখিয়া দেয়, তাহার কাজ কখনও শেষ হয় না ।

একবার কোন এন্ট্রেন্স স্কুলের শিক্ষকগণের পরিচালনার জন্ত গৃহ-পাঠের নিম্নলিখিতরূপ একটা তালিকা করিয়াছিলাম :—

বিষয়	মধ্য বিভাগ		উচ্চ বিভাগ	
	পরিমাণ	সময়	পরিমাণ	সময়
ইং সাহিত্য	১০ লাইন	১ ঘণ্টা	২০	১ ঘণ্টা
ইতিহাস	অর্ধ পৃষ্ঠা	১ ঘণ্টা	১ পৃষ্ঠা	১ ঘণ্টা
ভূগোল	...	১ ঘণ্টা	..	১ ঘণ্টা
ইং, বাং বা সংস্কৃত ব্যাকরণ	...	১ ঘণ্টা	...	১ ঘণ্টা
অঙ্ক, পাটীগণিত, বীজগণিত, পরিমিতি	২ টি	১ ঘণ্টা	৪ টি	১ ঘণ্টা
জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা	১ টি	১ ঘণ্টা	২ টি	১ ঘণ্টা
জ্যামিতির অনুশীলন	১ টি	১ ঘণ্টা	১ টি	১ ঘণ্টা
রচনা	৮।১০ লাইন	১ ঘণ্টা	১২।১৪ লাইন	১ ঘণ্টা
অনুবাদ	৪।৫ লাইন	১ ঘণ্টা	৮।১০ লাইন	১ ঘণ্টা
মানচিত্র	১ খান	১ ঘণ্টা	১ খান	১ ঘণ্টা
ড্রইং	..	১ ঘণ্টা	...	১ ঘণ্টা
সংস্কৃত	...	..	৮।১০ লাইন	১ ঘণ্টা
অনধীত বিষয়	..	১ ঘণ্টা	...	১ ঘণ্টা

বাড়ীতে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ক অধীত পাঠের

পুনরালোচনা করিবে মাত্র । এই তালিকায় সেই পুনরালোচনার সময়ই নির্দিষ্ট হইল । শ্রেণীতে অঙ্ক কিংবা জ্যামিতিশিক্ষা দিবার পূর্বে, আলোচনার জন্য ২।৩টী নুতন (কিন্তু সহজ) অঙ্ক বা একটী অনুশীলন বোর্ডে লিখিয়া দিবে । বাড়ী হইতে বালকেরা এই সকল অঙ্ক বা অনুশীলন কসিয়া আনিবে । রচনা বা অনুবাদ আবশ্যিক মত নুতন কি পুরাতন বিষয়ের নির্দেশ করিতে পার ।

এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে গৃহপাঠের একরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, মধ্য বিভাগের ছাত্রগণকে ২।৩ ঘণ্টা এবং উচ্চ বিভাগের ছাত্রগণকে যেন ৩।৪ ঘণ্টার অধিক বাড়ীতে পড়িতে না হয় । তবে ড্রইং ও রঙ্গের দ্বারা মানচিত্রাদি অঙ্কনে বালকগণ ক্লান্তি বোধ করে না । একরূপ কার্যের সঙ্গে অন্য কার্যের সময় একটু অধিক হইলেও হইতে পারে । বেশী অঙ্ক কসিতে দিলে, কি বেশী পড়া মুখস্থ করিতে দিলে কোন কাজ হয় না । কারণ বালকেরা করে না এবং করিতেও পারে না । আর আপাততঃ জোর করিয়া করাইলে ভবিষ্যতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না । নিম্ন বিভাগের ছাত্রের জন্য বাড়ীতে কোন কার্যের ব্যবস্থা না করাই বাঞ্ছনীয় ।

উপসংহারে দুই একটি গোপনীয় কথা—সকল ব্যবসায়েরই একটা গুণ আছে । শিক্ষকতা কার্যেও দুই একটি গুণ আছে । পাকা শিক্ষকগণকে আর যে সকল গুণের কথা শিখাইতে হয় না । কিন্তু শিক্ষানবিস শিক্ষক ও নুতন শিক্ষকের পক্ষে ব্যবসায়ের দুই একটি গোপনীয় কথা জানিয়া রাখা আবশ্যিক ।

যে দিন প্রথমে স্কুলে যাইবে সে দিন অনেক বিষয়ে সাবধান হইবে । (১) পোশাক পরিচ্ছদ বেশ পরিষ্কার পরিছন্ন ও স্ফুটনসম্পন্ন হইবে,—“আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারী ।” (২) ঠিক ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীতে প্রবেশ করিবে । (৩) বেশ গম্ভীর ভাব ধারণ করিবে, বেশী কথা বলিবে না । (৪) শ্রেণীর পাঠ্যাদির বিষয় পূর্বেই অবগত হইবে ও বিশেষ পরিশ্রম করিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিবে । (৫) শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াই কার্য আরম্ভ করিয়া দিবে । (৬) নুতন শিক্ষক দেখিলে দুই বালকেরা উৎপাত করিতে চেষ্টা করিবে । আবশ্যক হইলে মর্দাপেক্ষা দুই বালকটিকে দু চার বা লাগাইয়াও দিবে ।

(৭) যদি প্রথম দিন বিশেষ ভাবে প্রস্তুত না হইয়া থাক, তবে শ্রেণীতে কখনই উপস্থিত হইবে না। তুমি যে প্রস্তুত হইতে পার না, একথা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে বুঝাইয়া বলিলেই তিনি আর তোমাকে শ্রেণীতে যাইতে বলিবেন না। প্রথম দিনে বালকেরা যদি বুঝিতে পারে যে তুমি সময়নিষ্ঠ, সুপণ্ডিত আর শাসনেও খুব কড়া, তবে তাহাদিগের সেই ধারণা চিরকাল থাকিয়া যাইবে। কিন্তু যদি প্রথম দিনেই তাহারা বুঝিতে পারে যে, তুমি ভাল পড়াইতে পার না এবং ছুট্টাগী করিলে কিছু বল না, তবে তুমি শেষে হাজার পাণ্ডিত্য প্রকাশ কর, কি হাজার শাসন কর, সুফল লাভ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িবে।

উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে প্রত্যাহ নিয়মিত সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবে, ছাত্রগণকে পড়াইবার জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়া আনিবে, শ্রেণীতে উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইয়াই কার্য আরম্ভ করিয়া দিবে। পড়াইবার সময় কখনই বাজে গল্প করিবে না। (তুমি বাজে গল্প আরম্ভ করিলে ছাত্রগণ বেশ আগ্রহের সহিত তাহা শুনিবে বটে, কিন্তু তাহারাই আবার বাহিরে গিয়া বলিবে “পণ্ডিত মহাশয় পড়ান না, কেবল বাজে গল্প করেন”)। নির্দিষ্ট কর্ম নির্দিষ্ট সময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে।

ছাত্রগণের নিকট ভালবাসা লাভ করিতে হইলে, তাহাদিগকে উত্তম রূপে পড়াইতে হইবে, তাহাদিগের অভাব অভিযোগ শুনিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিবে, বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের পরেও তাহাদিগকে পাঠাদিতে সাহায্য করিতে হইবে, তাহাদিগের সহিত মহাশয়বদনে কথাবার্তা বলিবে, অথবা গম্ভীর ভাব বা অকুটী পরিত্যাগ করিবে, তাহাদিগের সঙ্গে খেলা করিতে হইবে, তাহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া বেড়াইতে হইবে, পীড়া হইলে তাহাদিগের খোঁজ লইতে হইবে, সর্বদা ও সকল বিষয়ে তাহাদিগকে নিজের পুত্রস্থানীয় মনে করিতে হইবে।

উপরিস্থ কর্মচারীর নিকট আদর পাইতে হইলে, তোমার নির্দিষ্ট কর্ম নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সুচারুরূপে সমাধা করিয়া, তাঁহার কাছের আর গ্রহণ করিবে। তুমি যতই তোমার উপরিস্থ কর্মচারীর কার্যভার লাঘব করিতে পারিবে, তুমি ততই তাঁহার আদর পাইবে। দলে মিশিয়া কখন তাঁহার নিন্দা করিবে না। ইহাতে কোন লাভ হয় না, বরং এইরূপ নিন্দাবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তোমার অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। একদা দেখা গিয়াছে যে, যাহাদের সহিত মিশিয়া নিন্দাবাদ করা যায়, তাহাদের মধ্যে কেহ এই সকল কথা উপরিস্থ কর্মচারীর কর্ণগোচর করিয়া তাঁহার অসুখপাত্র হইতে চেষ্টা করে। যদি উপরিস্থ

কর্মচারীর বিশেষ কোন দোষ বা ত্রুটি দেখিতে পাও, তবে বিনয়ের সহিত, ন্যায্যভাবে, তাহা কথা তাঁহার গোচর করিতে পার। তাঁহার আদেশের কখনও প্রতিবাদ করিও না। আদেশ অসম্মত হইলেও তাহা আগপথে প্রতিপালন করিতে যত্ন করিবে। যদি সেই আদেশ কায্যে পরিণত করা অসম্ভব দেখ, তবে কিছু দিন পরে সেই সকল সম্মত অস্থাবর তাহার গোচর করিবে ও তোমার পরামর্শ প্রদান করিবে। তিনি যখন তোমার উপর যে কায্যের ভার অর্পণ করিবেন, তাহা উৎসাহের সহিত নির্দিষ্ট সময়ে স্থচর ক্রমে সম্পন্ন করিতে বিশেষ রূপ চেষ্টা করিবে। উপরিস্থ কর্মচারীকে নিজের জ্যেষ্ঠতাতা স্থানীয় মনে করিয়া তাহার সাংসারিক ও পারিবারিক কায্যাদিতেও তোমার সাহায্য দান করিতে কটা করিবে না। কিন্তু তাঁহার সহিত খুব বেশী মেশামিশি করিও না—একটু ব্যবধান রাখিয়াই চলিবে। যদি যে অধিকতর দক্ষতার সহিত তোমার কর্তব্য কাম সম্পাদন করিবার নিমিত্তে যত্নশীল, কায্যের দ্বারা তাহার পরিচয় প্রদান করিবে। বিদ্যালয়কে নিজের গৃহ মনে করিয়া তাহার সাজ-সজ্জা ও সংস্কারে সর্বদা যত্ন করিবে, শিক্ষকগণকে নিজের জ্যেষ্ঠতাতা মনে করিয়া তাহাদিগের সহিত মধুর ব্যবহার করিবে, ছাত্রগণকে পুত্রস্থানীয় মনে করিয়া তাহাদিগকে মনবন্দী আদর করিবে। আর একটি অতি গোপনীয় উপদেশ এই যে, যদি তোমার উপরিস্থ কর্মচারী অপেক্ষা তোমার অধিক বিজ্ঞাবুদ্ধি থাকে তবে তাহা কদাপি তাহার সাফায়ে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিও না।

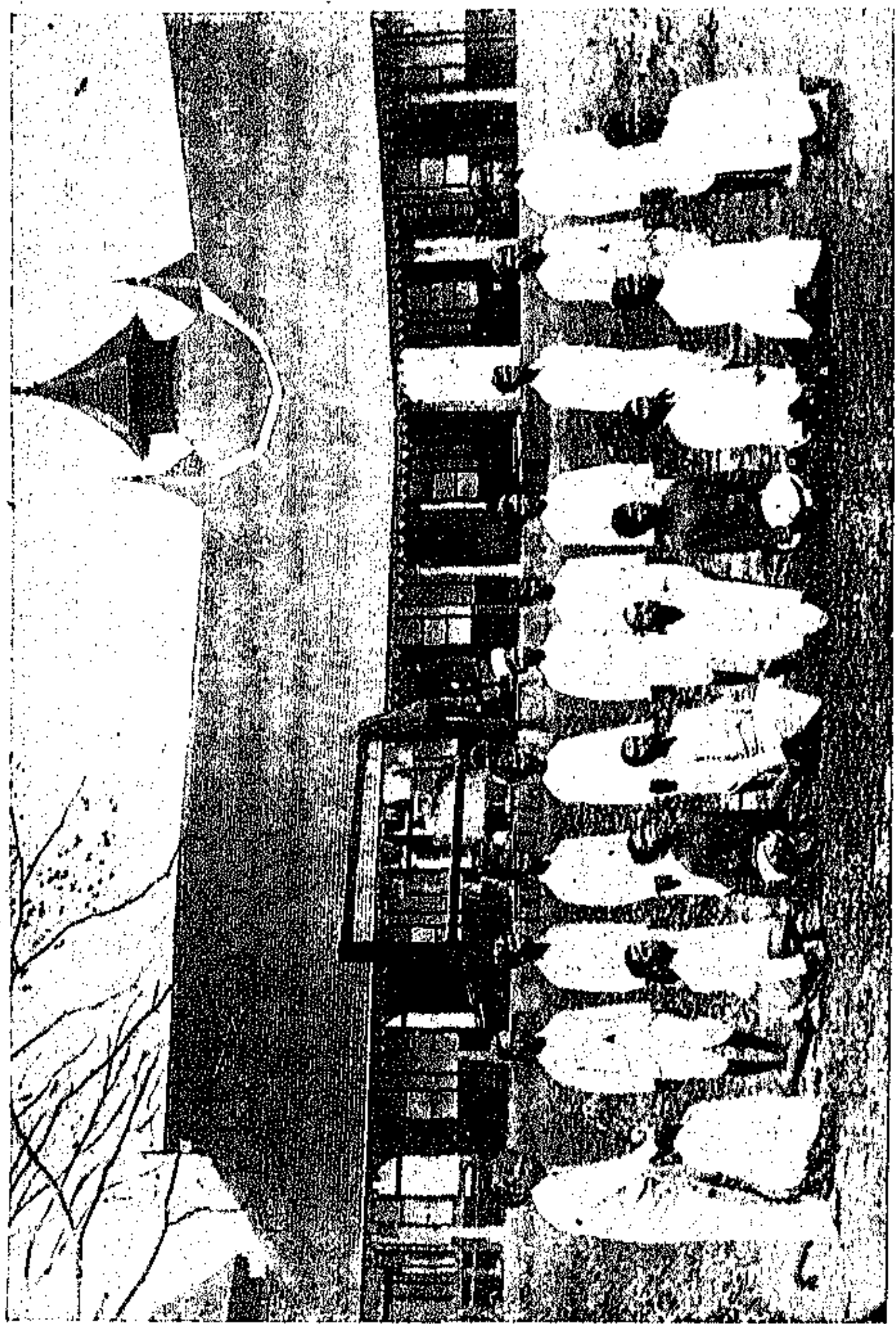
যদি তুমি কোন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হও, তবে এ সকল বিষয় ছাড়া তোমাকে আরও কয়েকটা বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। নিম্নস্থ শিক্ষকগণের সহিত কখনও অজস্র ব্যবহার করিবে না। অলস ও অব্যর্থ শিক্ষকগণের সহিত সময় সময় কঠোর ব্যবহার করা আবশ্যিক হইয়া থাকে বটে, কিন্তু শাসন করিবে, অপমান করিবে না। শিক্ষকগণের সহিত বন্ধুভাবে মিশিবে, তাহাদিগকে খুব বিশ্বাস করিবে, তাহাদিগের আশ্রয় প্রমোদে যোগ দিবে। তুমি কখনও কাহার নিকট তাহাদের নিন্দাবাদ করিবে না, বরং অজ্ঞ কেহ করিলে তাহার প্রতিবাদ করিবে। শিক্ষকগণের সাহায্যে আয় হইয়া পায় সে বিষয়ে যত্ন করিবে, তাহাদিগের পদোন্নতির জন্ত চেষ্টা করিবে। তোমার পারিবারিক সমস্ত অনুরোধে শিক্ষকগণকে নিমন্ত্রণ করিবে। তাহার কথা তাহাদিগের পারদর্শনকেই সীড়িত কি বিপদগ্রস্ত হইলে তুমি যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। তাহাদিগকে কোন আদেশ করিবার পূর্বেই তিনবার চিন্তা করিয়া দেখিবে সেই আদেশ কায্যে পরিণত করা সম্ভবপর কিনা। কোন শিক্ষকের প্রতি (বাহ্যিক ভাবে) অত্যধিক অনুরাগ দেখাইবে না। নিজে কখনও

ও সমরনিষ্ঠ হইয়া শিক্ষকগণকে আদর্শ দেখাইবে । কোন সময় কোন বিষয়ে ভুল করিলে তাহা চাকিতে চেষ্টা না করিয়া সরল মনে স্বীকার করিবে । আর এই কথা সর্বদা মনে রাখিবে যে মধুর ব্যবহারে লোকের নিকট যে পরিমাণ কাব্য আদায় করিতে পারা যায়, কঠোর ব্যবহারে তাহার শতাংশের একাংশও আদায় করা যায় না ।

নবীন শিক্ষকগণকে আর একটি বিষয় সম্বন্ধে সাবধান করা কর্তব্য মনে করিতেছি । কখনও নিজের ছুঃখ বা দারিদ্র্য জানাইয়া কাহারও নিকট কোন পদের প্রার্থী হইও না বা কর্তৃপক্ষের নিকট বেতন বৃদ্ধির আবেদন করিও না । দরিদ্র পোষণেব জন্ত কর্মে নিযুক্ত করা হয় না, বা ছুঃখ ঘিনোচনের জন্ত কাহারও বেতন বৃদ্ধি করা হয় না । কেবল গুণ দেখিয়া কার্যে নিযুক্ত করা হয়, আর কাযা দেখিয়া বেতন বৃদ্ধি করা হয় । দরিদ্র ব্যক্তিকে কেহ আদর বা সম্মান করে না বরং একটু ঘৃণাই করে । সংসারে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই সমাদৃত । তাই বলিয়া কখন নিজ অবস্থার একটা মিথ্যা ভাণ করাও উচিত নহে । নিজের ছুঃখ বা দুঃখের কথা কর্তৃপক্ষের নিকট না বলাই সম্ভব । “এই দরিদ্রকে কার্যে নিযুক্ত করিয়া প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা হয়”—দরখাশ্তে কখনই এইরূপ দীনতা-পূর্ণ বাক্য লিখিবে না । সর্বদা সর্বপ্রকারে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে ।

জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, নিজের কর্তব্য কাযা সুসম্পন্ন করিয়া লোকহিতকর সমস্ত শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করিবে ও সেই সমস্ত কাযা সুসম্পন্ন করিতেও বিশেষ যত্ন করিবে । নিজের শক্তিকে কখনই শুল্ল বলিয়া মনে করিও না । সাহসের সহিত সংসার-সংগ্রামে অগ্রসর হও, অসং দিক্‌দাতা তোমার সহায় ।





শিলাচর নর্মাল স্কুলের পঞ্চাৎ, ভাগ—কসরৎ ভূমিতে হল্পমান ডন।



বিবিধ বিধান।

দ্বিতীয় ভাগ—বিশেষ বিধান।

“Teach things, not words.”—Pestalozzi.

প্রথম প্রকরণ—শরীরপালন বিষয়ক।

১। ব্যায়াম।

“শরীরমাদ্যং থলু ধর্মসাধনম্।”

উপকারিতা।—(১) ব্যায়াম চর্চায় শরীর সবল ও সুঠান হয়। (২) মানসিক চিন্তায় মস্তিষ্কে যে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে, ব্যায়ামাদির অনুশীলনে সেই রক্ত মস্তিষ্ক হইতে শরীরের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। (৩) বক্ষঃস্থল প্রসারিত হওয়াতে হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসের শক্তি বৃদ্ধি হয়। (৪) রোগ, ব্যাধির হস্ত হইতে পরিচোণ পাওয়া যায়। (৫) দৈহিক কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। (৬) মেয়দও সরল ও সবল হওয়াতে শরীরের শ্রী সুন্দর হয়। (৭) মনোরম অন্ততন্ত্রী দ্বারা ভাব প্রকাশের ক্ষমতা জন্মে। (৮) মানসিক পরিশ্রম করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়। (৯) শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। (১০) নৈতিক চরিত্র গঠনের বিশেষ সহায়তা হয়।

প্রাপ্ত বক্ষঃস্থল, ক্ষীণ কটিদেশ, ক্ষীণ পেশীসমূহ কেবল যে দৃঢ়কায় ব্যক্তির লক্ষণ তাহা নহে, এ সমস্ত স্ত্রী-পুরুষের লক্ষণও নটে। স্থূল কটিদেশ, অপ্রাপ্ত বক্ষঃস্থল, অন্ত্রভ্রম মাংসপেশী ও উন্নত উদর কদাকারের লক্ষণ। আমাদের দেশে পুরুষকালে নানাবিধ ব্যায়ামাদির অনুশীলন হইত। তন্মধ্যে নৃত্য সর্বাঙ্গের আনন্দপ্রদ ব্যায়াম ছিল। স্ত্রী নৃত্য লাগু ও পুং নৃত্যকে তাণ্ডব বলিত। এখন পুরুষের নৃত্য নাই, স্ত্রীলোকের নৃত্যও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। নৃত্যে বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত ও পদদ্বয়ে শক্তি বৃদ্ধি হয়। বালকদিগের বিদ্যালয়ে যেকোন ব্যায়ামাদির ব্যবস্থা আছে, বালিকা বিদ্যালয়ে তদ্রূপ কিছু করা আবশ্যিক। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশে বালিকাদিগের ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা আছে। এই কারণে উক্ত দেশসমূহের স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই সবল ও স্ত্রী। অত্যাশ্চর্য বিষয়ের সহিত ব্যায়াম বিষয়ক কিছু জ্ঞানও শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। জর্মন দেশীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জন্য দরখাস্ত করিতে হইলে, দরখাস্তকারীকে অত্যাশ্চর্য গুণেব সহিত, তাহার ব্যায়াম বিষয়ক গুণ ও ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলা বিষয়ক পাবদর্শিতা উল্লেখ করিতে হয়।

ওজন ও উচ্চতা।—যে সকল বিদ্যালয়ে ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা আছে, সেখানে সুবিধা হইলে একটা মানুষ ওজনের যন্ত্র (রেলওয়ে স্টেশনের ওজনের যন্ত্রের মত) ও একটা উচ্চতা মাপের যন্ত্র। ইহা ও তাহার ভাগযুক্ত একখানি লম্বা কাঠখণ্ড—তাহার সহিত লম্বভাবে একখানি সরু কাঠখণ্ড একপভাবে সংলগ্ন যে, এই সরু কাঠখণ্ড ইচ্ছামত উপর নীচে উঠাইতে নামাইতে পারা যায়। বালককে কাঠখণ্ডের নিকট দাঁড় করাইয়া, সেই সরু কাঠখণ্ড তাহার মাথার উপরে রাখিলে, যে চিহ্নের নিকট এই কাঠখণ্ডের গোড়া থাকে, তাহাই বালকের উচ্চতা। রাখা আবশ্যিক। প্রত্যেক তিন মাস অন্তর বালকগণের ওজন ও উচ্চতা নির্ধারণ করিয়া পূর্বের ওজন ও উচ্চতার সহিত তুলনা করিতে হইবে।

যদি ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি না পাইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকার করা আবশ্যিক।

নিম্নলিখিত তালিকায় বালক বালিকাদিগের ক্রম বৃদ্ধির একটা মোটামুটি পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এই ছই তালিকা কারটার ও বটুকত ইংরাজা 'ব্যায়ামাধুশীলন' চইতে
গৃহীত হইল ।

বালকগণের বৃদ্ধির তালিকা ।

(একটা পয়সার ব্যায়াম এক ইঞ্চি ; এক পৌণ্ড প্রায় অন্ধ মের)

বয়স	উচ্চতা (ইঞ্চির হিসাবে)	বার্ষিক উচ্চতা বৃদ্ধি	ওজন (পৌণ্ডের হিসাবে)	বার্ষিক ওজনের বৃদ্ধি
৫	৪১'১৫		৩৭'১১	
৬	৪৩'১৮	২'০৩	৪০'৬৭	২'৫৬
৭	৪৫'১৫	১'৯৭	৪৪'০	৩'৩৩
৮	৪৬'৯২	১'৭	৪৭'১৫	৩'১৫
৯	৪৯'৫২	২'৬	৫১'২	৪'১৪
১০	৫০'৫২	২'০	৫৫'৫	৪'২১
১১	৫২'৮৭	১'৩৫	৬০'১৫	৪'৬৫
১২	৫৪'৪৫	১'৫৮	৬৪'৫২	৪'৩৭
১৩	৫৬'৫৬	২'১১	৭০'০	৫'৪৮
১৪	৫৮'৫৬	২'০	৭৯'৫৭	৮'৫৭
১৫	৬০'৭৭	২'২১	৯১'৪০	১১'৮৩
১৬	৬৩'৪২	২'৬৫	১০৭'৫৬	১৬'৪০
১৭	৬৪'৯৫	১'৫৩	১১৮'০৮	১০'২২
১৮	৬৫'৬৯	১'৭৪	১২৭'২৫	৯'১৭
১৯	৬৬'৩৭	১'৬৮	১৩১'৪৮	৪'২০
২০	৬৬'৮০	১'৪৩	১৩৭'২৮	৫'৮
২১	৬৬'৮৭		১৩৬'২৮	

বালিকাদিগের বুদ্ধির তালিকা ।

বয়স	উচ্চতা (ইঞ্চের হিসাবে)	বাৎসরিক উচ্চতার বৃদ্ধি	ওজন (পৌণ্ডের হিসাবে)	বাৎসরিক ওজনের বৃদ্ধি
৫	৪১'২৯		৩৯'৬৬	
৬	৪৩'৩৫	২'০৬	৪৩'২৮	৩'৬২
৭	৪৫'৫২	২'১৭	৪৭'৪৬	৪'১৮
৮	৪৭'৫৮	১'৭৯	৫২'০৪	৪'৫৮
৯	৪৯'৩৭	১'৯৭	৫৭'০৭	৫'০৩
১০	৫১'৪২	২'০৮	৬২'৩৫	৫'২৮
১১	৫৩'৪২	২'৪৬	৬৮'৮৪	৬'৩৯
১২	৫৫'৮৮	২'২৮	৭৮'৩১	৯'৪৭
১৩	৫৮'১৬	১'৭৮	৮৮'৬৫	১০'৩৪
১৪	৫৯'৯৪	১'১৬	৯৮'৪৩	৯'৭৮
১৫	৬১'১০	৪৯	১০৬'০৮	৭'৬৫
১৬	৬১'৫৯	'৩৩	১১২'০৩	৫'৯৫
১৭	৬১'৯২	'০৩	১১৫'৫৬	৩'৫০
১৮	৬১'৯৫		১১৯'০৬	

ব্যায়ামের বয়স ।—তালিকা লিখিত সংখ্যাগুলি মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে বালকেরা একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত একটু একটু করিয়া বাড়ে, একাদশের পর হইতেই তাহাদের বুদ্ধির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক । ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত এই ভাবে খুব বৃদ্ধি হইয়া, ১৭ হইতে আবার বুদ্ধির পরিমাণ কমিতে থাকে ; ২১ বৎসর পরে আর বড় একটা বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না ।

বালিকাদিগের সম্বন্ধেও সাধারণ বুদ্ধির নিয়ম এইরূপ । তবে বয়সের কিছু তারতম্য আছে । ৯ বৎসর পর্য্যন্ত বুদ্ধি কম মাত্রায় ; তার পর হইতে বুদ্ধির মাত্রা বেশী হইয়া থাকে । ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত এইরূপ অধিক মাত্রায় বুদ্ধি হয় । তার পর আবার অল্প অল্প বুদ্ধি হইয়া ১৮ বৎসরেই শেষ হয় ।

বালক বালিকার স্বাভাবিক শরীর বুদ্ধির বিয়য় শিক্ষা কার্য্যে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক । ৫ হইতে ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিশেষ কোনরূপ ব্যায়ামের ব্যবস্থা না করিলেও চলিতে পারে । কারণ এ সময়ে বাল-স্বভাব-স্বলভ-চাক্ষু্যবশতঃ বালকেরা ছুটাছুটি করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া থাকে । ১২ হইতে ১৬ বৎসর (বালিকার পক্ষে ১০ হইতে ১৩) পর্য্যন্ত শারীরিক বুদ্ধির মাত্রার আধিক্য বশতঃ দেহস্থ শ্বাস, পেশী প্রভৃতি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া থাকে । এ সময়ে বিশেষ সাবধানে ব্যায়ামাদি কার্য্য পরিচালনা করা কর্তব্য । সামান্যপরিমাণ সহজ ব্যায়ামাদির অনুশীলন করা যাইতে পারে । কিন্তু এ সময়ে ব্যায়ামের মাত্রা অধিক হইলে, উত্তেজিক শ্বাসপেশী অধিকতর উত্তেজিত হইয়া শীঘ্রই দুর্বল হইয়া পড়িবে । সুতরাং বালক বালিকার শরীরের বুদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটবে । এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে । যাহারা এইরূপ বয়সে অত্যধিক মাত্রায় অঙ্গ সঞ্চালন করে তাহারা প্রায়ই খর্বাকৃতি হইয়া থাকে । ডাক্তারেরা এ বয়সে বালক বালিকার বিবাহ দেওয়াকে প্ৰাস্থ্য পক্ষে বিশেষ হানিজনক মনে করিয়া থাকেন । তার পর ১৬ হইতে ২১ পর্য্যন্ত ব্যায়াম চর্চার উপযুক্ত কাল । ২১ বৎসরের পরে যে ব্যায়াম-চর্চার আবশ্যকতা নাই তাহা বলিতেছি না । ২১ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কাল । আমরা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিতেছি বলিয়া, ২১ বৎসরের একটা সীমা নির্দেশ করিয়াছি মাত্র ।

১৩ বৎসর পর্য্যন্ত বালক ও বালিকার ব্যায়াম সম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা না করিলেও চলিতে পারে । এ বয়স পর্য্যন্ত বালক বালিকার শক্তির বিশেষ

কোনরূপ তারতম্য দেখা যায় না । তবে ১৩ বৎসরের পর হইতে বালকেব শক্তি, বালিকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হয় বলিয়া, ব্যায়ামের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করা আবশ্যিক । বালক বালিকার দৈহিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্ত সর্বাঙ্গীন ব্যায়ামের নিত্য প্রয়োজন ।

১৩ বৎসরের নিম্নবয়সের বালক বালিকার জন্ত (বিশেষ ৫ হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত) নানাবিধ খেলাই অঙ্গ সঞ্চালনের উপযুক্ত বিধ । তবে এই বয়সের বালক বালিকাদিগকে সামান্যরূপে জ্বল করান যাইতে পারে । কিন্তু বার-ব্যায়াম (প্যারালেল, হারাইজন্টাল, ট্র্যাপিজ প্রভৃতির সাহায্যে ব্যায়াম) নিষিদ্ধ । ১২ বৎসর পর্য্যন্ত পেশীসমূহের বিশেষ উন্নতি হয় না— ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম । সেই জন্ত এই বয়সে তাহাদিগের হস্তের মাংসপেশী বার-ব্যায়ামের পক্ষে সম্পূর্ণ অসুপযোগী থাকে । সামান্যরূপে দেশী ব্যায়াম (নিছর ও বৈঠক) কবান যাইতে পারে । কিন্তু কঠিন ব্যায়াম, (ডন, চাল ও কুলাণ্ট), যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বাহ্য শক্তির আবশ্যক করে, তাহা না করানই যুক্তি । হস্তের পেশীর পূর্বে পায়ের পেশী উন্নত হইয়া থাকে । এ নিমিত্ত যে সকল ব্যায়ামে পায়ের সঞ্চালনের আবশ্যক তাহাই পূর্বে আরম্ভ করাইতে হইবে ।

ব্যায়ামের সময় ।—কেবল বয়স বিবেচনা করিলেও চলিবে না । বালক কোন রোগগ্রস্ত কি না, প্রচুর পরিমাণে উপযুক্ত আহার পায় কি না, তাহার কোন অঙ্গ বিকল কি না, বাত্রে তাহার শ্রুতিজ্ঞা হয় কি না, এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক । এক সঙ্গে জ্বল (বা দেশী কসরৎ) করাইতে হইবে বলিয়া সমস্ত ছাত্রকেই এক দলভুক্ত করা বিধেয় নহে ।

এই কথা বিশেষরূপে মনে রাখা আবশ্যিক যে, ক্লান্তি উপস্থিত হইবার পূর্বেই বালকগণকে ব্যায়ামাদি হইতে বিরত করিতে হইবে । তবে অভ্যাসে যখন শক্তি বৃদ্ধি পায়, তখন তত সহজে ক্লান্তি উপস্থিত

হয় না। সেই জন্য প্রথমে ৫ মিনিটের অধিককাল ব্যায়ামাদির অনুশীলন কর্তব্য নহে। শেষে ধীরে ধীরে ১০।১৫ মিনিট পর্য্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা যাওয়া পারে। কিন্তু আবার বিনা বিশ্রামে এক সঙ্গে ১৫ মিনিট কাল ব্যায়াম কলানও যুক্তিযুক্ত নহে। ১০ মিনিটই সাধারণতঃ কঠিন ব্যায়ামের পক্ষে দীর্ঘ সময়। আর এক বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে, ক্রান্তি উপস্থিত হইলেই বালকেরা ছাপাইতে আরম্ভ কবে। এই সময় অধিক বায়ু প্রয়োজন হয় বলিয়া তাহারা নাকে মুখে বায়ু গ্রহণ করিতে থাকে। কিন্তু মুখের দ্বারা বায়ু গ্রহণ অনিষ্টকর। বালকগণ বাত্বাতে মুখ বন্ধ রাখিয়া, কেবল নাকের সাহায্যেই শ্বাসের কার্য্য করে, সে বিষয়ে তাহাদিগকে সাবধান করিতে হইবে।

বালকেরা অপরাহ্নে ছুটীয় পর্ব হইতে ক্রিকেট, ফুটবল, হকী, কাডু ডুডু প্রভৃতি খেলিতে আরম্ভ কবে, আর সন্ধ্যা হইলেও যে কাল পর্য্যন্ত মানুষ্য দেখা যায় সে পর্য্যন্ত ছাড়ে না। ফলে ইহাই হয় যে রাতে আর তাহারা পাঠাদির কার্য্য করিতে পারে না। অতিশয় ক্রান্তি বশতঃ শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়ে। কেবল ইহাই নহে, প্রাতঃকালে উঠিতেও দেয়া করিয়া থাকে। বিশেষ কোন ম্যাচের (প্রতিযোগিতার খেলা) বন্দোবস্ত থাকিলে পৃথক কথা, কিন্তু সাধারণতঃ ১০।১৫ মিনিটের অধিক কাল খেলিতে দিবে না।

অঙ্গ সঞ্চালন।—ব্যায়ামে যাহাতে সর্বাঙ্গের পরিচালনা হয়, একপ ব্যবস্থা করা কর্তব্য। বার-ব্যায়ামে কেবল হস্ত ও বক্ষঃস্থলের পেশীর চালনা হয়। ফুটবলে পায়ের অধিক সঞ্চালন হয়, ক্রিকেটে বাস্তবিকের। ক্রান্ত, ডন প্রভৃতি ভূ-ব্যায়ামে নানারূপ অঙ্গের সঞ্চালন হইয়া থাকে। এক জন্ত ব্যায়ামের রুটীন প্রস্তুত করিবার সময়, পর্য্যায়ক্রমে যাহাতে সকল অঙ্গেরই উপযুক্তরূপ সঞ্চালন হইতে পারে, সেক্রম বিধান করা উচিত। তাহারা কেবল বার-ব্যায়াম অভ্যাস করে, তাহাদিগের বাস্তব ও অঙ্গের

পেশীসমূহ বেশ ক্ষীণ ও সবল হইয়া থাকে, কিন্তু পায়ের পেশীগুলি বড়ই ক্ষীণ দেখায়। আবার যাহারা কেবল সাইকেল অভ্যাস করে, তাহাদিগের পায়ের পেশীসমূহ বেশ শক্ত ও সবল হয় বটে, কিন্তু বাহু ও বক্ষঃস্থল ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত হয়।

ব্যায়ামের বিভাগ।—ব্যায়ামাদি সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। (১) শক্তি সাপেক্ষ, (২) সহন সাপেক্ষ, (৩) কৌশল সাপেক্ষ, (৪) ক্ষিপ্ততা সাপেক্ষ।

(১) যে সকল ব্যায়াম বা কার্য্যে যথেষ্ট পরিমাণ বলের আবশ্যক হয়, তাহাই শক্তি সাপেক্ষ। বড় বড় পাথর উচ্চে উত্তোলন করা, নিজের স্বন্ধের উপর অনেকগুলি বালককে একসঙ্গে দাঁড় করান, বাঁশের দুই দিকে আট দশটি ছেলে বুলাইয়া সেই বাঁশ ঘূর্ণন, ভারী লৌহ বল বা সুদগর উর্দ্ধে ক্ষেপণ প্রভৃতি ব্যায়াম বিশেষ শক্তি সাপেক্ষ। ইহাতে পেশীসমূহের উপরে যে পরিমাণ জোর লাগে, তাহাতে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায় ও ক্ষণেকের জন্ত রক্ত সঞ্চালনও বন্ধ হইয়া পড়ে। বালকগণের পেশীসমূহ যেরূপ দুর্বল, তাহাতে এরূপ ব্যায়ামের অনুশীলনে তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে শক্তি সাপেক্ষ ব্যায়াম, বিদ্যালয়ের ব্যায়াম বিধানে বর্জনীয়।

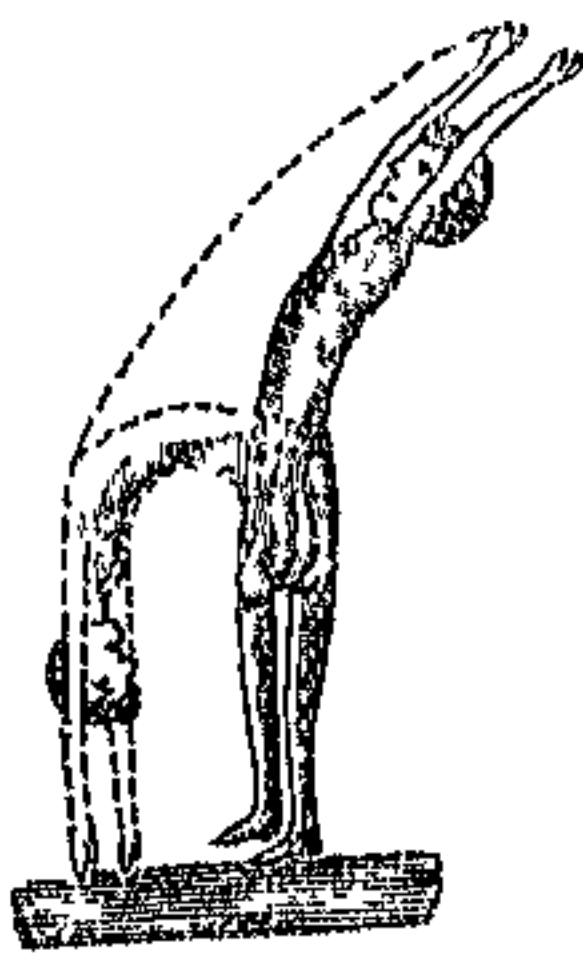
(২) অধিক শ্রমের কার্য্য না হইলেও, যদি অনেকক্ষণ এক কার্য্য পরিচালনা করা যায়, তবে তাহাতেও অবসাদ আসিয়া পড়ে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কার্য্যের কষ্ট সহ্য করিতে হয় বলিয়া ইহাকে সহনসাপেক্ষ বলে। সাধারণতঃ হাঁটিবার সময় আমরা কোনরূপ কষ্টবোধ করি না, কিন্তু যদি দূর-দেশে অনেকক্ষণ হাঁটিয়া যাইতে হয় তবে কষ্টবোধ হয়। বালকগণের পক্ষে অনেকক্ষণ এক কার্য্যে শক্তি নিয়োগ অহিতকর। মধ্য মধ্য শক্তির পুনঃ সঞ্চারের জন্ত বিশ্রাম আবশ্যক। এই জন্ত সহনসাপেক্ষ ব্যায়ামাদিও বিদ্যালয়ের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

(৩) যে সকল ব্যায়ামে কৌশলের আবশ্যক হয়, সে সকল ব্যায়ামও বিদ্যালয়ের পক্ষে উপযুক্ত নহে । কৌশল দেখাইতে হইলে শক্তির পরিচালনা আবশ্যক । বিদ্যালয়ে ব্যায়ামাদির অনুশীলন দ্বারা কেবল যে বালকগণের শক্তিবৃদ্ধি করাই উদ্দেশ্য তাহা নহে, মানসিক বৃত্তিগুলিকে বিশ্রাম দেওয়াও ইহার অপর উদ্দেশ্য । সর্প গতি, গবাক্ষের মত অঙ্গ স্থানের মধ্য দিয়া লম্ব প্রদান করিয়া গমন করা, দড়ির উপর ভ্রমণ, বলের উপর নৃত্য, ছুইটা বোতলের উপর ময়ূর হওয়া প্রভৃতি অনেক পারমাণ কৌশল সাপেক্ষ । বিদ্যালয়ে এ সমস্তের চর্চা করা কর্তব্য নহে ।

(৪) যে সকল ব্যায়ামে ঘন ঘন ও অতি দ্রুতবেগে অঙ্গ সঞ্চালন করিতে হয় তাহাকেই ক্ষিপ্ৰতা সাপেক্ষ ব্যায়াম বনে । শক্তি সাপেক্ষ ও ক্ষিপ্ৰতা সাপেক্ষ ব্যায়ামের দ্বারা স্বল্প সময়ে অধিক পরিমাণে অঙ্গ সঞ্চালন হইয়া থাকে । তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে শক্তি সাপেক্ষ ব্যায়ামে এক সঙ্গে ও বিনা বিরামে পেশীসমূহকে অধিকক্ষণ সঙ্কচিত করিয়া রাখিতে হয় ; কিন্তু ক্ষিপ্ৰতা সাপেক্ষ ব্যায়ামে ঘন ঘন বিরাম ও সঞ্চালন হেতু, পেশীসমূহও ঘন ঘন সঙ্কচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে । এই হেতু শক্তি সাপেক্ষ ব্যায়ামে যত শীঘ্র ক্লান্তি উপন্ন করে, ক্ষিপ্ৰতা সাপেক্ষ ব্যায়ামে তাহা করে না । এই কারণে ক্ষিপ্ৰতা সাপেক্ষ ব্যায়ামই বিদ্যালয়ের পক্ষে উত্তম । দৌড়, লম্ব প্রভৃতি, যাহাতে হস্তপদাদি দ্রুত সঞ্চালন করিতে হয়, একপ ভূ-ব্যায়াম ক্ষিপ্ৰতা সাপেক্ষ । এই সকল ব্যায়ামে যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গের সঞ্চালন হয়, অল্প সময়ে খুব কম ক্লান্তি বোধ হয়, বালকগণের স্বভাব সুলভ চপলতা এ সমস্ত ব্যায়ামের সহায় হয়, এবং সমস্ত অঙ্গের সমবায় সঞ্চালন হয় । আবার একপ ব্যায়ামে বিরামের প্রচুর সুযোগ পাওয়া যায় ।

নিশ্বাস প্রশ্বাস ।—আজ কাল চিকিৎসকেরা বক্ষঃস্থলের উন্নতি বিধানের জন্ত পূরক (ধীরে ধীরে নিশ্বাস টানিয়া লওয়া) রেচকের (ধীরে

ধীরে প্রশ্বাস পরিত্যাগ করার) ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ও উন্নত হইলে অনেক ছুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। ব্যায়াম শিক্ষাদানের কিছু পূর্বে কোন কোন বিদ্যালয়ে ২৩ মিনিট পূরক ও রেচক অভ্যাস করান হইয়া থাকে। পূরক ও রেচকের এইরূপ প্রণালী :—



১২ চিত্র।—পূরক রেচক। চক্ষুর দৃষ্টি থাকে।

(১ম) মাথা নীচু করিয়া দুই হাত প্রসারণপূর্বক ধীরে ধীরে প্রশ্বাস টানিতে আরম্ভ কর এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত ও মাথা উচু করিতে করিতে মাথা পশ্চাৎদিকে যতদূর হেলাইতে পার তাহা কর।

(২য়) তাব পর ধীরে ধীরে নিশ্বাস ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ও হাত নামাইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববৎ মাথা হেঁট কর। দুই অবস্থাতেই হাত ও মাথা একরূপ ভাবে একসঙ্গে সঞ্চালিত হইবে যে, হাতের অগ্রভাগের উপর যেন সকল সময়েই

নিশ্বাস প্রশ্বাসের এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা আর এক উপকার এই হয় যে, কোন কার্যে সহসা ক্রান্তি বোধ হয় না। যে সমস্ত ব্যায়ামানুশীলনে ক্ষণিকের জন্ত ও শ্বাসের কার্য্য বন্ধ করিতে হয়, সে সমস্ত ব্যায়ামে বক্ষঃস্থলের উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু বক্ষঃস্থলের উন্নতিবিধানের পক্ষে ধাবন (দৌড়ান) যেক্রপ হিতকর সেক্রপ আর কোন ব্যায়াম নহে। আমরাদিগের দেশীয় খেলা হাডু-ডুডু এ বিষয়ে, ক্রিকেট ফুটবল অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উন্নত। হাডু-ডুডু বক্ষঃস্থলের প্রশস্ততা বৃদ্ধির সাহায্য করে।

ড্রিল বা দেশী ব্যায়ামের মধ্যে যেগুলিতে হাত উর্দ্ধে উত্তোলন করিবার রীতি আছে, তাহাতে মস্তকও সঙ্গে সঙ্গে হেলাইয়া হাতের অগ্রভাগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

আমাম সেক্রেটারিয়েট থ্রেম হইতে প্রকাশিত ব্যায়াম শিক্ষা পুস্তকের অন্তর্গত দ্বিঃস্ত্র নিহর, হস্তপদ প্রসারণ মুখাবর্তন নিহর ও নিশান ডন নামক ব্যায়ামএয় এই জন্ত কিছু অসম্পূর্ণ। এই সকল ব্যায়ামে “এই অবস্থায় মস্তক সোজা ও দৃষ্টি কোন দূরবর্তী পদার্থের উপর রাখিবে” কেবল এইরূপ ব্যবস্থা না করিয়া, হাত উত্তোলনের সঙ্গে মস্তক হেলাইয়া হস্তের অগ্রভাগ দেখিবার ব্যবস্থা করিলে, এইগুলির অভ্যুদানে বক্ষঃস্থলের উন্নতির সহায়তা হইতে পারে। এই জন্ত ডম্বেল ব্যায়ামে হাত উত্তোলনের সঙ্গে, চক্ষু হাতের অগ্রভাগে বিশ্রুস্ত করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যায়ামের প্রকার।—ব্যায়ামের বহু প্রকার আছে, তন্মধ্যে যেগুলি সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যে প্রচলিত, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

- ১। খেলা—কানা গাছি, পালানটুট হাডু ডুডু।
- ২। ধাবন—দৌড়ান, লফন, উল্লভন, একপায় গমন, নিতম্বস্পর্শ দৌড়, বৈঠক দৌড়।
- ৩। ভূ-ব্যায়াম—নিহর, বৈঠক ও ডন (হুম্মানডন, পাগডন, একাধিডন, হিন্দোলডন, এক হস্ত ডন, শরীর উত্তোলন ডন, ১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্কের জন্ত নয়)।
- ৪। ড্রিল ও মার্চ (মার্শকৃত অথবা প্রকৃত ড্রিল পুস্তক হইতে)।
- ৫। বিলাতী খেলা—ক্রিকেট, ফুটবল, হকি।
- ৬। বার-ব্যায়াম—প্যাবেলাল বারে দোলন, বাররিয়ার, সিঙ্গল গাচ্চ, ডবল গাচ্চ। হরাইজণ্ট্যালবারে—ওঠা দাবা, লেগ গ্রাইন্ডিং, মাসল গ্রাইন্ডিং (১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্কের জন্ত নয়)।
- ৭। ডম্বেল—স্বাভাৱে প্রস্তাবিত ৮ রকমের ব্যায়াম (শেষ ৩ রকম ১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্কের জন্ত নয়)।

ব্যায়ামের রুটীন।—শিক্ষকসংখ্যা বেশী থাকিলে প্রত্যেক ঘণ্টার পরে ৫ মিনিট করিয়া ড্রিল করান মন্দ নহে। কিন্তু যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা কম ও যেখানে এক সঙ্গে সকল বালককে ড্রিল করাইতে হয়, সেখানে সময় নির্দিষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। স্কুলের কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে ড্রিল বা ব্যায়াম করান নিষেধ। বালকেরা থাইয়াই স্কুলে আসে, এ

অবস্থায় ভরা পেটে ব্যায়াম করাইলে পেটের ব্যথা ও মাথার ব্যথা হওয়ার পূর্ব সম্ভাবনা । বিছালয়ের পরেও ব্যায়াম করাইতে নাই—সে সময়ে বালকেরা সমস্ত দিনের মানসিক শ্রম এবং ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়া পড়ে । প্রথম তিন ঘণ্টা কার্যের পর—টিফিন ঘণ্টার অব্যবহিত পূর্বে, ড্রিল ও ব্যায়ামের উপযুক্ত সময় ; ব্যায়ামের পরেই বালকেরা টিফিনের বিশ্রাম পাইবে । বড় বড় ক্ষুদ্রে ড্রিলের জন্ত পৃথক গৃহ থাকে । যেখানে এরূপ ব্যবস্থা নাই, সেখানে ড্রিলের স্থানের পূর্বে ও পশ্চিম দিকে কতকগুলি গাছ লাগাইয়া দেওয়া আবশ্যিক । তাহা না করিলে দ্বিপ্রহরের প্রথর রৌদ্রে বালকগণের কষ্ট হইবে । কেহ কেহ বলেন যে, এরূপ একটু রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য করিতে অভ্যাস করানই বরং বাঞ্ছনীয় ।

ড্রিল এবং ব্যায়ামের জন্তও একটা রুটীন করিয়া রাখা আবশ্যিক । প্রত্যহ যাহাতে সকল অঙ্গের সঞ্চালন হইতে পারে, রুটীনে সে বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । কিন্তু আবার প্রত্যহ যাহাতে কেবল এক রকম ব্যায়ামের অনুশীলন না হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । নিয়ে রুটীনের একটা আদর্শ প্রদত্ত হইল । ড্রিল এবং ব্যায়াম শিক্ষার জন্ত যে সকল পুস্তক ব্যবহৃত হয়, সেই সকল পুস্তক দৃষ্টে ব্যায়ামের নম্বরগুলি বসাইয়া লইবে ও নিজ নিজ অবস্থা দৃষ্টে পরিবর্তন করিয়া লইবে ।

নিম্নবিভাগ (১৪ বৎসরের নিম্ন) ।

সোমবার—বাহার নিমিত্ত নিহর, পদের নিমিত্ত বৈঠক ।

মঙ্গলবার—সার্পের পুস্তক হইতে অমুক অমুক নম্বর ড্রিল ।

বুধবার—দৌড় (১০০ গজ), হরাইজট্যাল বারে দোলন ।

বৃহস্পতিবার—লক্ষন, উল্লভন, এবং প্যারাললে দোলনা ।

শুক্রবার—ডম্বেল (প্রথম তিন প্রকার), একপায় দৌড় ।

শনিবার—ক্রিকেট, ফুটবল বা হাডু-ডুডু ।

উচ্চবিভাগ (১৪ বৎসরের উদ্ধ) ।

সোমবার—প্যারানাল বারে সিম্ফ বা ডবল গাচ্চ (একবার),

হরাইজন্ট্যাল বারে লেগু গ্রাইন্ডিং (৩ পাক),

একপ্রকার গার্চ বা চা'ল ।

মঙ্গলবার—ডম্বেল (২ বকমের কঠিন), ডন (এক বকমের ৬ বার),

ড্রিলের টরনিং (২ বকমের) ।

বুধবার—নিহর (২ প্রকার), নিতম্পর্শ দোড় (২৫ গজ),

বৈঠক (২ প্রকার) ।

বৃহস্পতিবার—হরাইজন্ট্যাল বারে ওঠা (২ প্রকার), সাধাবণ

দোড় (১০০ গজ), প্যারানাল বারে ডন (১ প্রকার) ।

শুক্রবার—চা'ল (বৃষ্টিক চা'ল প্রভৃতি এক বকম), ডম্বেল

(সহজ ২ বকম), লক্ষন ও উল্লঙ্ঘন একপায়ে ও জোড়পায়ে ।

শনিবার—ক্রিকেট, ফুটবল, হকি বা হাডু ডুডু ।

গীর্ষ বা পূজা উপলক্ষে বিছালয়ের বন্ধের সময়, এমন কি রবিবারেও ব্যায়াম চর্চা বন্ধ করা স্বাস্থ্যবিরুদ্ধ । তবে রোগগ্রস্ত হইলে কি অথ কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকিলে, বন্ধ করা যাইতে পারে । নিহর, বৈঠক, ডন, ডম্বেল প্রভৃতি ব্যায়াম যখন শয়ন গৃহেও অভ্যাস করা যাইতে পারে, তখন কোনরূপ অসুবিধার কারণ নাই । লোচার সাধারণ ডম্বেল অপেক্ষা কাঠের ডম্বেল ভাল ; এক জোড়ার দাম ৮/০ আনা । অভাবে একখানি দেড় ইঞ্চি মোটা, ৩৭ ইঞ্চি লম্বা গোলা কাঠ বা বাঁশ হইলেও চলিতে পারে । রীতিমত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায়, কি কেবল প্রাতে ৮।১০ মিনিট করিয়া এইরূপ ব্যায়াম করিলে বৃদ্ধ ও সবল হইয়া থাকে । ছবল লোকের পক্ষে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দ্রুত ভ্রমণ উত্তম ব্যায়াম ।

অন্যান্য কথা ।—খেলার মাঠের নিকটে একজন শিক্ষকের উপস্থিতি থাকা আবশ্যিক । তিনি বালকদিগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না বটে, কিন্তু ইহাতে এই ফল হইবে যে বালকেরা কোনরূপ অসভ্যতা

কারিতে সাহস করিবে না। বিলাতে খেলার মাঠে বালকেরা ওয়াটারব্লু যুদ্ধ জয় করে, কিন্তু আমাদের হতভাগ্য দেশে এই খেলার মাঠেই অনেক বালকের সর্বনাশ হয়। এই খেলার মাঠেই খেলার উপলক্ষ করিয়া নানাক্রম বদ'কার্যের অনুশীলন করে। যদি কোন শিক্ষক উপস্থিত থাকিতে না পারেন, তবে উচ্চ শ্রেণীর কোন সচ্চরিত্র বালকের উপর ভার দেওয়া মন্দ নহে।

বালকেরা বাহাতে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালাইবার পূর্বেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারে, এইরূপ সময়ে খেলা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাহিরে থাকিতে দিলে নানাক্রমে চরিত্র কলঙ্কিত হইতে পারে।

বিদ্যালয়ের বালকদিগের সঙ্গে বাহিরের লোককে খেলিতে দেওয়া উচিত নহে। তবে মাচ্ কি টুর্নামেন্টের সময় কোনরূপ আপত্তি না করিলেও চলিতে পারে। শিক্ষকগণ সময় সময় বালকগণের খেলায় যোগদান করিবেন।

সাধারণ পরীক্ষার পরে, ব্যায়ামের পরীক্ষা উপলক্ষ করিয়া অভিভাবক ও অন্যান্য ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে ব্যায়ামানুশীলনে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করা হইবে।

কিন্তু এক কথা মনে রাখা উচিত যে, শারীরিক বৃত্তির অতিরিক্ত অনুশীলনের উৎসাহ দেওয়া কখনই কর্তব্য নহে। ব্যায়ামের উদ্দেশ্যই কেবল শরীর সুস্থ ও সবল রাখা, আর শরীর সুস্থ রাখিবার উদ্দেশ্য মানসিক শক্তির উন্নতিপথ উন্মুক্ত রাখা। বিদ্যালয়ে মানসিক বৃত্তির অনুশীলনকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। এই জন্য যে বালক পড়াশুনায় ভাল নয়, তাহাকে কেবল ব্যায়ামাদির জন্য পুরস্কার বা উৎসাহ দেওয়া সঙ্গত নহে। আবার যে বালক ব্যায়ামাদির সাধারণরূপ অনুশীলনেও অপটু, তাহাকে কেবল পড়াশুনায় জন্য পুরস্কার দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। দুই দিকেই চাই, তবে মাত্রার কম বেশী।

১ । স্বাস্থ্যরক্ষা ।

বিদ্যালয় ।—(১) জ্বলের ঘর ও ঘরের চারিদিক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে । বিদ্যালয় গৃহে বালকগণের প্রবেশ করিবার অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্বে, ঘরের দরজা জানালা প্রভৃতি খুলিয়া দিতে হইবে । ইহাতে দুর্গন্ধ ও দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যাইবে । আর বিদ্যালয়ের ছুটি হইবার অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বিদ্যালয়ের দরজা জানালা বন্ধ করিতে হইবে । তবে সামান্য খড়ের ঘরে এ ব্যবস্থা না করিলেও চলে । ঘরে উত্তমরূপ আলোক ও বায়ু প্রবেশের পথ রাখা আবশ্যক ।

আজকাল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে প্রায়ই বগ্ন দেখিতে পাওয়া যায় । চিকিৎসকগণ বলেন যে অনেকক্ষণ বহু ছাত্রের সহিত আবদ্ধ গৃহে একত্র বাস করাতে বালকের স্বাস্থ্যক্ষয় হইয়া থাকে । পূর্বে আমাদিগের দেশে আম্রকাননে বা অগ্ন্য বৃক্ষের মূলে ছাত্রগণ সমবেত হইয়া পাঠাভ্যাস করিত । ইহাতে স্বাস্থ্যের কোনরূপ ব্যাঘাত হইত না । বর্ধকালে বিদ্যালয়ের কাৰ্য্য বন্ধ থাকিত—এই জন্তই মেনগর্জনে পাঠ নিষেধ ছিল । বর্তমান সময়ে ফরাসী দেশের অনেক বিদ্যালয়ে বৃক্ষমূলে কাৰ্য্য করিবার ব্যবস্থা হইতেছে । আমরাও এ ব্যবস্থা করিতে পারি । ইতিহাস, প্রাকৃতিক ভূগোল, সাহিত্য, উদ্ভিদ, কৃষি, ডাকনামভা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা বৃক্ষমূলে করায় বাধা কি ?

(২) বাগকেরা বাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া আসিয়া কি খেলায় ক্লান্ত হইয়া জল খাইতে দৌড়ায় । কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিলে জল খাইতে দিবে না । উত্তম পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা কর্তব্য । অত্যাব পক্ষে কলসী ফিণ্টার করিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হইবে ।

(৩) একসঙ্গে তিন ঘণ্টার অধিককাল একরূপ ভাবে বসিয়া থাকিলে মেরদণ্ডে বেদনা উপস্থিত হইতে পারে । এই জন্ত তিন ঘণ্টার পর টিফিন কি শ্রেনী পরিবর্তন কি দণ্ডায়মান করাইয়া কোন কার্য্য করান কর্তব্য । অনেকক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখা, নীলডাউন করান প্রভৃতি শাস্তি স্বাস্থ্য-বিরুদ্ধ ।

(৪) বিছানায় গৃহে থুথু ফেলা সম্পূর্ণরূপ নিষেধ করা কর্তব্য। ডাক্তার-গণ প্রমাণ পাইয়াছেন, থুথু হইতেই অনেক রোগ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কোন বালককে ময়লা কি ছর্গক্ষয়ুক্ত কাপড় পরিয়া বিছানায় প্রবেশ করিতে দিবে না।

ছাত্রাবাসে বা হোষ্টেলে।—বালকেরা অনেক সময় জ্বরের জ্বগাঙের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, গুলোর স্বল্পতার দিকে দৃষ্টি করে। এই জন্ত কখন কখন তাহারা অতি অস্বাস্থ্যকর খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া নিজে রোগগ্রস্ত হয় এবং অপরকেও রোগগ্রস্ত করে। হোষ্টেলের অধ্যক্ষকে খাদ্য দ্রব্যাদির উত্তমত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আজকাল বালকগণের ধূমপান রোগ প্রবল হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহারও প্রতিবিধান আবশ্যক।

(২) এক বিছানায় একজনের অধিক লোকের শয়ন স্বাস্থ্যের বিবন্ধ। বিছানার চাদর, বালিশের খোল প্রভৃতি অন্ততঃ ১৫ দিন পরও একবার উত্তমরূপে ধৌত করা আবশ্যক।

(৩) ঘরে থুথু ফেলা, ঘরের নিকট প্রস্রাব করা, তক্তোপোষের নীচে ছেঁড়া কাগজ ফেলা, স্বাস্থ্যের বিশেষ হানিজনক। পাকা মেজে হইলে অন্ততঃ মাসে একবার উত্তমরূপে ধৌত করিতে হইবে, কাঁচা হইলে, নিকাইতে হইবে। বালকেরা যাহাতে নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে ও দ্রব্যগুলি বেশ গোছগাছ করিয়া রাখে সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে।

(৪) বালকেরা যাহাতে সমস্ত কাথাই নিয়মিত সময়ে নিক্ষেপ করে, সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিবার সময়, স্নানের সময়, আহারের সময়, সন্ধ্যায় পাঠে বসিবার সময় ঠিক থাকা উচিত। কোন কোন হোষ্টেলে এই সমস্ত সময় জ্ঞাপন করিয়া ঘণ্টা দেওয়া হইয়া থাকে। অধিক রাত্রজাগরণ এবং দিবা নিদ্রা নিষিদ্ধ।

সংক্রামক রোগে ।—হোষ্টেলে, রোগীর জন্য একটা পৃথক ঘর রাখিতে পারিলে ভাল হয় । কিন্তু কোনরূপ সংক্রামক রোগ হইলে রোগীকে অন্ত্র পঠাইতে চেষ্টা করিবে । বিশেষ বসন্ত ও গোমে এইরূপ ব্যবস্থা করা নিতান্তই কর্তব্য । খোস, পাচড়া, দাদ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত বালকের সহিত অন্য বালককে মিশিতে দিবে না । সংক্রামক রোগগ্রস্তকে স্কুলেও আসিতে দিবে না । এমন কি যে বালকের বাড়ীতে কোনরূপ সংক্রামক পীড়া হইয়াছে, তাহাকেও স্কুলে আসিতে দিবে না । বালকদিগের সংক্রামক পীড়া হইলে কতদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ছুটি দিতে হইবে তাহা নিম্নের তালিকা দৃষ্টে বুঝিতে পারিবে :—

রোগ	যতদিন পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা থাকে ।	পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার পরও যে কয়দিন সে বিদ্যালয়ে আসিবে না ।
চোক উঠা—	৭ হইতে ১৫ দিন, যে পর্য্যন্ত চোখের জলপড়া বন্ধ না হয় ।	৭ দিন ।
গাল ফুলা—	৭ হইতে ১৫ দিন ।	৫
গলায় ক্ষত—	ঐ	ঐ
হুপিং কাসি—	যে পর্য্যন্ত কাসি না মারে ।	১৫ দিন ।
হাম (কোদা, লুতি, পেরা)—	১৪ হইতে ২১ দিন । যে পর্য্যন্ত গালের শুক খোজস না পড়িয়া যায় ও কাসি না মারে এই শুক খোজসেই রোগ বিস্তার করে ।	১৫ দিন ।
জল-বসন্ত—	৩ হইতে ৫ সপ্তাহ যে পর্য্যন্ত সমস্ত শুক খোজস ঝরিয়া না পড়ে ।	১৫ দিন ।

বসন্ত—

যে পর্য্যন্ত না সারে ও

২১ দিন।

শরীরের গর্তগুলি পুরিয়া উঠিতে

আরম্ভ না করে।

আকস্মিক বিপদে।—হাত কাটা, পা ভাঙ্গা, জলে ডোবা, আগুনে পোড়া প্রভৃতি নানারূপ আকস্মিক বিপদ ঘটিয়া থাকে। বিপদ কঠিন হইলে ডাক্তারকে ডাকিতে হইবে। তবে ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব সময় পর্য্যন্ত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে নিয়ে তাহাই লিখিত হইল :—

কাটা।—ছুরিতে সামান্যরূপ হাত কাটিয়া গেলে একটা জলপটী দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। গাঁদার পাতা (অভাবে ঘাস) খেঁতলাইয়া সেই পাতা কাটার উপর চাপিয়া বাঁধিয়া দিলেও রক্তপড়া বন্ধ হয়। রেড়ির তৈল বা ক্যাষ্টর অইলে নেকড়া ভিজাইয়া কাটার উপর চাপিয়া দিলেও রক্তপড়া বন্ধ হয়। কাটা ঘায়ের ভিতর কোনরূপ ময়লা কি কাচ ভাঙ্গা থাকিলে পূর্বেই বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। তবে শিরা কি ধমনী কাটিয়া গেলে বিপদের কথা। ইহাতে অত্যন্ত রক্তশ্রাব হইতে আরম্ভ হয়। ডাক্তারের সাহায্য আবশ্যক। ডাক্তার আসিবার পূর্বে একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্রের দ্বারা, ক্ষত স্থানের উর্দ্ধদিকে (ধড়ের দিকে) ও একটু উপরে, খুব কসিয়া একটা বাঁধ দিয়া রাখিবে এবং ক্ষত অঙ্গকেও উর্দ্ধদিকে তুলিয়া ধরিয়া থাকিবে। ঠাণ্ডা জলধারা প্রায় সকল প্রকার কাটাতেই উপকারী।

ভাঙ্গা।—হাত, পা কি আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া গেলে (ডাক্তার আসিবার পূর্বে) সেই অঙ্গকে সুরলভাবে ধরিয়া একখানা পাতলা কাঠ কি বাঁশ কি খাঠি তার পাশে দিয়া, নেকড়া দিয়া জড়াইয়া ফেলিবে ও সেই নেকড়া ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া দিবে। রোগীকে স্থিরভাবে শোয়াইয়া রাখিবে। ভাঙ্গা অঙ্গ নাড়িতে দিবে না।

মুছা।—খেলিতে খেলিতে পড়িয়া গিয়া কি ব্যাট বা বলের আঘাত

জাগিয়া অনেক সময় মুচ্ছা হয় । রোগীর গায়ের জামা চাদর খুলিয়া ফেলিবে । তাহাকে ছায়াযুক্ত অথচ মুক্ত স্থানে চিৎ করিয়া শোয়াইবে । একটা বালিশ পাইলে ভাল, নাচে তাহার জামা চাদর প্রভৃতি দ্বারা বালিশ করিয়া মাথাটা একটু উচু করিয়া রাখিবে । চোখে মুখে ঠাণ্ডা জল দিবে এবং আন্তে আন্তে বাতাস করিতে থাকিবে । চারিদিকের লোকজন সরাইয়া দিবে ।

জলে ডোবা ।—মুচ্ছাতে বেক্রপ লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ অবস্থায় রোগীকে রাখিবে । কেবল বালিশটা মাথার নীচে না দিয়া পিঠের নীচে দিবে । শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য তাহার বাহুদ্বয় একবার মস্তকের দিকে টানিয়া আনিয়া, আবার বক্ষের উপরে ভাঙ্গিয়া ধরিবে । প্রাত চারি সেকেন্ডে এইরূপ প্রক্রিয়া যাহাতে একবার সম্পন্ন হইতে পারে সেইরূপ দীর্ঘতা এবং ক্ষিপ্ততার সহিত এই কার্য করিতে হইবে । যে পর্য্যন্ত রোগীর নিশ্বাস না চলে, সে পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে হইবে । একজনের হাত লাগিলে আর জনের উপর ভার দিবে । অর্ধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা এইরূপ পরিশ্রম করা আবশ্যিক ।

আগুনে পোড়া ।—যদি স্কুলে থাকে তবে ভাল, না হইলে নিকটের কোন বাড়ী হইতে চুনের জল আর নারিকেলের তেল আনা হইয়া একত্র মিলাও । এই তেলে গ্লুকড়া ভিজাইয়া ধানের উপর জড়াইয়া দিয়া, তার উপর তুলা ও গ্লুকড়া দিয়া, কি কেবল গ্লুকড়া দিয়া বাঁধিয়া দাও । স্কুলে কি নিকটস্থ কোন বাড়ীতে সোডা (বাই কার্ব) থাকিলে তাহা জলে গুলিয়া দগ্ধ স্থানে লাগাইয়া, তুলা ও গ্লুকড়ার দ্বারা জড়াইয়া দিলেও হয় । কিছু না জুটিলে কেবল গ্লুকড়ার দ্বারা জড়াইয়া রাখিবে । কথা এই যে, পোড়া ঘায় কিছুতেই বাতাস লাগিতে দিবে না ।

সাপে কাটা ।—বিষাক্ত সাপে কাটিলে, তৎক্ষণাৎ ক্ষতস্থানের উপর গুল কসিয়া দুইটি বাঁধ দিবে । ক্ষতস্থান ছুরীর দ্বারা চিরিয়া দিবে । ইহাতে রক্তের গতি বাহিরে চলিবে । ডাক্তারকে শীঘ্র ডাকিয়া পাঠাইবে ।

ক্ষিপ্তকুকুরে কামড়ান ।—ক্ষতস্থান উত্তমরূপ ধৌত করিয়া কারবলিক বা নাইট্রিক এসিডের (অভাবে তথ্য লৌহের) দ্বারা পোড়াইয়া দিবে । আর নিকটস্থ থানায় বা সনডিভিসনে কি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়া রোগীকে শিলং পাস্তুর হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে । গরীব হইলে গভর্ণমেন্ট সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া থাকেন ।

কলিকাতা হইতে শিলং যাইতে হইলে প্রথমে দারভিলিং রেলের সান্তাহার ষ্টেশনে আসিতে হয় । তারপর সান্তাহার হইতে অন্তরেলে পাণ্ডুঘাট ষ্টেশন পর্যন্ত আসিতে হইবে । পাণ্ডুঘাট ব্রহ্মপুত্রের উপর, গোহাটীর নিকট । পাণ্ডুঘাট হইতে শিলং মোটর গাড়ীতে যাইতে হইবে । কলিকাতায় ৪ টার সময় রেলের চড়িলে পবদিন ৫।৬ টার সময় শিলং পৌঁছিতে পারা যায় । শিলং মোটর গাড়ীর ষ্টেশন হইতে পাস্তুর হাসপাতাল দূর নয় । যে কোন কুলীর সাহায্য লইলেই হাসপাতালে পৌঁছিতে পাব যাইবে । বেল ও মোটর ভাড়া ১৫।২০ মত । ঢাকা কিম্বা চট্টগ্রাম হইতে শিলং যাইতে হইলে প্রথমে গোয়ালন্দে আসিতে হইবে । সেখান হইতে রেলের পোড়াদহ । পোড়াদহে দারভিলিং রেল ধরিয়া সান্তাহার । তারপর পাণ্ডুঘাট, শিলং । ভাড়া প্রায় ঐরূপ ।





দ্বিতীয় প্রকরণ শিশুশিক্ষা বিষয়ক ।

১। কিণ্ডারগার্টেন ।

শব্দের অর্থ।—কিণ্ডারগার্টেন শিশুশিক্ষার প্রণালী বিশেষ। শিশুশিক্ষায় এই প্রণালী বিশেষ ফলপ্রসূ বলিয়া, সভ্য জগতের সর্বত্রই এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। কিণ্ডারগার্টেন জার্মান ভাষার শব্দ। কিণ্ডার অর্থ “শিশুগণ” আর গার্টেন অর্থ “উদ্যান”। সম্পূর্ণ শব্দের অর্থ “শিশুগণের উদ্যান”। বাঙ্গালা-ভাষায় এই কথাটির একটা প্রাতিশব্দ ব্যবহার করিবার আবশ্যক হইলে ‘বাল্যবাগ’ * শব্দের দ্বারা সে ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। কিন্তু যখন এই প্রণালীর জন্মদাতা, ইহাকে ‘কিণ্ডারগার্টেন’ নামে অভিহিত করিয়াছেন, তখন আমাদের এই নাম ব্যবহার করাটাই কর্তব্য।

এই প্রণালী অনুসারে শিশুশিক্ষার জন্ম প্রথমে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে উদ্যান সংলগ্ন করা হইয়াছিল। শিশুশিক্ষার পক্ষে এইরূপ উদ্যান অধিকতর আবশ্যক দেখিয়া, সাধারণ লোকে শিশুগণের বিদ্যালয় না বলিয়া উপহাসচ্ছলে এই সমস্ত পাঠশালাকে ‘শিশুগণের

* ‘বাল্যবাগ’ না বলিয়া ‘নন্দনকানন’ বলিলে কেমন হয় ?—মঃ

উদ্যান' এই নামে অভিহিত করিয়াছিল। প্রাণালীর সৃষ্টিকর্তাও শেষে এই নামেই নিজ প্রাণালীকে অভিহিত করিয়াছিলেন। তবে তিনি এই কথাটিকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া একটা গূঢ় অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় - জ্ঞানস্বরূপ, বালকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষ, আর শিক্ষক উদ্যানপাল। উদ্যানপাল বৃক্ষে পরিমিত সার প্রয়োগ করিয়া বৃক্ষের বৃদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করে, শিক্ষক (বোর্ডিং স্কুলে) শিশুকে উপযুক্ত আহারাদি প্রদান করিয়া তাহাব দেহের পরিপুষ্টি সাধনে সহায়তা করেন *। উদ্যানপাল পরিমিত জল সেচন করিয়া বৃক্ষকে সরস করে, শিক্ষক সেইরূপ পরিমিত জ্ঞানবাবি সেচন করিয়া বালকের মন সরস করিয়া থাকেন। উদ্যানপাল যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধি সম্বন্ধে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করে না অর্থাৎ সে যেমন নিজ ইচ্ছামত বৃক্ষকে শীঘ্র শীঘ্র বাড়াইতে ইচ্ছা করে না (এবং করিলেও পারে না), সুশিক্ষক সেইরূপ শিশুর মন ও দেহকে (পরীক্ষায় পাস করাইবার নিমিত্ত বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে) শীঘ্র শীঘ্র অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করেন না। উদ্যানপাল যেমন অকালে ফলের প্রত্যাশা করে না, সুশিক্ষকও সেইরূপ অকালপকতা প্রত্যাশা করেন না। উদ্যানপাল যেমন বেড়া দিয়া বৃক্ষকে পশুর হস্ত হইতে রক্ষা করে, শিক্ষকও সেইরূপ ধর্ম ও নীতির বেড়া দিয়া শিশুকে কু-সঙ্গীর হস্ত হইতে রক্ষা করেন। অপরিমিত সার প্রয়োগ বশতঃ বৃক্ষের অপরিমিত বৃদ্ধি হইলে, তাহাতে যেমন ফুল ফল জন্মে না, তেমনি অপরিমিত আচারাদি দ্বারা বালকের দেহ অতিরিক্ত পুষ্ট হইলে, তাহার বৃদ্ধি বিকশিত হইতে পারে না। অপরিমিত জল সেচনে বৃক্ষের মূল যেমন পচিয়া যায়, অপরিমিত জ্ঞান দানেও সেইরূপ বালকের বুদ্ধির মূল (মস্তিষ্ক) নষ্ট হইয়া যায়। নানা জাতীয় বৃক্ষ প্রতিপালনের জন্ত যেমন নানারূপ

* মকল দেশেই কিঙারগাটেন শিক্ষাদানের নিমিত্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

ব্যবস্থার প্রয়োজন, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বালকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আবশ্যিক । বৃক্ষের সহিত বালকের এতদূর সাদৃশ্য আছে বলিয়া, বালক-সমন্বিত বিদ্যালয়কে বৃক্ষ-সমন্বিত উদ্যানের সহিত তুলনা করা সম্ভব হইয়াছে ।

পেট্রোলজী ।—যে প্রণালী এখন কিওয়ারগার্টেন প্রণালী বলিয়া পরিচিত, সে প্রণালীর প্রবর্তক, স্নাইট জরলও নিবাসী পেট্রোলজী (পেস্টালটগী) সাহেব । পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ সহজ শিলা শিক্ষাও কর্তব্য, তাহা তিনিই প্রথম নিষ্কারণ করেন । দরিদ্র কৃষক সম্ভ্রানগণের শিক্ষাতেই তিনি বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । সেই জন্য তাহাকে বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠের সঙ্গে বৃক্ষিকার্য শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছিল । শীতে বালকেরা বিদ্যালয়ের গৃহে পাঠাদির আলোচনা করিত ও গ্রীষ্মে উদ্যানে কি কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকর্ম শিক্ষা করিত । তিনি মনে করিতেন যে, বালকেব পক্ষে নানা জ্ঞান উপার্জন করা অপেক্ষা, উত্তমরূপ সদাচারী হওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয় । তিনি বলেন যে, “বালকেব হৃদয় ও পবিত্র পদার্থের প্রতি অনুরক্ত করিতে চেষ্টা কর,—তাহার জীবন ইহাতেই সমৃদ্ধ হইবে । কেবল বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করিয়া দিলে, মানসিক প্রবৃত্তিগুলির কুকায়া কবিরাব শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় মাত্র ।” এই জন্য পেট্রোলজী বালকগণকে নানারূপ পবিত্র কার্যে ব্যাপ্ত রাখিতেন, পবিত্র বিষয়ে তাহাদিগের চিত্তাশ্রোত পবিচালিত করিতেন, এবং প্রত্যহ তাহাদিগকে ভগবানের উপাসনায় নিয়োজিত করিতেন । শিক্ষাদান যাহাতে মানব মনের ক্রমিক বিকাশের সাধুকূল হয়, সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখাই পেট্রোলজীর প্রণালীর সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল । (পেট্রোলজীর জন্ম ১৭৪৬, মৃত্যু ১৮২৭)

ফ্রেবেল ।—কিন্তু কিওয়ারগার্টেন প্রণালীর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা জার্মানদেশনিবাসী ফ্রেডারিক ফ্রেবেল সাহেব । তিনি পেট্রোলজীর নিকট শিক্ষাদান প্রণালী শিক্ষা করেন এবং শুধু প্রদর্শিত প্রণালীর এরূপ আমূল সংস্কার করেন যে, এখন এই প্রণালী ফ্রেবেল প্রদত্ত বলিয়াই সর্বত্র পরিচিত । ১৮৩৭ খ্রীঃ তিনি এই নূতন প্রণালী মত বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এবং তাহার এই নূতন প্রণালীকে কিওয়ারগার্টেন নামে অভিহিত করেন । (ফ্রেবেলের জন্ম ১৭৮৩ মৃত্যু ১৮৫২ খ্রীঃ)

কিওয়ারগার্টেন প্রণালী কি ?—বালকগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়া তাহাদিগের শিক্ষা পরিচালনা করাই কিওয়ারগার্টেন

প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য। ক্রীড়া ও ক্রীড়নক পদার্থে, বালকগণের একটা স্বাভাবিক আসক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সংসারে সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা খেলার সামগ্রীই বালকের নিকট সর্বাধিক প্রিয়তম পদার্থ। আর সর্ব-কার্য্য অপেক্ষা খেলাই তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম কার্য্য। সুতরাং এই ক্রীড়া ও ক্রীড়নকগুলিকে যদি সুনিয়মিত করিয়া, কোন উদ্দেশ্য-বিশেষ সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তবে বালকগণ জ্ঞানোপার্জন জনিত কষ্টবোধ না করিয়াই বিচালাভ করিতে সমর্থ হইবে।

বিষ্ণুশর্মা।—এইরূপ স্বাভাবিক প্রকৃতি-অনুসৃত শিক্ষাদানের পথ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা কর্তৃকই সর্বপ্রথমে নির্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যখন বিদর্ভরাজপুত্রকে (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন) কোন শিক্ষক বর্ণমালাও শিক্ষা দিতে পারিলেন না, তখন রাজা বিষ্ণুশর্মাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিতপ্রবর রাজপুত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, রাজাকে ইহাই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন যে, “বিষ্ণুশর্মা যে রাজপুত্রের শিক্ষাদানার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন ইহা যেন রাজপুত্র জানিতে না পারেন।” পণ্ডিত দেখিলেন যে বালক কপোত পক্ষীর প্রতি অধিক পরিমাণে অনুরক্ত। তাহার পূর্ববর্তী শিক্ষকগণ বালকের এই কপোতাসক্তি নিবারণের নানারূপ চেষ্টা করিয়া বিফলমগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুশর্মা বালকের এই কপোতাসক্তি নিবারণ না করিয়া, বরং কপোতের সংখ্যা বৃদ্ধি দিকেই যত্ন করিতে লাগিলেন। কপোত ক্রয়, কপোত গৃহ নিগ্ধাণ, কপোতের আহার সংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বিষ্ণুশর্মার বিশেষ যত্ন দেখিয়া বালক বিষ্ণুশর্মার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। এদিকে কপোতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদিগের নামকরণ করা আবশ্যক হইল। রাম, হরি, ইত্যাদিরূপ নামকরণও হইল। কিন্তু এই সমস্ত নামে কপোতকে ডাকিলে, রাজবাড়ীর ঐ নামযুক্ত ভূতোরা আসিয়া উপস্থিত হইত। এই অসুবিধা নিবারণের জন্য বিষ্ণুশর্মা রাজকুমারকে অন্তরূপ নাম রাগিতে উপদেশ দিলেন। বালক তাহার বন্ধু (শিক্ষক নয়) বিষ্ণুশর্মার উপর সে কার্য্যের ভার অর্পণ করিল। বিষ্ণুশর্মা তখন অ, আ, ক, খ, প্রভৃতি একাক্ষরী নামে কপোতগুলির নামকরণ করিলেন। রাজপুত্র এই সমস্ত নূতন অথচ সহজ নাম যত্ন সহকারে অভ্যাস করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু অসুবিধা হওয়াতে, পায়রাগুলিকে সহজে চিনিবার নিমিত্ত তাহাদের গলায় ঐ সমস্ত নামের মাত্ৰৈকিক চিহ্ন (অর্থাৎ অ, আ, ক, খ, অক্ষর) যুক্ত টিকিট বাঁধিয়া দেওয়া হইল। বালক

নিজেই আশ্রয় করিয়া টিকিটগুলি লিখিত, বিখুশগী পরিচালিত করিতেন মাত্র । তার পর কপোতগণের জোড়া মিল করিয়া কর, খল, ইত্যাদি দুই অক্ষর যুক্ত কথা ও তাহার লেখাও শিক্ষা দেওয়া হইল । কপোতের শাবক হইলে অভয়, মদন ইত্যাদি তিন অক্ষরী, জলাপ, পদতল প্রভৃতি চারি অক্ষরী শব্দেরও শিক্ষা হইতে লাগিল । এই প্রণালীএমে মানারূপ অক্ষরও শিক্ষা দেওয়া হইল । বালক কিন্তু এ পণ্যস্ত মনে ভাবিতেছিল যে একাপ নাম ও মস্তক তাহাদিগেরই অপূর্ব সৃষ্টি । এইরূপ সাংকেতিক চিহ্নে কপোতের নানারূপ বিবরণ, কপোতের আহার বিহারের প্রণালী প্রভৃতিও লিখিত হইল । শেষে এই কপোতের গল্প উপলক্ষ করিয়া বালককে অতি অল্প সময়ে রাজনীতি পণ্যস্ত শিক্ষা দেওয়া হইল ।—হিতো-পদেশ ও পঞ্চতন্ত্র চিরদিন ইহার সাফ্য প্রদান করিতেছে—তার পর একদিন রাজপুত্রকে রাজসভায় উপস্থিত করাইয়া বিখুশগী রাজাকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন । বালককে তখন বিবিধ ধর্ম ও রাজনীতিগ্রন্থ পাঠ করিতে দেওয়া হইল । বালক অনায়াসে সেই সমস্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিল ।—কিন্তু তাহাদিগের লিখিত মস্তক অল্পে কল্পে জানিতে পারিল ইহাই জানিবার জন্ত উৎসুক হইল । রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বালকের শিরশ্চূষন করিলেন ও বালকের নিকট বিখুশগীর পরিচয় প্রদান করিলেন । বালক তখন অপ্রাপ্ত লোচনে বিখুশগীর পদধূল গ্রহণ করিয়া ও তাহার সাহিত গাঢ় আলিষন করিয়া অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন । বিপথগামিনী প্রব্রাজকে ফিরাইয়া এইরূপে অভীষ্টপথে আনয়ন করা যাইতে পারে ।

ঔষধ খাইতে কষ্ট হয় বলিয়া নানারূপ মিষ্ট ঔষধের ব্যবস্থা হইতেছে । ভিত্ত ঔষধ ঠোমের (ক্যাপসিউল) মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে । দূরদেশে গমনাগমনের কষ্ট নিবারণ জন্ত জাভগামী রেলগাড়ী ও ষ্টীমারের সৃষ্টি হইয়াছে । এইরূপ সমস্ত বিষয়ের কষ্ট নিবারণ জন্তই চেষ্টা হইতেছে । কিন্তু বালক যে পুস্তক হাতে করিয়াই নয়নদ্বারা বক্ষঃস্থল প্রাবিত করিত সেদিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না । লেখাপড়াকে সুখকর করিবার জন্ত এ পণ্যস্ত কেহই চেষ্টা করেন নাই । মহাজ্ঞা ফ্রেবেলই এই কাধ্যে অগ্রণী হইয়া শিশুশিক্ষার পথ বহুল পরিমাণে সুখকর করিয়াছেন ।

ফ্রেবেল প্রদর্শিত দ্বাদশ বিধান ।—কিওয়ারগার্টেন প্রণালীমত কার্য্য করিতে হইলে শিক্ষকগণের এই দ্বাদশ বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

১। যেরূপ সহজধর্ম্যভাব, ভগবানের সহিত শিশুহৃদয়কে যুক্ত করিতে পারে, শিশুর অন্তরে সেই ভাবের উন্মেষ করিয়া দিবে ও তাহার পোষণে এবং পরিবর্দ্ধনে সহায়তা করিবে ।

২। ধর্ম্মশাস্ত্রের যে সকল সরল শ্লোক বালকগণ মুখস্থ করিয়া উপাসনা বন্দনা প্রভৃতি কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারে, তাহা তাহাদিগকে মুখস্থ করাইতে হইবে ।

৩। জ্ঞানোপার্জন, শরীর সঞ্চালন প্রভৃতি কার্য্যকে মানসিক উন্নতি সাধনের সহায় বলিয়া মনে করিতে হইবে ।

৪। প্রকৃতি ও বাহ্য জগতের বিষয়ে শিশুর চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তিকে পরিচালিত করিতে হইবে ।

৫। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও জীবগণের কার্য্যাকার্য্য বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা মুখস্থ করাইতে হইবে, এবং মধো মধো সুর সংযোগে সেগুলি গান করাইতে হইবে ।

৬। মনের ভাব বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিবার শক্তি লাভের নিমিত্ত শিশুগণকে সাধু ভাষায় বাক্য রচনার পদ্ধতি শিখাইতে হইবে ।

৭। বস্তুর আকারাদি বিষয়ক জ্ঞানলাভার্থ আকার প্রকারের অনুশীলন আবশ্যক । কাদার দ্বারা দ্রব্যাদির প্রতিকৃতি গঠন এই কার্য্যের যথেষ্ট সহায় ।

৮। চেক্ কাগজে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতে হইবে ।

৯। নানাপ্রকার রঙের জ্ঞান প্রদান করিতে হইবে এবং সে সমস্তের ব্যবহার (কাগুজে চিত্র অঙ্কন করিয়া) শিক্ষা দিতে হইবে ।

১০। সাধারণ খেলা বা কিণ্ডারগার্টেন প্রথা নির্দিষ্ট খেলায় বালকগণকে উৎসাহিত করিতে হইবে ।

১১। দিনের বা কালের ঘটনার সহিত যোগ করিয়া গল্প, উপকথা, উপন্যাস প্রভৃতি শুনাইতে হইবে ।

১২। শিশুগণকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্তী সুন্দর সুন্দর স্থানে লমণ করিতে হইবে ।

ক্রীড়নক ব্যবহারে লক্ষ্য ।—কিওয়ারগার্টেন প্রথা কেবল কতকগুলি ক্রীড়া ও ক্রীড়নকের সমষ্টি মাত্র । এই ক্রীড়া ও ক্রীড়নকের যাহাতে সদ্যবহার হয় সেদিকে দৃষ্টি না রাখিলে সমস্ত কার্যই বিফল । ফ্রেবেল এই চারি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন :—

(১) বালকেরা স্বাধীনতা-প্রিয়, সেই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে । তবে যাহাতে বিপথগামিনী না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে । যে কার্য তাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধ তাহাদিগের দ্বারা একরূপ কার্য করান কখনই কর্তব্য নহে ।

নীতিবিগর্হিত বা অনিষ্টজনক কার্য ব্যতীত বালকের অন্ত কোন কার্যে বাধা দেওয়া বিধেয় নহে । তাহাদিগের জন্ত উত্তম উত্তম খেলার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে । ক্রীড়নকগুলি যাহাতে তাহাদিগের মনোমত হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । যাহাতে সমস্ত ক্রীড়নকগুলি তাহারা অবাধে ব্যবহার করিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে । প্রত্যেক পদার্থ যাহাতে বালকেরা ইচ্ছামত পরীক্ষা করিতে পারে, সে ব্যবস্থা করাও আবশ্যক ।

(২) বালকেরা ভাঙ্গা-গড়া ভালবাসে । ধূলি বালি দিয়া তাহারা ইচ্ছামত কত কি গড়ে । এইরূপ ভাঙ্গা-গড়া করিয়া শিশুগণ বস্তুর আকার, বর্ণ, কঠিনত্ব, কোমলত্ব প্রভৃতি নির্ধারণ করে । সুতরাং বালকের ক্রীড়নক-গুলি একরূপ সুকৌশল সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক যে, তাহা দ্বারা বালকগণ যেন নানারূপ ভাঙ্গা-গড়া করিতে পারে । কবি যেমন কবিতার দ্বারা, চিত্রকর যেমন চিত্রের দ্বারা, গায়ক যেমন সঙ্গীতের দ্বারা মানসিক ভাবের বিকাশ করিয়া থাকেন, নানাবিধ দ্রব্যের অনুকরণে নানারূপ গঠনের দ্বারাও বালকগণ সেইরূপ মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে । ইহাতে উদ্ভাবনী শক্তির যথেষ্ট অনুশীলন হইয়া থাকে ।

অনেক অজ্ঞ ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস যে বর্ণপরিচয়াদির শিক্ষা ভিন্ন অর্থাৎ লিখিত পুস্তক বা মুদ্রিত পুস্তকাদির পাঠ ভিন্ন জ্ঞানোপার্জন অসম্ভব। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে বাহ্য জগতের যে সমস্ত বিবরণ লিখিত থাকে, তাহা যদি মুদ্রিত পুস্তক পাঠ না করিয়া বাহ্য জগতের বৃহৎ প্রকৃতি পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়, তবে পুস্তক লিখিত বা অল্প কর্তৃক সংগৃহীত জ্ঞানের আলোচনার আবশ্যকতা কি? বালকেরা যাহাতে এই জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও তত্তৎ দ্রব্যাদি হইতে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, আজ কাল সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্তই পণ্ডিতগণ চেষ্টা করিতেছেন। কিণ্ডারগার্টেন, পদার্থ-পরিচয় প্রভৃতি সেই চেষ্টার কিঞ্চিৎ ফল মাত্র।

(৩) বালকেরা কার্যাপ্রিয়, সর্বদাই কোন না কোন কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে ভালবাসে। আলস্য তাহাদিগের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কিন্তু আবার এক প্রকার কার্যে অধিকক্ষণ বা অল্পক্ষণের জন্তও সুখকর কার্য ভিন্ন অপরূপ কার্যে, মনোনিবেশ করিতে পারে না। খেলাই বালকের পক্ষে সুখকর কার্য। বালকের স্বাভাবিক কার্যকারিণী ইচ্ছাকে সদা ব্যাপৃত রাখিবার জন্ত নানারূপ খেলার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আর সেই খেলাগুলি দ্বারা যাহাতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। উদ্দেশ্যশূন্য ও বিশৃঙ্খল খেলারও আবশ্যকতা আছে বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা কোনরূপ সুফল লাভ হয় না। ফ্রেবেল সাহেব কর্তৃক রচিত ক্রীড়া ও ক্রীড়নকগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

(৪) বালকের বৃত্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে খেলারও পরিবর্তন আবশ্যক। জ্ঞানোপার্জনে, চক্ষুই প্রথমে অধিক কার্যক্ষম হইয়া থাকে। সেই জন্ত প্রথমেই চক্ষুর সাহায্যে আকার, বর্ণ প্রভৃতি শিক্ষা বিষয়ক খেলার আবশ্যক। তৎপরে স্পর্শ—হস্তের সাহায্যে কঠিন, কোমল, ককশ প্রভৃতি শিক্ষা। কর্মোদ্রিগের মধ্যে আবার পদদ্বয়ই সর্বপ্রথমে শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

সুতরাং যে সকল ভঙ্গী-সঙ্গীতে বা খেলায় পদসঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে, প্রথমে তাহাই আরম্ভ করা কর্তব্য। ইন্দ্রিয়াদির এইরূপ ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক শিক্ষারও ক্রমিক উন্নতি বিধানে সাহায্য করা আবশ্যিক। ফ্রেবেল বলিয়াছেন, “ভগবান যাহা (দেহ, মন ও আত্মা) সংযুক্ত করিয়াছেন, মানুষে যেন তাহা বিচ্ছিন্ন না করে।” শিশুশিক্ষায় যাহাতে দেহ, মন ও আত্মার সমবায় উন্নতি বিধান করা যাইতে পারে, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। একটীর উন্নতি করিতে গিয়া যেন অন্যটি উপেক্ষিত না হয়।

ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষার প্রণালী (অর্থাৎ কোন্টীর পর কোন্টীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে, এবং সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বা কি কি বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে) বঙ্গদেশের ডিরেক্টর জীযুক্ত পেডনার সাহেব প্রদর্শিত (বঙ্গদেশের উপযোগী) কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি দৃষ্টে কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যাইবে। কেবল শিশুশ্রেণীর তিন মানের জন্য একরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

(১) চক্ষুর সাহায্যে (রূপ)—

(ক) আকার বিষয়ক শিক্ষা—বেকা (বক) রেখা ; গোলা (সরল) রেখা ; এঁকাবেঁকা (কুটিল) রেখা ; গোলাকার পদার্থ।

(খ) রঙ বিষয়ক শিক্ষা—কাদা ও মাদা পদার্থ ; হুন্দু ও আল পদার্থ ; মীল ও মনুজ পদার্থ।

(২) হস্তের সাহায্যে (স্পর্শ)—

শক্ত (কঠিন) ও নরম (কোমল) পদার্থ ; গম্বুসে (বন্ধুর) ও তেলতেলে (মসৃণ) পদার্থ ; ভারি (গুরু) ও হালকা (লঘু) পদার্থ ; টুনক (উজ্জ্বল) ও ঠগক (ঘাতসহ) পদার্থ।

(৩) জিহ্বার সাহায্যে (রস)—

মিঠা (মিষ্ট) ও টক (অম্ল) পদার্থ; ঝাণ (কটু) ও তিতা (তিক্ত) পদার্থ, জোলা (লবণাক্ত) ও কষা (কষায়) পদার্থ।

(৪) কর্ণের সাহায্যে (শব্দ)—

নানাবিধ জীব জন্তুর শব্দেণ পার্থক্য, মধুর ও ককণ শব্দ, আনন্দের ও নিরানন্দের শব্দ, দূবস্ত ও নিকটস্থ শব্দ, উচ্চ ও মৃদু শব্দ।

(৫) নাসিকার সাহায্যে (গন্ধ)—

সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের গন্ধ, ঘূনের গন্ধ ও নিকটের গন্ধ।

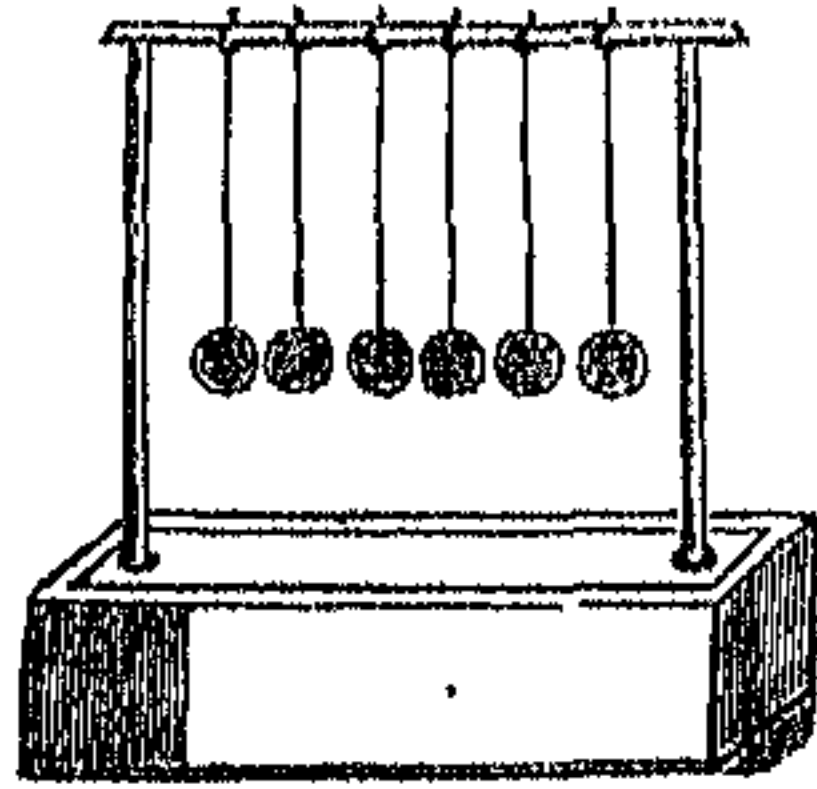
আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—পঞ্চেন্দ্রিয়ের কাযের এইরূপ ক্রম নির্দেশ করিয়াছেন। যে প্রণালীতেই হউক ইন্দ্রিয়াদির বিকাশের সাহায্য করিতে হইবে; আর চক্ষুর কাধাই যে প্রথম আবস্ত করিতে হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

শিক্ষার সরঞ্জাম।—কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার সরঞ্জামগুলি ভাল ব্যয়ে সংগ্রহ করা কঠিন। সুন্দর গৃহ, সুন্দর উদ্যান, সুন্দর ডেকা, চেয়ার, বেঞ্চ এবং বহু সুশিক্ষিত শিক্ষক আবশ্যিক। এক বিদ্যালয়ে ২০ জনের অধিক বালকের শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্তব্য নহে। শিক্ষয়িত্রীগণই কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার উপযুক্ত পাত্রী। শিশুশিক্ষায় যে পরিমাণ স্নেহ, ভালবাসা ও ধৈর্যের আবশ্যিক তাহা পুঙ্খবহুর নিকট আশা করা যায় না। বিশেষ শিশুগণ শিক্ষককে মাতৃমূর্তিতে দেখিলে বিদ্যালয়ের কার্য তেমন ভীতিজনক মনে করিবে না। ফ্রেবেল রচিত ক্রীড়নকগুলির ব্যবহারের যেরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালী, একটীর সঙ্গে অন্যটী যেমন সংযুক্ত, তাহাতে উত্তমরূপ উপদেশ প্রাপ্ত না হইলে কেবল পুস্তক পড়িয়া তাহার ব্যবহার পরিজ্ঞাত হওয়া সুকঠিন। আমাদিগের দেশে কিণ্ডারগার্টেন বলিয়া যে প্রণালী প্রচলিত, তাহা ফ্রেবেল-রূপিত প্রণালীর ছায়া মাত্র।

কিণ্ডারগার্টেন ক্রীড়নক।—ফ্রেবেল ২০ প্রস্থ খেলনা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ক্রীড়নকগুলির সাধারণ উদ্দেশ্য (১) নানারূপ আকারের অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া (২) সংখ্যা, শৃঙ্খলা ও অনুপাত শিক্ষা

দেওয়া (৩) সৌন্দর্য্য ও সমতা শিক্ষা দেওয়া । ইহার মধ্যে ১০ প্রান্তের বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যবহার প্রণালী প্রদত্ত হইল । আমাদিগের বিদ্যালয় সমূহে এই ১০ প্রান্তের কিছু কিছু প্রচলন আছে ।

১ম খেলনা ।—একটা লম্বা বাক্স, তাহার ভিতর উলো মোড়া ছয় রঙের ৬টি রবারের বল—লাল, নীল, হলুদ—তিনটি মূল রঙ, আর বেগুনে, কমলা ও সবুজ—তিনটি মিশ্র রঙ । এই ছয় রঙের ৬ গাছি সূতাও বাক্সে থাকে । আর তিনখানি কাঠের কাঠি থাকে । দুইখান কাঠি বাক্সের উপর খাড়া করিয়া, আর একখানা তার উপরে আড়ার মত করিয়া আঁটিয়া



১ চিত্র ।—নানা বঙের বল ।

দেওয়া যাইতে পারে, কাঠিতে একরূপ কতকগুলি ছিদ্র আছে । সূতার দ্বারা এই আড়ার সঙ্গে বল ছয়টি বুলাইতে পারা যায় ।

এই খেলনা খুব ছোট ছোট ছেলেদের (বয়স ৩।৪ বৎসর) জন্ম রচিত । রঙ, আকার ও সংখ্যা শিক্ষা দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য ।

এই প্রথম শিক্ষা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বালকদিগকে শুদ্ধ ভাষায় কথা-বার্তা বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । শৃঙ্খলাশিক্ষাও এই সময়েই আরম্ভ করা হয় ।

এই বয়সের সাহায্যে নানারূপ খেলা শিখাইবার বিধান আছে । নিম্নে আদর্শ স্বরূপ কয়েক প্রকার খেলা বর্ণিত হইল । প্রথমে এক একটা বল লইয়া খেলা আরম্ভ করিতে হইবে । পরে বলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে । সূতার সহিত বুলাইয়া বা আলাগা ভাবেও বলগুলির ব্যবহার করা যাইতে পারে । ছোট ছোট বালকদিগের শিক্ষায় এক কথা পুনঃ পুনঃ বলা আবশ্যক বিধায়, অনেক কথার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে ।

প্রথম পাঠ (উদ্দেশ্য :—বহুর আকার ও বর্ণ শিক্ষা, বহুর স্বর উচ্চারণ শিক্ষা ও নুতন কথা শিক্ষা ।)

প্রণালী :—ছেলেদের মেয়েদের প্রত্যেকের হাতে এক একটা করিয়া বল্ দাও । কি এক জনের হাতের নিকট বস্তুটি রাখিয়া তাহাকে সেগুলি এক এক করিয়া চালাইয়া করিতে শিক্ষা দেও । এই শৃঙ্খলাশিক্ষার আরও । শিশুগণকে বল্ গুলি নিজ নিজ সম্মুখে রাখিতে বল । তারপর প্রফুল্ল বদনে সুন্দর প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ কর :—

আমাদের এই খেলার জিনিষ গুলির নাম কি ? বল্ । আমার কাছেও একটা বল্ আছে, দেখেছ ? আমি আবার এই বল্ টা হাতে লইলাম, তোমরাও তোমাদিগের সকলের বল্ গুলি হাতে লইয়া বলত “আমরা বল্ হাতে লইয়াছি” । (শিশুগণের তদ্রূপ করণ) নিজে নিজে বল্ টা বেশ করিয়া দেখ, বল্ টা কেমন ? গোলা, ঠিক কথা, বল্ যে, “আমাদের বল্ গোল” । (শিশুগণের তদ্রূপ কথন) ।

বল্ টা আর কেমন ? “নবম”—ঠিক কথা । সকলে বল্ যে “আমাদের বল্ নবম” (শিশুগণের তদ্রূপ কথন) । সকলে নিজ নিজ বল্ হাতে টিপিয়া দেখ, নবম কিনা । “আমাদিগের বল্ নবম” । আচ্ছা বল্ টা আবার দেখ । বল্ টা কি দিয়া তৈয়ারি করিয়াছে ? “বল্ উল তৈয়ারী” । আচ্ছা বেশ, সবলা তাব নিজে বল্ টার আর কি কথা বলিতে পাবে দেখা যাউক । “লাল” । লাল না বলিয়া “এই বল্ টা লাল” এইরূপ বল । তারপর সরলার বল্ টার রঙের সঙ্গে আর সকলের বহুর বড় মিলান করিয়া দেখিতে বল “এক রকম কিনা ?” “আমাদের বল্ একরকম বঙেন নয় ।” [পুনরাবোচনা—“আমাদের বল্ গোল” । “আমাদের বল্ নবম” “আমাদের বল্ উল দিয়া তৈয়ারী” “সরলার বল্ লাল” তারপর বল্ গুলি একত্র করিয়া হাতে হাতে ফিরাইয়া দেও ।]

২য় পাঠ (উদ্দেশ্য :—ডান হাত ও বাম হাত শিক্ষা দেওয়া । ‘উপর নীচ’ কথা শিক্ষা দেওয়া) প্রণালী—পূর্বে প্রণালীর মত এক একটা বল্ হাতে থাকিবে । ছুচাটী প্রশ্নের দ্বারা পূর্বে দিনের পাঠের পুনরাবোচনা করিয়া পাঠ আরম্ভ করিতে হইবে ।

আজ বল্ দিয়া আমরা আর এক খেলা খেলিব । আচ্ছা, তোমাদের কয়খানা হাত ? হাত তোলত ? (শিক্ষকের নিজেরও তদ্রূপ করণ) আবার হাত নাগাও । দরদার দিকে যে হাত সেই হাত তোল । আর এক হাতও তোল । দুই হাতের দুই নাম । “দরদার দিকে যে হাত তার নাম কি” ? “ডান হাত ।” “হাঁ, ঠিক কথা, সকলে ডান হাত তোল ।” “আমরা ডান হাত তুলিয়াছি” । “ডান হাত মাথার উপর রাখ ।” “আমরা ডান হাত

মাথার উপর রাখিয়াছি ।" "ডান হাতে বল লও" "আমরা ডান হাতে বল নিয়েছি ।" "হাত নামাও, বল রাখ ।" তাহার পর বা হাতেও একরূপ অভ্যাস করাইবে ।

"আচ্ছা বাথালের কোন্ হাতে বল আছে বলত ?" "ডান হাতে" । একরূপ শিক্ষক ডান বাম জ্ঞান কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিবেন । "বল টা টেবিলের উপর রাখ ।" "বল টা কোথায় আছে ?" "বল টেবিলের উপর আছে ।" একরূপ বেঞ্চের উপর রাখিতে বল । তারপর টেবিলের নীচে, তাবপর বেঞ্চের নীচে ইত্যাদি শিক্ষা দাও । সকলেই বল ডান হাতে কর, আবার বা হাতে কর । ইত্যাদি রূপে এক সঙ্গে কাযা করা শিক্ষা দাও । তাবপর পূর্ববৎ বল গুণি একত্র করিয়া বাক্কে রাখিয়া দাও ।

অনেক বিদ্যালয়ে ছুটির সময় ডান বাম প্রভৃতি শিশুর মাঝামাঝি একরূপ প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে , সকলে ডান হাতে পুস্তক দাও, সকলে বাম হাতে পুস্তক দাও, ডান হাত উঠাও, ডান হাত নামাও, বাম হাত উঠাও, বাম হাত নামাও, দাড়াও, একে একে বাড়ী যাও ইত্যাদি ।



১৪ চিত্র ।—ডান বাম পরিচয় । মণিপুরী শিশুশিক্ষালয় ।

তৃতীয় পাঠ । উদ্দেশ্য—নীলরঙ শিক্ষা দেওয়া । (কেহ কেহ প্রথমে লাল রঙ শিক্ষা দেওয়া ভাল মনে কবেন, আবার কেহ কেহ প্রথমে কাল ও সাদা শিক্ষা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করেন । শিক্ষক নিজের অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিবেন । এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নাই । আমরা এখানে নীল রঙ শিক্ষার আদর্শ প্রদান করিলাম ।)

প্রণালী :—পূর্বের মত বালকদিগের দ্বারা বল্‌গুনি সন্দের হাতে হাতে বিতরণ করিয়া পূর্ব পাঠের পুনরালোচনার পর, “যাহার হাতে নীল রঙের বল্‌ আছে, সে হাত তোল ।” “আচ্ছা সুধার বল্‌টা নীল কিনা বলত ?” “না এটা নীল নয় ।” (তারপর সুধার বল্‌টা নীলরঙের বলের পাশে রাখিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে বল) “যাহার যাহার নীল বল্‌ নাই, তাহারা এই বাগ হইতে এক একটা নীল বল্‌ বাহির করিয়া লও ।” কেহ কেহ ভুল করিলে, তাহাদিগের ভুল বল্‌টা নীল রঙের বলের পাশে রাখিয়া ভুল সংশোধন করিয়া দিবে । “সকলেই নীল বল্‌টা ডান হাতে লও, আর বল যে আমার ডান হাতের বল্‌টা নীল ।” “আচ্ছা এই ঘরে নীল রঙের আর কোন জিনিষ আছে ?” ননীল মাড়ীখানি নীল ।” আকাশের রঙ কোন বর্ণের মত ? “আকাশের রঙ এই নীল বর্ণের মত ।” (এখানে এক কথা বলা আবশ্যিক । এই যে নীল বর্ণের কথা বলা হইতেছে, ইহা আকাশের মত নীল বর্ণের কথা অর্থাৎ আসমানী রঙের কথা ; গাঢ়নীল অর্থাৎ নীল বড়ির মত রঙের কথা নহে) “কি রকম দিনে আমরা আকাশে বেশী নীল দেখিতে পাই ?” “যে দিন মেঘ থাকে না সেই দিন আকাশ বেশ নীল থাকে ।” তারপর আসমানী রঙের কাগজ, কাপড়, ফুল প্রভৃতি দেখাইয়া এই রঙটা বেশ করিয়া পরিচয় করাও । অস্থায়ী রঙের পরিচয় করাইবারও এই রীতি । রঙগুলি মিশাইয়া শিক্ষা দিতে হইবে । কোন্‌ কোন্‌ রঙ মিশাইলে কিরূপে কি রঙ উৎপন্ন হয় পরে লিখিত হইল ।

চতুর্থ পাঠ ।—ঝুলান বল । উদ্দেশ্য—ঝুলান ও ঘূর্ণন শিক্ষা দেওয়া ।

প্রণালী :—ভিন্ন ভিন্ন রঙের বিষয় পুনরালোচনা করিয়া, শিক্ষক নিজহস্তস্থিত বলে এক গাছি সূতা ঝুলিবেন । বালকগণকে তদ্রূপ সূতা বাঁধিতে শিখাইয়া দিবেন । তারপর নিজ হস্তস্থিত বল্‌টা ঝুলাইয়া দিয়া ... “বল্‌টা কি করিতেছে ?” “বল্‌টা ঝুলিতেছে” “এ” রকমের আর কি ঝুলিতে দেখিয়াছ ?” “দোলনায় করিয়া ছোট ছেলেকে এইরূপ ঝুলাইয়া থাকে ।” “আর কি জান ?” “ঝুলনমাজা ও দোলনের সময় ঠাকুরকে এই রকমে ঝুলান হয় ।” “আর কোন জিনিষকে এরূপ ঝুলিতে দেখিয়াছ ?” “বড় ঘড়ির দোলন এইরূপে ঝুলিতে থাকে ।” “ঘড়ির দোলন, ঝুলিবার সময় কিরূপ শব্দ হয় ?” “টক্‌ টক্‌ শব্দ হয় ।”

তোমাদের বল্‌গুলি বড়ির দোহানের মত তুলেও" । তারপর বদাটা পুরাঠিয়া তাহার সম্বন্ধেও এইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে ।

পঞ্চম পাঠ ।—বল্‌ ও বদোব মত আকারের বাদ্য নিম্নে একটা ভঙ্গী মধ্যাত (ভঙ্গী-সঙ্গীত প্রকরণে এ বিষয় বিশদীকৃত করা হইয়াছে ।)

প্রণালী :—হস্তের ভঙ্গী করিয়া নিম্নলিখিত কবিতা সমন্বয়ে আবৃত্তি করিলে :—

বল্‌ গোলা (১)

বেলা গোলা (২)

আল গোলা (৩) গোলা (৪)

গড়িয়ে দিলে (৫)

গড়গড়িয়ে (৬)

অগ্নি তাদের (৭) ঢোলা (৮)

(বেল গড়াইয়া দিলে, কেমন গড়াইয়া যায়, তাহা বালকগণকে পূর্বেই একবার দেখাইতে হইবে । হস্তের ভঙ্গীর প্রকরণ :—

(১) ডান হাতে গোলার আকার দেখাইয়া

(২) বাঁ হাতে " " "

(৩) (পুনঃ ডান হাতে) " "

(৪) " বাম হাতে " "

(৫) ডান হাতে গড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গী করিয়া

(৬) বাঁ হাতে " "

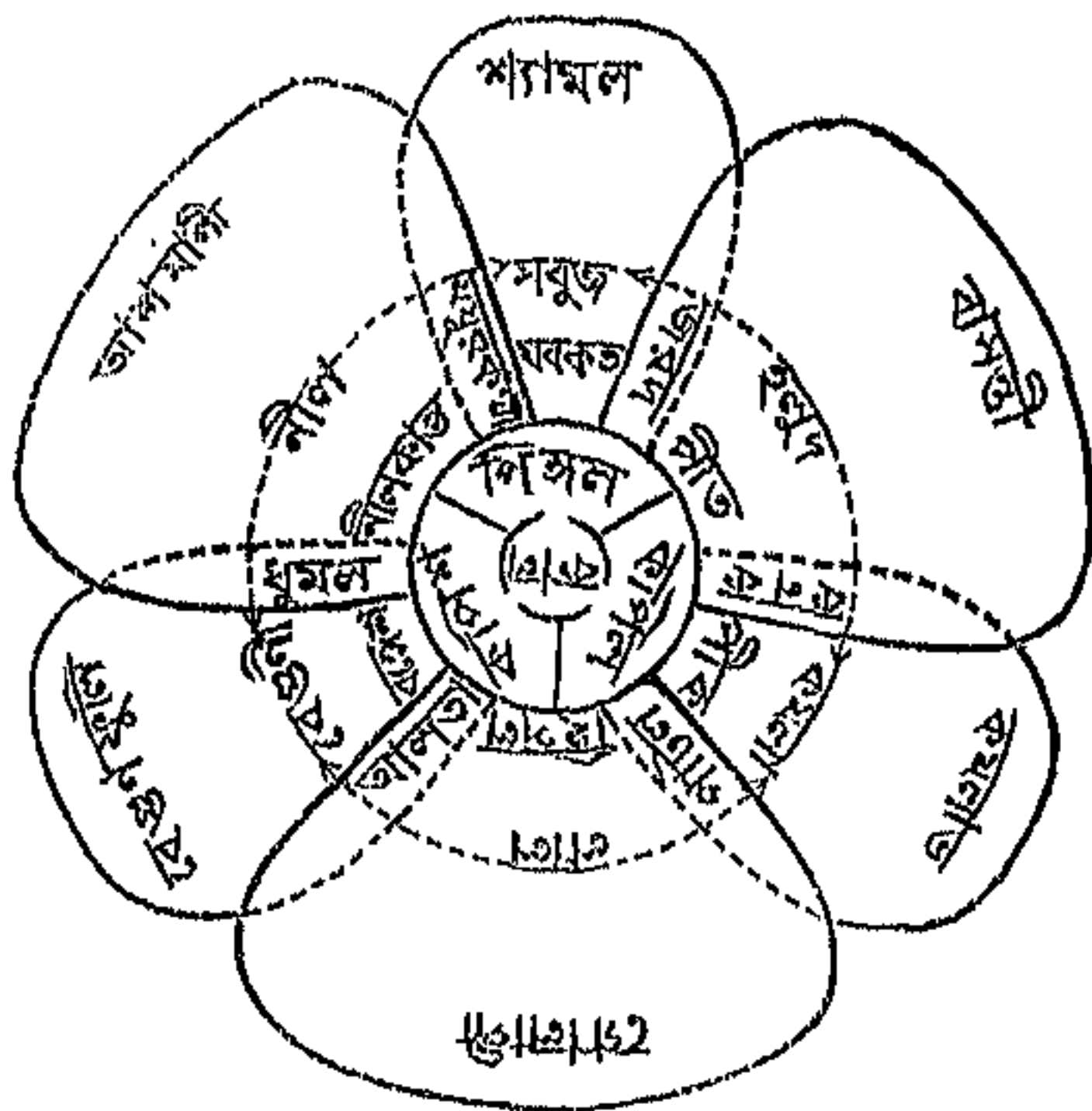
(৭) (পুনঃ) ডান হাতে " "

(৮) বাম হাতে

এইরূপ ভাবে বল উপলক্ষ করিয়া বালকগণকে নানা বিষয় শিখান দেওয়া যাইতে পারে । এই পাঁচ পাঠে প্রণালীর কেবল আভাস ও আদর্শ মাত্র দেওয়া হইল । শিক্ষকগণ নিজেই নুষ্টি পরিচালনা করিয়া এইরূপ নানা পাঠের সৃষ্টি করিতে পারিবেন ।

রঙের বিবরণ ।—কোনটী মূল রঙ, কোনটী মিশ্রিত রঙ, কোন রঙের সহিত কোন রঙের মিশ্র করিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মিশ্র রঙের উৎপত্তি হয় তাহা শিক্ষকগণ নিজে উত্তমরূপ না জানিলে বালকগণকে শিক্ষা দিতে পারিবেন না । এইজন্য নিম্নে কিঞ্চিৎ রঙের বিবরণ প্রদত্ত হইল । কিন্তু তাই বলিয়া এই রঙের বিবরণ বালকদিগকে এক

দিনে কি এক বৎসরে শিক্ষা দিতে হইবে না । ক্রমে ক্রমে তাহারা যতই বড় হইবে ততই নানাক্রম মিশ্র রঙের বিবরণ নিখিতে থাকিবে ।



১৫ চিত্র ১—রঙ পবিচয় ।

লাল—(মূলবর্ণ) গোহিত, রক্ত । ডালিম ফুলের বর্ণ ; পলাশ ফুল, চোনে লম্বা ফুলের বর্ণ, নিশুদ্র রক্তের বর্ণ লাল । পদ্মমূর্খী বা, শিমুল ফুল, সিন্দূর, হিম্মুল বর্ণ । সাধারণ গোলাপের বর্ণ গোলাপী বা রক্তমস্ত । লাল বড় পাতলা হইলেই গোলাপী হয়, আর গাঢ় হইলেই হিম্মুল হয় ।

নীল—(মূলবর্ণ) সাধারণতঃ আকাশের বর্ণকে নীল বর্ণ বলে । কিন্তু প্রকৃত নীল বর্ণ, আকাশের নীল বর্ণ হইতে গাঢ় । অপরাজিতা, নান পাটো, তিমির ফুলের বর্ণ কতক নীল । হাইকোর্টের উকীলবাবুদিগের গাউনের বর্ণ প্রকৃত নীল । আকাশের বর্ণকে আসমানী রঙ বলে । খুব গাঢ় নীল বর্ণকে (প্রায় কাল রঙের মত) নীলকাস্ত বলে । দাঁড়কাকের রঙ কাল নয়, নীলকাস্ত ।

হলুদ—(মূলবর্ণ) হলুদ বা হলুদে । শুক হলুদের বর্ণ । আভগী ফুল, করগী ফুল, কোন কোন গাঁদা ফুল হলুদ বর্ণের । হলুদ গাছ হঠলে পীত বর্ণে । পিত্তবোগ বর্ণ পীত । পাতলা হলুদকে বাসন্তী বলে, যেমন মনশ ফুলের রঙ ।

সবুজ—(মিশ্রবর্ণ) নীলে হলুদে মিশাইলে সবুজ হয় । কদার পাতা, কচুপাতা, ধান গাছ, প্রভৃতির রঙ । সাধারণতঃ সকল পাতাকেই সবুজ বলা হইয়া থাকে, কিন্তু অনেক পাতার বর্ণ ঠিক সবুজ নয়, সবুজের সহিত একটু কাদা মিশ্রিত । গাছ সবুজকেই মরকত বলে ; দূর হইতে অপক ধানের ক্ষেত যেমন দেখায় । শ্যামলা—পাতলা সবুজ, নতুন ধানের বর্ণ বা ধানের উপর তিন চারি দিন এক খানা চট চাপা দিয়া রাখিয়া পরে সেটাই মরাইলে, ধানের যে রঙ দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাতে নীলের ভাগ অতি সামান্য থাকে । আমাদিগের দেশের অনেক চিত্রকর রামচন্দ্রের চিত্রে সবুজ বঙ ব্যবহার করিয়া থাকেন ; কিন্তু সেটী অত্যন্ত ভুল । রাসেব বর্ণ নবদাবাদলের ছায় গৌরবর্ণ ।

কমলা—(মিশ্রবর্ণ) লাল ও হলুদে মিশাইলে কমলা হয় । পাকা কমলার বর্ণ । গাছ-কমলাবর্ণকে পোক বলে, কাটা হলুদের রঙ । চুণে হলুদে মিশাইলে পোক বর্ণ হয় । অনেক গাঁদা ফুলের বর্ণ পোক । পাতলা কমলা বর্ণকে কমলাঙি বলে, যথা কমলা লেবন শুক গোমার বঙ, বা টোম কমলা লেবন রঙ ।

বেগুণে—(মিশ্রবর্ণ) নীলে ও লালো মিশাইলে বেগুণে হয় । কচি বেগুণের রঙ । বেগুণ বড় হইলে যে গাছ বেগুণে রঙ হয়, তাহাকেই বেগুণ বা বেগুণ বড় বলে । বেগুণ ফুলের বর্ণ পাতলা বেগুণে বা বেগুণ ফুলী ।

আলতা—লালের সহিত একটু নীল মিশ্রিত, যথা মেডেটার বর্ণ, আলতার বর্ণ ।

পাটল—লালের সহিত সামান্য কাদা, যেমন ভট্টের বর্ণ, পাটলেকদি রঙ ।

কনক—পাতের সহিত অল্প লাল মিশ্রিত, পাকা গোমার বর্ণ ।

রস—হলুদের সহিত একটু সবুজের আভা, যেমন পাকা বাতানা বেগুন (বাগুন) রঙ ।

ময়ূরকণী—নীলের ভাগ অধিক যুক্ত সবুজ, ময়ূরের কণ্ঠের রঙ ।

ধূমল—নীলের মধ্যে একটু বেগুণের আভা, রামধনুর নিম্নাংশের রঙ ।

কপিল—লাল হলুদের সহিত একটু কাল রঙের মিশ্রণ ।

কপিল—নীল ও লালের সহিত একটু কাল ।

পিঙ্গল—নীল ও হলুদের সহিত একটু কাল ।

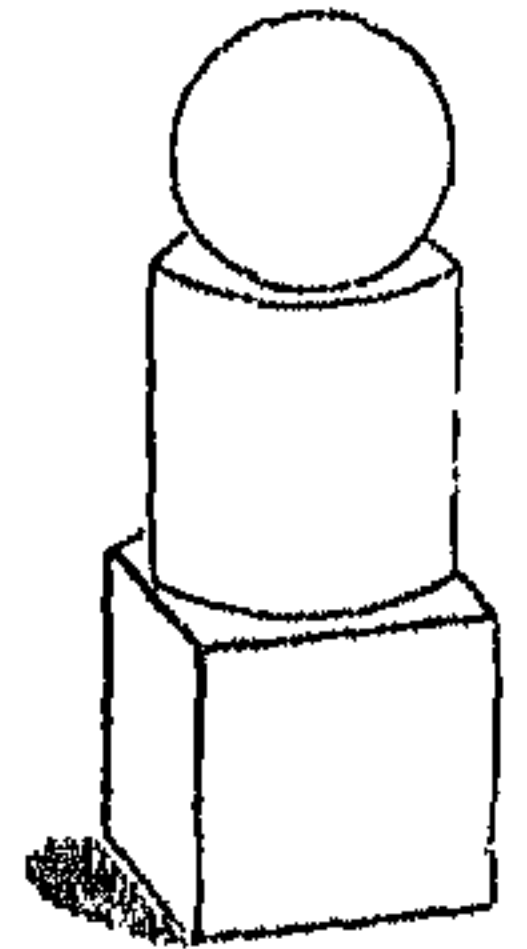
ধূসর—সাদার সহিত কান মিশ্রিত, ছাফ । ধূসরের সহিত একটু লাল বা হলুদ মিশ্রিত হইলে কটা বড় হয় । কোন প্রকার জ্বোয়র প্রকৃত রঙের নিবর্ণিত খাটানে তাহাকে পাংশু পাংশুটে, পিংশে বলা হয় ।

রঙ বন হইতে হইতে কান বড়ের দিকে অগ্রসর হব, আবার পাতলা হইতে হইতে সাদা রঙের দিকে চলিয়া যায় ।

মিশ্র রঙের মধ্যে সবুজ, বেগুনে ও কমলা রঙের উৎপত্তি বালকগণের সম্মুখে শিক্ষক পরীক্ষা করিয়া দেখাইবেন । লাল, নীল ও হলুদ রঙের গুঁড়া কিনিতে পাওয়া যায় । সেইগুলি জলে গুলিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিবেন । পরীক্ষার সময় একটা চীনে মাটির বাটীতে বা বাছুরকে প্রথমে একটা রঙ ঢালিবেন—মনে করুন হলুদ । তারপর এই হলুদের সহিত একটু একটু করিয়া নীল রঙ মিশাইয়া ও তুলিব দ্বারা সেই রঙ কাগজে লাগাইয়া শ্রামল, সবুজ ও মরকত বর্ণ দেখাইয়া দিবেন । এইরূপে বেগুনে ও কমলা মিথাইতে হইবে । অত্যাশ্চর্য মিশ্রবর্ণ নিম্ন শ্রেণীতে মিথাইবার আবশ্যকতা নাই ।

২য় খেলনা ।—একটা লম্বা বাক্যের ভিতর একটা কাষ্ঠের গোলা, একটা কাষ্ঠের ঢোল ও একটা কাষ্ঠের ছক । গোলাব ব্যাস, ঢোলের ও ছকের উচ্চতার সমান বা কিছু কম বেশী ।

আর ছকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ সমান । সূতা বাঁধিবার জন্ত ইহাদের গায়ে ছোট ছোট ছক লাগান থাকে । পূর্বের খেলনার সেই বলের সহিত যোগ করিয়া ২য় খেলনার সৃষ্টি । ২য় খেলনার সৃষ্টিতে যে বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বুঝিতে পারিলে, ফ্রোবেলের প্রতিভার কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে । একটা মাটির



গোলায় এক অংশ ছুরি দ্বারা ভূমির সমান্তর করিয়া কাট, ঠিক তার

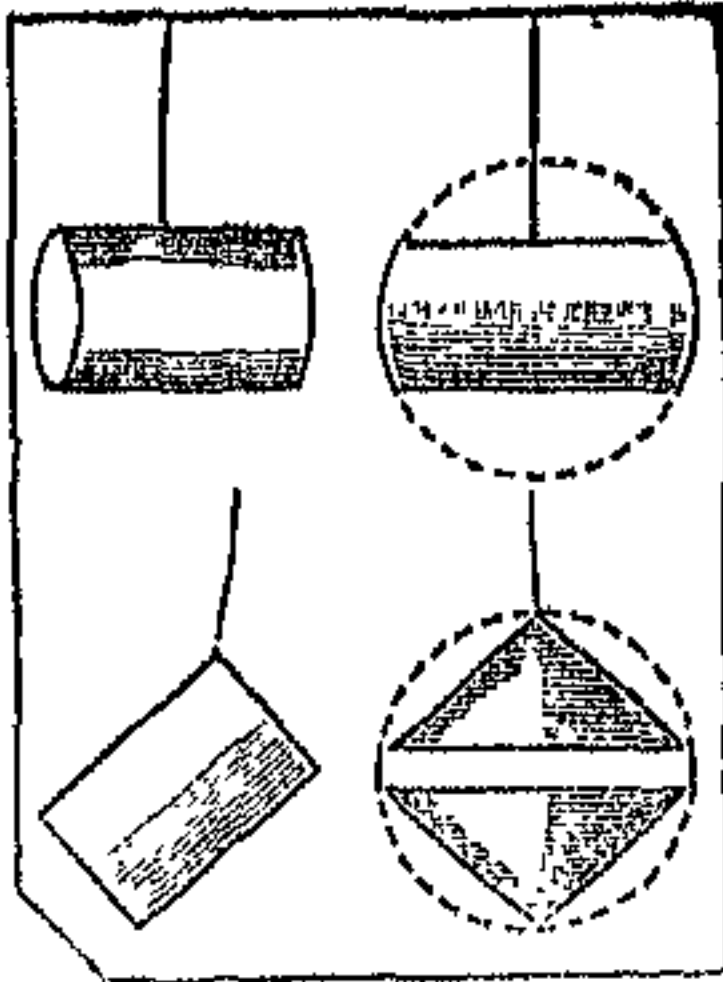
বিপরীত দিকেও এইরূপ করিয়া কাট । গোলা হইতে ঢোল উৎপন্ন হইল । আবার এই ঢোলের কুজ পার্শ্ব চারি ভাগ করিয়া কাটিলেই ছক হইল । সেই প্রথম খেলার বন্ অন্বেষণ করিয়া ঢোল, আর ঢোল হইতে ছক গঠন করা হইল । দ্রব্যাদি ব সাধারণ আকারও এই তিন প্রকার, গোলাকার, ঢোলাকার ও ছকাকার । এই বিশ্ববাজ্যে গোলাকার জিনিসই বেশী । চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্তই গোলাকার । নয়ন মেলিয়াই আমরা প্রথম এই সমস্ত দেখি, আর এই সমস্ত আলোক দান করিয়াই আমাদেরকে সমস্ত দেখায় । তারপর পৃথিবীতে দেখি ঢোলাকার জিনিসই বেশী । গাছের গুঁড়ি, ডালপালা, মানুষের অঙ্গ, পশু পক্ষীর অঙ্গ সমস্তই ঢোলাকার । ছকাকার দ্রব্য আমরা করিয়া লইয়াছি ; আমাদের গৃহ সামগ্রীর মধ্যে অনেক গুলিই ছকাকার । যথা, দালান, কোঠা, বাক্স, তক্তপোষ, পুস্তক, টেবিল ইত্যাদি ।

গোলায় কথা । — গোলা, ঢোল ও ছক বালকের সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কোনটী দেখিয়াছে । বালক অবশ্য গোলায় কথাই বলিবে । তাবপর সেই উলের বন্ ও এই কাটের গোলা দুইটী তুলনা করিতে আবন্ত কর । উলের বন্ খসখসে, নানা রঙের, উলের বন্ নবম, গড়াইলে শব্দ হয় না, তেমনি তাড়াতাড়ি গড়ায় না, ফেলিয়া দিলে তেমনি শব্দ হয় না, লাফাইয়া উঠে । কিন্তু কাটের বন্ তেমনে, মাদা বড়ের, কাটের তৈয়ারী, শক্ত, গড়াইলে শব্দ হয়, তাড়াতাড়ি গড়ায়, ফেলিয়া দিলেও শব্দ হয়, আর তেমনি লাফাইয়া উঠে না । এইরূপ কাটের বন্কে গোলা বনে । লোহার, মাসার, পিতলের বন্কেও গোলা বনে ।

বালকেরা গোলায় মত যে সকল জিনিস দেখিয়াছে তাহার নাম করিবে । বেগ, তাল, কুল, কমলা, গোলা, মাবুল, ছানাবড়া, গোলক ইত্যাদি যে কয়টা নাম করিতে পারে । শিক্ষকও ইহার মধ্যে ২।১টা সহজ মত দেখাইয়া শিখাইয়া দিতে পারেন । তারপর গোলা বুলাইয়া দেখাইবেন যে গোলাও বনের মত গুলে । গোলা ঘুরাইয়া দেখাইবে যে গোলা ঘুরাইলেও গোল দেখায় । তারপর বালকগণকে গোলাকার করিয়া দাঁড় করাইয়া একজনকে গোলাটী অন্নের নিকট গড়াইয়া দিতে বল । সে আবার তার নিকটবর্তী বালকের নিকট

গড়াইয়া দিলে ইত্যাদি প্রণালীতে বালকেরা গোলা বড়িয়া খেলা করিলে । দুইজন বালকের মধ্যে যে দূরত্ব সেই দূরত্বের হিসাবে কি পরিমাণ জোরে গোলা চালান আবশ্যক বালকেরা তাহা বুঝিতে পারিলে । হাতের স্থিরতা জন্মাইবে । চক্ষুর স্থির দৃষ্টিরও অভ্যাস হইবে, স্বতন্ত্র চক্ষু ও হস্তের একত্র কাম্য করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে ।

টোলের কথা ।—গোলায় মচিত, ছকের ও টোলের আকারগত পার্থক্য কি ? টোলের পাশে গোলায় মত গোলা, আর উপর নীচের ভাগ ছকের পাশের মত চ্যাপটা ।



বালকেরা টোলের মত যে সকল চিনিয় দেখিয়াছে তাহার নাম করিলে । (গোলা খাম, বাঁধাখার ঢোল, গাছের গুঁড়ি, বাছ, মোতল, গোলম ভাঙুতি) গোলাকে যে কোন পাশে গড়াইয়া দিলেই গড়াইয়া যায়, কিন্তু টোলকে গোলায় মত পাশে গড়াইলেই

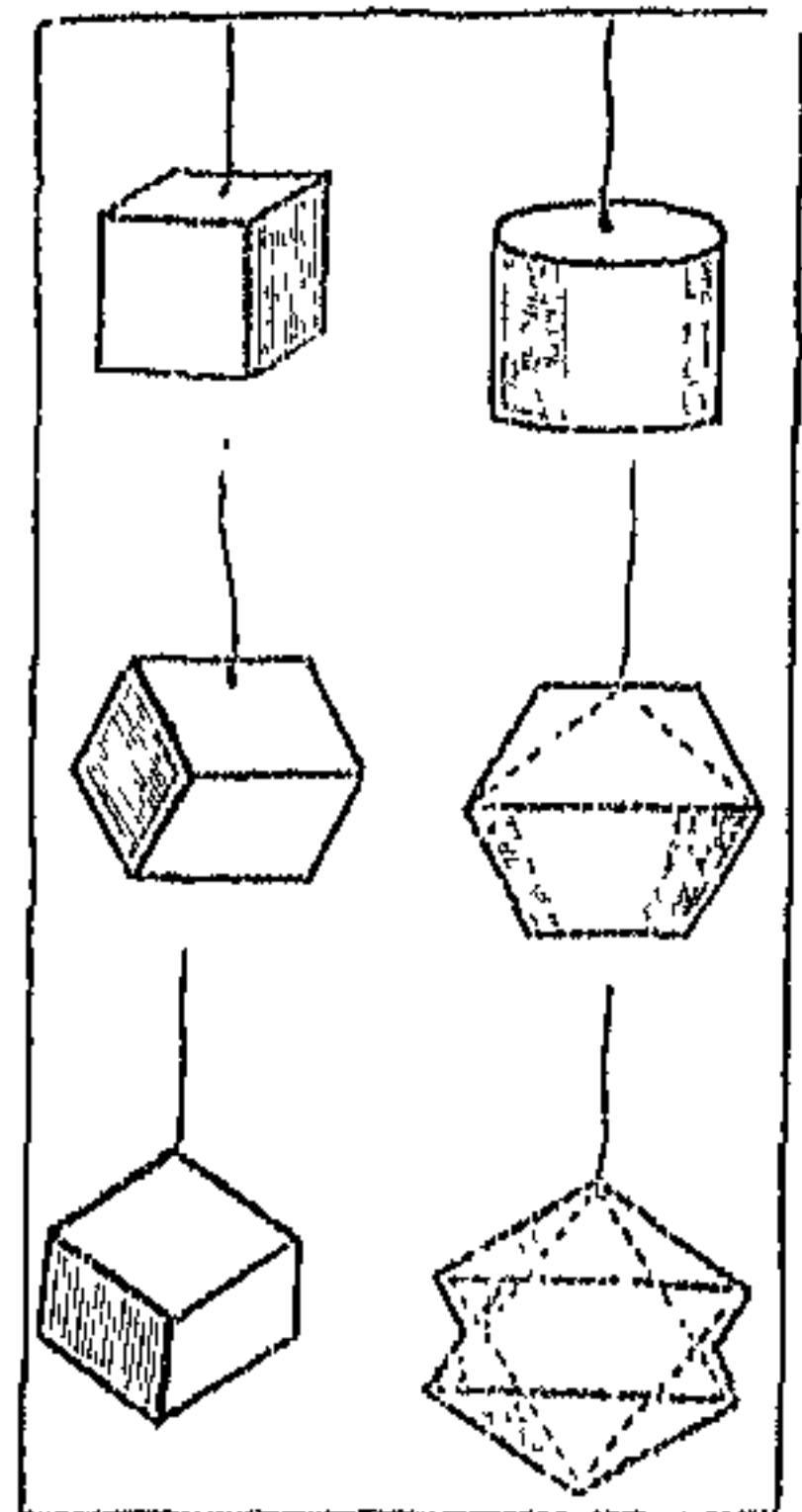
১৭ চিত্র ।—টোল দৃশ্য ।

গড়াইয়া যায়, চ্যাপটা পাশে গড়াইয়া না । টোলকে লম্বালম্বি বুলাইয়া ঘুরাইলে টোলের মতই দেখায় কিন্তু পাশে বুলাইয়া ঘুরাইলে গোলায় মত দেখায় । (১৭ চিত্র দেখ)

আবার এক ধরনের বুলাইয়া ঘুরাইলে ছুঁটা লাগিয়া নাথায় মত দেখায় ।

এই টোল গুড়াইয়াও পূর্বের মত খেলা করা যাইতে পারে । কিন্তু এ খেলা যে গোলায় মত সৃষ্টিশীলজনক হইবে না অর্থাৎ টোল যে গোলায় মত তাঁর উদ্ভাসরূপে গড়াইবে না তাহা বালকেরা উদ্ভাসিতে পারিলে ।

ছকের কথা ।—ছকের মত চিনিয়ের নাম কর (বাক্স, পুস্তক, মাঝান, ইট



১৮ চিত্র ।—ছক দৃশ্য ।

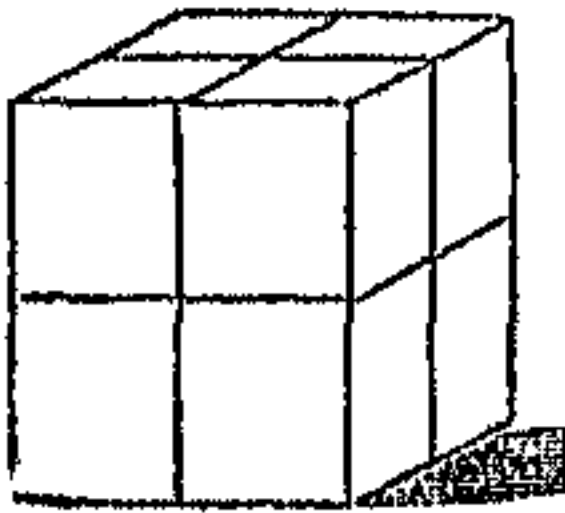
ইত্যাদি), পাশ (৬টি) ধার (১২টি) ও কোণের (৮টি) পরিচয় করাও ও গণনা করাও । তারপর ছকের ঘূর্ণনে ভিন্ন ভিন্ন আকার দেখাও । ১৮ চিত্র দেখ ।

(১) পাশে স্থিত বাক্সের ঘূর্ণনে চোয়াল হয় (চোয়ালের সহিত ছকের মিল) ।

(২) একধারের শিরের উপর স্থিত বাক্সের ঘূর্ণনে গাড়ীর চাকার ঘূর্ণের মত দেখায় ।

(৩) এক কোণে ঘূর্ণনে দুইটা মোচার মাপার মত দেখায় ।

৩য় খেলনা ।—একটা দুই ইঞ্চি ছককে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধে সমান ভাগে ভাগ করিয়া ৮টা ১ ইঞ্চি ছক করা হইয়াছে ।



১৯ চিত্র—ছক ।

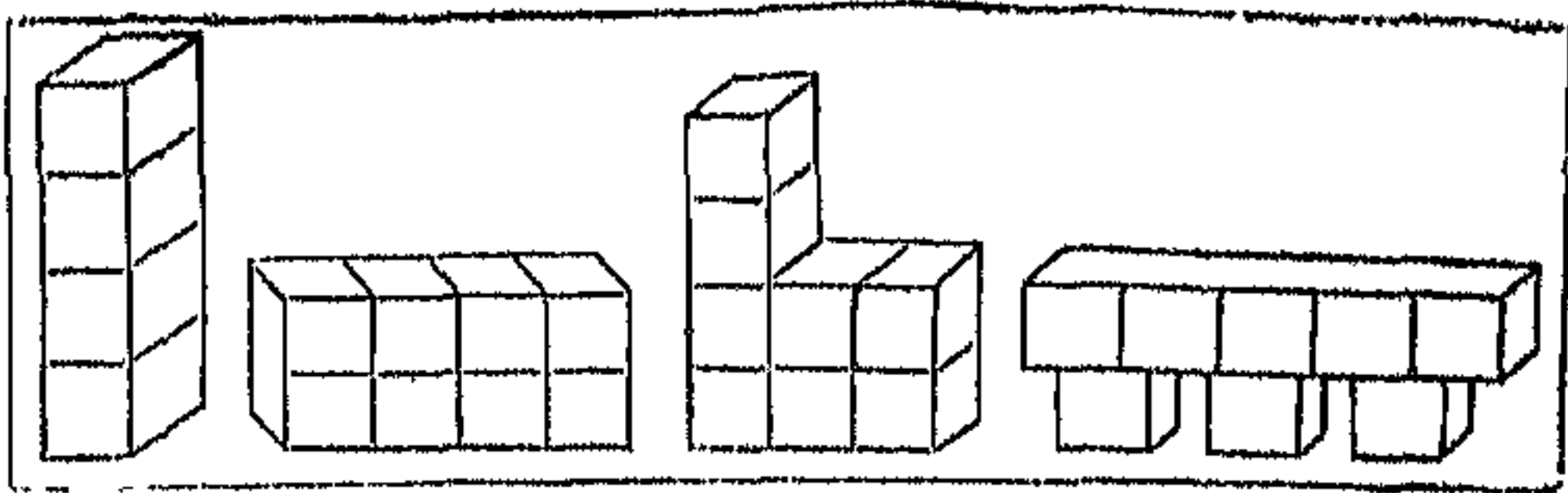
২য় খেলনায় ছকের সাধারণ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । এই ছককে এখন ভাঙ্গিয়া দেখাইতে হইবে । বালকেরাও একটা খেলনা পাইলে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া পরীক্ষা করিতে ভালবাসে । ভাঙ্গা-গড়া বালকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি । এই ৩য় খেলনা, ৩ বৎসরের

হইতে ৬ বৎসরের বালকের জন্য রচিত । বয়সভেদে বিষয় নির্ধারণ করিতে হইবে ।

বালকের সম্মুখে ছকটি স্থাপন কর । বালকেরা আস্ত ছক ভাঙ্গিয়া যাহাতে আবার পূর্ববৎ গড়িতে পারে সেরূপ শিক্ষা দাও ।

গঠন শিক্ষা ।—৩।৪ বৎসরের বালকগণের পক্ষে পদার্থের অনুকরণে গঠন করা আশ্চর্যজনক । ছকগুলি সাড়াইয়া গাম, দেওয়াল, চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল প্রভৃতির অনুকরণ করা যাইতে পারে । শিক্ষক নিজের টেবিলের উপর গঠন করিবেন, বালকেরা তাহাদের নিজ নিজ ছক দ্বারা তাহাদের সম্মুখে মাটি বা টেবিলের উপর শিক্ষকের অনুকরণে গঠন করিবে । নিম্নে গঠনের কয়েকটা নমুনা দেওয়া হইল :—

কোন জন্মের গঠন করিতে শিখিলেই চলিবে না, সেই জন্য সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানবা বিষয়ও কিছু কিছু শিক্ষা দিতে হইবে । নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ, চেয়ার উপলক্ষ করিয়া একটা পাঠের অভ্যাস দেওয়া হইল (চিত্র দেখ) ।



গাম

দেয়াবা

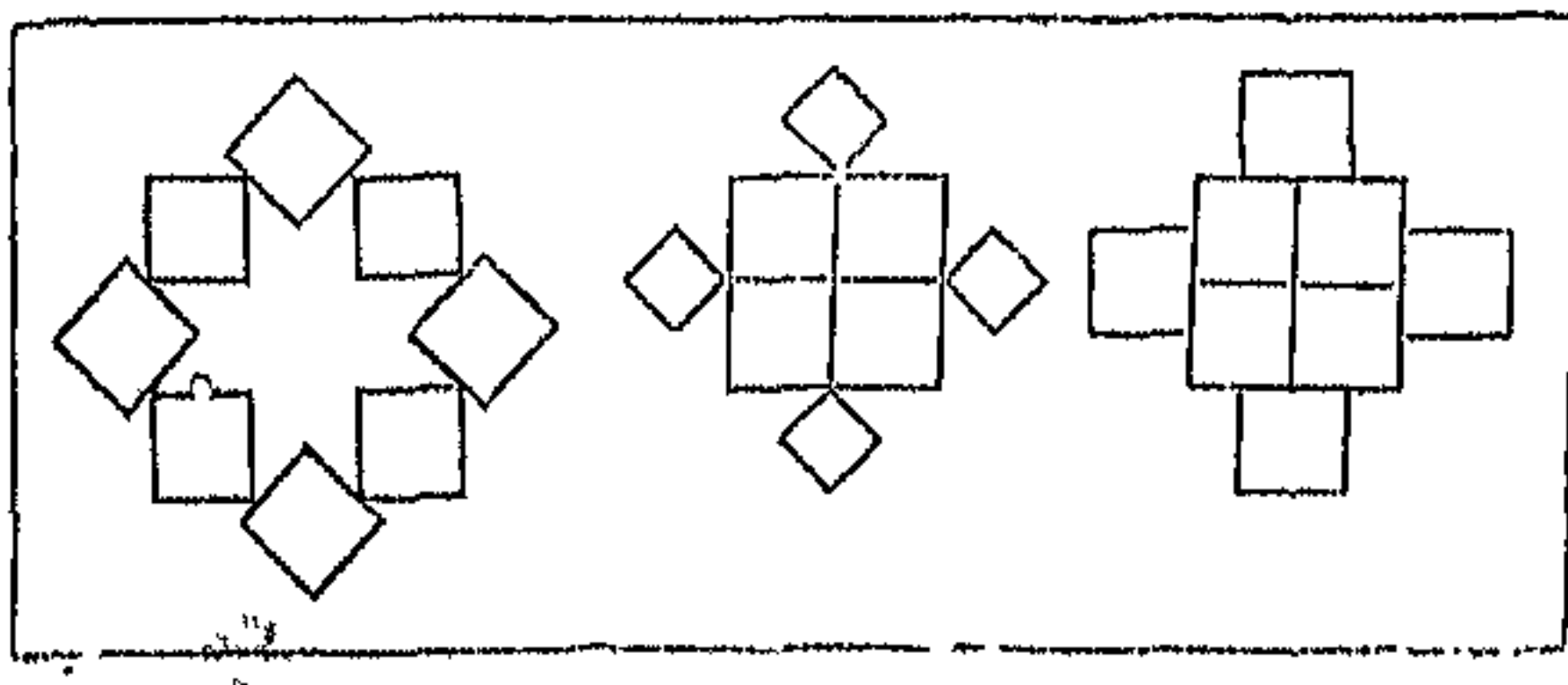
চেয়ার

সাকো

২০ চিত্র।—ছকের দ্বারা জবা গঠন।

"এই জিনিষটা কোন জিনিষের মত?" এটা চেয়ারের মত" "ইহার কোন ভায়গায় বসে আর কোন ভায়গায় ঠেস দেয়?" (দেখাইয়া) "এই ভায়গায় বসে, এই ভায়গায় ঠেস দেয়" "যেখানে ঠেস দেয় তাহাকে চেয়ারের পিঠ বলে—এই চেয়ারের পিঠ দেখাও?" (শিক্ষকের চেয়ার দেখাইয়া) "ইহার পিঠ দেখাও।" "চেয়ার কি দিয়া তৈয়ারী করে? কাঠ কোথায় পায়? কেমন করিয়া তত্ত্বা কবে?" "যে লোক চেয়ার, বাক্স, টেবিল তৈয়ারী করে তাহাকে কি বলে?" ইত্যাদিরূপ প্রশ্ন করিয়া বালককে আবশ্যকীয় ছচারিটী নূতন কথা শিখাইতে হইবে। কিন্তু সাবধান যেন মাত্রা অধিক না হয়। এইরূপ যে দিন যে জিনিষের গঠন করিবে সে দিন সেই জিনিষ সম্বন্ধে শিক্ষা দিবে।

সৌন্দর্য ও সমতা শিক্ষা।—টেবিল বা মাটির উপর (ছকের) কাঠের গুণ্ডুলি পাতিয়া নানারূপ মাজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহাতে বালকগণের মগতা ও সৌন্দর্যের बोध জন্মিবে। নিম্নে আদর্শ স্বরূপ কয়েকটি মাজের নমুনা দেওয়া হইল :—



২১ চিত্র।—ছকের দ্বারা মাজ গঠন।

শিক্ষকগণ নিজের এই আদর্শে নানা মাজের রচনা করিতে পারিবেন । বালকেরাও নানারূপ মাজ নিজেরাই কল্পনা করিতে পারিবে । নিয় শ্রেণীর বালকগণকে এইরূপ মাজ বচনায় নিমুক্ত রাখিলে, তাহাদিগের সময় আনন্দে কাটিবে, কোনরূপ গোলমাল হইবে না, আর শিক্ষক এই সময়ে অল্প শ্রেণীতে কার্য্য করিবার অসমর পাইবেন ।

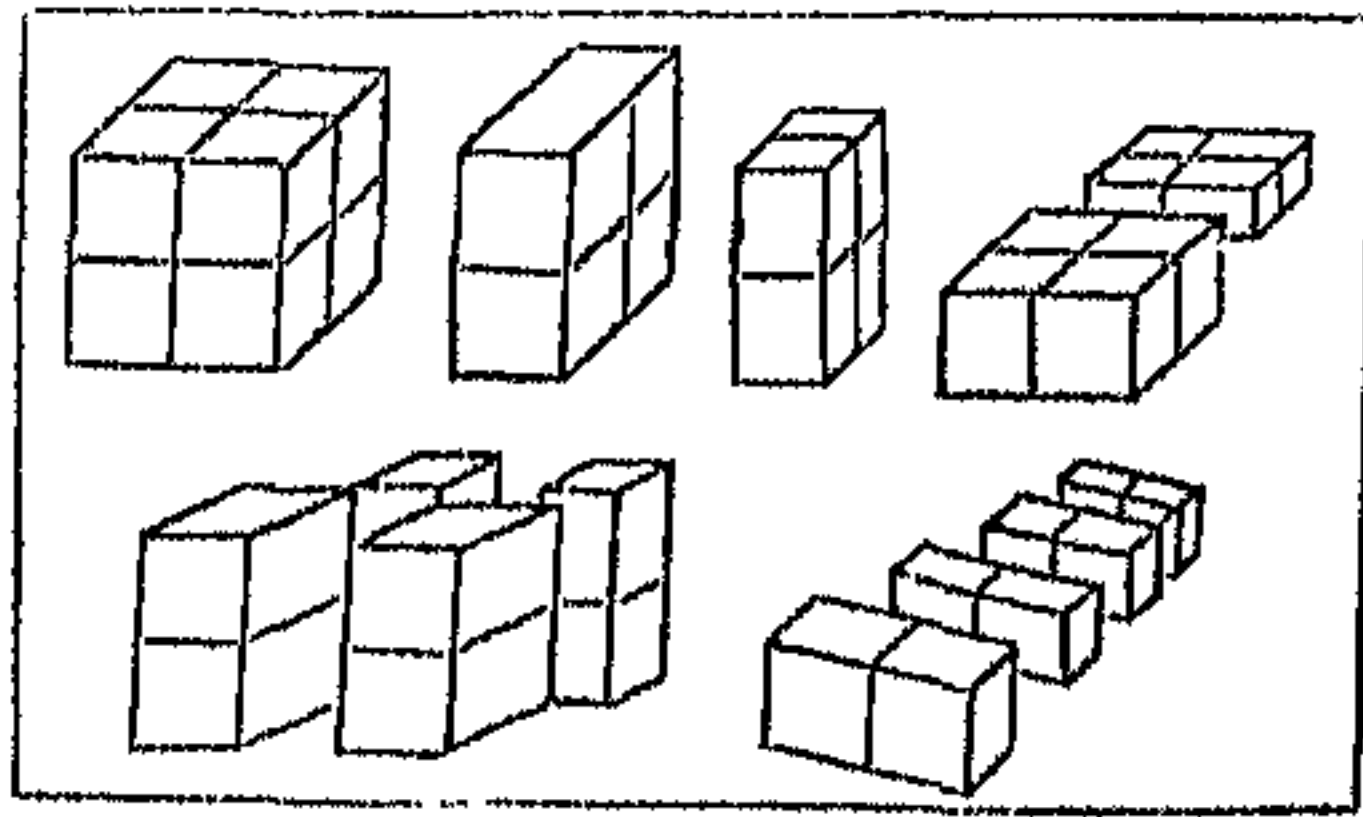
গণনা শিক্ষা ।—এক এক খণ্ড কাঠ লইয়া বালকদিগকে প্রথমে ১, ২ গণনা শিক্ষা দিতে হইবে । ছকের খণ্ডগুলি সমস্ত এক জায়গায় রাখ । বালকেরাও তাহাদের খণ্ডগুলি নিজের সম্মুখে রাখিবে । শিক্ষক এক একখানি কাঠখণ্ড সরাইবেন আর ১, ২, ৩ ইত্যাদি গণনা করিবেন, বালকেরাও শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুকরণে এক একটা করিয়া কাঠ সরাইবে ও ১, ২, ৩ প্রভৃতি গণনা করিবে । এইরূপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে (এক দিনের নয়) বালকদিগের সংখ্যাবোধ হইবে । দুই হাতের অঙ্গুলি লইয়াও এইরূপে সংখ্যা শিক্ষা দিতে হয় । কাঠের দ্বারা সংখ্যাশিক্ষার প্রণালী অষ্টম খেলনায় বিবৃত হইয়াছে ।

তারপর যোগ শিক্ষা—একটা ছোট ছক কাছে রাখ, বালকেরাও তদ্রূপ করিবে । আর একটা ছক ঐ প্রথমটির কাছে সরাইয়া বল “এক ছক আর এক ছক, ২ ছক ।” আর একখানি, এই দুইখানির নিকট সরাইয়া আনিয়া বল “২ ছক ও ১ ছক, তিন ছক”—বালকেরা সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করিবে, ইত্যাদি ।

এইরূপে যোগ শিক্ষার পর বিয়োগের শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে । একটা ছকের সহিত আর একটা ছক যোগ কর আর পূর্ব্বের মত বল “১টা ছক ও ১টা ছক, ২টা ছক” । তারপর এই দুইটা হইতে একটা সরাইয়া বল “২টা ছক হইতে একটা ছক সরাইলে, ১টা ছক থাকে ।”—আবার দুইটা ছকের সঙ্গে ১টা যোগ করিয়া বল “২টা ছকের সঙ্গে ১টা ছক যোগ করিলে ৩টা ছক হয়,” “৩টা ছক হইতে ১টা ছক নিলে ২টা ছক থাকে ।” “৩টা ছক হইতে ২টা ছক নিলে ১টা ছক থাকে” ইত্যাদি—দুইটা সরাইয়া

লইলে, যেটা অবশিষ্ট থাকিবে, সেটাকে হাত দিয়া দেখাইয়া দিবে।
যাহাই শিখাইবে তাহাই বস্তুর সাহায্যে, বস্তু দেখাইয়া শিখাইবে। বাণকেন্দ্র
অনুকরণ করিবে। ৫।৬ বৎসরের বালককে ভগ্নাংশ বিয়য়ক সামান্য শিক্ষাও
দিতে হইবে।

একটা বড় ছককে (ছোট ছোট ছকের সমষ্টি) পাশাপাশী ২ ভাগে ভাগ
করিয়া দেখাও—“একটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা গেল, এক এক
ভাগকে আধা (বা আধখানা) বলে।” “তোমাদের মধ্যে কেহ একটা
লম্বালম্বী ২ ভাগে ভাগ কর। এই আধা (ছোট ছোট ছকগুলি গণনা
করিয়াও দেখাইতে পার যে পূর্বের আধায় যতগুলি কাঠ, এই আধায়ও তত-
খানি)। তারপর চারি ভাগ করিয়া দেখাও আর বল যে “ইহার এক
এক ভাগকে সিকি বলে।” “কয়টা সিকিতে একটা পূরা জিনিষ হয়?”
“কয়টা আধায় একটা পূরা জিনিষ হয়?”—এইরূপ আট ভাগ কর ও
তাহার এক এক ভাগকে যে ছয়খানী বলে, তাহা শিখাইয়া দাও। আটটা
ছয়খানীতে যে একটা পূরা জিনিষ হয়, তাহা জুড়িয়া দেখাও।



২২ চিত্র।—ছকের ভগ্নাংশ।

এইরূপে ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগও মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া যাইতে
পারে। . পাটীগণিত পরিচ্ছেদের ভগ্নাংশ প্রকরণে ইহার বিবরণ লিপিত
হইয়াছে।

গড়াভাঙ্গার সাধারণ নিয়ম ।—এইরূপ গড়াভাঙ্গায় কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রতিপালন করা নিতান্ত আবশ্যিক :—

- (১) ছকটিকে বালকের সম্মুখে (না ভাঙ্গিয়া) আশু রাখিয়া দিবে ।
- (২) বালকও কাঁচের শেষে থণ্ড-ছকগুলি মিলাইয়া বড় ছক রচনা করিয়া বাক্সে রাখিবে ।
- (৩) সমস্তগুলি থণ্ড-ছকের ব্যবহার করিতে হইবে ।
- (৪) একটা গঠনের সহিত যোগ বিয়োগ করিয়া অথবা গঠনের সৃষ্টি করিতে শিক্ষা দিবে । অর্থাৎ একটা গঠন সম্পূর্ণরূপে না ভাঙ্গিয়া তাহার সহিত ছুটার খান ঢক যোগ করিয়া বা তাহা হইতে ছুটার খান সরাইয়া, বা ছুটার খানির স্থান পরিবর্তন করিয়া নূতন জিনিষের রচনা করিবে ।
- (৫) যে জিনিষের বচনা বা গঠন করা হইবে, সেই জিনিষ সম্বন্ধে বালকগণকে সামান্য সামান্য শিক্ষাও দিতে হইবে ।
- (৬) বালকেরা যে জিনিষ গড়িবে, তাহার একটা নামকরণ (যে জিনিষের প্রতিকৃতি তাহার নাম অনুসারে) করা আবশ্যিক । আর সেইরূপ গঠনের সেই নামই ঠিক রাখা আবশ্যিক ।
- (৭) বালকেরা যাহা রচনা বা গঠন করিবে, তাহা বাহাতে অল্প খালকে ভাঙ্গিয়া না দেয় সে বিষয়ে সাবধান করিতে হইবে । বাহাতে বালকেরা অপরিষ্কার বা বিশৃঙ্খল ভাবে কাজ না করে, সে বিষয়ে শিক্ষককে মনোযোগী হইতে হইবে । একজনের ঢকগুলি যেন অশ্বে ব্যবহার না করে ।
- (৮) প্রত্যেকবার বালকগণকে নূতন নূতন জিনিষ বা মাত্র রচনা করিতে উৎসাহ দিবে । এক রকমের রচনা করা বাঞ্ছনীয় নহে ।

৪র্থ খেলনা ।—এটীও দ্বিতীয় খেলনার মত । একটা ২ ইঞ্চি ছক । তবে ২য় খেলনার ছক, ৮টা ছোট ছোট ছকে ভাগ করা হইয়াছে, আর এই খেলনার ছককে ইটের মত লম্বা আকারে ৮ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে । ইহার দ্বারাও নানা জিনিষের প্রতিকৃতির অঙ্কন করা যাইতে পারে ।

আমাদিগের বিদ্যালয়ে এ সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার নাই বলিয়া এই চতুর্থ

খেলনা বিষয়ে অধিক লেখা হইল না। যাহারা ইংরেজি জানেন না, তাঁহারাও যদি এ বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, তবে কিওয়ার্গার্টেন সম্বন্ধীয় নানাক্রপ ইংরেজী পুস্তকের অন্তর্গত ছবিগুলি দেখিলেই এই সমস্ত খেলনার শিক্ষাপ্রণালী বুঝিতে পারিবেন।

৫ম খেলনা।—এটী একটা ৩ ইঞ্চি ছক। ইহাকে ২৭ সমান ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারাও নানাক্রপ গঠনের কার্য্য হইয়া থাকে।

৬ষ্ঠ খেলনা।—একটা ৩ ইঞ্চি ছক, ২৭ খানি ইটের মত লম্বা ফলকে ভাগ করা হইয়াছে; ইহার দ্বারা নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দ্রব্যের গঠন করা যাইতে পারে।

৭ম খেলনা।—বর্গক্ষেত্র ও ত্রিভুজের আকারে কতকগুলি রঙ করা পাতলা কাট বা মোটা কাগজ কাটা; এইগুলি মাটী বা টেবিলের উপর সাজাইয়া নানাবিধ দ্রব্যের অনুরূপ করা যাইতে পারে ও সুন্দর সুন্দর ফুল ও সাজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। শিক্ষকগণ ইচ্ছা করিলে রঙ করা কাগজে কতকগুলি বর্গক্ষেত্র ও কতকগুলি ত্রিভুজ (নানা রকমের) কাটিয়া দিতে পারেন। বালকেরা সেগুলি সাজাইয়া নানা রকমের সাজ রচনা করিবে। বিলাতী কাপড়ে যে সকল ছবি আঁটা থাকে, তাহা সংগ্রহ করিয়াও এক রকমের খেলনার রচনা করা যাইতে পারে। একখানি ছবিকে কাঁচি দিয়া ৪ ভাগ করিয়া কাটিয়া দাও, বালকেরা সেগুলি সাজাইয়া পূরা ছবি করিবে। এইরূপ আর একখানিকে ৮ ভাগে, অন্য একখানিকে ত্রিভুজের মত ভাগ করিয়া, বালকগণকে সাজাইতে বলিলে, তাহারা বেশ আমোদ বোধ করিবে।

৮ম খেলনা।—১ ইঞ্চি, ২ ইঞ্চি, ৩ ইঞ্চি, ৪ ইঞ্চি ও ৫ ইঞ্চি লম্বা কতকগুলি কাঠী। কাঠীগুলি দেশলাইএর কাঠী বা বাঁটার কাঠীর মত সরু। কিওয়ার্গার্টেন বাক্সের সঙ্গে যে কাঠী বিক্রয় হয় সেগুলি কাঠের

সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে । বাঁশের কাঠী, কাঠের কাঠী অপেক্ষা শক্ত, সুন্দর, সস্তা, ও সহজপ্রাপ্য ।

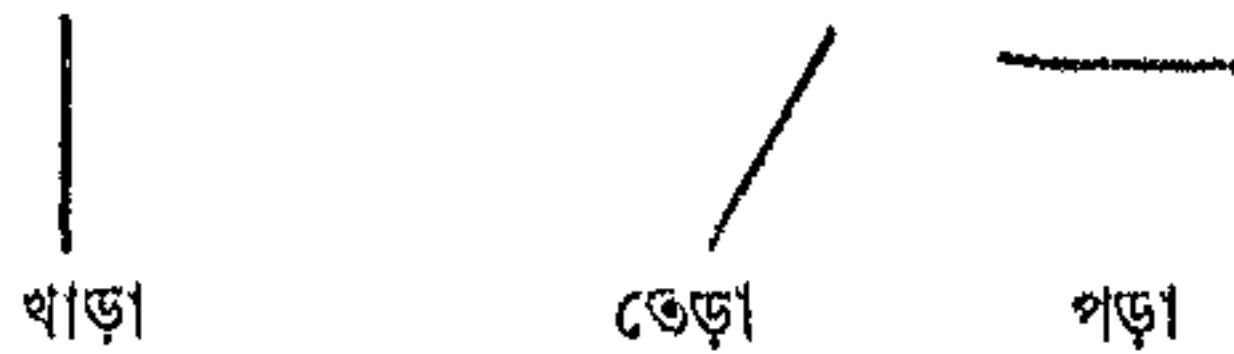
৬ষ্ঠ খেলনা পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধযুক্ত কাঠফলকের ব্যবহার ছিল । তবে ৬ষ্ঠ খেলনায় কাঠফলকগুলির বেধ কমিয়া গিয়াছিল । ৭ম খেলনায় আবার এই বেধ একবারে কমিয়া গিয়াছে । বেধকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া (সপ্তম খেলনায়) কেবল দৈর্ঘ্য-প্রস্থবিশিষ্ট সমতল লাইয়াই জ্রব্যাদির রচনা করা হইয়া থাকে । এই অষ্টম খেলনায় আবার সেই সমতলও পরিত্যাগ করিয়া কেবল সমতলস্থ সরল রেখা মাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে । ক্রমে স্থল হইতে স্থল ও স্থলতর বিষয়ে প্রবেশ করা হইতেছে ।

কিঙারগার্টেন খেলনাগুলি না কিনিয়া নিজেও প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে । যাহা হউক অল্প সমস্ত খেলনা শিক্ষক জয় করিতে বা প্রস্তুত করিতে পারেন বা নাই পারেন এই অষ্টম খেলনা তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে । খরচও নাই, তেমন পরিশ্রমও নাই, আর এই খেলনার মত আশ্চর্যকর খেলনাও আর নাই । অক্ষর শিক্ষা, অঙ্কন শিক্ষা, গণিত শিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষার সহজ উপায় এই খেলনায় নিহিত ।

কাঠী সাজান ।—খাড়া, পড়া ও তেড়া এই তিনটিই সরল জিনিষের সাধারণ অবস্থা । এক বাগলকে শ্রেণীর সম্মুখে খাড়া করিয়া বল “বালকটী দাঁড়াইয়া বা খাড়া হইয়া আছে ।” তাহাকে টেবিলের উপর শোয়াইয়া বল “বালকটী টেবিলের উপর শুইয়া বা পড়িয়া আছে ।” তাহাকে দেওয়ালের গায়ে হেলাইয়া বল যে “বালকটী দেওয়ালের গায়ে হেলিয়া বা তেড়া হইয়া আছে ।” তারপর একটা ছাতা টেবিলের উপর খাড়া করিয়া বল যে “খাড়া ছাতা,” শোয়াইয়া বল যে “পড়া ছাতা,” হেলাইয়া ধরিয়া বল “তেড়া ছাতা ।” বালকেরাও শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে খাড়া ছাতা, পড়া ছাতা ও তেড়া ছাতা বলিবে । তারপর টেবিলের উপর একটা পেন্সিল খাড়া করিয়া ধর, আর বালকগণকে পেন্সিলের অবস্থা

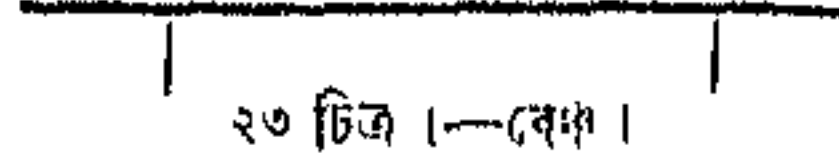
জিজ্ঞাসা কর। বালকেরা 'খাড়া পেন্সিল বলিতে' শিখিয়াছে কিনা তাহা বুঝিতে পারিবে। এইরূপে পেন্সিল টেবিলের উপর শোয়াইয়া রাখিয়া ও তেড়া করিয়া ধরিয়া বালকের জ্ঞান পরীক্ষা কর। তার পর নিজে একটা বড় কাঠী লও ও বালকগণের হাতেও একটা কাঠী দাও। নিজে কাঠীটি টেবিলের উপর খাড়া করিয়া বল "খাড়া কাঠী," বালকেরাও নিজ নিজ কাঠী, মাটি বা ডেস্কের উপর খাড়া করিয়া বলিবে "খাড়া কাঠী"। এইরূপে শিক্ষক টেবিলের উপর কাঠী তেড়া করিয়া বলিবেন "তেড়া কাঠী"। বালকগণও তদ্রূপ করিবে। এইরূপে "পড়া কাঠী"ও শিখাইতে হইবে। একটু অভ্যাস হইলে পরে বালকগণকে বিছালয় গৃহস্থিত খাড়া, তেড়া, পড়া বাঁশ বা কাঠ দেখাইতে হইবে। (টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চের পা, দরজার খাড়া চৌকাঠ, ঘরের থাম প্রভৃতি খাড়া; ঘরের চালের বাঁশ বা কাঠের কয়লা তেড়া। চৌকাঠের উপরনীচের কাঠ, বেঞ্চের তক্তা পড়া।

ইহার পর খাড়া, তেড়া, পড়া, আবার অল্প রকমে শিখাইতে হইবে। শিক্ষক নিজের সম্মুখে টেবিল বা মাটির উপর লম্বভাবে একখানি কাঠী রাখিয়া বলিবেন "খাড়া কাঠী," তারপর সেই কাঠী ঠিক নিজের চক্ষের সমান্তর করিয়া বলিবেন "পড়া কাঠী।" বোর্ডেও চক দিয়া এইরূপে



খাড়া, তেড়া ও পড়া কাঠী আঁকিয়া দিবেন। বোর্ডে অঙ্কিত এই তিন প্রকারের টান (বালকেরা রেখাকে 'টান' বলে) যাহাতে বালকেরা দেখিয়াই বুঝিতে পারে সেরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। ২৩ দিনেই বালকেরা খাড়া টান (রেখা) পড়া টান ও তেড়া টান বুঝিবে ও বলিতে শিখিবে।

গঠন শিক্ষা ।—(১) বালকগণের ডান হাতের পাশে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ১০।১২টী করিয়া ২ ইঞ্চ ও ৫ ইঞ্চ কাঠী রাখ । তারপর নিম্নে বোর্ডে চক দিয়া একটা পড়া-টান দিয়া বল “এই রকমে বড় কাঠী দিয়া



২০ চিত্র ।—বেঞ্চ ।

একটা পড়া-কাঠী সাজাও ।” তারপর শিক্ষক বোর্ডে চক দিয়া সেই পড়া-টানের নীচে, একটু দূরে দূরে ২টী ছোট খাড়া-টান দিয়া বলিবেন “পড়া কাঠীর নীচে এইরূপ ২টী ছোট কাঠী খাড়া করিয়া লাগাও ।” বসিবার বেঞ্চ হইল । এখন বেঞ্চ বিষয়ে বালককে গল্পচ্ছলে ছ’চারিটী কথা শিখাইয়া দাও ।

(২) বালকের পাশে ৩ ইঞ্চ, ২ ইঞ্চ কাঠী রাখ । বোর্ডের উপর চক দিয়া আঁক আর বল “এই রকমে একটা ছোট পড়াকাঠী সাজাও ; তার সঙ্গে এই রকমে ২টা ছোট খাড়াকাঠী লাগাও, আর তার সঙ্গে এই রকমে একটা তেড়াকাঠী লাগাও ; বালকেরা সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করবে ।

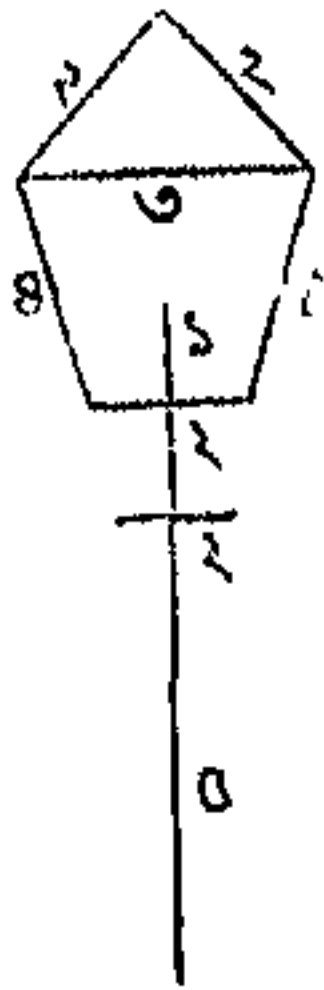


২৪ চিত্র ।—চেয়ার ।

বালকেরা ঠিক করিয়া কাঠী সাজাইতে পারিল কিনা তাহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে হইবে । একখানা চেয়ার হইল । এখন চেয়ার সম্বন্ধে বালককে ২৪টী কথা শিখাও ।

(৩) পাঁচ রকমের কাঠীর যাহাতে ব্যবহার হইয়া থাকে, এরকমের একটা দৃষ্টান্ত দিলে শিক্ষকগণ কাঠীর দ্বারা গঠনের বিষয় সমস্তই বুঝিতে পারিবেন । শিক্ষক বোর্ডের উপর একটা একটা করিয়া দাগ দিতে থাকিবেন আর বালকেরা

কাঠির দ্বারা তাহার অনুকরণ করিবে । কাঠীগুলির নাম এক ইঞ্চ কাঠী, দুই ইঞ্চ কাঠী এরূপ বলিখে হয়ত বালকেরা ধরিতে পারিবে না, সেই জন্য কেহ কেহ বড়কাঠী, মেজোকাঠী, সেজোকাঠী প্রভৃতি নামকরণ পছন্দ করেন । যাহা হউক এ সকল বালকের বুদ্ধি ও শিক্ষকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে । ৫ রকমের কাঠী দ্বারা একটা রাস্তার ল্যাম্প-পোস্ট প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইল :—



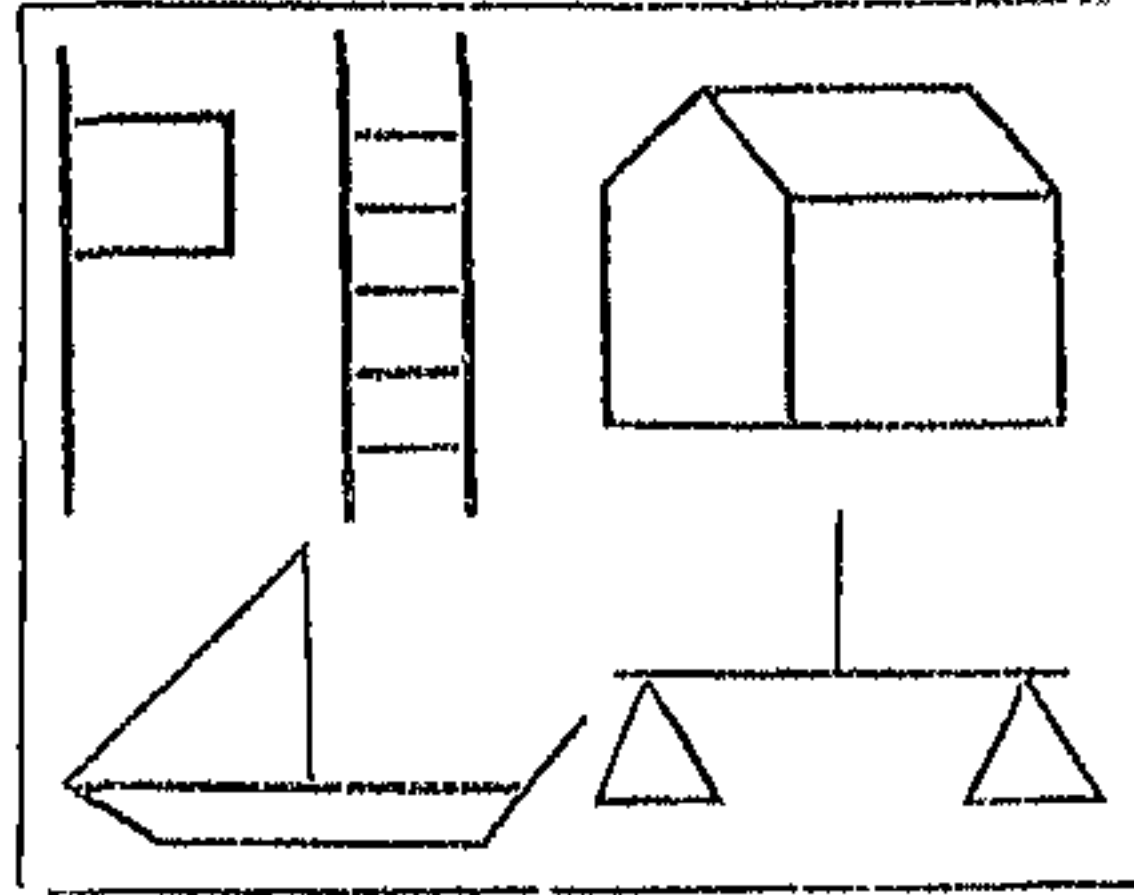
শিক্ষক শিশুগণকে এইরূপ আদেশ করিবেন :—“একটা ৩ ইঞ্চ পড়াকাঠী মাজাও (শিক্ষক এইরূপ আদেশের সঙ্গে, একে একে বোর্ডে আঁকিতে থাকিবেন, আর বালকেরা মাটি বা টেবিলের উপর চিত্রের অনুকরণে কাঠী মাজাইতে থাকিবে) ; তারপর দুইটা ২ ইঞ্চ তেড়া কাঠী লাগাও ; তার নীচে দুইটা ৪ ইঞ্চ তেড়া কাঠী মাজাও ; তার নীচে একটা ৫ ইঞ্চ খাড়া কাঠী লাগাও ; ২ ইঞ্চ পড়াকাঠীর উপর একটা ১ ইঞ্চ খাড়া কাঠী বসান ।” এইরূপে মাজান হইলে লঠনের সমস্ত অংশের পরিচয় করাও, অর্থাৎ কোন্টী লঠনের চাল, কোন্টী তাল (বা ডাদ), কোন্টী পাশ, কোন্টী তল (বা সেজে), কোন্টী বাতি, কোন্টী থাম, কোন্টী মই লাগাইবার আড়া ইত্যাদি দেখাইতে বল ।

২৫ চিত্র ।—রাস্তার আলো ।

তারপর এই গঠন উপলক্ষ করিয়া বালকগণকে কিছু শিক্ষাও দিতে হইবে । রাস্তায় আলো দেয় কেন, এষ্ট আলোতে কি রকম তেল ব্যবহার করে, কত রকম তেলের নাম জান, কোন্ তেলের দ্বারা কি করা হয়, আলো কাচ দিয়া ঢাকা কেন, টিন কি কাঠ দিয়া ঢাকিলে কি হয়, না ঢাকিলে কি হয় ইত্যাদিরূপ প্রশ্নোত্তরের দ্বারা বালকগণকে অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে ।

নিম্নে আরও ২৩টা গঠনের আদর্শ প্রদত্ত হইল, শিক্ষকগণ চিন্তা

করিয়া নানারূপ গঠন আবিষ্কার করিতে পারিবেন । একথা মনে রাখা আবশ্যক যে অধিকাংশ চিত্রেই প্রথমে পড়ারেখা আঁকিয়া (বা পড়া কাঠী সাজাইয়া) চিত্র আরম্ভ করিতে হইবে, তারপর তেড়া, খাড়া ।



২৬ চিত্র ।—পাখা, সিঁড়ি, ঘর, নৌকা, দাঁড়িপালা ।

অক্ষর শিক্ষা ।—কাঠীর দ্বারা বাঙ্গালা অক্ষর শিখান ভেদে অনেক সুবিধা হয় না । ইংরাজী অক্ষরগুলি বেশ শিখান যায় । বাঙ্গালা অক্ষর শিখাইবার পক্ষে তেঁতুলের বীজ বেশ সুবিধাজনক । তবে সরল রেখাযুক্ত বাঙ্গালা অক্ষরগুলি কাঠীর সাহায্যে শিখান যাইতে পারে । আবার অক্ষর শিক্ষার সাধারণ নিয়মও এই যে, প্রথমে সরল রেখাযুক্ত অক্ষরগুলিই শিক্ষা দিতে হইবে । প্রথমে ব্যাকরণসম্মত প্রণালী অবলম্বন করা সুবিধাজনক নহে ।

ব র (ক) ঝ (ঘ) (ঙ) য এই কয়েকটি সরল রেখাযুক্ত । তবে 'র'এর ফোটা, 'ক'এর ও 'ফ' এর আঁকড়ী, সরল কাঠীর দ্বারা হয় না । এইজন্য 'র'এর ফোটার স্থানে একটা ছোট মাটি বা ইঁটের টুকরা কি একটি বীজ ব্যবহার করিতে হইবে । আর 'ক'এর ও 'ফ'এর আঁকড়ী, কাঠী একটু একটু ভাঙ্গিয়া (একেবারে বিচ্ছিন্ন না করিয়া) প্রস্তুত করিতে হইবে ও আঁকড়ীর মাথার ফোটার স্থানে মাটি বা ইঁটের ছোট টুকরা বা কোন বীজ

বসাইতে হইবে। এইরূপে কাঠী ভাজিয়া অত্যাশ্র অনেক অক্ষর প্রাপ্ত
করিতে পারা যায়।

এখন অক্ষর শিক্ষা দিবার প্রকরণ জানা আবশ্যক। প্রথমে 'ব' শিখাইতে
হইবে। বোর্ডের উপর প্রথমে একটা খাড়াটান দাও। বালকগণকে
কাঠী দিয়া, একটা 'খাড়াকাঠী' সাজাইতে বল। তারপর নিজে বোর্ডের
উপর ২টা তেড়া, ও মাত্রার স্থানে একটা পড়াটান দাও। আর বালকগণকে
২টা 'তেড়াকাঠী' ও মাত্রার স্থানে একটা 'পড়াকাঠী' সাজাইতে বল।
সকলকে এক সঙ্গে 'ব' বলিতে বল। তারপর একটা বটগাছ আঁকিয়া
তাহার 'ব' (বুরী) দেখাও। যদি কোন নিকটস্থ বটগাছে 'ব' দেখান
যাইতে পারে তবে আরও ভাল হয়। তারপর উত্তমরূপে 'ক' প্রাপ্ত করিতে
শিক্ষা দাও। 'ক'এর আঁকড়ীর কাঠীগুলি শিক্ষক নিজে ভাজিয়া না দিলে



২৭ চিত্র।—বোড়ে বক অক্ষর।

বালকেরা ভাজিতে পারিবে না। এইরূপে দুইটা অক্ষর শিক্ষা হইলে দুইটা
অক্ষর একত্র করিয়া 'বক' উচ্চারণ করাও।

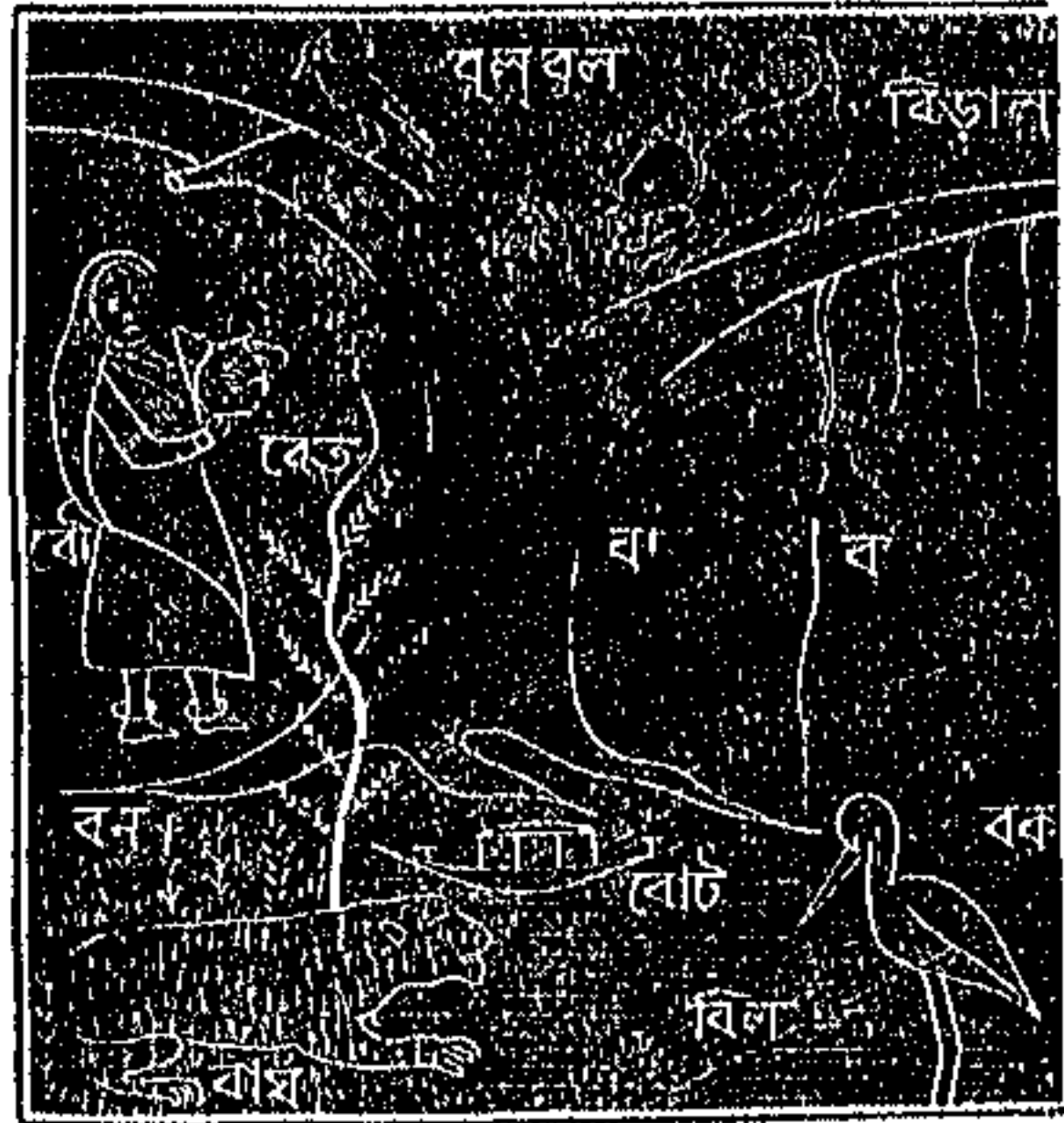
সকলে সমস্তরে 'বক' উচ্চারণ করিবে। বোর্ডে 'বক' শব্দ লিখিয়া তাহার পাশে একটা বকের ছবি আঁকিয়া দাও। কি যদি 'ব' লেখার পর 'র' লেখা শিখান পছন্দ কর, তবে 'র' শিখাইয়া 'বর' লিখিয়া দিবে ও বোর্ডে একটা বরের আকৃতি করিয়া দিবে। এ সমস্ত চিত্রে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইবার জন্ত সময় নষ্ট করিবার আবশ্যিকতা নাই। একটা মোটাগুটি রকমের রৈখিক চিত্র (out-line) হইলেই চলিবে।

কেবল বরের মাথার টোপরটী একটু জাঁকাল করিতে হইবে, কারণ টোপরেই বরের পরিচয়। এইরূপে 'ব' ও 'ক' ঠিক রাখিয়া, বল, বস, বন, কল, রথ প্রভৃতি কথা শিখাইতে হইবে। যে সকল শব্দে কোন জিনিষ বুঝায়, এরূপ শব্দই প্রথমে শিক্ষা দিবে। কেবল একটা মাত্র চিত্র অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে আকার ইকার প্রভৃতি শিক্ষা দিতে পারা যায়। চিত্রাঙ্কনে কিঞ্চিৎ পটুতা থাকিলেই এরূপ শিক্ষা



২৮ চিত্র।—বোর্ডে বর অঙ্কন।
দান সহজ ও সুখকর করিতে পারিবে। মনে কর প্রথমে একটা বটগাছ আঁকিলে (কেবল লাইনের দ্বারা অঙ্কন—খুব শক্ত নয়), তার ব (বুরি) দেখাও ; গাছের গুঁড়ি, ডাল ও বুরি দ্বারা যে একটা ব এর মত অঙ্কন হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখাইতে পার। তার পর 'বট' লিখিয়া বটের গাছের বিষয় গল্প কর। এক ধারে 'বন' আঁক ও লেখ। বনের মধ্য হইতে 'বাঘ' (ব এ আকার যোগ শিখাইবার জন্ত) বাহির কর। 'বিলের' (ইকার যোগ) ধারে 'বক' বসাত। গাছের উপর 'বিড়াল' বসাত, আর এক ডালে 'বুলবুল' আক ইত্যাদি। একখান বোর্ডে, দিন দিন একটু একটু চিত্র বাড়াইবে, আর কেবল পারচিত পদার্থের চিত্রাঙ্কন করিয়া আকার, ইকার প্রভৃতির ব্যবহার শিখাইবে। পূর্ক দিনের (বোর্ডের)

চিত্র পুঁছিয়া ফেলিবে না—ক্রমাগত তাহার সঙ্কিত যোগ করিয়া যাউবে।
চিত্রগুলি একপভাবে পরস্পরের সহিত সংসৃষ্ট হইবে যে, সমস্ত চিত্রখানি
যেন একটা সম্ভবপর ব্যাপারের ছবি হয়।



৩৯ চিত্র।—চিত্রাবলম্বনে শব্দ শিক্ষা।

শব্দটী শিক্ষাব সম্মে সেই জিনিষ বা জিনিষের ছবি দেখাইলে বালক-
গণের বড়ই আনন্দ হয়। আব তাহারা যে দ্রব্য বিশেষের নাম পড়িতে
বা লিখিতে জানে ইহা বুঝিতে পারিয়া উৎসাহিত হয়।

যেটীর পব যে অক্ষর শিক্ষা দিলে সুবিধা হইতে পারে নিয়ো তাহাব
আভাস দেওয়া গেল।

ব	র	ক	ধ	বা	না	প্লা	।	য	ষ	ফ	য	।	ন	ণ	ম	থ	খ	ল	শ	।
ত	অ	আ	ভ	।	চ	ট	ঠ	চ	ছ	।	ড	উ	ঊ	ঙ	জ	।				
হ	ই	দ	।	গ	প	।	এ	ঐ	এও	।	ও	ঔ	।	স	ঈ	।				

তবে যে ঠিক এই শৃঙ্খলাক্রমেই শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নহে।
আবশ্যক বোধে শিক্ষক নিজের ইচ্ছা মত বিভাগ করিয়া লইতে পারেন।

আর এক কথা, এই নিয়মে ১০।১৫টা অক্ষর শিক্ষা হইলে পর পুস্তকাদির সাহায্যে অক্ষরগুলি শৃঙ্খলার সহিত তাড়াতাড়ি শিখাইয়া লইবে । ৯ অক্ষর শিখাইবার আবশ্যকতা নাই । বাঙ্গালায় ইহার ব্যবহার নাই ।

বীজ সাজান ।—তেঁতুলের বীজ, কড়ি, বোতাম, ছোট ছোট পাথরের টুকরা দ্বারা বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করাইতে হইবে । প্রথম প্রথম মাটির উপর কি স্টেটের উপর চকের দ্বারা অক্ষর লিখিয়া দিবে । বালকেরা বীজ বা কড়িগুলি অক্ষরের দাগের উপর সাজাইবে । এইরূপ দু চারি দিবস অভ্যাস হইলে, একটা অক্ষর (যথা ব) লিখিয়া দিবে আব সেই অক্ষরের একটু একটু পরিবর্তন করিয়া অন্ত অক্ষর প্রস্তুত করাইতে শিখাইবে । মনে কব প্রথমে তেঁতুল বীজ দিয়া একটা ‘ব’ সাজাইলে । বালক ‘ব’ প্রস্তুত করিল এবং মুখেও ‘ব’ পড়িল । তাবপর একটা বীজের দ্বারা ফোটা দিয়া বালক ‘ব’ কে ‘র’ করিল ও ‘র’ পড়িল । তাবপর ফোটার বীজটি তুলিয়া, ‘ব’ এ আঁকড়ি লাগাইয়া ‘ক’ করিবে ও ‘ক’ বলিয়া পড়িবে । এইরূপে ‘ক’ এর আঁকড়ী সরাইয়া ‘খ’ করিবে ইত্যাদি । কথা এই যে একটা অক্ষর আরম্ভ করিয়া; তাহারই কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া সেই আকারের অন্যান্য অক্ষর প্রস্তুত করাইতে হইবে ।



৩০ চিত্র ।—বীজের ব্যবহার ।

তেঁতুলের বীজ বা বোতামের দ্বারা প্রবোধ অঙ্কন বা নানারূপ সাজ প্রস্তুত করাইতে হইবে । কাঠী দ্বারা বক্ররেখা করা যায় না, কিন্তু তেঁতুলের বীজ সাজাইয়া সহজেই বক্ররেখা করা যাইতে পারে । এইজন্য কাঠীর গঠনে যে সকল চিত্র দেওয়া হইয়াছে, বীজের দ্বারা সে সকল ত করা যাইতেই

পারে, তাহা ছাড়া লাঠী, পাখা, চাবি, ফুল প্রভৃতি বক্র রেখাযুক্ত দ্রব্যের গঠন শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

অক্ষর শিক্ষা বিষয়ে আরও অনেক কথা “বর্ণ-পরিচয় শিক্ষা” অনুচ্ছেদে লিখিত হইল। কাঠী, বীজ প্রভৃতির সাহায্যে অঙ্ক শিক্ষার প্রণালী ‘পাটীগণিত’ অনুচ্ছেদে লিখিত হইল।

৯ম খেলনা।—কতকগুলি ছোট ছোট লৌহ-বলয়। তার কতকগুলি আঁত, আর কতকগুলি আঁধখান ও শিকিখান করিয়া কাটা। এইগুলির দ্বারা বক্র রেখাযুক্ত নানাবিধ সাজ প্রস্তুত করাইতে হয়।

এইরূপ খেলনা আশাদিগের বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয় না বটে কিন্তু আশাদিগকে বক্ররেখা ও কুটিল রেখা শিখাইতে হয়। বক্র (বঁকা) ও কুটিল (এঁকাবঁকা) রেখা শিখাইবার সময় যদি শিক্ষক বালকগণের হাতে একটু একটু লৌহ-তারের টুকরা দিতে পারেন তবে কাজের বেশ সুবিধা হয়। অভাবে পাতলা বাঁশের চটা বা সরু কাঠী বা বেতের টুকরা হইলেও চলিতে পারে। শিক্ষক নিজে লোহার তার বা বাঁশের চটা হাতে করিয়া বলিবেন “এই তার সোজা” তারপর বঁকাইয়া বলিবেন, “এই তার বঁকা হইল।” বালকেরা নিজের তার বঁকাইয়া শিক্ষকের অনুকরণ করিবে। তারপর দুইটা ছেলেকে দাঁড় করাইয়া তাহাদের হাতে একগাছি দড়ি দিয়া টান করিয়া ধরিতে বলিবেন। টান করিয়া ধরিলে সোজা রেখা হইল। একটা ছেলেকে অপর ছেনোটীর দিকে সরাইলেই দড়ি টিলা পড়িয়া বঁকা রেখার দৃষ্টান্ত হইবে। ধনুক, থালা, বাটী ও আম কাঁটাল পাতার ধার, চক্ষের ভ্রু প্রভৃতি বঁকা রেখা। শিক্ষক বোর্ডে নানা রকমের বঁকা রেখা আঁকিয়া দিবেন। তারপর শিক্ষক হাতের তারকে সাপের গতির মত এঁকাবঁকা করিয়া গড়িয়া, এঁকাবঁকা রেখা দেখাইবেন। বালকেরা নিজের তারে তাহার অনুকরণ করিবে। মাটির উপর দড়িগাছি সাপের গতির মত এঁকাবঁকা করিয়া রাখিবে ও এঁকাবঁকা রেখার দৃষ্টান্ত

হইবে । বেগুণের পাতা, কুমড়ার পাতা ও গোলাপের পাতার দ্বারা এঁকাবঁকা । শিক্ষক বোর্ডে এঁকাবঁকা রেখা আঁকিয়া দিবেন । (এই সমস্ত পাতা বা অন্যান্য দ্রব্য শিক্ষককে পূর্বেই এ পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে যে সকল বালকই যেন প্রত্যেক বকমের পাতা বা জিনিষ একটা একটা নিজেরা পরীক্ষা করিতে পারে) ।

১০ম খেলনা ।—শিক্ষকের জন্য একখান কিণ্ডারগার্টেন বোর্ড ও বালকদিগের জন্য কিণ্ডারগার্টেন স্টুট বা খাতা । চিত্রাঙ্কন শিক্ষাই এই খেলনার উদ্দেশ্য ।

কিণ্ডারগার্টেন বোর্ড ।—সাধারণ কাল বোর্ডের উপর লম্বালম্বী ও পাশাপাশি ১ ইঞ্চ ফাঁক করিয়া লাল রঙের কাল কাটা । একপ কাল কাটবার প্রণালী পরিশিষ্টে বোর্ড নির্মাণ পদ্ধতিতে লিখিত হইয়াছে । একপ বোর্ড কিনিতেও পাওয়া যায় ।

কিণ্ডারগার্টেন স্টুট ।—একখানি স্টুটের এক পৃষ্ঠের উপর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ২ ইঞ্চ ফাঁকে ফাঁকে লৌহ প্রেক বা শলাকার দ্বারা কাল কাটা । একপ স্টুট কিনিতে পাওয়া যায়, তবে শিক্ষক নিজে হাতেও করিয়া দিতে পারেন ।

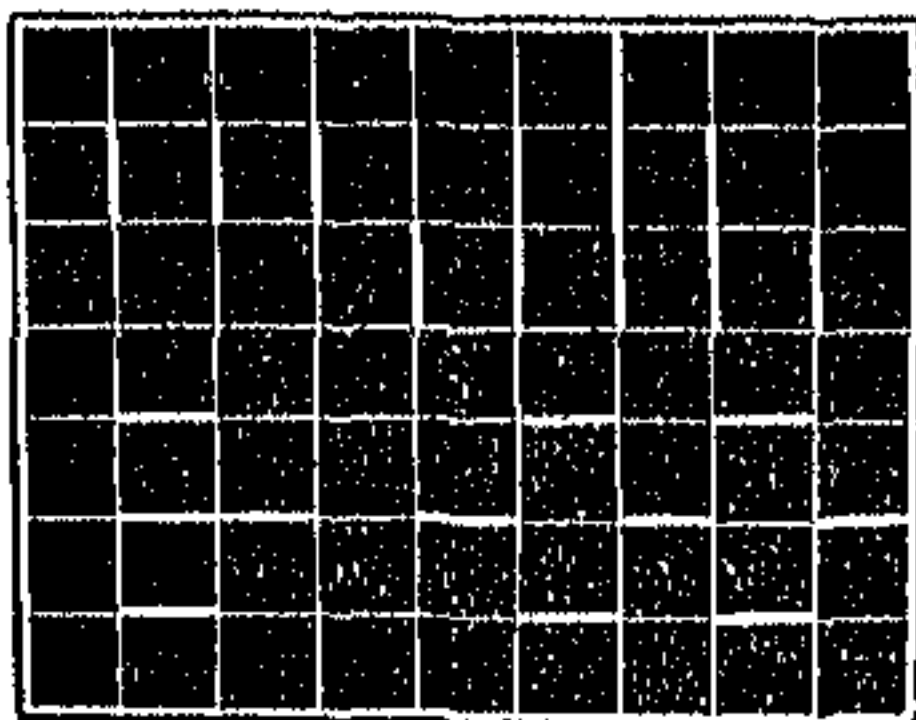
কিণ্ডারগার্টেন খাতা ।—কাগজের উপর পেন্সিল বা পুঁব পাতলা সবুজ বা নীল কালী দ্বারা ২ ইঞ্চ ফাঁকে ফাঁকে দৈর্ঘ্য প্রস্থে কাল কাটা । একপ খাতাও কিনিতে পাওয়া যায় ।

বালকের বয়স যখন ৪ বৎসর তখনই তাহার হাতে স্টুট পেন্সিল দিতে হইবে । সে পেন্সিল দ্বারা স্টুটের উপর ইচ্ছামত হিজিবিজি করিবে । চক দিয়া মাটি বা বোর্ডের উপর এইরূপে যথেষ্ট দাগ কাটাকাটি করিবে । ইহার দ্বারা হাতের জড়তা দূর হইবে । কিরূপে জোরে পেন্সিল ধরিতে হয়, কেমন করিয়া দাগ কাটিতে হয় তাহা বালক এইরূপ অমুশীলনে নিজেই বুঝিতে পারিবে ।

৫ বৎসর বয়সে কিণ্ডারগার্টেনে স্টুট হাতে দিবে । ইহার পূর্বেই বালকদিগকে খাড়া, তেড়া ও পড়া রেখার এবং বঁকা ও এঁকাবঁকা রেখার শিক্ষা দিতে হইবে । (৮ম ও ৯ম খেলনার বিষয় পাঠ কর) ।

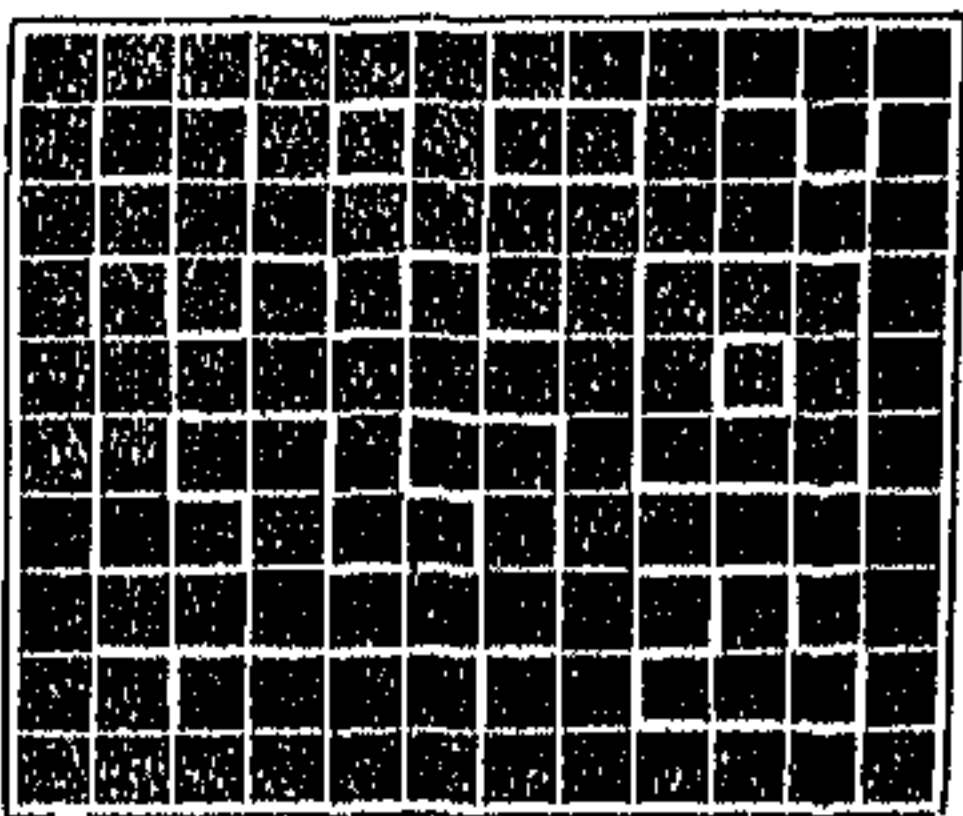
প্রথমে স্টুটে খাড়া রেখা ও পড়া রেখা অঙ্কন অভ্যাস করিবে ।

প্রথমে সমান সমান রেখা, তারপর একটা অপেক্ষা অপরটা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ইত্যাদি অঙ্কন করিবে। ইহার দ্বারা অনুপাতের উত্তম জ্ঞান জন্মাইবে। নিম্নের চিত্র দেখিলেই শিক্ষকেরা এ পদ্ধতি বুঝিতে পারিবেন। শিক্ষক বোর্ডে এইরূপ দাগ কাটিবেন আর বালকেরা সেটে তাহার অনুকরণ করিবে।



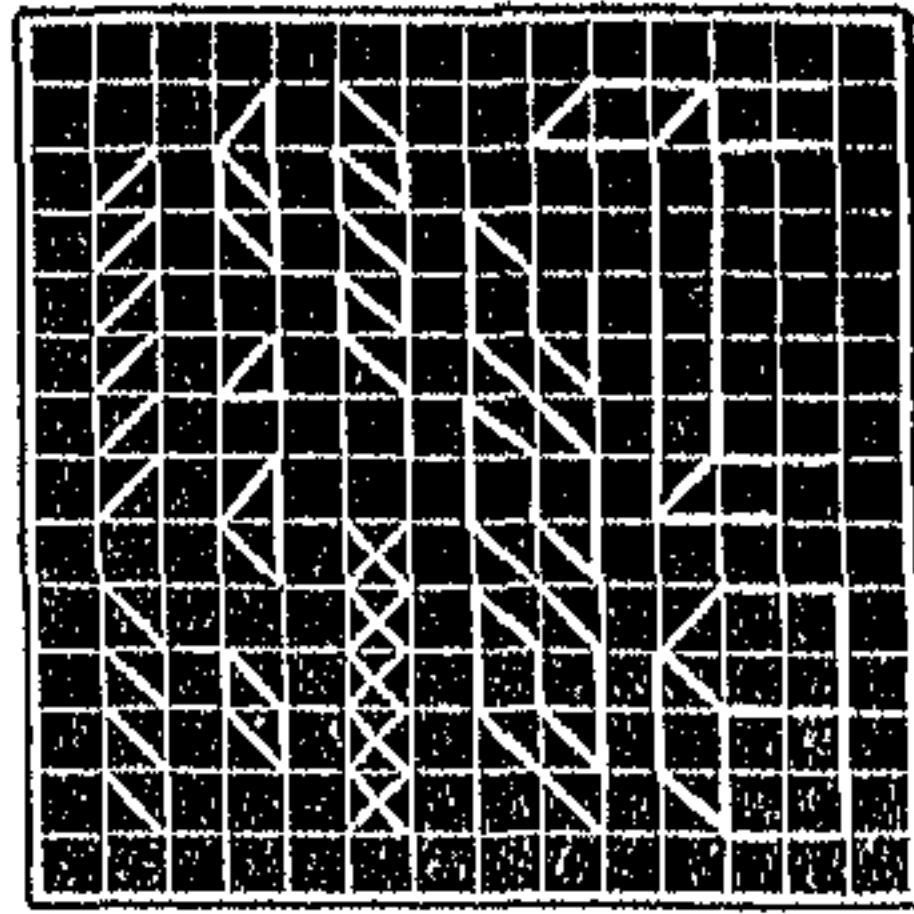
৩১ চিত্র।—খাড়া ও পড়া টান।

এইরূপে খাড়া ও পড়া রেখা অঙ্কন কিছু অভ্যাস হইলে খাড়া ও পড়া রেখাদ্বারা নানারূপ দ্রব্য ও সাজ প্রস্তুত শিখাইতে হইবে।



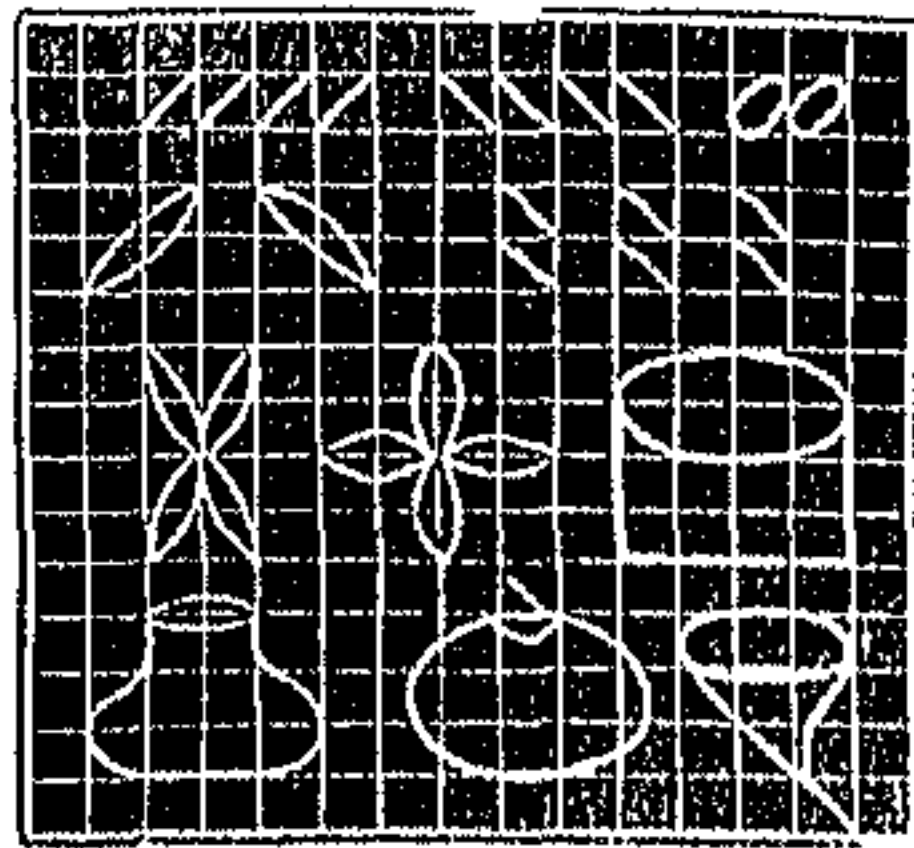
৩২ চিত্র।—খাড়া টান ও পড়া টানের যোগ।

ইহার পর তেড়া রেখা অঙ্কন শিখাইবে। বর্গক্ষেত্রগুলি কর্ণরেখা ক্রমে যোগ করিলেও তেড়া রেখা হইবে। তার পর খাড়া, পড়া, তেড়া রেখা দ্বারা দ্রব্য ও সাজ অঙ্কন শিখাইবে। নিম্নে আদর্শ প্রদত্ত হইল :—



৩৩ চিত্র ।—তেড়াটানের যোগ ।

ইহার পর বঁকা রেখার ব্যবহার শিখাইতে হইবে :—



৩৪ চিত্র ।—বঁকাটানের যোগ ।

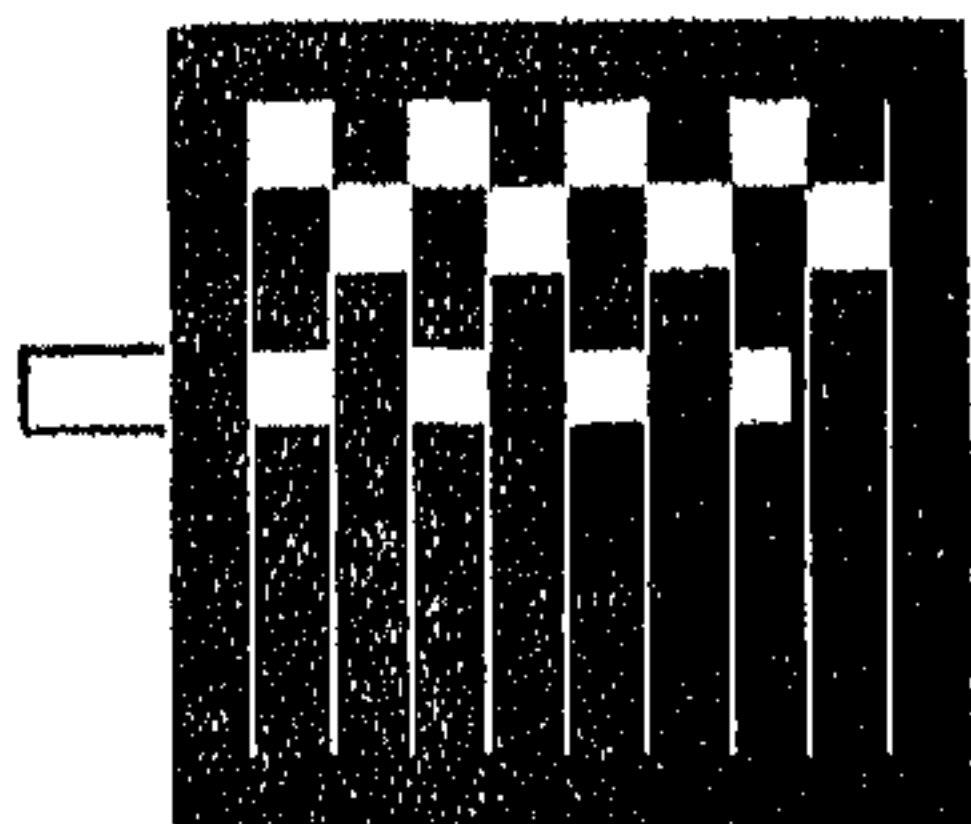
প্রথম শিক্ষার সময় বালকেরা যাহাতে মোটাগুটি রকমের ভাব প্রকাশ করিয়া চিত্র অঙ্কন করিতে পারে সেইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে । লাইন উত্তম হইল না, কি গঠন সুস্থভাবে ব্যক্ত হইল না, এ সকলের দিকে তেমন দৃষ্টি রাখার আবশ্যক নাই ; একটু একটু ভাব প্রকাশ হইলেই চিত্রাঙ্কনের প্রতি বালকের আগ্রহ জাগিলে । আর আগ্রহ জাগিলেই তাহার চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিবার জন্য একটা আকাজক হইবে । এই আগ্রহ জগাইয়া দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য । বালককে পঞ্চমবর্ষেই নবি বর্ণায় পরিণত করা উদ্দেশ্য নহে । চিত্রাঙ্কন পরিচ্ছেদে এই বিষয় সম্বন্ধে অশ্রান্ত জ্ঞাতব্য উপদেশ জন্মিত ।

১১শ খেলনা।—১০ম খেলনায় বেধশূন্য রেখার ব্যবহার করা হইয়াছে। এই ১১শ খেলনায় সেই রেখার সূক্ষ্মতম অংশ ‘বিন্দু’ জইয়া কারবার। কেমন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। ১১শ খেলনার বিষয়, পুকের খেলনার মত চেক্-কাটা কাগজ আর একটা মোটা স্ট্র। এই স্ট্রের দ্বারা কাগজের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া নানারূপ লতা পাতা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বালিকাবিদ্যালয়ের পক্ষে এই খেলনা বিশেষ আবশ্যক। ছিদ্র করিবার জন্য এই রকম চিহ্নযুক্ত চেক্-কাটা মোটা কাগজ কিনিতে পাওয়া যায়।

১২শ খেলনা।—এটীও বালিকাদিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়। এই ১১শ খেলনার ছিদ্রকরা কাগজে উল কি রঙকরা সূতা দিয়া (স্ট্রের সাহায্যে) নানারূপ ফুলপাতা বুনন করাই এ খেলনার উদ্দেশ্য।

১৩শ খেলনা।—রঙকরা কাগজ ও একখানি মাথামোটা কাঠী (ছোট ছোট বালকগণকে সূক্ষ্মমাথায়ুক্ত কাঠী দিতে নাই। অসাবধানে কোথাও বিদ্ধ করিয়া কষ্ট পাইতে পারে) আর এক শিশি আঁটা। কাগজের ফুল ও পাতা ও সাজ কাটা শিখাইতে হইবে। লাল কাগজে সুন্দর সুন্দর ফুল কাটিয়া ও সবুজ কাগজে পাতা কাটিয়া, আঁটার দ্বারা সাদা কাগজে লাগাইলে বেশ দেখায়। আবার থাকে থাকে কাগজ আঁটিয়া নানারূপ সুন্দর সুন্দর ফুল ও পাতা প্রস্তুত করা যায়। এই সমস্ত কাগজের ফুল পাতা প্রস্তুত শিক্ষা দেওয়াই ১৩শ খেলনার উদ্দেশ্য।

১৪শ খেলনা।—কাগজের চাটাই বুনন। ইহার এত রকম আছে যে তিন বৎসরের শিশু হইতে ১৩শ বৎসরের বালক পর্য্যন্ত এই খেলনায় আমোদ পাইতে পারে। এই খেলনার আসবাবও মূল্যবান নহে। বাজারে যে একপিঠ উজ্জল রঙকরা এক রকম কাগজ পাওয়া যায় তাহাই ইহার প্রধান উপকরণ। তবে ছোট ছেলেদের জন্য, শিক্ষককে একখানি ধারাল ছুরি ও কলের সাহায্যে কাগজ কাটিয়া দিতে হইবে।



৩৫ চিত্র ।—চাটাই বুনন ।

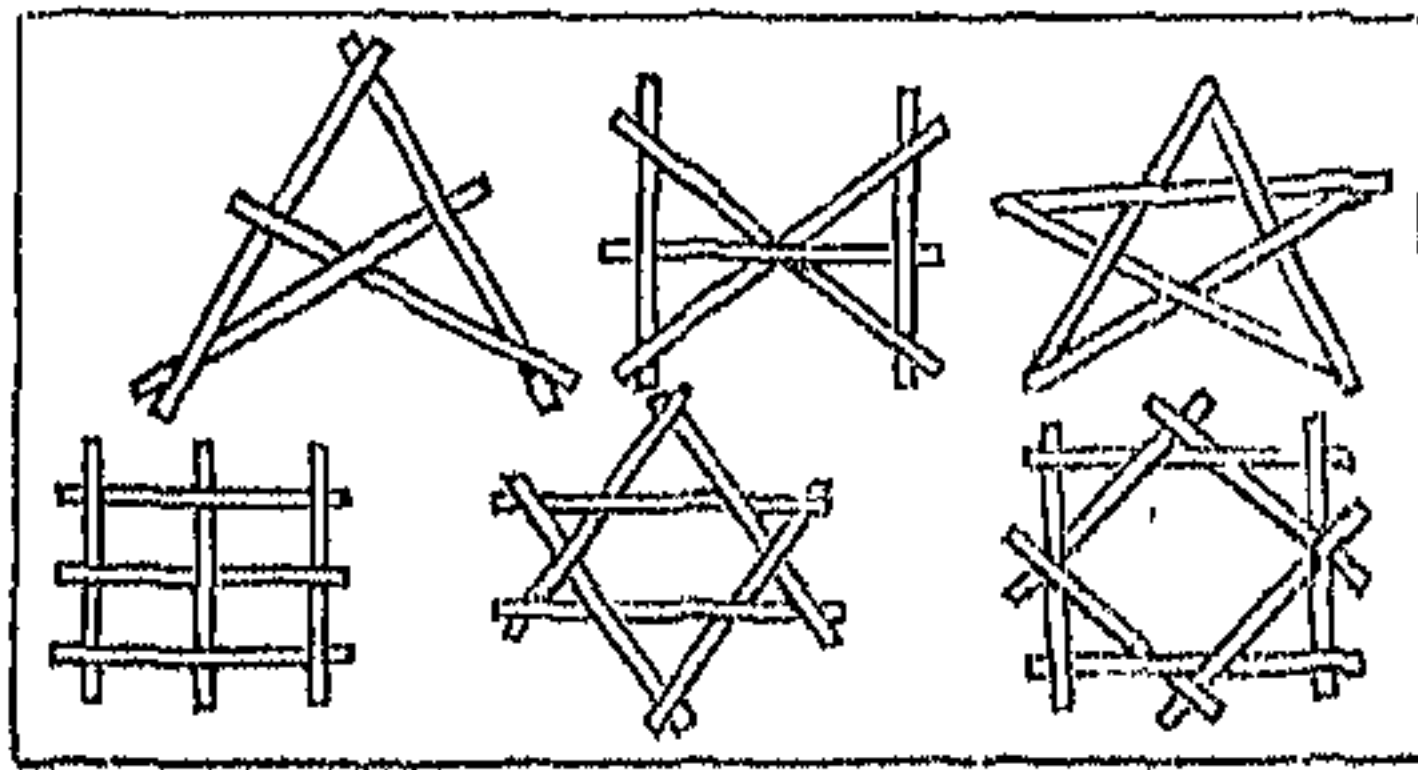
একখানি আয়ত ক্ষেত্রাকার (মনে কর $৬'' \times ৪''$) রঙকরা (মনে কর সবুজ) কাগজের উপর নীচে একটু কাগজ বাদ দিয়া ফালি কাটিবে, যেন কাগজের ফালিগুলি পড়িয়া না যায় । তারপর অল্প রঙের কাগজে (মনে কর লাল) ঠিক এই সকল ফালির প্রস্থের সমান করিয়া, আর কতকগুলি আলাগা ফালি কাটিয়া লও । এখন চিত্রের অনুরূপ, একটার নীচে একটার উপরে দিয়া, আলাগা ফালিগুলি গাথিয়া যাও ; বেশ সুন্দর চাটাই হইবে । প্রথম ফালিগুলি যেমন ভাবে বসাইবে, দ্বিতীয় লাইনে ঠিক তার বিপরীত করিতে হইবে । অর্থাৎ প্রথম লাইনে ১টার উপর ১টার নীচে চাটাইলে, দ্বিতীয় লাইনে ১টার নীচে ১টার উপরে না গাঁথিলে সুন্দর দেখাইবে না ।

আবার এই রকমে :—

- (২) এক লাইনে ২টার উপরে, ২টার নীচে, পরের লাইনে ৩টার নীচে, ২টার উপরে,
 - (৩) „ „ ২টার উপরে, ১টার নীচে, „ „ ২টার নীচে, ১টার উপরে,
 - (৪) „ „ ৩টার উপরে, ১টার নীচে, „ „ ৩টার নীচে, ১টার উপরে,
 - (৫) „ „ ৩টার উপরে, ২টার নীচে, „ „ ৩টার নীচে, ২টার উপরে
- ইত্যাদি নানাপ্রকার চাটাই বুনন শিখাইতে পারা যায় । শিক্ষক নিজে একখানি বুনিতে আরম্ভ করিবেন আর যেকোন আদর্শ বালকগণের দ্বারা প্রস্তুত করাইতে ইচ্ছা করবেন, সেই ধারানুসারে বালকগণের পরিচালনার্থ এইরূপে ডাকিয়া বলিবেন :—“১ উপর, ২ নীচে”

অর্থাৎ প্রথমটার উপর দিয়া যাইবে তারপর ২টার নীচে দিয়া যাইবে; এইরূপ ১ উপর ২ নীচ করিয়া প্রথম লাইন শেষ হইলে, আবার "১ নীচ ২ উপর" এইরূপ ডাকিয়া বলিবে। বালকবালিকাগণ দ্বিতীয় লাইনে এই অনুসারে কার্য্য করিবে। এই সমস্ত চাটাইএর আলংকারিকালিগুলি একটু আঁটা দিয়া আঁটিয়া যদি খাতার উপর লাগাইয়া দেওয়া যায়, তবে খাতার বেশ সুন্দর মলাট হয়। এই খেলনায় দুই হাতেরও চালনা হইয়া থাকে। বালকগণের নিপুণতা অভিমান হয়। শিল্প শিক্ষার এই সমস্ত সূচনা।

১৫শ খেলনা।—১০ ইঞ্চি লম্বা, ৫ ইঞ্চি চওড়া ও ১৬ ইঞ্চি মত পুরু কতকগুলি বাঁশের চটা। বিলাতী কিঙারগার্টেন বাক্সের সঙ্গে পাতলা কাঠের চটা থাকে, কিন্তু বাঁশের চটাই আমাদের পক্ষে সস্তা ও সুবিধাজনক। এইগুলির দ্বারা নানা রকমের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পূর্ব খেলনায় কাগজের ফালিগুলির যেমন ব্যবহার হইয়াছে, এবারে এ চটাগুলিরও প্রায় সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। নিম্নের চিত্র দেখিলেই শিক্ষকগণ ইহার ব্যবহার বুঝিতে পারিবেন :—



৩৬ চিত্র।—চটাসাজান।

১৬শ খেলনা।—১৫শ খেলনার মত কাঠের চটা, তবে লম্বায় ৪ ইঞ্চি মাত্র। এই ছোট ছোট চটাগুলি কজার দ্বারা আঁটা। ইচ্ছামত খোলা ও বন্ধ করা যায়। ইহার ব্যবহার কতকটা পূর্ব খেলনার মত, তবে তাহা অপেক্ষা একটু জটিল।

১৭শ খেলনা।—সাদা বা রঙ করা কাগজের দশ ইঞ্চি লম্বা ও ৬ ইঞ্চি চওড়া কতকগুলি ফালি। ব্যবহার ১৬শ খেলনার মত, তবে তাহা অপেক্ষা একটু অধিক শক্ত।

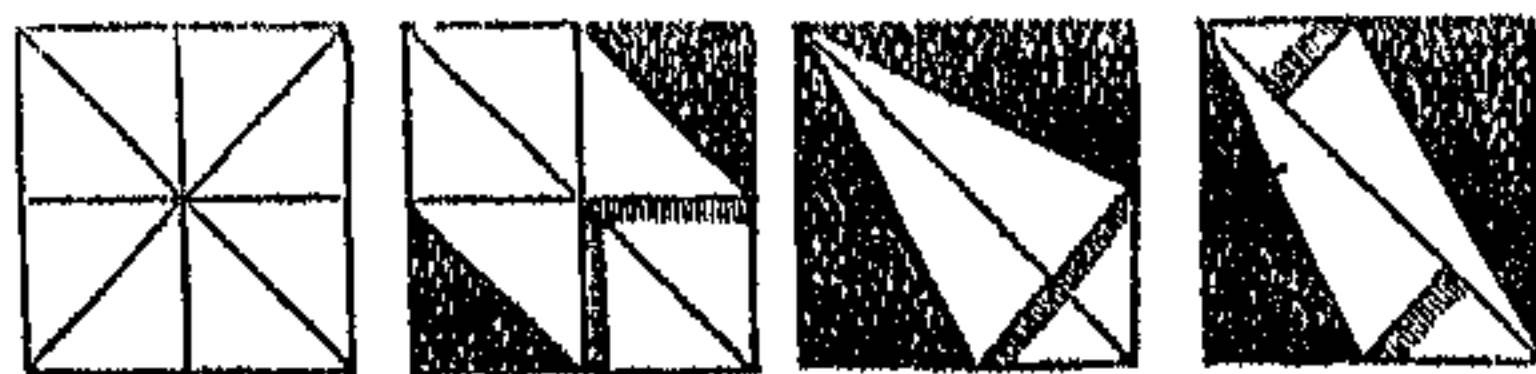
১৮শ খেলনা।—কাগজ ভাঁজ করা। এ খেলনার দ্বারা অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে পারা যায়। আর এ খেলনায় খরচও নাই। এক টুকরা সাদা কাগজ হইলেই হইল।

প্রথমে বালকগণকে ৭ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ২½ ইঞ্চি প্রশস্ত আয়তক্ষেত্রাকার কাগজের টুকরা দাও। ভাঁজ শিক্ষা দিবার পূর্বে, বালকগণের সঙ্গে কাগজ সম্বন্ধে গল্প কর। কাগজের রঙ সাদা, কাগজ পাতলা, মসৃণ, ভাঁজ করা যায়, সহজে ছেঁড়া যায়, ছেঁড়া নেকড়া দিয়া কাগজ তৈয়ারী করে ইত্যাদি মোটামুটি বিষয়ে একটু আলোচনা কর। তার পর এই কাগজ টুকরার ৪ কোণ, ৪ ধার। ৪ ধারের, দুই দুই ধার সমান; আবার দুই ধার বড়, আর দুই ধার ছোট। কোণ ৪টি সমকোণ। টেবিলের কোণ, স্কেটের কোণ, ঘরের কোণ প্রভৃতি সমকোণ।

তার পর ভাঁজ করা—নীচের ধার তুলিয়া উপরের ধারের সহিত মিল কর। মধ্য টিপিয়া ভাঁজ কর। একটী আয়ত ক্ষেত্র, ২টী ছোট সমান সমান আয়ত ক্ষেত্র হইল, ইত্যাদিরূপে শিক্ষা দাও।

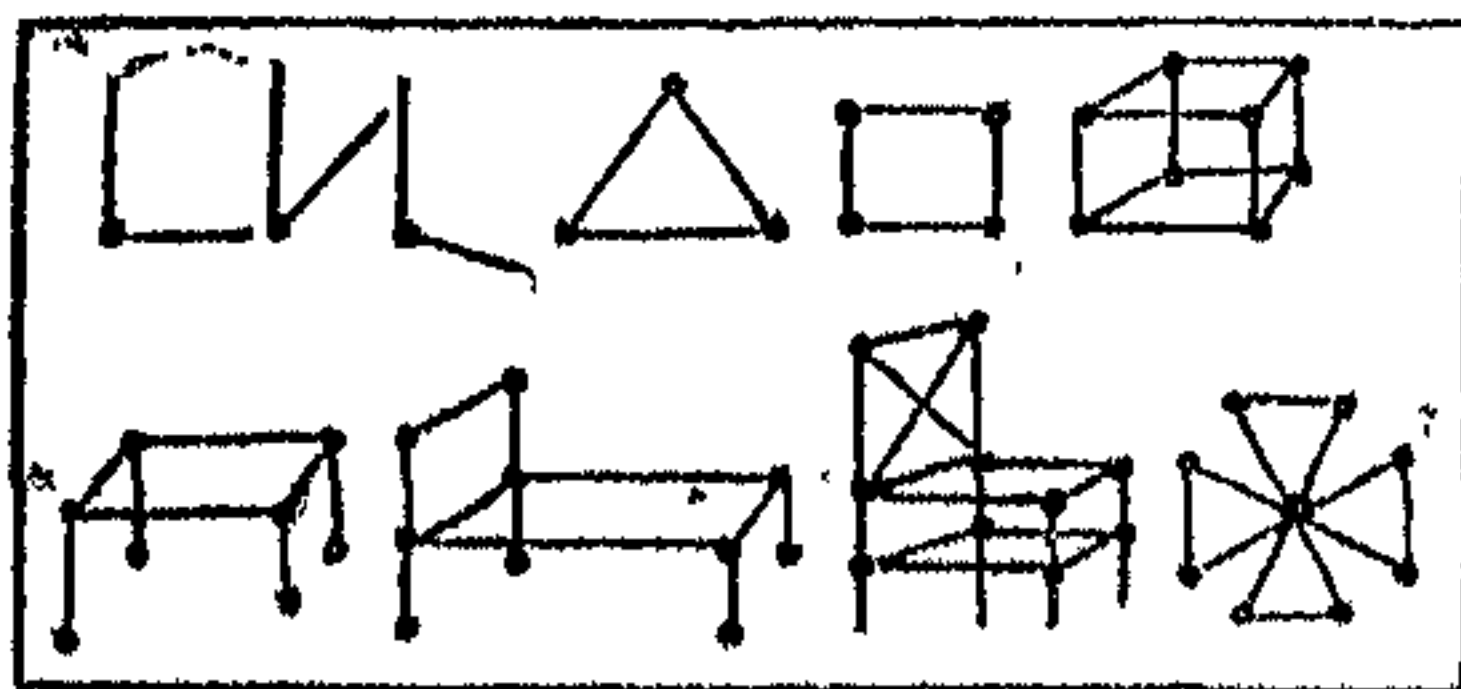
ইহার পর বর্গক্ষেত্রাকার কাগজের টুকরা দাও। “চারধার সমান, ৪ কোণ সমকোণ হইলে তাহাকে বর্গক্ষেত্র বলে” ইহা বুঝাইয়া দাও। তার পর ভাঁজ আরম্ভ কর।

বর্গক্ষেত্রকে মধ্য ভাঁজিয়া ২টী আয়তক্ষেত্রে ভাগ কর। কর্ণরেখা ক্রমে ভাঁজিয়া ২টী সমান সমকোণী ত্রিভুজ কর; এই রেখাকে কর্ণরেখা বলে; কর্ণ রেখার দ্বারা এইরূপ ক্ষেত্র দুই সমানভাগে বিভক্ত হয় ইত্যাদির আলোচনা করিতে হইবে। অন্যান্য ভাঁজ নিয়মের চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। এই খেলনা জ্যামিতি শিক্ষার সূচনা।



৩৭ চিত্র।—কাগজ ভাঁজ করা ।

এ সকল ভাঁজ শিক্ষার পর কাগজের নৌকা, টুপি, দোয়াত, বাক্স, পাখা প্রভৃতির গঠন শিখাইতে হইবে। এ সমস্ত খেলনা অনেকেই গড়িতে জানেন বলিয়া এ সম্বন্ধে কোন উপদেশ লিখিত হইল না। যে শিক্ষক না জানেন, তিনি আশ্রয় নিকট শিখিয়া লইবেন। এ বিষয়ে লিখিয়া উপদেশ দিতে গেলে কেবল পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয় মাত্র, কারণ লিখিত উপদেশ বৃদ্ধিবার পক্ষে তেমন সুবিধাজনক হয় না।



৩৮ চিত্র—মটর ও কাঠী দ্বারা গঠন ।

১৯শ খেলনা।—বাঁটার কাঠীর মত খুব সরু কতকগুলি বাঁশের শলাকা, আর বড় বড় মটর। মটরগুলি ১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে, আর কাঠীগুলির অগ্রভাগ আবশ্যক মত ছুরির দ্বারা সরু করিয়া লইতে হইবে। স্মরণ্য এক একখানা ছুরি থাকাও আবশ্যক। দেশী

কামারেরা ছ পয়সা, চার পয়সা দারৈয়ে যে ছুরি বিক্রয় করে, তাহাই একটু বসিয়া ধারাল করিয়া লইলেই চলিবে। এই ভিজান মটারের সঙ্গে, কাঠী রাখিয়া নানারূপ গঠন করা যাইতে পারে। ৩৮ চিত্র দেখিলেই প্রণালী বুঝিতে পারা যাইবে।

মটর না ভিজাইয়া, ছোট ছোট করিয়া আলুর টুকরা কাটিয়া লইলেও হয়। তরমুজের বা কুমড়ার খোসা, লাউর মাথা প্রভৃতি তরকারীর পরিত্যক্ত জিনিষগুলিও টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ব্যবহার করা যায়। পিটেপোড়া, কনককরবী প্রভৃতির ফল কাটিয়াও এ কাজ করিতে পারা যায়। খরচ নাই, কেবল শিক্ষকের একটু যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক।

এই খেলনায় বালকগণকে পরিমাণ মত কাঠী কাটিয়া লইতে হইবে। পরিমাণ ও অনুপাত বোধের অনুশীলন হইবে। পূর্বে বর্ণিত খেলনার প্রণালী মত প্রত্যেক গঠন লইয়াই বালকগণকে কিছু কিছু নূতন তত্ত্ব শিখাইতে হইবে।

২০শ খেলনা।—ঠাকুর গড়া মাটী, মোম, প্লাসটিসিন বা পুটীন (পুটীন, প্লাসটিসিন প্রভৃতির প্রণালী পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে), কয়েকখানি বাঁশের শক্ত চটা ও মাটী রাখিবার জন্য এক এক টুকরা কাঠ বা টিন। মোম, পুটীন দাগী জিনিষ। মাটীর দ্বারাই যখন বেশ কাজ চলিতে পারে, তখন দাগী জিনিষের আবশ্যকতা নাই। পূর্বোক্ত সমস্ত খেলনায় জব্যাদির একটা মোটামুটি অনুকরণ করা হইয়াছে মাত্র। এই শেষ খেলনায় জব্যের সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণ করাই উদ্দেশ্য। মাটীর দ্বারা ছক, ঢোল, বল, বোতল, গেলাস, বাটি প্রভৃতি হইতে নানা রকমের ফল, ফুল, পাতা পর্যন্ত গঠন করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। এই খেলনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও আমোদবর্ধক। মাটীর দ্বারা জব্যের প্রতিকৃতি করিতে গেলেই জব্যটিকে পুজানুপুজারূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। এই খেলনায় শৃঙ্গ দৃষ্টির ও

পর্যবেক্ষণ-শক্তির সুন্দর অনুশীলন হইয়া থাকে । যাহারা কিণ্ডারগার্টেনের অন্য কোন খেলনাই পছন্দ করেন না, তাঁহারাও এই খেলনাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই । কাদামাটি লইয়া খেলা করাও বালকগণের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কারণ কাদা কোমল অঙ্গুলির অতি সহজ সঞ্চালনেই ইচ্ছানুরূপ নানা আকারে পরিবর্তিত হয় । মৃদুর্ক্তি গঠন পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে ।

কিণ্ডারগার্টেনের অন্যান্য কার্য্য ।-- কিণ্ডারগার্টেন নির্ধাচিত বিংশতি খেলনা ছাড়া আরও কতকগুলি অতিরিক্ত খেলা ও খেলনার বিধান আছে । কিণ্ডারগার্টেন খেলনার মহিত এইগুলিকে পৃথক করিবার জন্য, ইহাদিগকে কিণ্ডারগার্টেন খেলনা না বলিয়া কিণ্ডারগার্টেন কাছা বলা হইয়া থাকে । কিণ্ডারগার্টেন কার্য্যের মধ্যে ভঙ্গী-সঙ্গীত ফ্রোবেল-সম্মত । অন্যান্য কার্য্য নানা ব্যক্তি দ্বারা কল্পিত ।

ভঙ্গী-সঙ্গীত ।—যে সকল সঙ্গীতের সঙ্গত করিবার সময় সঙ্গীত-নির্দিষ্ট ভাবগুলি সুর ও ভঙ্গীর দ্বারা ব্যক্ত করিতে হয়, তাহাকে ভঙ্গী-সঙ্গীত বলে । মনোগত ভাব প্রকাশের প্রধান উপায় শব্দ ও ভঙ্গী । যেখানে এই শব্দ এবং ভঙ্গী একত্র মিলিত হয়, সেখানে ভাবও উত্তমরূপে পরিস্ফুট হয় । তবে বালকগণের সহজ বোধের নিমিত্ত প্রথম প্রথম কিণ্ডারগার্টেন-সম্মত সঙ্গীতে ভঙ্গীর আধিক্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে । কিন্তু শেষে এই আধিক্য কমিয়া গিয়া নিয়মিত ভঙ্গীতে পরিণত হয় ।

ভঙ্গী-সঙ্গীত-শিক্ষায় শিক্ষকগণকে নিয়মিত নিয়মগুলি মনে রাখিতে হইবে :—

(১) কিণ্ডারগার্টেন খেলনায় বা কার্য্যে যে বিষয়ের আলোচনা হইবে, তাহা উপলক্ষ করিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে হইবে (১ম খেলনার শেষ অংশ পাঠ কর) অবধা কোন সরল উপকথা বলিয়া, তাহাই উপলক্ষ করিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে হইবে ।

(২) যাহাতে গীতটি বালকেরা মোটামুটী রকমে বুঝিতে পারে সেরূপ ভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। বালকগণের বয়স বিবেচনায় ভঙ্গী-সঙ্গীতের ভাব, ছন্দ ও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবে। ছোট ছোট শিশুগণের পক্ষে সহজ ভাব, সরল ছন্দ ও স্বল্প পরিমাণ বিধেয়।

(৩) সঙ্গীতগুলি ছড়ার আকার হইলেই চলিবে—পাঠের নিয়মানুসারে অক্ষর গণনাদির বিশেষ প্রয়োজন নাই।

(৪) এই সঙ্গীতগুলি কবিতার মত আবৃত্তি করিলেও হইবে। তবে পারিলে একটু সরল সুর সংযোগ করা মন্দ নয়। শিক্ষক প্রথমে সঙ্গীতটি খুব সহজ সুরে গান করিয়া শুনাইবেন ও গানের বা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সুসঙ্গত ভঙ্গী প্রদর্শন করিবেন। বালকগণ নিবিষ্টচিত্তে শিক্ষকের অনুকরণ করিবে।

(৫) সঙ্গীতটির সমস্ত অংশ একেবারে নিখাইতে চেষ্টা করিবেন না। প্রথম অংশ উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলে, দ্বিতীয় অংশ; দ্বিতীয় অংশ হইলে তৃতীয় ইত্যাদি।

(৬) যাহাতে সকল বালকের সমান সুর ও ভঙ্গী হয়, এবং যাহাতে সকল বালক একসঙ্গে একরূপে অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করিতে পারে, সে বিষয়েই প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৭) ভাব-ভঙ্গী সমূহ যাহাতে বালকগণের সুখপ্রদ হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই ভঙ্গী-সঙ্গীত শিক্ষার বয়স ৭৮ বৎসর পর্য্যন্ত। ইহার পর হইতে অভিনয় শিক্ষা দিতে হইবে। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ২ জনের (কথোপকথন) এবং তাহার পরে বহুজনের (নাটকের) অভিনয় শিক্ষা দেওয়া রীতি।

ভঙ্গী-সঙ্গীতের আদর্শ :—১। গনে কর শ্রেণীতে বালকগণকে সাদা কাল রঙ শিক্ষা দেওয়া হইল। শিক্ষার শেষে বালকগণের সুখকর অথচ বিষয়সংযুক্ত একটা

গুপ্তী-সঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারিলে আগোদ ও আলোচনা দুইই হইবে। নিম্নে এইগুপ্তী সঙ্গীত বা ছড়ার একটা আদর্শ দেওয়া হইল :—

দাঁত মাদা (১)

নথ মাদা (২)

মাদা কাপড়খানি (৩)

চুল কান (৪)

ভুরু কান (৫)

কান চোখের মণি (৬)।

- (১) দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা দাঁত দেখাইয়া।
- (২) দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর দ্বারা বাম হস্তের অঙ্গুলির নথ দেখাইয়া।
- (৩) দুই হাতে কোঁচার কাপড় একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া।
- (৪) দক্ষিণ হাতের তর্জনীর দ্বারা চুল দেখাইয়া।
- (৫) বাম হস্তের তর্জনীর দ্বারা বাম ভুরু দেখাইয়া।
- (৬) দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর দ্বারা দক্ষিণ চোখের মণি দেখাইয়া।

প্রথমে, প্রথম দুই লাইন শিখাইবে। তারপর অবশিষ্ট অংশ। প্রথম প্রথম অভ্যাসের জন্য ৫।৭ বারের অধিক আলোচনা করা কর্তব্য নহে। মাত্রাধিকা হইলে বালকগণের বিরক্তি জন্মিতে পারে। উত্তমরূপে অভ্যাস হইলে, সমস্ত সঙ্গীত এক সময়ে ৩ বারের অধিক আবৃত্তির প্রয়োজন নাই।

২। উপকথা অনুচ্ছেদে লিখিত ৩য় গল্পের সংগ্রহে নিম্নলিখিত সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে :—

তাই তাই তাই^১, মামাবাড়ী যাই^২

মামা দিল দই সন্দেহ^৩, দোরে বসে থাই^৪

মামী এল^৫ লাঠী হাতে^৬, পালাই পালাই^৭

- (১) তিনবার হাতে তালি দিয়া।
- (২) ডান হাতের তর্জনী দ্বারা দূরে বাড়ী দেখাইয়া।
- (৩) এক পা অগ্রসর হওন, যেন কোথাও যাওয়া হচ্ছে।
- (৪) ডান হাত বাড়াইয়া কোন জিনিস দিবার মত গুপ্তী করিয়া।
- (৫) কোন জিনিস লইবার মত যেমন করিয়া হাতের তালু পাতিতে হয় সেইরূপ করিয়া।
- (৬) ডান হাতের তর্জনী দ্বারা দরজা দেখাইয়া।

- (৭) ডান হাতে থাইবার মত ভঙ্গী করিয়া ।
 (৮) পশ্চাতের দিকে চাহিয়া যেন পশ্চাৎ হইতে কেহ আসিতেছে এই ভাব দেখাইয়া ।
 (৯) দুই হাতে লাঠি ধরিবার মত ভাব করিয়া ।
 (১০) সকল বালক একসঙ্গে ৪।৫ পা দৌড়াইয়া যাইবে । (সঙ্গে সঙ্গে ছুটি কি টিফিনের ছুটির ব্যবস্থা হইলে উত্তম হয়) ।

৩। কোন কোন পাঠ (যথা শবীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ) কেবল এইরূপ মজীতেগ্ন বাহায্যেই শিক্ষা দিতে পারা যায় :—

এইটী মস্তক মোর, এ ছুটি চরণ,
 এইটী উদর মম, এ ছুটি নয়ন ।
 এই বক্ষ, এই নাভি, এই ছুটি উরু,
 এই মোর কটিদেশ, এই দুই ভূব ।
 ললাট, চিবুক, নাসা, কব দরশন,
 এই দুই গণ্ড মম, এ দুই শবণ ।
 অধর নীচের ঠোঁট, উর্দ্ধে তান ওষ্ঠ,
 এই দুই জডবা মম, এ দুই নকোষ্ঠ ।
 জামু, গুলফ, মণিবক্ষ, এ দুই কফোনি ।
 কনিষ্ঠা, ও অনাগিকা, মধ্যমা, তর্জনী ।
 অঙ্গুষ্ঠ ইহার নাম, এই গ্রীবা দেশ'
 দুই দিকে দুই কক্ষ, এই কৃষা কেশ ।
 জিহ্বা, দন্ত, দুই শব্দ, এ দুই প্রগণ্ড,
 দুই পাশ, এক পৃষ্ঠ, এক মেবাদণ্ড ।
 যকৃত দক্ষিণে আছে, প্লীহা থাকে বামে,
 বক্ষ মধ্যে রক্তাধার, হৃদপিণ্ড নামে ।
 পাকস্থলী এইখানে, অঙ্গ যুক্ত তাম,
 যুগযুগ দুই পাশে, মস্তিস্ক মাঝায় ।
 এই সব অঙ্গ মোর যিহার রচনা,
 ছুটি হস্ত জুড়ি করি তাঁহারে বন্দনা ।

এই কবিতা আবৃত্তির সহিত যেরূপ ভঙ্গীর আবশ্যক তাহা শিক্ষকগণ বিনা উপদেশেও

নুঝিতে পারিবেন, তবে এক কথা বলা আবশ্যক যে, সমস্ত অঙ্গই দুই হাতে দেখাইতে হইবে, দুই মণিবন্ধ দেখাইবার সময়, দুই হাতের মণিবন্ধ জড়াইয়া ধরিতে হইবে ।

৪ । কোন পাঠ বা গানের উপলক্ষ না করিয়া, কেবল নানাক্রম কর্ণের ধারাও শুধী-সঙ্গীতের দ্বারা গীত হইয়া থাকে ; যথা—ধানকাটা, নৌকাবহা, গাছ ধরা, তাঁত বোনা প্রভৃতি কার্য । নিম্নে ধানকাটার বিষয়ে একটি শুধী-সঙ্গীতের আদর্শ প্রদত্ত হইল :—

আয় রে ভাই ধান কাটিগে কচাকচ ।

ডান হাতে কাস্তে করি, বাম হাতে গোছা ধব,

গোড়া পেড়ে মারব ফ্যাস ফসাকম্ ।

গোছাগুলি একে একে, রাখব ভূঁয়ে ভাগে ভাগে,

শুছিয়ে নিয়ে বাঁধব তাঁটী, টপাটপ ।

মাথায় করে সন্ধ্যাবেলা, আনন্দ বাড়ী করব পালা,

শুকিয়ে গেলে মলব ধান গজাগজ ।

ভান্ব ধান ঢেঁকি ফেলে, রাঁধব ভাত নূতন চেলে,

খাব ভাই মনের সুখে, সপাসপ ।

৫ । নিম্ন প্রাথমিক উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী একটি ক্ষুদ্র অভিনয়ের আদর্শ প্রদত্ত হইল । মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের জন্য যোগীন্দ্রনাথ বসুর “ভারতের মানচিত্র দর্শন,” কাগিনী রায় কৃত “একলব্য” প্রভৃতি অভিনয়ের উত্তম বিষয় ।

যড় খাত্তু ।

(নিম্নলিখিত শৃঙ্খলাক্রমে এক এক জন করিয়া প্রবেশ)

১ । গ্রীষ্মের (লাল কাপড় পরিয়া) প্রবেশ—

প্রথর ভাঙ্গুর তেজে পৃথিবী তাপিত,

অনিল ভনল সম ধূলি ঘুমরিত ;

কোথা জল কোথা বায়,

গেল প্রাণ গেল আয়,

ফুকানিতে জীবগণ হইয়া কাতর ;

গ্রীষ্মের প্রতাপ দেখ কত ভয়ঙ্কর ।

২। বর্ষার (বেগুনে কাপড়) প্রবেশ—

চাকিয়াছি দিক দেশ সব মেঘ দিয়া,
ভরিয়াছি খাল বিল সলিল ঢালিয়া,
অশনির গরজন,
ভয়াকুল প্রাণিগণ,
বিছ্যাৎ চমকে কাঁপে স্বাবর জঙ্গল,
বনবার তাই দেখে প্রতাপ কেমল ।

৩। শরতের (নীল কাপড়) প্রবেশ—

গ্রীষ্ম, বর্ষা গেছে চলে ভারত ছাড়িয়া,
শীতকাল বহু দূরে আছে দাঁড়াইয়া,
ভানু-তেজ কমিয়াছে,
চপলাও নিবিয়াছে,
নিদাঘ শিশিরে গেছে কেমল গিশিয়া,
শরতের শোভা দেখে নয়ন ভরিয়া ।

৪। হেমন্তের (সবুজ কাপড়) প্রবেশ—

সোণার বরণ মাঠ ধানে নলমল,
শিশির নুকুতা পাতি করে টলমল,
প্রফুল্ল সবার গাণ
পাইয়া নূতন ধান,
ধন ধাত্ত-দাতা বজি আগারে আদরে,
হেমন্ত আমার নাম রক্ষা করি নরে ।

৫। শীতের (হলুদ কাপড়) প্রবেশ—

শাল, লুই, আলোয়ান, চাদর, কধল,
লেপ, আর ছেঁড়া কাঁথা যা আছে সম্বল,

বের কর শীঘ্র করি,
 নহিলে যাইবে মরি,
 আসিয়াছি আমি শীত গবে তাড়াইয়া,
 আমার প্রতাপে সূর্য্য গিয়াছে মরিয়া ।

৬। ঋতুরাজ বসন্তের (কমলা কাপড়) প্রবেশ—

(গান) বসন্তে আজি, চাঁদ চকোরে, পাগল হুধু হাসিয়া,
 ঢল ঢল তম্বু, আনন্দে বিভোর, নাচিছে হেলিয়া ছলিয়া ।
 শিশির অবশে পড়িয়াছে ঢলে,
 বরষা হৃদয়ে গিয়াছে যে ঢলে,
 হুধু বনরাজি হাসিছে মৃদুল কুসুমে কুসুম গিলিয়া ।
 কোকিলা পাগিয়া ভাবে মাতোয়ারা,
 জানে না কেন যে গাইতেছে তারা,
 ধীরে ধীরে ধীরে, স্বরের লহরী, উঠিছে গগন ভেদিয়া ।
 জোছনা মাথিয়া বসন্ত বানিনী,
 মদয় আনিলে খেলিছে মোহিনী,
 কুসুম-পরাণে পরিমল মাখি প্রকৃতি যাইছে ভাসিয়া ।

৭। সূর্য্যের (মাদা কাপড়) প্রবেশ—

এরা মবে কেউ কিছু নয়, আমি সবার রাজা ;
 আমা ছাড়া হয় না ঋতু, এরা আমার প্রজা ।

৮। সকলে (সূর্য্যকে আহ্বান করিয়া)—

সূর্য্যামা, সূর্য্যামা, দাঁড়াও মোদের মাঝে,
 তোমা ছাড়া আমাদের কি বড়াই করা গাজে ।

(সূর্য্য মধ্যস্থলে দাঁড়াইলে পর, সকলে তাহাকে ঘিরিয়া হাত ধরাধরি করিয়া চক্রাকারে
 নৃত্য করিতে করিতে)—

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ আর ছয়,
এমনি করে ঘুরে ঘুরে বড় খড়্ হয় ;
গ্রীষ্ম এস, বর্ষা গেল, শরৎ তৎপর,
হেমন্ত পরেতে শীত বসন্তে বৎসর ।

(এক লাইন হইয়া দর্শকগণলীকে অভিবাদন করতঃ সকলের গ্রহণ)

গ্রীষ্মকালের ভীষণ তাপ প্রকাশের জন্য লাল কাপড়, মেঘের বর্ণ অনেক সময় বেগুনে বলিয়া বর্ষার বেগুনে রঙের কাপড়, শরতের আকাশ নির্মল নীল বলিয়া শরতের নীল কাপড়, হেমন্তে মাঠ শস্যপূর্ণ বলিয়া হেমন্তের সবুজ কাপড়, শীতে গাছের পাতা সমস্ত পাকিয়া হলুদবর্ণ হয় বলিয়া শীতের হলুদ কাপড়, বসন্তে নানারূপ লাল হলুদ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া বসন্তের লাল হলুদ মিশ্রিত কমলা কাপড় । এইরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া ছয়জনে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইলে রঙ শিক্ষা দিবারও সুবিধা হইবে । যারপর যে রঙ হওয়া আবশ্যক, এই বিস্তারিত তাহাই দেখান হইয়াছে । আবার সূর্য্যায়িত্রে এই ছয় বর্ণ (আসমানী ও নীল এক ধরিয়া) বিস্তারিত । মাদা কাপড় পরিয়া সূর্য্য মধ্যে দাঁড়াইলে, এই ছয় জনের দ্বারা তাহার ছয় বর্ণের রশ্মি প্রকাশিত হইবে । এখানে কেবল কাপড়ের কথাই উল্লিখিত হইল,—অভিনেতৃগণের অস্থায়ী মাজগোত্র শিক্ষকগণ নিজের পছন্দ মত করিয়া দিবেন । ফুলের মাল', ফুলের মুকুট, ফুলের বসন প্রভৃতি দ্বারা বসন্তকে মাজাইতে হইবে আর শরতকে নানাবিধ মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারে মাজাইবে । বসন্ত ঋতুরাজ বলিয়া, তাহার কবিতা একটু বড়, এইটী গাহিতে পারিলেই ভাল হয় । বালিকাবিদ্যালয়েও এ অভিনয় করান যাইতে পারে । কোন বালিকাবিদ্যালয়ের জন্যই ইহা রচিত হইয়াছিল ।

উপকথা ।—বালকেরা উপকথা শুনিতে যে বড়ই ভালবাসে, তাহা সকলেই জানেন । সুন্দর সুন্দর উপকথা কেবল যে আনন্দবর্ধক তাহা নহে, ইহার দ্বারা বালকগণের ভাষাজ্ঞান জগে, তাহাদিগের বর্ণনা-শক্তি বৃদ্ধি পায় আর তাহাদিগের চরিত্র-গঠিত হয় । কিন্তু উপকথাস্তেমন সুন্দর-ভাবে বলিতে না পারিলে সুখপ্রদ হয় না । স্থান বিশেষে স্বর ক্রম, দীর্ঘ করিতে হইবে আর চোখ, মুখের ও হাতের ভঙ্গী করিতে হইবে অর্থাৎ একাই নানাজনের অভিনয় করিতে না পারিলে গল্প সূত্রাব্য হইবে না ।

উপকথাগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—(১) সত্য ঘটনা অবলম্বনে, (২) কাল্পনিক ঘটনা অবলম্বনে। আবার কাল্পনিক ঘটনাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত (ক) স্বাভাবিক, ও (খ) অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক কাল্পনিক ঘটনা অবলম্বনে যে সকল উপকথা রচিত (যথা, হিতোপদেশের গল্প, ঈসপের গল্প, পরীর গল্প, ভূতের গল্প ইত্যাদি) তাহার দ্বারা বালকগণের প্রকারান্তরে মিথ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, এই এক শ্রেণীর পণ্ডিতবর্গের মত। কেহ কেহ কাল্পনিক অথচ স্বাভাবিক গল্পগুলি (নাটক, নভেল, উপন্যাসের গল্প) পর্যন্তও পছন্দ করেন না। যাহা হউক এ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। শিক্ষকগণ নিজের অভিরুচি অনুসারে ব্যবস্থা করিবেন।

বালকগণের বয়স ও জ্ঞান বিবেচনায় উপকথার ভাব, ভাষা ও পরিমাণ নিরূপণ করিতে হইবে।—বিদ্যালয়ের নীতি শিক্ষার জন্ত পৃথক সময়ের ব্যবস্থা থাকিলে সেই সময়েই এইরূপ উপকথার কথন আবশ্যিক। সেরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে বিদ্যালয়ের কার্যে যখন অবসর পাওয়া যাইবে, অথবা যেদিন বৃষ্টির জন্ত বা অজ্ঞ কোন কারণে বালকগণ টিফিনের ছুটিতে বাহিরে যাইতে পারিবে না, অথবা যেদিন বা যে সময়ে ড্রিল ও ব্যায়ামের অনুশীলনে কোন বাধা ঘটিবে, সেই সময়ে উপকথা দ্বারা বালকগণকে নিযুক্ত রাখা সম্ভব। নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রগণের উপযোগী তিনটি উপকথার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :—

(১) সত্য ঘটনা।—রঘুনাথ নামে একটা ছেলে টোলে পড়ত। রঘুনাথের পণ্ডিত একদিন বললেন “রঘুনাথ ঐ ভট্টাচার্য্যদের বাড়ী থেকে একটু আগুন নিয়ে এসত বাবা।” রঘুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিয়াই আগুন আনতে ছুটে গেল। ভট্টাচার্য্যর গিন্নি রান্না করছিলেন। রঘুনাথ রান্নাঘরের কাছে গিয়া দুহাত পাতিয়া বলিল “মা আমাকে একটু আগুন দিন।” গিন্নি বলিলেন, “তুইত বড় বোকা ছেলে, আগুন কি হাতে করে নেওয়া যায় ?” এই কথা শুনিয়াই রঘুনাথ বলিল “তা নেওয়া যায় না।” সে এই বলিয়াই এক আঙ্গুল ধুলি হাতে করিল, তারপর সেই ধুলির উপর আগুন নিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের

কাছে উপস্থিত । সকলে রঘুনাথের বুদ্ধি দেখে অবাক । এই রঘুনাথই শেষে খুব বড় পণ্ডিত হয়েছিল । (এক বালকের হাতে ধূলা দিয়া তার উপর আগুন লাগিয়া কাঁপাতও দেখাইয়া দিতে হইবে ।)

(২) কাল্পনিক অথচ স্বাভাবিক ।—একটা কাকের খুব পিপাসা লেগেছে । একজনের বাড়ীর উঠানে একটা ঘড়া দেখে, ভাল খাবার জন্তু সেই ঘড়ার উপর গিয়া বসল । কিন্তু ঘড়ায় জল খুব কম, কাক ঠোঁট দিয়া জল পায় না । তখন কাক এক এক খান করে পাথরের (বা ইটের) টুকরা এনে জলের মধ্যে ফেলতে লাগল । যখন জল ঘড়ার মুখের কাছে এল, তখন সে পেট ভরে জল খেল । (একটা গেলাসে অল্প জল রাখিয়া তার মধ্যে পাথর বা ইটের ছোট ছোট টুকরা ফেল । কেমন করিয়া জল উঠু হইয়া উঠে তাহা বালকগণকে দেখাইয়া দাও) ।

(৩) কাল্পনিক ও অস্বাভাবিক ।—টুঙ্গ বুলু ছুই ভাই । টুঙ্গর জর, আব বুলু পোটের অস্থখ । বাড়ীতে ছুই ভাই কেবল খাব খাব করে কান্দিতে লাগল । তাদের মা কিছুই খেতে দিল না । তখন বুলু বলিল “ভাই টুঙ্গ, মামার বিয়ে, চল মামার বাড়ী যাই, সেখানে অনেক জিনিষ খেতে পাব ।” তাদের মামার বাড়ী অনেক দূর—কেমন করে যাবে ? তাই দুজনে একটা ইঁদুরের কাছে গেল । ইঁদুর ঘুমিয়ে ছিল, তাব ঘুম ভাঙাবাব জন্তু টুঙ্গ বুলু তাই দিয়া বলল—

তাই তাই তাই, ওরে ইঁদুর ভাই,

মামা বাড়ী বে' দেখতে কেমন করে যাই ?

ইঁদুর বলল “তা আমাকে যদি খুব খেতে দিস তবে আমি তোদের দুজনকে পিঠে করে নে যেতে পারি ।” টুঙ্গ বুলু বলল, “আচ্ছা তোকে খুব খেতে দেব ।” ইঁদুর রাজি হ'ল । টুঙ্গ বুলু ইঁদুরের পিঠে উঠে ছুট । মামা বাড়ীতে এলেই, মামা তাদের দেখে খুব খুসী হ'ল । আর দই সন্দেশ খেতে দিল ।

তাই তাই তাই, মামা বাড়ী যাই,

মামা দিল দই সন্দেশ দোরো বসে থাই ।

তারাই ছুই ভাই দোরো বসে দই সন্দেশ খেতে লাগল ; আর ইঁদুরটাও তাদের পাশে বসে খেতে লাগল । ইঁদুরটা খুব বড় কিনা তাই তার কুটুর কুটুর করে খাওয়ার খুব শব্দ হ'তে লাগল । মামী জেগে উঠল । মামী ঘরে ঘুমিয়ে ছিল । মামী দেখে যে মশ

একটা ইঁদুর, আর কাদের দুটা ছেলে এসে সব সন্দেশ খেয়ে ফেললে । অমনি এক লাঠী নিধে ভাড়া । টুন্টু বুলু ভেঁ দৌড়—এক দৌড়ে বাড়ী আসা ।

তাই তাই তাই, মামা বাড়ী যাই,
মামা দিল দই সন্দেশ দোরে বসে খাই,
মামী এল লাঠী হাতে, পালাই পালাই ।

এইরূপ উপকথা দুই তিন দিন বলিবার পর, বালকগণকে বর্ণিত উপকথা বিবৃত করিতে বলিবে । প্রথম প্রথম ধারাবাহিক প্রশ্ন করিয়া গল্প আদায় করা যাইতে পারে । যথা—কাকের কি হয়েছিল ? সে উঠানে কি দেখিল ? জল খাইতে পারিল না কেন ? তার পর কি করিল ? ইত্যাদি ।

ইংলিশ এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট (সরকিউলার ৩২২) নিম্নলিখিত কিণ্ডারগার্টেন কার্যাবলী অনুমোদন করিয়াছেন :—

(১) মৃণ্ময় মূর্তি গঠন (সপ্তম প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে) ।

(২) অঙ্কন ও রঞ্জন ।—অঙ্কনের বিষয় পূর্বে (১০ম খেলনায়) বর্ণিত হইয়াছে । তবে সে কেবল পেন্সিলের দ্বারা অঙ্কন । আজ কাল রঙের দ্বারা চিত্রাঙ্কনশিক্ষারস্ত করাই অনেকে সুসঙ্গত মনে করেন । রঙ চিত্রাকর্ষক ও রঙের দ্বারা অঙ্কিত লতা, পাতা, ফুল প্রভৃতি প্রকৃত পদার্থের অনেকটা নিকটবর্তী হয় বলিয়া এই সকল চিত্র অধিকতর উৎসাহবর্দ্ধক । রঙের দ্বারা চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে খরচও বেশী নয় । প্রত্যেক বালককে মূল্যবান রঙের বাক্স কিনিতে হইবে না । বাজারে যে সকল গুঁড়া রঙ—খুনথারাপী, গ্যাজেণ্টার, ভাইওলেট, গ্রীন, নীলবড়ি, পেউডী প্রভৃতি বিক্রয় হয় তাহাই টুচার পরসার করিয়া কিনিয়া জলে গুলিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিবে । কতকগুলি অল্পদামের চীনা মাটির ছোট ছোট বাটি (১০ ১৫ ১০ দাম) কিনিয়া রাখিবে বা কোন পুকুর হইতে ঝিলুক সংগ্রহ করিবে । পাঠার ঘাড়ের লোম দিয়া কতকগুলি তুলি প্রস্তুত করিয়া রাখিবে । তুলি কিনিতেও পাওয়া যায় । সাধারণ কাজ চলার মত একটা তুলির দাম

১৫ কি ১০ । ৩ কি ৪ নম্বর তুলিই বালকগণের পক্ষে উপযোগী । বালক-
গণের হাতে একটা তুলি দাও ও এক একটা বাটিতে বা বায়ুকে একটু
একটু রঙ ঢালিয়া দাও । প্রথমে এক রঙেই চিত্রাদি অঙ্কন কারবে ।
বালকেরা প্রথম প্রথম তুলির দ্বারা নিজের ইচ্ছামত কাগজে রঙ লাগাইবে ।
এইরূপ দু চার দিন স্বাধীনভাবে তুলি চালনা করিলে, তাহারা বিনা
উপদেশেই তুলির ব্যবহার কিছু কিছু বুঝিতে পারিবে অর্থাৎ কিরূপ
করিয়া তুলি ধরিতে হইবে, কিরূপ জোরে তুলি চাপিয়া ধরিলে মোটা
রেখা হইবে, কিরূপ করিলে সরু রেখা হইবে ইত্যাদি বিষয়ে কিছু জ্ঞান
জন্মিবে । সময়মত শিক্ষককেও একটু একটু সাহায্য করিতে হইবে ।
তার পর তুলির দ্বারা চারখানা (বর্গক্ষেত্রাক্ত) কাগজে চিত্রাঙ্কন আরম্ভ
করাও । ১, ২ কি ৩ ইঞ্চ ফাঁকে ফাঁকে পেনসিলের কল কাটিয়া দাও বা
এইরূপ চারখানা কাগজ ক্রয় করিয়া আন । তার পর তুলির দ্বারা যেকোন
ধারাবাহিকরূপে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নিম্নের চিত্র দেখিলেই
শিক্ষকগণ বুঝিতে পারিবেন :—



৩৯ চিত্র ।—তুলি ব্যবহার ।

মন্দির স্থান ফাঁক রাখিলে এই সমস্ত চিত্র সুন্দর দেখায় । ফুলের পাপড়ীগুলির জোড়ের স্থান, পাতার ও ডালের জোড়ের স্থান, মাছির শরীরের নানা জোড়ের স্থান, বোতল, সরিষার সংযোগ স্থান ফাঁক রাখা হইয়াছে । তবে জোড়ের স্থান ফাঁক না রাখিয়াও এইরূপ চিত্রাঙ্কন করাইতে পারা যায় । যথা :—



৪০ চিত্র ।—এক বণ্ডের দ্বারা ডাল পাতা ।

কেবল এক বণ্ডের দ্বারা নানারূপ বৃক্ষ, পাতা, পশু, পক্ষীর চিত্রাদির অঙ্কন শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে ।



৪১ চিত্র ।—এক বণ্ডের দ্বারা বৃক্ষ ।

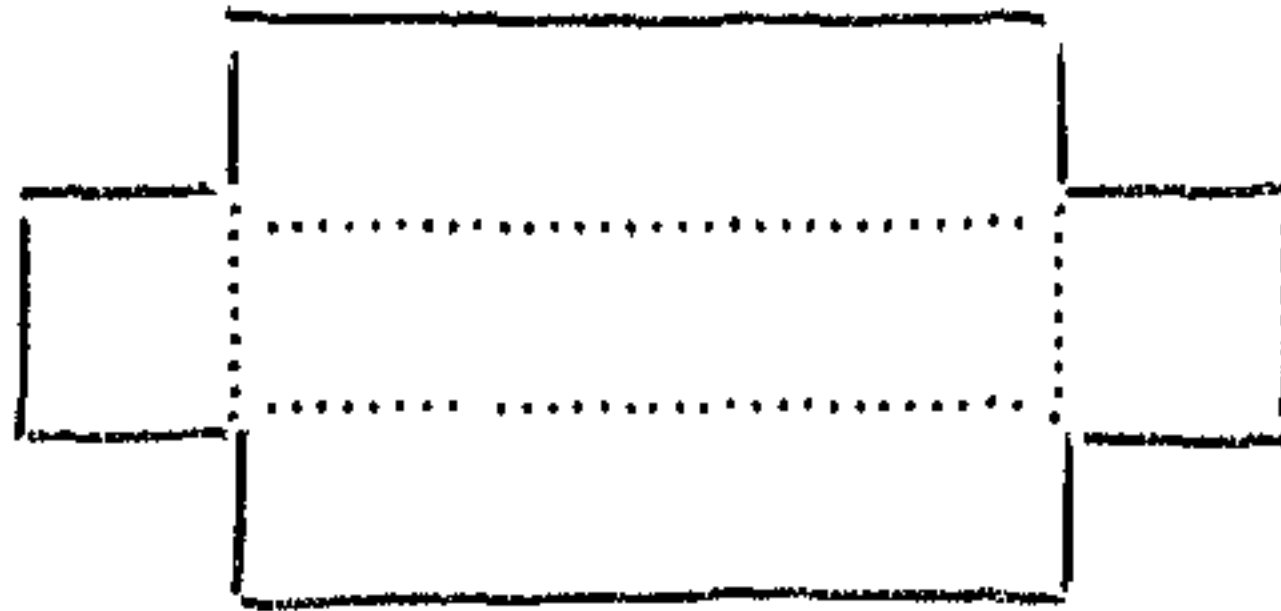
প্রথমে বণ্ড ও তুলির ব্যবহার না করাইয়া তক্তা, প্লেট বা খসুখসে পুরু কাগজের উপর নরম কয়লা, সাদা চক বা রঙিন চক দিয়া চিত্রাঙ্কন শিক্ষা আরম্ভ করাইলে সফল পাওয়া যায় । সকলরূপ চিত্রাঙ্কন শিক্ষায় শিক্ষকগণকে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বালকগণ প্রথম প্রথম

কিছুতেই সুন্দর চিত্র আঁকিতে পারিবে না । তাহার। যাহা আঁকিবে তাহাই উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিবে ও একটু একটু তাহাই মেরামত করিতে থাকিলে দু তিন বৎসরে তাহাদিগের হাতে মোটামুটি রকমের সুন্দর চিত্র আসিবে । শিক্ষকের ও ছাত্রের ধৈর্য্য থাকা আবশ্যক—শিক্ষকের পক্ষেত নিশ্চয়ই ।

(৩) কাগজ কাটা ।—সাদা কাগজে জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কন করিয়া কাঁচির দ্বারা কাটা । কাগজ ভাঁজ করিয়াও নানারূপ জ্যামিতিক চিত্র দেখান যাইতে পারে (১৮ খেলনা) । সাদা কাগজে অক্ষর কাটিয়া, লাল, নীল বা সবুজ কাগজের উপর আঠার দ্বারা আঁটিয়া নীতিবাক্য রচনা করা যাইতে পারে । এইরূপ নীতিবাক্যের দৃষ্টান্ত ;—“সময় চলিয়া গেলে ফিরিবে না আর, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পাতন, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন, সুসময়ে অনেকেই বয়ু বটে হয়, যতন বিহনে কোথা মিলায়ে রতন, দানেই হস্তের শোভা না হয় কক্ষণে, বিছাই আনিয়া দেয় সুদিন সম্পদ” ইত্যাদি । কাগজ কাটিয়া ঘড়ি প্রস্তুত করাইলে ছোট ছোট বালক-গণকে সেই সঙ্গে ঘড়িতে সময় দেখা শিখান যাইতে পারে । সাদা কাগজে চারিটি গোল বৃত্ত কাটিয়া একখানি নীল কাগজের উপর বৃত্তাভাসের পথে (ঋতু পরিবর্তনের চিত্রাঙ্করণে) আঠার দ্বারা আঁটিয়া ঋতু পরিবর্তনের চিত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে । গ্রহের যে অংশ সূর্য্যের বিপরীত দিক তাহা কালির দ্বারা কাল করিয়া দিতে হইবে । নক্ষত্র-কারে একটুকরা কাগজ কাটিয়া (সূর্য্য) বৃত্তাভাসের মধ্যে বসাইবে । লাল কালির দ্বারা পৃথিবীর গতিপথ চিহ্নিত করিবে । ছোট ছোট নক্ষত্র কাটিয়া নীল কাগজে লাগাইয়া, মণ্ডুর্বিমণ্ডল ও ঐব নক্ষত্র, এবং কালপুরুষ ও লুক্কাক প্রস্তুত করিলে, আমাদের সঙ্গে অনেক শিক্ষা হয় ।

শক্ত কাগজ কাটিয়া বাস্তব প্রস্তুত করা শিখান হইয়া থাকে । এই

কার্যের জন্য কিরূপে কাগজ কাটিতে হইবে, তাহা নিম্ন চিত্র দৃষ্টে বুঝিতে পারিবে :—



৪২ চিত্র।—কাগজের বাক্স।

(৪) তার বঁকাইয়া নানারূপ ক্ষেত্র ও অক্ষর নির্মাণ।

আমাদিগের প্রদেশে বঙ্গীয় কিণ্ডারগার্টেন নামে যে প্রণালী আছে, তাহা ফ্রবলের কিণ্ডারগার্টেন ও হারবার্টের পদার্থ-পরিচয় মিশ্রিত একপ্রকার প্রণালী। যাহারা কিণ্ডারগার্টেন ও পদার্থ-পরিচয় প্রকরণ দুইটি উত্তমরূপে পাঠ করিবেন, তাহাবা বঙ্গীয় কিণ্ডারগার্টেনের সমস্ত মর্ম বুঝিতে পারিবেন।

মণ্টেসরী প্রথা।—ডাক্তার মণ্টেসরী একজন ইটালীদেশীয় বিদ্বানী মহিলা। কুলী রমণীদিগের পুত্রকন্যার হৃদিশা দেখিয়া তাহার মনে বেদনা উপস্থিত হয়। অধচ এই কুলী রমণীর পুত্র কন্যাগণই দেশের সর্বপ্রকার কার্যে প্রধান অবলম্বন। ইহাদিগের স্বাস্থ্য বা শিক্ষার দিকে কেহই দৃষ্টি করেন না দেখিয়া মণ্টেসরী নিজে এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। তাহার শিক্ষা প্রণালীর মূলে ফ্রবলের কিণ্ডারগার্টেন নীতি। কিন্তু তিনি ফ্রবলের মূল্যবান খেলনা গুলির ব্যবহার না করিয়া, এই সকল অসমজীবীর পুত্র কন্যাগণেব, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহাদিগেব জন্য নূতন শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করেন। ফ্রবলের পদ্ধতিতে শিশুদিগের স্বাধীনতা পূর্বপ্রচলিত সকল-পদ্ধতির অপেক্ষা বেশী, মণ্টেসরী প্রণালীতে এই স্বাধীনতার ণাত্রা আরও বেশী। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যেসকল টেবিল চেয়ার নিজে নিজে সরাইতে নড়াইতে পারে, বিদ্যালয়ের টেবিল চেয়ারগুলি সেই আকারের। এইগুলি অতি সাবধানে এই ছোট ছোট বালক বালিকাগণকেই গুছাইয়া রাখিতে হয়। তারপর কাপড় ধোয়া, জামার বোতাম লাগান, মালা গাঁথা প্রভৃতি নানারূপ কার্য শিক্ষাদান করা হয়। ইচ্ছা যথেষ্ট হাতের লেখা, পড়া ও একটু অঙ্ক

শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও আছে । সকোপাশি ইহাদিগকে নীতিবান, বলবান ও আগ্রহী করার ব্যবস্থাই এই পদ্ধতির প্রধান বিশেষত্ব ।

২। বর্ণপরিচয় ।

কিণ্ডারগার্টেনে অষ্টম খেলনায় অক্ষর শিক্ষার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে । শিক্ষকগণ এই পরিচ্ছদ পাঠ করিবার পূর্বে একবার উক্ত অংশ পাঠ করিয়া লইবেন । লেখা ও পড়া একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া বর্তমান প্রণালী সম্মত । লেখা শিখাইবার পূর্বে কিরূপে খাড়া, পড়া ও তেড়া রেখা শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাও ১ম খেলনায় বিবৃত হইয়াছে । হস্তাক্ষর শিক্ষার পরিচ্ছেদে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে । প্রত্যেক অক্ষর শিক্ষার সঙ্গে, তাহার উচ্চারণ, তাহার লেখা, তাহা দ্বারা সহজ শব্দ গঠন ও সেই শব্দ পঠন শিক্ষা দিতে হইবে ।

অক্ষর উচ্চারণের ধারা—অক্ষরগুলির উচ্চারণ শিক্ষায় তিনটি ধারা অবলম্বিত হইয়া থাকে, (১) বর্ণের ধারা, (২) ধ্বনির ধারা, (৩) শব্দের ধারা ।

(১) বর্ণের ধারা ।—প্রথমে শৃঙ্খলাক্রমে অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বর্ণমালার সাধারণ উচ্চারণ শিক্ষা দিয়া, পরে তাহার দ্বারা শব্দ নির্মাণ শিক্ষা দেওয়াকে বর্ণের ধারা বলে । সাধারণতঃ যে প্রণালীতে বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাই বর্ণের ধারা । এই প্রণালীই ভাষা শিক্ষাদানের প্রারম্ভ হইতে এ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে । বিশেষ, অন্যান্য প্রণালী অপেক্ষা এইটাই সহজ—শিক্ষকের পক্ষে তা নিশ্চয়ই । কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে দেখা যায় যে, এই প্রণালীতে বর্ণগুলির প্রকৃত উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয় না । আমরা যখন ক খ প্রভৃতির উচ্চারণ শিক্ষা দান করি তখন প্রকৃত ক, খ উচ্চারণ না করিয়া, স্বরযুক্ত (অযুক্ত) ক, খ উচ্চারণ করিয়া থাকি । ইহাতে যে দোষ হয় তাহা একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা

দেখাইতেছি। ‘বক’ উচ্চারণ করিতে আমরা অকার যুক্ত ব উচ্চারণ করিলাম, কিন্তু অকার যুক্ত ‘ক’ ত উচ্চারণ করিলাম না। এখানেই ‘ক’এর ঠিক উচ্চারণ হইল। কিন্তু ক শিখাইবার সময় আমরা অকার যুক্ত ‘ক’এর উচ্চারণ শিখাইয়া থাকি। এইজন্ত পণ্ডিতেরা একটা ধ্বনির ধারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

(২) ধ্বনির ধারা।—স্বরবর্ণের সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া, ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণের নিমিত্ত যে ধ্বনি মাত্র করা হয় তাহাকে ধ্বনির ধারা বলে। ‘ম’ উচ্চারণ করিবার সময়, আমরা প্রথমে ওষ্ঠ অধর সংলগ্ন করি, পরে ‘ম’ এর অকারাংশ উচ্চারণের জন্ত আবার ওষ্ঠদ্বয় বিভিন্ন করি। কিন্তু যদি ম উচ্চারণে আমরা ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করিয়াই আর ফাঁক না করি, তবেই ‘ম’ এর প্রকৃত উচ্চারণ হয়। ‘আম’ উচ্চারণ করিতে যে অকারশূন্য ম এর উচ্চারণ হয়, তাহাই ম এর প্রকৃত ধ্বনি। ক্ষুদ্র শিশুর অর্ধক্ষুট উচ্চারণগুলি যিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই ব্যঞ্জনের প্রকৃত উচ্চারণ বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে এ প্রথা বিজ্ঞানসম্মত হইলেও, খুব কঠিন। সকল শিক্ষকের দ্বারা এই প্রথানুযায়ী বর্ণ শিক্ষা হওয়া সম্ভবপর নয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এইরূপে বর্ণের উচ্চারণ শিক্ষা দিলে বালকগণের তৌতলামি অভ্যাস হইতে পারে। কিন্তু এ প্রথার সেরূপ কোন দোষ থাকিলেও, বর্ণের প্রকৃত শক্তি শিক্ষা দানের নিমিত্ত ইহার আলোচনা যে বিশেষ আবশ্যক, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

(৩) শব্দের ধারা।—এই ধারাকে সাধারণতঃ ‘দেখা পড়া’ ধারা বলে। এই ধারার প্রবর্তকেরা বলেন যে, যখন আমরা প্রথমে শব্দ শিক্ষা করিয়া থাকি অর্থাৎ যখন আমরা অ আ ক খ না পড়িয়াই প্রথমে নানা শব্দের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করি, তখন বিশ্লেষণ প্রথানুসারে শব্দ ভাঙ্গিয়া বর্ণ শিক্ষা করা কর্তব্য, কারণ শব্দই আমাদের পরিচিত, আর বর্ণ অপরিচিত। এই প্রণালীতে বর্ণ শিক্ষা দানের একটা

উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে । বোর্ডের উপর উত্তম অক্ষরে ‘বক, বর, বন, বল’ লিখিয়া দিলে । বালকেরা এ সমস্ত কথা জানে । তারপর, দর্শনী কাঠির দ্বারা এক একটা শব্দ দেখাও, আর উচ্চারণ কর ও বালকগণকে বোর্ডে-লিখিত শব্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, উচ্চারণ করিতে বল । এইরূপে শব্দের আকৃতি বোধ জন্মিলে—অর্থাৎ যখন বালকেরা বোর্ডে-লিখিত শব্দ শিক্ষকের বিনা সাহায্যে পড়িতে শিখিবে—তখন বক, বর, বন ও বল প্রভৃতি শব্দের দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ পৃথক্ করিয়া (ধ্বনির ধারানুসারে) শিখাইতে হইবে । বর্ণের আকার ও উচ্চারণ এক সঙ্গেই শিক্ষা হইবে ।

(৪) বিশেষ উচ্চারণের ধারা ।—ইংরাজী বর্ণমালা অসম্পূর্ণ বলিয়া ইংরাজেরা একটা বিশেষ উচ্চারণের ধারা সৃষ্টি করিয়াছেন । ইংরাজীর অনেক বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ এক, কিন্তু শব্দের সংযোগে তাহাদিগেব বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ হইয়া থাকে । cut—এখানে c এর উচ্চারণ ক এর মত, city—এখানে c এর উচ্চারণ স এর মত । এইজন্য ইংরাজী ২৬টা অক্ষর ভাঙ্গিয়া, তাহার ৪০টা অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন । কিন্তু সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা অক্ষরগুলি, অন্যান্য ভাসার অক্ষরের সহিত তুলনায়, এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ । সুতরাং বাঙ্গালা বর্ণমালায় এ ধারার কোন আবশ্যকতা নাই ।

উচ্চারণ ।—বালকগণকে বর্ণগুলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিতে হইবে । অ, আ না বলিয়া, কেহ কেহ স্বরের অ, স্বরের আ, এইরূপ ভুল শিক্ষা দিয়া থাকেন । স্বরের অ, আ ভিন্ন, ব্যঞ্জননের অ, আ নাই । যে বর্ণকে অন্তস্থ অ (য) বলা হয়, তাহার উচ্চারণ অ নয়, ‘ইয়’ । সুতরাং অন্তস্থ য কে, ‘ইয়’ বলিয়া উচ্চারণ করা কর্তব্য । ক্রম ও দীর্ঘ, এই দুইটা কথা শিশুগণের উচ্চারণের পক্ষে শক্ত বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ ছোট ই, বড় ই এবং ছোট উ, বড় উ, এরূপও পড়াইয়া থাকেন । এ মন্দ নয় । বর্ণের উচ্চারণের সময় গুণ্ঠনের যথোচিত সঞ্চালন ও বিস্তারণ আবশ্যিক । মুখ বুজিয়া অস্পষ্ট উচ্চারণ বিশেষ দোষের । ক, খ প্রভৃতি যেন ঠিক কর্তৃ হইতে নির্গত হয় । গ, ঘ উচ্চারণে যেন অস্পষ্ট পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় । বর্ণের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এক রকমে উচ্চারণ করা জেলা বিশেষের

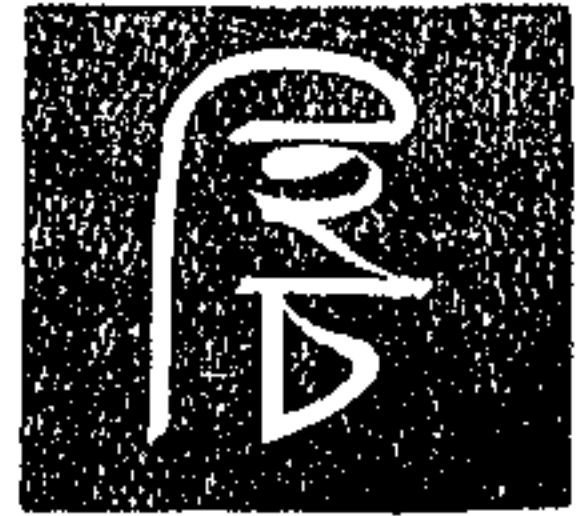
দোষ—এইজন্ত ঘর কে ‘গর,’ ‘ভাত’ কে ‘বাত,’ ‘ধান’ কে ‘দান’ বলিতে শুনা যায় । ও কে উয়া বলা ভুল, ঠিক কণ্ঠ হইতে ‘অঙ্গ’ মত ধ্বনি নির্গত হইবে । বাঙ্গালার সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণই এক মাত্র ‘অ’ এর যোগে উচ্চারিত হয়, সুতরাং ‘য়া’ হইবে না । ‘রঙ’ উচ্চারণে ও এর প্রকৃত ব্যঞ্জন উচ্চারণ পাওয়া যায়—ইহার সহিত অ যোগ করিয়া পড়িলেই, ও বর্ণের উচ্চারণ হইবে । চ বর্ণ উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর সহিত সংলগ্ন করিতে হইবে । কোন কোন জেলায় কেবল জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তমূলে লাগাইয়া চ বর্ণের উচ্চারণ করিয়া থাকে । কিন্তু চ তালব্য বর্ণ, দন্ত্য বর্ণ নহে । ঞ এর উচ্চারণ ইঁ (ন) য—জিহ্বা তালুর সহিত লাগাইয়া উচ্চারণ করিতে হইবে । ট বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ বক্র করিয়া দন্ত ও তালুর সন্ধিস্থলের কিঞ্চিৎ উপরে স্পর্শ করাইতে হইবে । ত বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ দন্ত স্পর্শ করিবে । প বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ নীচের দন্তপাটির নিম্নে থাকিবে, কারণ প বর্ণে কেবল ওষ্ঠের কার্য্য । ক বর্ণে জিহ্বার অগ্রভাগ কণ্ঠের নিকট, চ বর্ণে তালুর মধ্যভাগে, ট বর্ণে দন্ত ও তালুর সন্ধিস্থলে, ত বর্ণে দন্তের উপর, প বর্ণে দন্তের নীচে—কেমন শৃঙ্খলাক্রমে জিহ্বা মুখ গহ্বরে ঘুরিয়া আসিল । য উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ (বাঙ্গালায় এই য এর প্রকৃত উচ্চারণ হয় না বলিয়া) তালুতে, র উচ্চারণে দন্ত তালুর সন্ধিস্থলে, ল উচ্চারণে দন্তে ও ব উচ্চারণে দন্তের নীচে থাকিবে ।

বাঙ্গালায় ণ ও ন এর ভিন্ন উচ্চারণ নাই । তবে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বা ট বর্ণের উচ্চারণ স্থানে ও ন উচ্চারণের সময় ত বর্ণের বর্ণ উচ্চারণের স্থানে থাকিবে । বাঙ্গালায় ব দুইটীরও উচ্চারণ এক কিন্তু শিক্ষকগণের প্রকৃত উচ্চারণ জানিয়া রাখা ভাল । অন্তস্থ ব, ‘ওয়াও’ মত উচ্চারণ করিতে হয় । তিনটী শ একরূপে উচ্চারিত হয় । কিন্তু ইহাদের প্রকৃত উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন । শ উচ্চারণে

(চ বর্গের মত) জিহ্বা তালুর সহিত সংলগ্ন হইবে, স উচ্চারণে (ত বর্গের মত) জিহ্বা দন্ত স্পর্শ করিবে । এই স কতকটা কোমল ছ এর মত উচ্চারিত হয় (ইংরাজীর S ও পার্শ্বের সিন) । ছাত্রগণ অন্ততঃ বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়িলে, তাহাদিগকে বলিয়া দিবে যে বাজানা ছাড়া অন্য কোন ভাষার কথায় 'স' দেখিলে, তাহা যেন কোমল ছ এর মত পড়ে । কারণ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোলের নানা দেশীয় নামের স, কোমল 'ছ' এর মত উচ্চারণ করিতে হইবে । যথা, ইয়াসিন, সাইন বোর্ড, সলফর, লিসবন, ওয়েলসলি, সোডা ওয়াটার, সবক্তজিন ইত্যাদি । ষ এর উচ্চারণ কোমল থ এর মত । ড, ঢ ও র এর উচ্চারণ পৃথক্ করিতে পারে না বলিয়া, অনেক ছাত্র ডএ বিন্দু ড, ঢএ বিন্দু ঢ ও বএ বিন্দু র, এইরূপে পড়িয়া থাকে । জিহ্বা খুব বক্র করিয়া তালুর সহিত লাগাইয়া ড, ঢ, উচ্চারণ করিতে হইবে । 'সকল' বলিতে 'হকল' 'শশা' স্থানে 'হোহা' 'শাক' স্থানে 'হাগ' আবার 'হরি' বলিতে 'শরি' 'হাত' বলিতে 'সাত' ইত্যাদি বিকৃত উচ্চারণ, স ও হ এর উচ্চারণগত পার্থক্য না শিখাইবার দোষেই ঘটিয়া থাকে । কোন কোন জেলায় চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ একেবারেই হয় না, যথা—চাদ, বাশ, পাঠা ; আবার কোন কোন জেলায় কিছু বেশী মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, যথা—কেন, এঁসেছ, কুঁড়ে, ইত্যাদি । শিক্ষককে প্রথম হইতেই সাবধান হইতে হইবে । বালকগণকে শিক্ষা দিবার সময় অবশ্য তাহাদিগকে এই সমস্ত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে না, শিক্ষক নিজে উত্তমরূপে উচ্চারণ করিলে বালকেরা সহজেই অনুকরণ করিতে পারিবে ।

স্বর সংযোগ ।—আকার, ইকার প্রভৃতির সংযোগ শিক্ষায় বালকগণের চক্ষু কণ—দুইই ব্যবহার করাইবে । শিক্ষক বোর্ডে লিখিবেন ও উচ্চারণ করিবেন, বালকেরা বোর্ডের উপর দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষকের অনুকরণে উচ্চারণ করিবে । মনে কর আকার সংযোগ শিক্ষা দিতে হইবে । বোর্ডের উপর, ক আ এই দুই অক্ষর খুব পাশাপাশি

করিয়া লিখিয়া দিলে । তারপর ক, আ এই বর্ণ দুইটা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিতে করিতে এত দ্রুত উচ্চারণ করিবে যে ক এর সঙ্গে আ যুক্ত হইয়া যেন কা উচ্চারিত হয় । আবার লেখাতে এইরূপ প্রথমে ক আ থাকিবে, পরে আ বর্ণের অ ভাগ অল্পে অল্পে পুঁছিয়া দিবে, কেবল আকার থাকিবে । এখন কা এইরূপ লিখিয়া কা উচ্চারণ শিক্ষা দাও । ক এর সহিত যে আ যুক্ত হইল, ইহাই বুঝাইয়া দেওয়া উদ্দেশ্য । এইরূপে ব আ=বা শিখাইবে । পরে কাকা বাবা প্রভৃতি শব্দ শিক্ষা দিবে । ইকার সংযোগে প্রথমে এইরূপই লিখিবে, তারপর ইকারের মাথার খুঁটিটাকে বামের দিকে টানিয়া নামাইবে, পরে অনাবশ্যকীয় অংশ পুঁছিয়া ও কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া কেবল ি এই অংশ রাখিবে । এইরূপে নি শিখাইয়া ‘চিনি’ কথা শিখাইবে । উকার সংযোগে কু এইরূপে লিখিয়া, পরে, একটু একটু পরিবর্তন করিয়া কু করিবে । তারপর “কুকুর” কথা শিখাইবে । সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত কথা লিখিতে ও পড়িতে শিখিলে বালকগণের আনন্দ হইবে আর শিখিতে আগ্রহ জন্মিবে । অত্যাশ্রয় স্বর সংযোগও এইরূপে শিখাইবে ।



সংযুক্ত বর্ণ ।—সংযুক্তবর্ণ শিক্ষাদানেও পূর্বোক্ত রীতি অবলম্বন করিতে হইবে । ‘শস্ত্র’ লিখিবার সময় প্রথম শ্র না লিখিয়া সম এইরূপ লিখিবে ও পড়িবার সময় ‘শসয়’ (শসইয়) এইরূপ পড়িবে । তারপর স শ্র যুক্ত য় পুঁছিয়া পুঁছিয়া ি এইরূপ পরিবর্তন করিবে । ‘ভাদ্র’ শিখাইবার সময় ভ্র কে দর এইরূপ লিখিবে, ও ‘ভাদর’ এইরূপ পড়িবে । তারপর পুঁছিয়া পুঁছিয়া, করিবে ও ‘ভাদ্র’ পড়িবে । ‘সর্প’ শিখাইবার সময় স্প কে র্প এইরূপ লিখিবে, পরে র এর কতক অংশ পুঁছিয়া কেবল একটা (রেফের) টান মাত্র রাখিবে । কিরূপে বর্ণগুলি

সংযুক্ত হয় তাহাই বালকগণকে দেখান উদ্দেশ্য । ‘অজ্ঞ, শিখাইবার সময় জ এর সহিত যে কেমন করিয়া ঞ সংযুক্ত হইল অর্থাৎ জ এর কোন্ অংশের সহিত ঞ এর কোন্ অংশ যুক্ত হইয়া জ্ঞ এই অক্ষর হইল, তাহা দেখাইয়া দিবে । এক কথা মনে রাখা কর্তব্য যে বালকেরা বানানগুলি চোখের সাহায্যেই অধিক পরিমাণ শিক্ষা করে, সুতরাং বানান শিক্ষায় বোর্ডের যথেষ্ট ব্যবহার হওয়া কর্তব্য । বহু কঠিন শব্দের বানান শিখাইতে চেষ্টা করিয়া বালকগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিও না । যে সকল শব্দ আপাততঃ বালকের ব্যবহারে আসিবে না (যথা পর্জন্ত, কুচ্ছ, শ্মার্ভ) তাহা শিখাইবে না । বালকগণকে লেখা ও পড়া এক সঙ্গে শিখাইতে হইবে ।

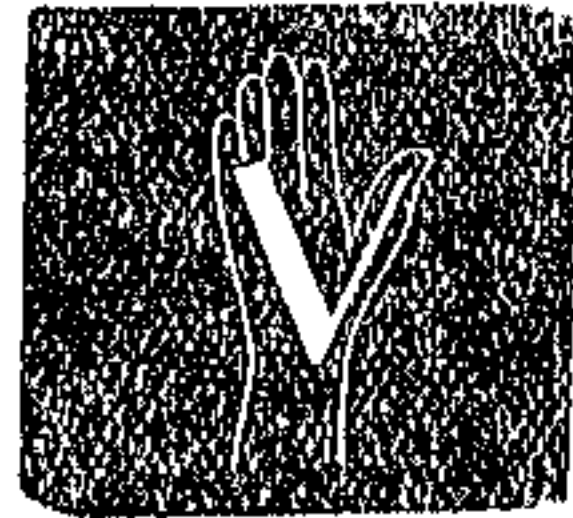
৩। ধারাপাত ।

দৈনিক কাজ কর্মে ধারাপাতের বিশেষ আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় । সুতরাং সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই ধারাপাত শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয় । সাধারণ দোকানদারগণ কেবল ধারাপাতের বিজ্ঞাতেই সূচাক্রমে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতেছে ।

সংখ্যা অবধারণে বালকগণের একটা স্বাভাবিক জ্ঞান আছে বলিয়া মনে হয় । তাহারা সংখ্যাদি পরিচায়ক নাম না জানিলেও, সংখ্যার তারতম্য বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকে । একটা শিশুকে একটা সন্দেশ দিয়া, আর একজনকে দুইটা সন্দেশ দিলে, যাহার একটা সে দুইটার দিকে লোমূপ দৃষ্টি করিয়া থাকে । অনেক জীবজন্তুরও এইরূপ সংখ্যাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় । যে বিড়ালী নিজের ছানা কি অপরের ছানা তাহা চিনিতে পারে না, তাহার যদি ৪টা ছানার স্থানে ৩টা হইয়া থাকে, তবে সে ৪র্থ টা খুঁজিয়া বেড়ায় । এইরূপ নানা কারণে পরিমাণ-বোধ স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় ।

রোমান অঙ্ক ।—শতকিয়া শিক্ষাই ধারাপাতের আরম্ভ । দ্রব্যাদির

সাহায্যে কিরূপে সংখ্যা শিক্ষা দিতে হইবে তাহা (কিণ্ডারগার্টেন ওয় খেলনা) বর্ণিত হইয়াছে। হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা সংখ্যা শিক্ষাদানের প্রণালী বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দশ দশ করিয়া গণনার প্রথা এ বিষয়ের সাফল্য প্রদান করিতেছে। ঘড়ির উপর যে অঙ্ক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও প্রকারান্তরে অঙ্গুলি চিহ্ন মাত্র; । ॥ III IIII যথাক্রমে একটা, দুইটা, তিনটা ও চারিটা অঙ্গুলিজ্ঞাপক। পাঁচ লিখিতে যে V চিহ্ন দেওয়া হয় তাহাও পাঁচটা অঙ্গুলি চিহ্ন মাত্র, কনিষ্ঠ হইতে তর্জনী পর্যন্ত অঙ্গুলিগুলি একত্র করিয়া বুজাঙ্গুলি পৃথক রাখিলেই ঠিক V চিহ্ন হইল। বালকগণকে এই V চিহ্ন এইরূপে বুঝাইতে হইবে। বোর্ডের উপর হাত রাখিয়া চকেব দ্বারা হাতের চারিদিকে দাগ দিলেই হাত অঙ্কন হইবে। সেই হাতের উপর একটা V লিখিয়া হাতের চিহ্ন পুঁছিয়া ফেলিবে। এইরূপে ছয় (এক হাত আর এক অঙ্গুলী) VI; সাত আট প্রভৃতিও তদ্রূপ। নয় লিখিতে প্রথমে VIIII এইরূপে লিখিবে। দুইটা V উপর নীচ করিয়া জুড়িলে একটা X অর্থাৎ দশ হইল। এইরূপ X X পর্যন্ত অঙ্ক শিক্ষা দিলেই চলিবে। অঙ্ক বিষয়ক একটু জ্ঞান জন্মিলে, । X এই রূপ নয় শিক্ষা দিবে—বামের ক্ষুদ্র অঙ্ক বাদ দিতে হয় বলিয়া দিবে। এই রূপ দাগের দ্বারা এক দুই শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। বিশেষ ঘড়ির ব্যবহার যখন আবাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন এই অঙ্ক শিক্ষা দেওয়াও কর্তব্য।



৪৩ চিত্র—পাঁচ পরিচয়।

শতকিয়া শিক্ষা।—৩ কি ৪ ইঞ্চ লম্বা কতকগুলি বাঁশের কাটি (দেশলাই বা বাঁটার কাঠির মত সব) সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। বালকগণকে টেবিলের চারিদিকে দাঁড় করাইয়া—বা শিক্ষক সহ সকলে মাদুরে বসিয়া—প্রত্যেক বালকেব ডান হাতের দিকে

কতকগুলি কাঠী গুছাইয়া রাখ । শিক্ষক নিজের ডান হাতের দিকেও কতকগুলি কাঠী রাখিবেন । তাবপব একটা, দুইটা তিনটা কাঁচা কাঠী বামের দিকে সবাও, আর সঙ্গে সঙ্গে এক, দুই, তিন ইত্যাদি গণিতে থাক । বালকগণ শিক্ষকের সঙ্গে তদ্রূপ করিবে । এইরূপে দশ পর্য্যন্ত গণনা অভ্যাস হইলে, দশটা কাঠী একত্র করিয়া, সূতাব দ্বারা বাঁধিয়া একটা আঁটা কর । তার পর এই আঁটার ডান দিকে আবার পূর্ব্ববৎ এক একটা কাঠী রাখ আৰ এগাব বার ইত্যাদি গণনা শিখাও । ২০ পর্য্যন্ত গণনা হইলে, এই দশ কাঠীর দ্বারা আবার আৰ একটা আঁটা কর । এই প্রণালীতে ১০০ পর্য্যন্ত গণনা শিখাইয়া, ১০টা দশের আঁটা একত্র বাঁধিয়া একটা এক শতের আঁটা কর । তার পর ১০১, ১০২ ইত্যাদি ঐ প্রণালী মত শিখাও । বালকদিগকেও কাঠী সাজাইয়া সংখ্যা প্রকাশ করিবার দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে । প্রণ কব—কাঠীর দ্বারা ৮৩ সাজাও । উত্তর :—



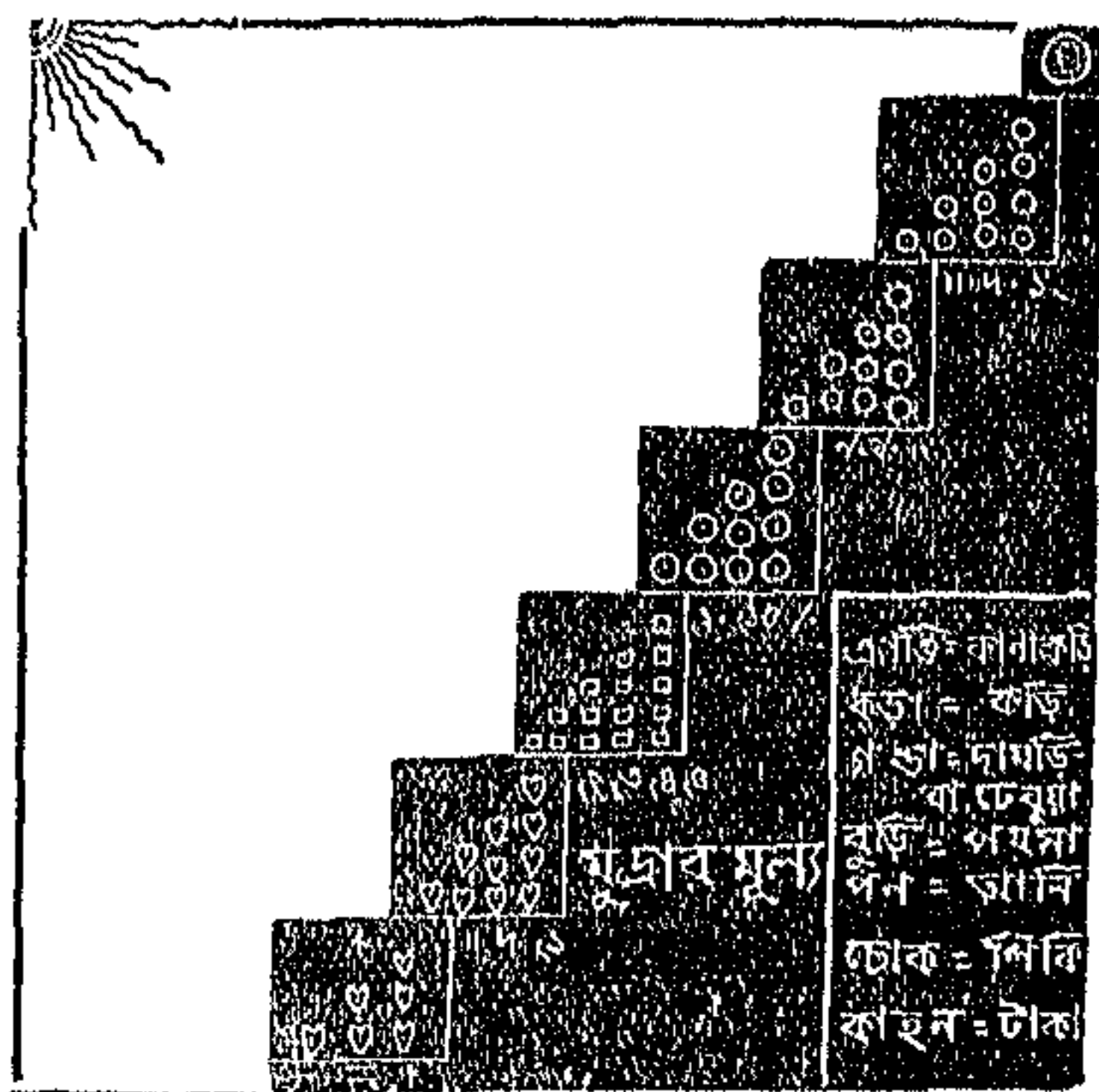
৪৪ চিত্র ।—৮৩ সাজন ।

এই সমস্ত কার্যের জন্ত কতকগুলি দশের আঁটা ও একটা শতের আঁটা বাঁধিয়া রাখিবে এবং কতকগুলি আলুগা কাঠীও রাখিবে । এই কাঠীগুলি একটা কাগজের বাক্সের ভিতর গুছাইয়া রাখিলে কার্যের সুবিধা হইবে । কেবল কাঠীর দ্বারা এইরূপ গণনা শিক্ষা দিলে বালক-গণের হয়ত এমন একটা ধারণা হইতে পারে যে, সংখ্যা বুঝি কেবল কাঠী গণনাতেই লাগে । এই জন্ত ফুল, পাতা, ফল, কড়ি, মুড়ি, তৈতুলের বীজ, পয়সা প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যের ব্যবহার আবশ্যক । দশের সংখ্যার জন্ত, ১০টা ফুল সূতায় বাঁধিয়া, ১০টা পাতা বাঁশের শলাকায় বিদ্ধ করিয়া, ১০টা কড়ি একটা কাপড়ের থলির ভিতর

পুরিয়া, ১০টা ছুড়ি এক একটা খালি দেশলাইর বাস্কে রাখিয়া, ১০টা পয়সা কাগজে মুড়িয়া রাখিলেই বেশ হইবে। কেবল কাঠীর দ্বারা প্রত্যহ শিক্ষা দিলে বালকগণের বিরক্তিও জন্মিতে পারে ; সেজন্যও নানারূপ দ্রব্যের ব্যবহার আবশ্যক। শতকিয়া দ্বারা দ্রব্যাদির সংখ্যা বোধ হইলে, দ্রব্য উপলক্ষ বাতীত শতকিয়া পড়িতে শিক্ষা দিবে। সকলের একসঙ্গে সমস্তের পাঠ করিবার যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অতি উত্তম প্রথা। এইরূপ পড়াকে ‘ডাকপড়া’ বলে। সাধারণ শতকিয়া অভ্যাস হইলে, ১, ৩, ৫, ৬ ইত্যাদি ক্রমে এক এক বাদ দিয়া ও ২, ৪, ৬, ৮ ইত্যাদি ক্রমে ছুই ছুই বাদ দিয়া পড়া শিক্ষা দিবে। এই সময় ‘জোড় বিজোড়’ কথা দুইটি শিখাইবে। কড়ি বা তেঁতুলের বীজ লইয়া বালকগণকে জোড় বিজোড় খেলা শিখাইবে ; আমোদের সঙ্গে অনেক শিখাইতে পারা যাইবে।

কড়া, গণ্ডা প্রভৃতি।—বার বৎসর পর্য্যন্ত মুখস্থ করিবার উপযুক্ত কাল। কড়া, গণ্ডা, বুড়ি, পণ, চোক প্রভৃতি এই সময়ের মধ্যেই মুখস্থ করাইয়া দিতে হইবে। এই সময়ে অন্ততঃ কুড়ির ঘর পর্য্যন্ত নামতাও শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। বালকেরা এই সমস্ত গণনা ‘ডাকপড়ার’ নিয়মে উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া থাকে। পাঠশালায় প্রত্যহ কি একদিন পর একদিন, এইরূপে ডাকপড়ার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। টাকা পয়সা বিষয়ে কড়া গণ্ডার যে ব্যবহার, বালকগণকে প্রথমে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। ক্রান্তি = কাণা কড়ি, কড়া = কড়ি, গণ্ডা = ডেবুয়া বা দামড়ী (উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এখনও চল আছে, তবে দামের তারতম্য হইয়াছে। তেঁতুলের বীজের মত তাম্রখণ্ড বিশেষ), বুড়ি = পয়সা, পণ = আনা, চোক = সিকি এবং কাহণ = টাকা। নিম্নের চিত্রানুরূপ একখানা কাগজে টাকা, পয়সা, কড়ি প্রভৃতি উত্তম আটার দ্বারা আঁটিয়া রাখিলে বালকগণের বুঝিবার সুবিধা হইবে। একখণ্ড তাম্র শলাকা, তেঁতুলের বীজের আকারে কাটিয়া লইলেই ‘ডেবুয়ার’ কাজ চলিবে।

যদি কাগজখানি চুরি যাইবার ভয় থাকে তবে সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে বা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে যে সকল মের্কী টাকা, সিকি পাওয়া যায়, সেইগুলির এইরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে।



୪୫ ଚିତ୍ର ।—ସୁଦ୍ରା ଅସ୍ତ୍ରଚକ୍ର ।

বিদেশীকে শতকিয়া শিখান।—অনেক সাহেব মেম বাজালা শিখিবার জন্য বাজালী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। একপ ছাত্র হইলে কেবল শতকিয়ার পড়া মাত্র শিক্ষা দিতে হইবে। প্রথমে এক ছই করিয়া দশ পর্য্যন্ত শিখাইয়া দাও। তারপর অষ্টাঘ সংখ্যার নাম শিক্ষায় অষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিলে কাজ কিছু সহজ হইতে পারে। এইরূপে বুঝাইয়া দাও ; এগার = এক + আরও অর্থাৎ দশের পর আরও এক, তের = তিন আরও ইত্যাদি। বার, বাইশ, বত্রিশ প্রভৃতি শব্দে, 'দ্বি' কথার 'ব' মাত্র আছে, বার = ন + আরও। 'উন' শব্দের দ্বারা পরবর্তী সংখ্যার এক কম বুঝায়। উনত্রিশ = ত্রিশ অপেক্ষা এক উন বা কম। 'শূন্যের' শ, ব তে লাগিয়া বিশ, তিনে লাগিয়া ত্রিশ ইত্যাদি। একুশ, বাইশ প্রভৃতি শব্দে 'নিশের' ইশ মাত্র আছে ; এক + ইশ = একুশ। কোন সংখ্যাবাচক

শব্দের পূর্বে এ থাকিলে এক, ব (দ্বি) থাকিলে দুই, ত থাকিলে তিন, চ থাকিলে চার, প থাকিলে পাঁচ, ছ থাকিলে ছয়, সা থাকিলে সাত ও আ থাকিলে আট সংশ্লিষ্ট সংখ্যা বুঝাইবে ; যথা বত্রিশ = ব (দুই) আর ত্রিশ, চৌয়ান—চৌ (চার) আর আন আধ - গণ্য, অর্থাৎ যতদূর গণনা করিতে হইবে তাহার অর্ধেক = (পঞ্চাশ), সাতাশী = সাত - আশী ইত্যাদি । তবে চৌদ্দ, মোল শব্দগুলি চার - আরও, কি ছয় - আরও করিয়া বুঝান যাইবে না ; আর ষাট, সত্তর, নব্বই প্রভৃতি শব্দেও শূন্যের 'শ' যুক্ত নাই এইরূপ দুই চারিটা ব্যতিক্রম বলিয়া দিতে হইবে ।

মৌখিক যোগ, বিয়োগ।—নামতা মুখস্থ করাইবার প্রণালীতে যোগ, বিয়োগের ধারাও কিছু মুখস্থ করান উচিত । যথা, চারে তিনে সাত, চারে চারে আট, চারে পাঁচে নয় ইত্যাদি । এইরূপ নয়ে নয়ে আঠার পর্য্যন্ত শিক্ষা দিলে যোগ, বিয়োগ উভয় কার্যেরই সাহায্য হইবে । তারপর বালকগণকে দুই অঙ্কযুক্ত সংখ্যার যোগ শিখাইবে । যথা, ৩৫ আর ৬০ কত হয়?—এইরূপ অঙ্কে প্রথমে একক যোগ না করিয়া দশক দুইটা যোগ করা সুবিধাজনক ; ৩ আর ৬এ নয় দশ, ও ৫ আর ০এ বার অর্থাৎ এক দশ দুই ; সর্বসমেত দশ দশ আর ২, অর্থাৎ ১০২ । বিয়োগেও এই প্রণালী অবলম্বন করিবে । ইচ্ছা করিলে মনে মনে এককের ঘর হইতেও যোগ বিয়োগ আরম্ভ করিতে পারে, কিন্তু বালকেরা মৌখিক যোগ, বিয়োগে দশকের ঘর হইতে কার্য্য আরম্ভ করাই সুবিধাজনক মনে করে । শিক্ষক এ বিষয়ে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন । অঙ্ক বিশেষে আবার অন্তরূপ কোশল অবলম্বন করিতে হয় । মনে কর ৪৯ + ৩৫ যোগ করিতে হইবে ; যোগের সুবিধার জন্ত ৫০ + ৩৫ ধর, উত্তর হইল ৮৫ ; এখন ৪৯ কে ৫০ ধরাতে যে ১ বেশী ধরা হইয়াছে তাহা ৮৫ হইতে বাদ দিলে ৮৪ হইবে । ইহাই ঠিক উত্তর । এইরূপে ৮১ + ১৪, ধর ৮০ + ১৪ = ৯৪, ৯৪ + ১ = ৯৫ উত্তর । আবার ৩৯ + ৫৯, ধর ৪০ + ৬০ = ১০০, ১০০ - ২ = ৯৮ । সংখ্যা দুইটির এককের ঘরে দশকের ১ কম বা বেশী থাকিলে মৌখিক যোগে এই প্রণালীই সুবিধাজনক ।

৪ । হস্তাক্ষর ।

আরম্ভ ।—লেখা শিখাইবার প্রণালী কিঞ্জারগার্টেন ১০ম খেলনায় বিবৃত হইয়াছে । প্রথমে বালককে কয়লা বা চক্ দিয়া কাঠ বা মাটির উপরে, বা পেন্সিল দিয়া স্কেটের উপরে তাহার স্বেচ্ছামত হিজিবিজি লিখিতে দিবে । ইহাতে তাহার কতকটা হাত ঠিক হইবে । কি পরিমাণ জোরে লিখিলে মোটা দাগ পড়ে ও কি পরিমাণ জোরে লিখিলে সরু দাগ পড়ে, তাহা সে আপনা আপনি বুঝিতে পারিবে । ইহার পরে পূর্বের উপদেশমত (১০ম খেলনা) খাড়া, পড়া, তেড়া এবং বৈকা ও একাবৈকা রেখা শিক্ষা দিতে হইবে । লেখা শিখাইবার সময় ব, র, ক প্রভৃতি সহজ সহজ অক্ষর হইতে আরম্ভ করা ভাল । ইংরাজিতে যেমন ছাপার অক্ষর ও লেখার অক্ষর ভিন্ন ভিন্ন, বাঙ্গালায় তাহা নহে বলিয়া এক সঙ্গে লেখা ও পড়া শিক্ষা দেওয়া সমধিক সুবিধাজনক । যাহার অক্ষর যতদূর ছাপার অক্ষরের সদৃশ, তাহার অক্ষর তত সুন্দর । সেইজন্য লিখিবার সময় বালকেরা যাহাতে ছাপার অক্ষরের অনুকরণ করে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য ।

আজকাল বাঙ্গালা কাপিবুক দেখিতে পাওয়া যায় । কোন কোন কাপিবুকে একটা বাঙ্গালা জড়া লেখারও আদর্শ আছে । এরূপ আদর্শ না থাকাই ভাল । তাড়াতাড়ি লিখিবার সময় সুবিধার জন্য ছাপার অক্ষরগুলিকে ভাঙিয়া চুরিয়া একটা জড়া লেখা করা হইয়া থাকে ; তাই বলিয়া সে লেখা আদর্শ হইতে পারে না । ছাপার লেখাই আদর্শ থাকিলে । কাগজের সুবিধার জন্য তাড়াতাড়ি যাহা লেখা হয় তাহাকে উত্তম লেখা বলে না । যে ছাপার মত লিখিতে পারে ও তাড়াতাড়ি লিখিতে পারে সেই সর্বোত্তম লেখক । ইংরাজী স্পীলট (জড়া) অক্ষরেরও একটা আদর্শ আছে । তাড়াতাড়ি লিখিবার সময় কয়লার লেখা সেই আদর্শের অনুরূপ হইয়া থাকে ? তাই বলিয়া ইংরাজী কাপিবুকে একটা বিদ্রী জড়া লেখার আদর্শ দেওয়া হয় না ।

শিক্ষাদানের নিয়ম ।—(১) লেখার সময় বালকগণ সহজ ও সরল ভাবে বসিবে । ঘাড় বাঁকাইয়া, মাথা একদিকে হেলাইয়া জিব বাহির করিয়া,

জ কুণ্ঠিত করিয়া, ঠোঁট কামড়াইয়া, পিঠ কুজ করিয়া লিখিবার অভ্যাস প্রথম হইতেই নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে । মস্তক যেন কাগজের উপর অত্যধিক ঝুকিয়া না পড়ে । গৃহে আলোক প্রবেশের পথ বামে থাকিলেই ভাল ।

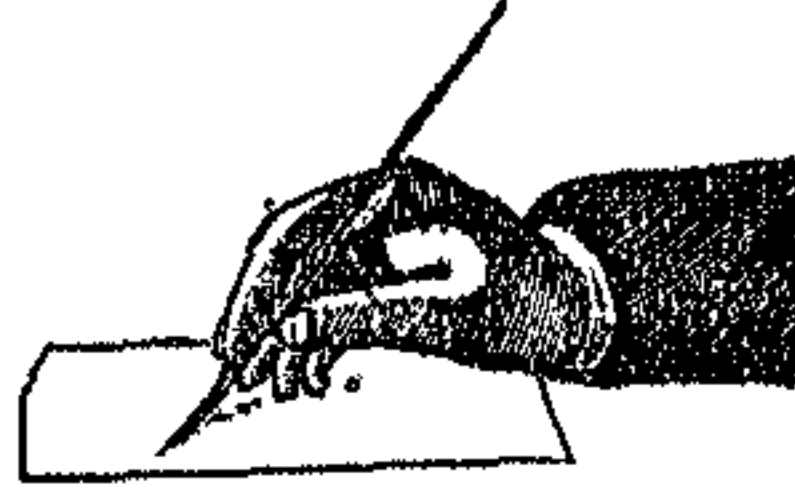
(২) লিখিবার উপকরণ উত্তম হওয়া আবশ্যিক । ভাল কাগজ, ভাল কলম ও ভাল কালি না হইলে লেখা ভাল হইবে না । কাগজের উপর কালকালির দাগগুলি যত উজ্জ্বল দেখাইবে, লেখাও তত সুন্দর দেখাইবে । পাতলা ও ময়লা রঙের কাগজ, ফ্যাড়ফেড়ে কলম, ও জলো কালিতে ভাল লেখাও বিকৃত হইয়া যায় । বালকের স্লেট বেশ পরিষ্কার হওয়া আবশ্যিক । মধ্যে মধ্যে জল ও কয়লা দ্বারা ঘষিয়া তেলের দাগ তুলিয়া ফেলিতে হইবে । স্লেটে ভাল দাগ না বসিলে লিখিয়া আনন্দ পাইবে না । নিম্ন শ্রেণীতে কলম কাটা স্লেট ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

(৩) লিখিবার পূর্বে, হাত বেশ করিয়া কাপড়ে মুছিয়া লইতে হইবে । হাতের তেল কাগজে লাগিলে লেখা চপ্সিয়া যাইবে আব কাগজও ময়লা দেখাইবে । পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা লেখার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সর্বপ্রধান সহায় । দোয়াত কলম বালকের ডাহিনে থাকিবে ।

(৪) পেন্সিল বা কলম ধরিবার প্রণালী বালকগণকে প্রথম হইতেই শিখাইতে হইবে । একবার অভ্যাস খারাপ হইয়া গেলে শেষে আর বদলাইতে পারা যাইবে না । তবে অঙ্গুলির স্বাভাবিক জড়তা-বশতঃ কেহ কেহ ভিন্ন প্রকারে কলম ধরিতে সুবিধা মনে করে । সে পৃথক কথা ।

মধ্যম অগ্রভাগের উপর কলম রাখিবে, তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগে দ্বারা কলম ধরিবে । কাগজের সহিত কলমের অগ্রভাগের ১৫।২০ ডিগ্রি মত কোণ হইবে । কলমের উর্দ্ধাংশ তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির সংযোগস্থলে রাখিবে । কনিষ্ঠা কাগজের উপরে থাকিবে ।

অনামিকার অগ্রভাগ কনিষ্ঠ ও মধ্যমার মধ্য হইতে হাতের তালার দিকে একটু বাহির হইয়া থাকিবে।



৪৬ চিত্র ।—কলম ধরা ।

(৫) আদর্শ সুন্দর হওয়া আবশ্যক । সুন্দর বড় বড় অক্ষরে নাতিবাক্য লিখিয়া দেয়ালে বুলাইয়া রাখিলে ভাল হয় । শিক্ষকের নিজের হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয় । শিক্ষককে সম্মুখে লিখিতে দেখিলে বালকগণ : অক্ষরের আকৃতি যে পরিমাণ অনুধাবন করিতে পারে, মুদ্রিত কাপিবুকের সাহায্যে তাহা পারে না ।

(৬) অক্ষরগুলির লিখিবার ক্রম বোর্ডের উপর বুলাইয়া দিতে হইবে । ব লিখিতে হইলে কোন্ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ দিক দিয়া কোথায় গিয়া শেষ করিতে হইবে, তাহা না দেখাইয়া দিলে বালকেরা বুঝিতে পারিবে না । শিক্ষক বোর্ডে লিখিয়া দেখাইবেন ।

(৭) প্রথমে এক একটা করিয়া অক্ষর লিখিতে শিখাইবে । কোন অক্ষর লিখিতে ভুল করিলে, বোর্ডে সেই ভুল অক্ষর ও শুদ্ধ অক্ষর লিখিয়া তাহাদিগের পার্থক্য বুঝাইয়া দিবে । বালকের লেখার খাতায় তাহার ভুল অক্ষরগুলি লাল কালির দ্বারা শুদ্ধ করিয়া দিবে । অক্ষরগুলির আকার যাহাতে সমান হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবে । এই জন্ত প্রথম প্রথম স্টেটে বা কাগজে রুল কাটিয়া দিতে হইবে ।

(৮) লেখা শিখাইবার সময়, যুরিয়া যুরিয়া বালকগণের লেখা পরীক্ষা করিবে । একটা লাল পেনসিল হাতে রাখিবে : যখন যাহার যে

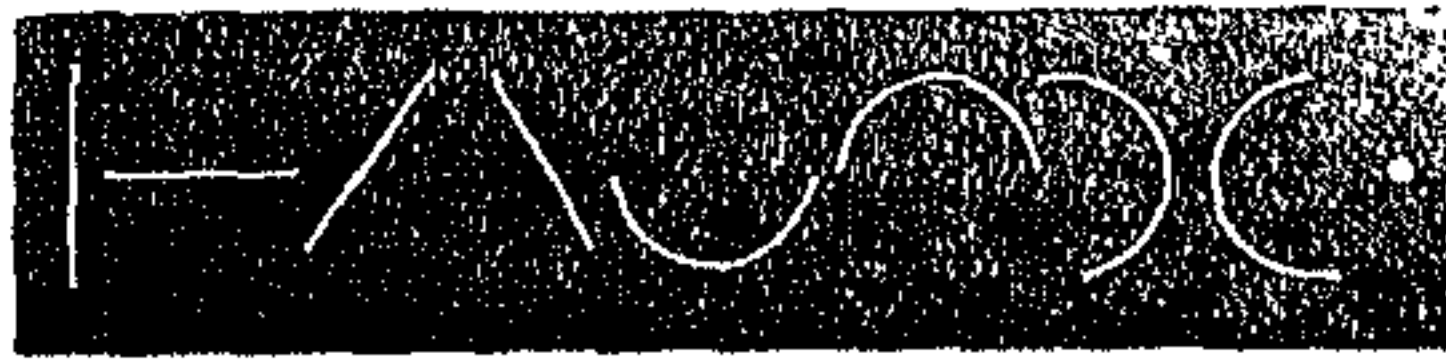
ভুল দেখিতে পাইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ লাল পেন্সিল দিয়া শুদ্ধ করিয়া দিবে।

(৯) শ্রেণীতে বালকেরা যদি এক সময়ে একটী অক্ষর বা একটী বাক্যের অনুশীলন করে, তবে শিক্ষকের পক্ষে লেখা শিখান সুবিধা হয়। ভুল হইলে তখনই বোর্ডে লিখিয়া দেখান যাইতে পারে।

(১০) উত্তম হস্তাক্ষর কেবল অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। সুতরাং যাহাতে প্রচুর পরিমাণে লেখার আলোচনা হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে।

অনেক সময় বালকেরা যেমন তেমন করিয়া, তাড়াতাড়ি কলম চালাইয়া, কতকগুলি ছাই মাথা মুগ্ধ লিখিয়া আনিয়া হাতের লেখার বুঝ দিয়া থাকে; আর শিক্ষকও অর্ধ নিম্নলিখিতেন্ত্রে একটা নাম দস্তখত করিয়া তাঁহার দায় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ উভয় পক্ষের অবহেলায় বিষয় অনিষ্ট হইয়া থাকে। লেখা ভালত হয়ই না, পরন্তু বালকগণের বিদ্যালয়ের সকল কার্যেই অবহেলার প্রবৃত্তি জন্মিয়া যায়।

অক্ষরের অংশ।—প্রথমে নিম্নলিখিত রেখাগুলির অঙ্কন শিক্ষা দিলে, লেখা শিখান সহজ হইতে পারে :—



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

৪৭ চিত্র।—অক্ষরের প্রাথমিক অংশ।

(১) এই রেখা বালকেরা নীচের দিক হইতে টানিয়া উপরের দিকে ও উপরের দিক হইতে টানিয়া নীচের দিকে আঁকিবে (২) বাম হইতে ডান দিকে (৩, ৪) উপর হইতে নীচের দিকে (৫) ডান হইতে বাম দিকে (৬) বাম হইতে ডান দিকে (৭) নীচ হইতে উপর দিকে (৮) উপর হইতে নীচে (৯) ডান হইতে বামের দিকে ঘুরাইয়া শূন্য দিবে।

প্রথম প্রথম বোর্ডের উপর না মাটির উপর চক্ দিয়া মক্স করা অর্থাৎ শিক্ষকের লেখার উপর হাত বুলান উত্তম প্রথা।

মুদ্রিত অক্ষরগুলিতে স্থূল সূক্ষ্ম নানারূপ দাগ থাকে । লিখবার সময় দাগগুলি সরু মোটা না করিলেও চলিতে পারে ।

অক্ষ লিখন ।—অ, আ, ক, খ, শব্দের অংশ মাত্র । একাধিক বর্ণ একত্র না হইলে কোন অর্থ প্রকাশিত হয় না । কিন্তু ১, ২ প্রভৃতি অর্থযুক্ত চিহ্ন । প্রত্যেক চিহ্নে এক একটা বিশেষ সংখ্যা বোধ হয় । সুতরাং এই সমস্ত সংখ্যালিখন শিক্ষায় তৎতৎ সংখ্যার জ্ঞানদানও আবশ্যিক । এইজন্য প্রথম অক্ষলিখন শিক্ষা দিতে হইলে বোর্ডে কাঠীর চিত্র আঁকিয়া তাহার উপর অক্ষ লিখিতে হইবে ; যথা :—



৪৮ চিত্র ।—অক্ষ লেখা ।

তারপর অল্পে অল্পে দাগগুলি পুঁছিয়া ফেলিয়া কেবল অক্ষের চিহ্নই রাখিতে হইবে । এইরূপে ৯ পর্য্যন্ত লিখন হইলে, দশের বেলা বোর্ডে একটা ‘দশের আঁটি’ আঁকিয়া তাহার গায়ে বড় করিয়া একটা ১ লিখিয়া দিবে । দশের আঁটি বড় বলিয়া তাহার গায়ে লিখিত একও বড় । এই আঁটির পর আর আলাগা কাঠী নাই বলিয়া, সেখানে একটা শূন্য দিবে । বুঝাইয়া দাও, আলাগা কাঠী না থাকিলেই সেখানে এইরূপ একটা ০ চিহ্ন দেওয়া হয় । ‘দশের আঁটির’ ডাহিনে একটা আলাগা কাঠী আঁকিয়া তার উপর একটা ছোট করিয়া ১ লিখ । শেষে আঁটি কাঠী পুঁছিয়া ফেলিলে ‘১১’ এইরূপ এগার থাকিবে । এইরূপে ১২, ১৩ প্রভৃতি লিখাইবে । তারপর অভ্যাস হইয়া গেলে এককের ও দশকের অক্ষ এক আকারেই লিখিবে । বামে থাকিলে যে দশকের অক্ষ বুঝায় ইহা বালকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবে ।

৫। শ্রুতলিপি।

শিক্ষার উদ্দেশ্য।—বালকেরা অক্ষরের আকৃতি না দেখিয়া লিখিতে পারে কি না তাহার পরীক্ষা হয়। শুদ্ধ বানান মনে আছে কি না, তাহার পরীক্ষা হয়। আর দ্রুত লিখিবার অভ্যাস হইতেছে কি না, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এ সকল ব্যতীত শ্রুতলিপি শিক্ষায় বালকের মনোযোগ শক্তি ও স্মরণশক্তির বৃদ্ধি সাধন হয়।

শিক্ষা দিবার নিয়ম।—(১) বালকের বয়স ও জ্ঞান বিবেচনায় শ্রুতলিপির অংশ নির্ধারণ করিবে। ছোট ছোট বালকগণকে ২। টী শব্দ লেখাইলে যথেষ্ট হইয়া থাকে। নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে ৪।৫, উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে ৭।৮ ও ছাত্রবৃত্তিতে ১০।১২ লাইন লেখাইলেই চলিতে পারে।

(২) বালকগণকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে অনেক শিক্ষক কঠিন কঠিন শব্দযুক্ত প্রবন্ধাংশ বাছিয়া লয়েন; এরূপ করা অনিষ্টকর। বালকের পাঠ্য পুস্তক হইতে অথবা সেই রকমের অন্য কোন পুস্তক হইতে শ্রুতলিপি দেওয়া কর্তব্য। অনেক শিক্ষক কঠিন কঠিন শব্দগুলি প্রথমে একবার বোর্ডে লেখাইয়া লয়েন। এ নিয়মও বেশ—কারণ শিখান উদ্দেশ্য, ঠকান নয়।

(৩) যে অংশের শ্রুতলিপি দিতে হইবে, শ্রুতলিপি লেখাইবার পূর্বে তাহা একবার পড়িয়া শুনাইবে। কারণ বিষয় জানিলে লিখিবার সুবিধা হয়, বাক্য বা বাক্যাংশ সহজেই মনে থাকে।

(৪) বাক্যাংশ বা বাক্য একবারের অধিক ডাকিয়া দিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাড়াতাড়ি করিবে না। বালকেরা সাধারণতঃ যত সময়ে সেই অংশ লিখিতে পারে মনে কর, তত সময় থামিয়া, তবে অপরাংশ ডাকিয়া দিবে। শিক্ষকের বলা শেষ না হইলে বালকগণ

লিখিতে আবস্ত করিবে না। যে সকল বালক বাক্যাংশ ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে লিখিতে আরম্ভ করে, তাহারা বাক্যাংশের প্রথম ২১টী কথাই শুনে, কিন্তু শেষাংশের প্রতি মনোযোগ থাকে না বলিয়া ‘তারপর কি, তারপর কি’ করিয়া চীৎকার করে। একবারের বেশী না বলিলেই, বালকগণ বাধ্য হইয়া মনোযোগী হইবে ও একবার শুনিয়াই সমস্ত বাক্যাংশ মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি দুয়েরই অনুশীলন হয়। তবে বাক্যাংশের পরিমাণ, ছাত্রদের বয়স বা জ্ঞানবিস্তার নির্ধারণ করিতে হইবে। নিম্ন প্রাথমিকের বালকগণের জন্য এক সঙ্গে ৩৪টী, উচ্চ প্রাথমিকের বালকের জন্য ৪৫, এবং ছাত্রবৃত্তির বালকেব জন্য ৫৬টী কথার বাক্য বা বাক্যাংশ ডাকিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া অসংলগ্ন বাক্যাংশ ডাকিতে নাই। মনে কর “রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন”—এই অংশের ক্রতলিপি লেখাইতে হইবে। এখন নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে ৩৪ কথার অংশ এক সঙ্গে ডাকিয়া দিতে হইবে বলিয়া, “রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে ॥”—ইত্যাদি প্রকারে পড়িতে হইবে না। ক্রতলিপি ডাকা শেষ হইলে, সমস্ত অংশ আর পুনরায় পড়িয়া শুনাইবে না। প্রথমেই ত পড়িয়া শুনাইয়াছ।

(৫) বালকেরা প্রায়ই যুক্ত অক্ষরগুলি লিখিতে জানে না। ‘পুষ্ক’ লিখিতে হয়ত একটা আন্ত ‘য’এর নীচে একটা ‘প’ লিখিয়া রাখিল। ক্রতলিপিতে এগুলি শিখাইতে হইবে।

(৬) ক্রতলিপি পরীক্ষার সময়, অশুদ্ধ বর্ণবিচ্ছাসের নীচে একটা দাগ দিয়া দিবে। বালক পুস্তক দেখিয়া নিজেই শুদ্ধ বানান লিখিবে। যে বানানগুলি প্রায় বালক লিখিতে ভুল করে, সেগুলি বোর্ডে লেখাইয়া লইবে। অনেক শিক্ষক অশুদ্ধ বর্ণবিচ্ছাসগুলির শুদ্ধ বানান ৩৪ বার করিয়া লেখাইয়া লয়েন। এ প্রথা মন্দ নয়।

(৭) সকল সময় নিজে শ্রুতলিপি পরীক্ষা না করিয়া মধো মধো ছাত্র-গণের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লইবে। এর স্লেট তাকে, তার স্লেট ওকে, এইরূপে বালকেরা পরস্পরের স্লেট বদল করিয়া লইবে। বালকেরা স্লেট পরীক্ষার সময় অশুদ্ধ বানানগুলির নীচে দাগ দিয়া দিবে। মধো মধো, যাহার স্লেট তাহাকে দিয়াও পরীক্ষা করান মন্দ নহে।

(৮) কোন কোন শিক্ষক বোর্ডে কতকগুলি অশুদ্ধ বানান লিখিয়া দিয়া বালকগণকে শুদ্ধ করিতে বলিয়া থাকেন। এরূপ করা অত্যন্ত দোষের। আমরা চক্ষুর দ্বারা বানান শিখি—লিখিবার সময় শুদ্ধ শব্দটির বর্ণগুলি চোখে ভাসিতে থাকে। সুতরাং অশুদ্ধ বানান দেখাইয়া কখনই বালকের চোখ নষ্ট করিয়া দিবে না।

(৯) ঠিক এক প্রণালীতে শ্রুতলিপি শিখাইলে বালকগণের প্রীতিপ্রদ হইবে না। মধো মধো শ্রুতলিপিতে শব্দ বাদ দিয়া ডাকিয়া দিবে। বালকেরা সে সমস্ত শব্দ পূরণ করিয়া দিবে। যথা :—পানীয় জল——— না হইলে———অসুখ হইতে পারে। ওলাউঠার———জল ও ছুর বিপুলতা সম্বন্ধে———সাবধান হওয়া———।





তৃতীয় প্রকরণ—ভাষা বিষয়ক ।

১। সাহিত্য ।

উদ্দেশ্য ।—(১) ভাষাবোধ অর্থাৎ লিখিত ভাষা পাঠ করিয়া লেখকের উদ্দিষ্ট ভাব বুঝিবার ক্ষমতালাভ । (২) রচনাশক্তি অর্থাৎ বিগুঢ় ভাষাতে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা লাভ । (৩) বিষয়-জ্ঞান অর্থাৎ নানাবিষয় সম্পর্কীয় বিবরণ পাঠ ও সেই সমুদয় বিষয় প্রত্যক্ষ, পরীক্ষা, আলোচনা বা বিস্তার দ্বারা তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ । (৪) মনোবৃত্তির বিকাশ অর্থাৎ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ, অভূমিতি, কার্য্য কারণাদি সম্বন্ধ বোধ, যুক্তিপ্রয়োগশক্তি প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্কীয় যাবতীয় মানসিক ক্ষমতার বৃদ্ধি । (৫) জ্ঞানভূষণ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয় সমুদায়ের পাঠ ও আলোচনা দ্বারা তৎসম্বন্ধে কুতূহল বা অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার স্পৃহাবর্ধন । (দীননাথ সেন—শিক্ষাদান প্রণালী) ।

সাহিত্যের শিক্ষকতা ।—যে শিক্ষকের সাহিত্য বিষয়ক জ্ঞান শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকেই সীমাবদ্ধ, সে শিক্ষক সাহিত্য শিক্ষাদানের উপযোগী হইতে পারেন না । হেমচন্দ্রের কবিতাবলী পড়াইতে হইলে, অন্ততঃ হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী উত্তমরূপে পাঠ করা আবশ্যক । যে গ্রন্থকারের পুস্তক

পড়াইতে হইবে তাঁহার লিখিত অনেক পুস্তক না পড়িলে, তাঁহার ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারা যাইবে না। সাহিত্য ভাবের রাজ্য। সাহিত্য বিদ্যালয়-পাঠের প্রাণস্বরূপ। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিতাদি পাঠজনিত শ্রান্তি, সাহিত্য পাঠে বিদূরিত হয়। শিক্ষক যোগ্য হইলে, সাহিত্য পাঠের ঘণ্টায়, বাৎসরিককে বিদ্যালয়ের প্রাচীরাবন্ধ কক্ষ হইতে কল্পনা ও বর্ণনার সাহায্যে মদনমোহনের 'প্রভাত সমীরণে', মধুসূদনের 'অশোক কাননে', হেমচন্দ্রের 'নিবিড় অরণ্যে', নবীন চন্দ্রের 'আত্মবনে' ও রবীন্দ্রনাথের 'গিরিগুহা শায়িত নির্ঝরে স্বপনে' পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারেন। শিক্ষকের ভাবের আবেগ চাই, কল্পনার ক্ষুরণ চাই, ও বর্ণনার চাতুর্য্য এবং মাধুর্য্য চাই। এ সমস্ত কেবল উত্তম উত্তম গ্রন্থাদি পাঠের উপর নির্ভর করে। সাহিত্য কেবল বালকের বুদ্ধিবৃত্তির উপর নহে, তাহার সমস্ত প্রকৃতির উপর কার্য্য করিয়া থাকে। মানবচরিত্রের বিচিত্র খেলা ও প্রকৃতির প্রাহেলিকাময়ী লীলা, বালক সাহিত্য পুস্তকের সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারে। তেমন স্মৃতিচরিত্র পরিচালক হইলে, বিদ্যালয় গৃহেই কেশবচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, বিদ্যাসাগরের বীজ বপন করিতে পারেন। কৃৎ, তদ্বিত, সন্ধি, সমাস প্রভৃতি লইয়া অপরিমিত অনুশীলন করিলে সাহিত্যের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়—স্ব-রসাল রসশূন্য হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ে এ সকলের আবশ্যকতা আছে বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ আছে। সাহিত্যগ্রন্থ সন্নিবিষ্ট উন্নত ভাবসমূহ উপলব্ধি করাই, সাহিত্য পাঠের পৌনেষোল আনা উদ্দেশ্য। ব্যাকরণাদির আলোচনা সামান্য মাত্রাই আবশ্যক। আমি পরীক্ষার কথা বলিতেছি না—সেক্ষেপ কোন প্রয়োজন থাকিলে, পরীক্ষা ও পরীক্ষকের রীতি বুঝিয়া পৌনেষোল আনা ব্যাকরণ পড়ানও আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে সাহিত্য পাঠের প্রকৃত ফললাভ করা যায় না। উপরন্তু ব্যাকরণগত নীরস খুটিনাটি আলোচনা করিতে করিতে এক্ষণে কু অভ্যাস হইয়া যায় যে, সাহিত্যের প্রকৃত

মাধুর্যের প্রতি তেমন আর লক্ষ্য থাকে না । নিম্নে সাহিত্য শিক্ষাদানের সাধারণ নিয়মাদির উল্লেখ করা হইল । বিদ্যালয়ের শ্রেণী অনুসারে এই সকল প্রণালীর কিছু কিছু পরিবর্তন করা আবশ্যক হইতে পারে ।

সাহিত্য শিক্ষায় লক্ষ্য ।—সাহিত্য শিক্ষায় আমরা তিনটা বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া থাকি :—পাঠ, শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা । এই তিনটির মধ্যে উত্তমরূপ পাঠ বা আবৃত্তি সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় । সাহিত্য পাঠের অন্ততম উদ্দেশ্য—শব্দের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়া, সভ্য সমাজে নিজের উচ্চ উচ্চ মনোভাব উত্তমরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হওয়া । এই প্রকাশের ক্ষমতা কেবল শব্দ যোজনার উপর নির্ভর করে না, কথনের প্রণালী ও ভঙ্গীর উপরও যথেষ্ট নির্ভর করিয়া থাকে । শব্দের ও বাক্যের আবশ্যকতা বিবেচনায় আমরা বাক্য কথনের সময়, শব্দ বিশেষ বা বাক্যের অংশ বিশেষ অপেক্ষাকৃত জোরে উচ্চারণ করিয়া থাকি । ইহা ভিন্ন বক্তব্য বিষয়ের ভাবের সহিত যোগ দিয়া, আমরা আশাদিগের কথার সুরও নিয়মিত করিয়া থাকি । খেদসূচক বিষয় হইলে গম্ভীর স্বরে, আনন্দের বিষয় হইলে মধুর স্বরে, বীরত্বের বিষয় হইলে তেজস্বচক স্বরে বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত করি । ইহাতেই বক্তব্য বিষয়ের কথন দ্বারা আশাদিগের বাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়া থাকে । ভিক্ষুক দ্বারে আসিয়া তেজস্বচক স্বরে প্রার্থনা করিলে সে ভিক্ষা পায় না ; কিস্বা করণ স্বরে কাহাকেও তিরস্কার করিলে কোন ফলোদয় হয় না । সেই জন্য উত্তমরূপ পাঠ করিতে শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক ।

পাঠ ।—বিদ্যালয়ে বালকদিগকে পাঠ শিক্ষা দিতে এই সকল নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । (১) ছোট ছোট বালকেরা যখন বাক্য পড়িতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে হইবে । কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি প্রভৃতি বিরামবোধক চিহ্ন ব্যতীত,

পাঠকালে বাক্যের অংশে অংশে, অর্থবোধে, অনেক বিরাম প্রয়োগ করিতে হয় । বিশেষ্যগুণি বিশেষ্যের সঙ্গে, ক্রিয়ার বিশেষ্য ক্রিয়ার সঙ্গে, সম্বন্ধ কারক তাহার সম্বন্ধীয়ের সঙ্গে, কর্ম কারক তাহার ক্রিয়ার সঙ্গে একত্র পঠিত হইয়া থাকে । (বালকদিগকে যে ব্যাকরণ শিখাইয়া লইয়া, পাঠ শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নহে, শিক্ষকগণের সাহায্যার্থে এই সকল সংক্ষেপ নির্দেশ করা হইতেছে) । বালকদিগকে প্রথমে পড়িয়া শুনাইতে হইবে,—তাহারা অনুকরণ করিবে । কোন কোন শিক্ষককে পেন্সিল দিয়া এইরূপ দাগ দিতেও দেখিয়াছি । যথা :—

একদা । দুইটা দুই বালক । একটা বড় পুরুষের ধারে । অতি অসাবধানে ছুটাছুটি করিতেছিল ।

এইরূপ করিয়া না পড়িয়া যদি নিম্নের বিরাম লক্ষ্য করিয়া পড়া যায় তবে অর্থবোধ হইবে না :—

একদা দুইটা । দুই বালক একটা । বড় পুরুষের । ধারে অতি । অসাবধানে ছুটা । ছুটি করিতেছিল ।

দাগ দিবার বিশেষ কোন আবশ্যকতা দেখি না । শিক্ষক নিজে উত্তম করিয়া পড়িয়া দিলেই বালকেরা সহজেই অনুকরণ করিতে পারিবে । তবে বিশেষ আবশ্যক হইলে, অতি নিকর্ষাধ বালকের পক্ষে, এইরূপ দাগের প্রয়োজনীয়তা হইতে পারে । তারপরে বিশেষ্যাদি গুণবাচক শব্দের ও ভাবের যোগ রাখিয়া, কোন কোন শব্দ একটু অপেক্ষাকৃত অধিক জোর দিয়া পড়িতে হয় । যেমন এখানে ‘দুই’, ‘বড়’ ও ‘অতি অসাবধানে’—এই সকল শব্দের প্রতি একটু অধিক জোর দেওয়া আবশ্যক ।

(২) কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি প্রভৃতি চিহ্ন দেখিয়া বালকেরা থামিবে । কতক্ষণ থামিতে হইবে তাহা শিক্ষকের পাঠ শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে । কমার নিকট এক, সেমিকোলনের নিকট দুই এবং দাঁড়ির

নিকট তিন গণনা করিতে যত সময় লাগে ততক্ষণ থামিবে—এই নিয়ম অনুসারে থামিতে শিক্ষা দিলে, সহজ বিষয় কঠিন করিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। কোন কোন বালক আবার কমা দেখিলে হয়ত বড় করিয়া ‘এক’ বলিয়াও ফেলিবে। নিয়ম ইহাই বটে, কিন্তু বালককে নিয়ম না শিখাইয়া সেই নিয়মের কার্য্য অর্থাৎ পড়া শিখাইয়া দাও। প্রায়বোধক চিহ্নবিশিষ্ট বাক্য বিরূপ সুরে পড়িতে হয়, তাহা অনেক বালক জানে না। এ বিষয়ে শিক্ষককে বিশেষ উপদেশ দিতে হইবে, অর্থাৎ উত্তম করিয়া পড়িয়া শুনাইতে হইবে, আর বালকগণের নিকট তদ্রূপ পাঠ আদায় করিতে হইবে। আশ্চর্য্যবোধক চিহ্ন সম্বন্ধেও কিছু কিছু উপদেশ আবশ্যক।

(৩) পড়ার স্বর অত্যধিক উচ্চ বা নীচ ভাল নহে। আমরা সাধারণতঃ যে স্বরে কথা বলি, তাহাই পাঠের পক্ষে উত্তম স্বর। অনেক বালক সুর করিয়া বা ঘ্যাঙাইয়া পড়ে। প্রথম হইতেই শিক্ষক এই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করাইতে চেষ্টা করিবেন। খেদসূচক অংশ অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে ও ধীরে পড়িতে হয়। বীরত্বব্যাঞ্জক অংশ একটু উচ্চ ও দ্রুত পড়া রীতি। যাহারা উত্তমরূপ অভিনয় বা বক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহাদিগের অভিনয় বা বক্তৃতা শ্রবণ করিলে, এ বিষয়ে অনেক শিক্ষা হয়। তবে অভিনয়ে ধেরূপ ক্রন্দন, হাস্য, রোষ প্রভৃতি ভাবের প্রকৃত অনুকরণ করা হইয়া থাকে, শ্রেণীস্থ পাঠে ততদূর করার রীতি নাই। কেবল ভাব বুঝিয়া পাঠের স্বর উচ্চ, নীচ, ধীর, দ্রুত বা গম্ভীর করিতে হইবে মাত্র।

(৪) পাঠের কালে ভাব অনুসারে চোখ, মুখ ও হস্তের কিঞ্চিৎ ভঙ্গির আবশ্যক। চিত্র পুস্তকিকার ছায় নিশ্চল নিষ্পন্দভাবে পাঠ করিলে ভাবের উদয় হয় না। তাই বলিয়া যাত্রার দলের ছোকরার মত অস্বাভাবিক ‘অঙ্গসঞ্চালনও বাঞ্ছনীয় নহে।

(৫) উচ্চারণের জড়তা পরিত্যাগ করাইতে হইবে। যাহারা বাল্যকাল হইতে খুব তাড়াতাড়ি কিম্বা জম্পষ্ট স্বরে পড়িতে অভ্যাস করিয়াছে, তাহাদেব উচ্চারণ জড়তায়ুক্ত হইয়া থাকে। সমস্ত শব্দটী একবারে উচ্চারণ করিতে না পারিলে, শব্দের অংশ অংশ উচ্চারণ করিবে। “প্রাকৃতিক” কথা একবারে উচ্চারণ করিতে যদি জড়তা আসিয়া পড়ে, তবে ‘প্রা’, ‘কু’, ‘তিক’ এইরূপ খণ্ড খণ্ড করিয়া উচ্চারণ করাইয়া লইতে হইবে। বোর্ডে এইরূপ কঠিন শব্দগুলি লিখিয়া, পাঠের পূর্বে বালকগণকে অভ্যাস করান মন্দ নহে।

(৬) কতকগুলি শব্দের উচ্চারণ দেশজ দোষে বিকৃত হইয়া থাকে। “ভালবাসা” স্থানে ‘বালবসা’, ‘দত্তবাদ’ স্থানে ‘দত্তবান’, ‘ঘর’ স্থানে ‘গর’,—এইরূপ বর্ণের চতুর্থ বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই দোষ ছাড়াইতে হইলে, চতুর্থ বর্ণযুক্ত শব্দগুলি উচ্চারণের সময়, ঐ চতুর্থ বর্ণে বিশেষ জোর দিয়া উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিবে। তাহা হইলে ধীরে ধীরে এই দোষ পরিত্যক্ত হইবে। ‘বড়’ স্থানে ‘বর’, ও ‘চাঁদ’ স্থানে ‘চাদ’ শুনিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থানেও, যে বর্ণের ভুল উচ্চারণ হয়, পাঠকালে সেইটির প্রতি সমধিক জোর দেওয়া আবশ্যিক। লেখা আছে ‘শোক’ কিন্তু পড়িবার সময় পড়ে ‘শুকে’, ‘মাছে আলো দাও’ আর ‘ঘরে আলু দাও’—অর্থাৎ ওকার স্থানে উকার ও উকাবের স্থানে ওকার—ইহাও কোন কোন জেলাব দোষ। তারপর আরও কতকগুলি উচ্চারণের বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যিক; যথাঃ—অনন্ত, অভয়, অঘোর, অন্ন প্রভৃতি শব্দে অকারের প্রকৃত উচ্চারণ হয়, কিন্তু অখিল, অধীন, অধিকারী প্রভৃতি শব্দের ‘অ’কারের উচ্চারণ একটু ‘ও’ সংযুক্ত *।

* যদি অকারের পরস্থিত ব্যঞ্জনান্ত স্বব অ আ উ ঐ ও ঔ হয় তবে অকারের উচ্চারণ সম্পূর্ণ অকাবের মতই হইয়া থাকে, যথা অভয়, সকল, অনাদি, সখা,

এইরূপ ব্রজেন্দ্র, ব্রজরাজ পড়িতে 'ব্র' অকার যুক্ত না হইয়া একটু 'ও' কার যুক্ত হইবে । রক্ষ, রক্ষা, অজ্ঞ, অজ্ঞতা প্রভৃতিব অ ওকারযুক্ত । আবার বেল, তেল, বেত, দেড়, পেট, এবং, দেশ, মেঘ, কেবল, একদা, ছেঁড়া, দেড়া, এখানে প্রভৃতি শব্দে 'এ'কারের প্রকৃত উচ্চারণ ; কিন্তু কেন, এত, দেখ, হের, এক, কেমন, যেমন, তেমন, এখন, বেড়া, তেড়া, ভেড়া, বৈকা, বেঙ প্রভৃতি শব্দে 'এ'কারের উচ্চারণ কতকটা 'খফলা আকার' তুল্য । 'বায়ু' উচ্চারণে 'বায়ু' হইবে না, 'বায়ু' হইবে, 'মায়ু' উচ্চারণে 'মোয়উর' হইবে । ব্যক্তি, বায়, ব্যথা উচ্চারণে ব্যক্তি, ব্যয়, ব্যথা হইয়া থাকে । সংস্কৃতে আকার ইকার প্রভৃতির চিহ্ন আছে কিন্তু অনাবশ্যক হেতু অকারের কোন চিহ্ন নাই । বাঙ্গলায় অকার চিহ্নের একটু আবশ্যকতা আছে । বাঙ্গলা শব্দে অকারযুক্ত বাঙ্গলার উচ্চারণ, স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয় । 'যখন' পড়িতে য ও খ অকারযুক্ত কিন্তু ন হসন্ত । এইরূপ আকার ইকারাদি বিহীন আত্ম ও মধ্য বর্ণ অকারযুক্ত কিন্তু শেষ বর্ণ হসন্ত । কিন্তু যেখানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় সেখানে (প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে) অকারের চিহ্ন আবশ্যক । একটা বিন্দু দ্বারা এই কাজ চলিতে পারে । যথা গৃহ, বৃষ, তব, ঘন, কাল (কৃষবর্ণ), সন্দেহ ইত্যাদি, গামলা, বালতী লিখিতে ম ও লএ হসন্ত চিহ্ন দেওয়া আবশ্যক ।

(৭) কি বাড়ীতে, কি স্কুলে, কি পাঠ মুখস্থের সময়, কি আবৃত্তির সময়, কোন সময়েই যেন বালক তাড়াতাড়ি ও অস্পষ্টরূপে উচ্চারণ না করে । তবে একবার পাঠের রীতি উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইয়া গেলে, আর কোনরূপ বিধির আবশ্যকতা থাকিবে না । তখন বালকের অর্দ্ধশতাব্দী

অপূর্ব, সম্পূর্ণ ; অশেষ, নবোদয় ; অঘোর, মহোৎসব , অধৈর্য, শৈবঃ , অগোণ, জলোকা ইত্যাদি । কিন্তু যদি অকারের পরস্থিত বাঙ্গলায় স্বর ই ঐ উ ঋ হয় তবে অকারের উচ্চারণ একটু ওকারযুক্ত হয়, যথা অধিকারী, যদি ; অমিয়, নদী ; অরণ, বন্ধু ; অমৃত, মন্থন ইত্যাদি । তবে ব্যতিক্রম আছে । (রবীন্দ্র বাবুর 'শব্দতত্ত্ব' পাঠ কর) ।

স্বরে বা গুণ গুণ করিয়া পাঠ অভ্যাস করাতেও কোনরূপ ক্ষতির কারণ হইবে না। কিন্তু প্রথম অবস্থায়, বালকগণকে কোন সময়েই অস্পষ্ট উচ্চারণ করিতে দিবে না।

(৮) কোন কোন বালক স্বভাবতঃ একটু লজ্জানীল। এই লজ্জাবশতঃই অস্পষ্টরূপে ও মৃদুস্বরে পাঠ করিয়া থাকে। নিম্ন শ্রেণীতেই এইরূপ দোষ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যো মধ্যো সকল বালককে দণ্ডায়মান করাইয়া সমস্বরে পাঠ করাইলে এই লাজুক বালকগণের লজ্জা ভাঙ্গিয়া যায়। লাজুক বালকেরা এইরূপ সমস্বরে পাঠের সময় উপযুক্তরূপে ও উচ্চস্বরে সকলের সহিত আবৃত্তি করিতেছে কি না, এ বিষয়ে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ অনেক বালক সমস্বরে পাঠের সময়ও তাহা-দিগের লজ্জানীলতার বশে, মৃদুস্বরে ও অস্পষ্টরূপে আবৃত্তি করিয়া থাকে।

(৯) বিদ্যালয়ের জন্মদিনে বা পুরস্কার বিতরণ দিনে বা গ্রীষ্মের বন্ধ কি পূজার ছুটির পূর্ব দিনে, কোন কোন বিদ্যালয়ে সভা হইয়া থাকে। এই সভায় সাধারণের সমক্ষে আবৃত্তি করাতে বালকগণের লজ্জা ভাঙ্গিয়া যায় ও উত্তমরূপ আবৃত্তি করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র “কথোপকথনের” অভিনয় করান যাইতে পারে। যোগেন্দ্রনাথ বসু কৃত “ভারতের মানচিত্র দর্শন” ও শ্রীযুক্ত কাশ্মিনী রায় কৃত “একলব্যের গুরুদক্ষিণা” বিদ্যালয় অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী। (কিওয়ারগার্টেন পরিচ্ছেদে আবৃত্তি ও অভিনয়ের অংশ দেখ) উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ “নেথনাদ বধের” বা “পলাশীর যুদ্ধের” কোন অংশ অভিনয় করিতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, মানকুমারী, গিরীন্দ্র মোহিনী, গোবিন্দচন্দ্র দাস কৃত গ্রন্থাবলীতে যথেষ্ট আবৃত্তির উপযুক্ত কবিতা আছে। কলিকাতার নীতি বিদ্যালয় কর্তৃক প্রচারিত ‘সঙ্গীত মুকুল’ নামক পুস্তকে বালকগণের আবৃত্তির উপযোগী অনেকগুলি কবিতা ও সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তমরূপ ভঙ্গীর সহিত এগুলি আবৃত্তি করিতে পারিলে বিশেষ শ্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। ইহা বাতীত শিক্ষকের কর্তব্য যে, তিনি মধ্যো মধ্যো শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্য কোন সমগ্রস্থ বালকগণকে পড়িয়া শুনান। শিক্ষককে উত্তমরূপ পাঠক হইতে হইবে।

(১০) শ্রেণীতে পর পর পাঠের যে রীতি আছে, তাহা সুফলপ্রদ নহে । প্রথম বালক যখন পড়িতে আরম্ভ করে, তখন দ্বিতীয় বালক প্রথম বালকের পড়া না শুনিয়া, নিজের যে অংশ পড়িতে হইবে, তাহাই আন্দাজ করিয়া মনে মনে অভ্যাস করিতে থাকে । এইরূপ তৃতীয়, চতুর্থ হইতে শেষ বালক পর্য্যন্ত সকলেই একটা আন্দাজ করিয়া নিজ নিজ অংশ লইয়া ব্যস্ত থাকে । সুতরাং কে কিরূপ পড়িল তাহার দিকে মনোযোগ থাকে না । একজনের পাঠের পর অল্প কাহাকে যে পড়িতে হইবে, তাহা যেন বালকেরা পূর্ব্ব হইতে না জানিতে পারে । শিক্ষক যে কোন বালককে পড়িতে বলিতে পারেন । তারপর উপরিস্থ বালকের ভুল ধরিয়া নিম্নের বালক উপরে উঠিতে পারে, বিচ্ছালয়ে এইরূপ রীতি আছে । ইহাতে শ্রেণীর বালকগণ নিবিষ্টচিত্তে কেবল ভুল ধরিবার লগ্ন্যই ব্যস্ত থাকে । বালক পড়িল—

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক কাননে
ফাঁদেন বাঘের বাচ্চা আঁধার কুটীরে
বিবরে, ইত্যাদি ।

নিম্নের বালক বলিয়া উঠিল ‘বাঘের বাচ্চা’ নয় “রাঘব বাচ্চা” আর উপরে গিয়া বসিল । শিক্ষকও ইহাতেই তুষ্ট হইলেন । দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা বা অর্থবোধের অভাবে কোন বালকের পক্ষে এরূপ পড়া অসম্ভব নহে কিন্তু ‘বাঘের বাচ্চা’, ‘রাঘব বাচ্চা’ হইলেই বিমুগ্ধ পাঠ হইয়া গেল না । আমরা কেবল বালকগণকে ভুল ধরিতেই শিক্ষা দিয়া থাকি, কিন্তু গুণের সূখ্যাতি করিতে শিক্ষা দিয়া থাকি না । বালকেরা পুস্তক বন্ধ করিয়া চক্ষু বুঁজিয়া বসিয়া থাকুক—আর কাহার পড়া কেমন মধুর ও ভাব-ব্যঞ্জক হইতেছে তাহাই লক্ষ্য করুক—দোষ অপেক্ষা গুণ দেখিতে অভ্যাস করুক । এইরূপে গুণের আলোচনা করিতে করিতে নিজের দোষ অলক্ষিতে সংশোধিত হইয়া যাইবে । শব্দ পাঠের ভুল সংশোধনের কিঞ্চিৎ আবশ্যকতা আছে বটে ; কিন্তু প্রকৃত ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষাকরতঃ, স্বর

অবস্থানুযায়ী হ্রস্বদীর্ঘ করিয়া যে পাঠ করা হয় তাহাই উত্তম পাঠ। পাঠের এই সর্বপ্রধান বিষয় বালক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে কি না দেখিতে হইবে। শিক্ষকের নিজেরও উচিত, পাঠ্য পুস্তকের লাইনের প্রতি চক্ষু না রাখিয়া, বালকগণের পড়ার দিকে কাণ রাখা। তাহা হইলে কাহার পড়া কিরূপ সুন্দর হইতেছে, তাহা বিচার করিতে সক্ষম হইবেন।

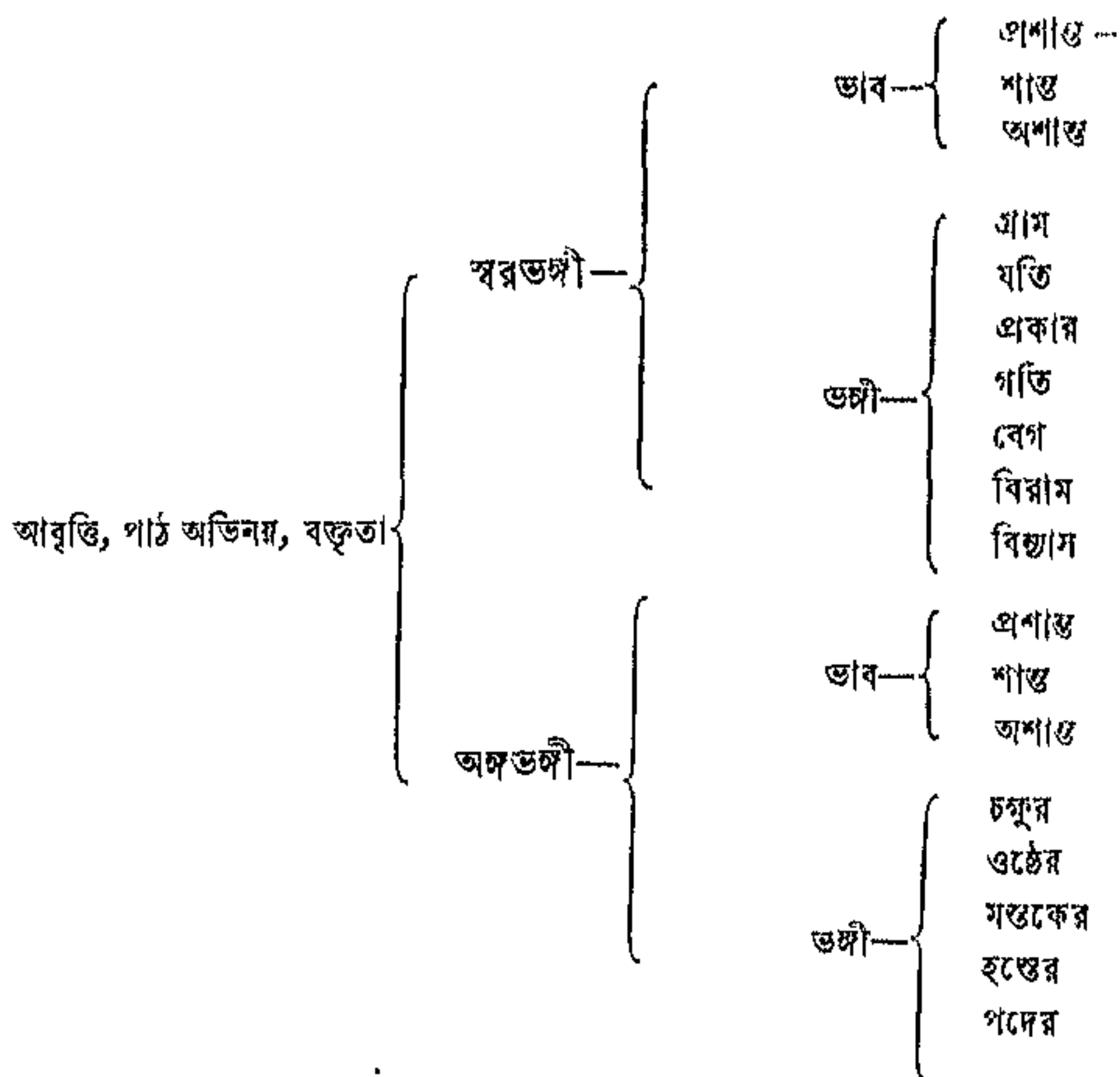
সাধারণতঃ লিখিত পরীক্ষা গৃহীত হয় বলিয়া শিক্ষকগণ এখন পাঠের উৎকর্ষতার দিকে তেমন মনোযোগ অদান করেন না। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে সংসারের কাজ কর্মে লিখিত উত্তরের আবশ্যকতা হয় না; বাক্য কথনের দ্বারাই মনের ভাব বাস্তব করিতে হয়। সুতরাং পাঠ বা উত্তম কখনই বিশেষ প্রয়োজনীয়। পাঠ শিক্ষাদানের দ্বারা, লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে যে সকল শিক্ষক, পাঠ আবৃত্তি প্রভৃতির উৎকর্ষতা সাধনে যত্নশীল, তাহাদিগের সাহায্যার্থ পাঠ শিক্ষাদানের আরও কয়েকটি নিয়ম প্রদত্ত হইল।

পাঠাদিকে চার ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) পাঠ অর্থাৎ পুস্তক বা প্রবন্ধাদি দেখিয়া পড়া; (২) আবৃত্তি অর্থাৎ কোন বিষয় মুখস্থ করিয়া তাহাই বলা; (৩) বক্তৃতা অর্থাৎ মনে মনে রচনা করিয়া অনর্গল বলিয়া যাওয়া; (৪) অভিনয় অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের কথা মুখস্থ করিয়া সেই ব্যক্তির অনুকরণে সেই কথার কথন।

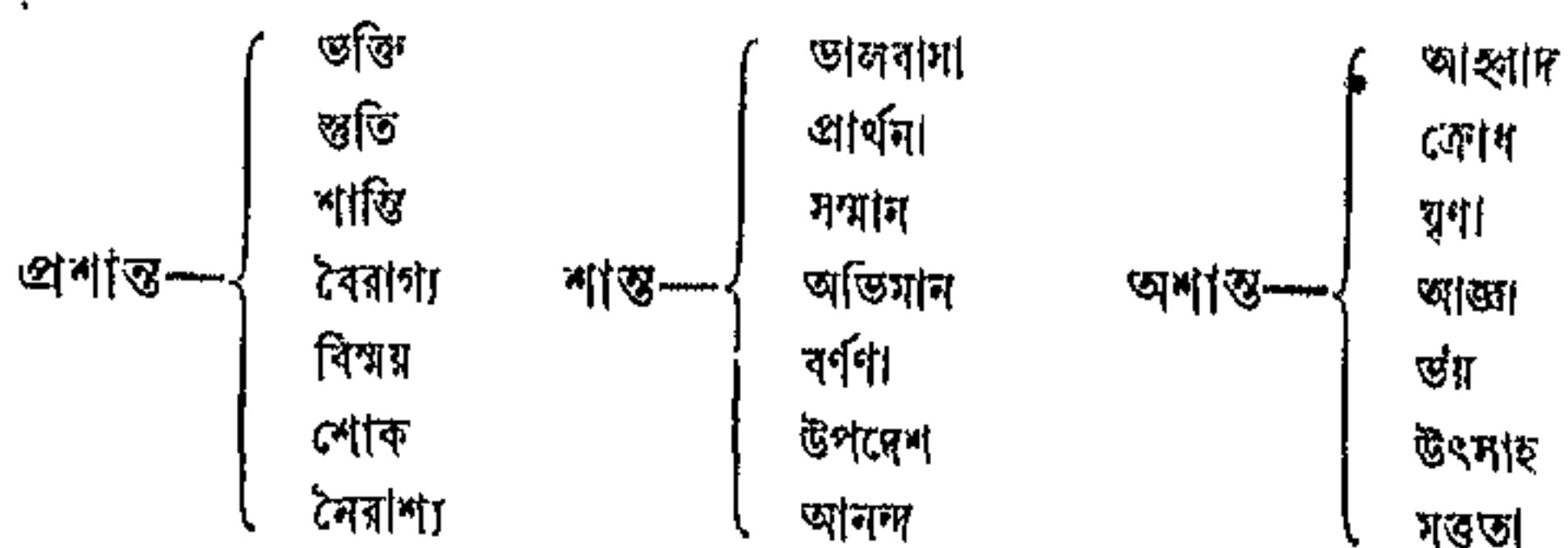
এই চার বিষয়ের অনুশীলনে স্বরভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গীর আবশ্যক। সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠে এই দুই ভঙ্গীর যাত্রা খুব কম, কিন্তু অভিনয়ে ইহাদিগের যাত্রা খুব বেশী। তবে পাঠে ভঙ্গীর যাত্রা খুব কম বলিয়া ইহা উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে বরং যাত্রা কম বলিয়াই উত্তম পাঠ সর্বপেক্ষা কঠিন। দত্ত বিকাশ করিয়া আনন্দ প্রকাশ বা অশ্রু বিসর্জন করিয়া শোক প্রকাশ সহজ, কিন্তু দত্ত ঢাকিয়া আনন্দ ও নির্জল নেত্রে শোক প্রকাশ শক্ত। পাঠে এই শক্ত পথই অবলম্বন করিতে হয়।

প্রথমে স্বরভঙ্গীর কথা। এই ভঙ্গীর তিন আবস্থা—প্রশান্ত, শান্ত ও অশান্ত (বা চঞ্চল)। “জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে” প্রশান্ত ভাব, “ছিন্নু মোরা স্থলোচনে গোদাবরী-তীরে” শান্তভাব, “দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন” অশান্ত ভাব। এই তিন ভাব পড়িয়াই কেহ হয়ত মনে করিতেছেন যে অশান্ত ভাবে বুঝি খুব চীৎকার করিয়া দ্রুত পড়িতে হয়, আর প্রশান্ত ভাবে ধীরে ধীরে যত্নসহ পাঠ করিতে হয়। অবস্থা বিশেষে তাহা আবশ্যক হইতে পারে বটে, কিন্তু সর্বত্র এ নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না। এখানে স্বরের ভাবের কথা বলা হইতেছে, স্বরের গ্রাম বা গতির কথা বলা হইতেছে না। যামিনী বলিল “গোবিন্দলাল আমিয়াছে।” ভ্রমর কাদিয়া বলিল “একবার দেখা দিদি! এই ভ্রমে আর একবার দেখি। এই সময়ে আর একবার দেখা।” এখানে রূপ শম্যাশামিনী ভ্রমরের স্বরের ভাব (হঠাৎ আহ্লাদে) অশান্ত কিন্তু স্বর গ্রাম উচ্চ নহে—মৃদু, স্বরের গতি দ্রুত নহে—ধীর।

গ্রাম, গতি, প্রকার, যতি প্রভৃতি স্বরের নানারূপ ভঙ্গী আছে। নিম্নের ফর্দগুলি দেখিলেই এই সমস্ত ভঙ্গীর অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে।



কোন কোন নিষয় কোন ভাবের অন্তর্গত নিয়ে তাহারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত
হইল।



গ্রাম, যতি অনুসারে বিষয়ভেদে স্বরের নানাক্রপ পরিবর্তন হইয়া থাকে ।—নিম্নের ফর্দে তাহাই প্রদর্শিত হইল ।

গ্রাম ।

অতিউচ্চ—	{ আহ্লাদ চীৎকার আহ্বান
উচ্চ—	{ আনন্দ উত্তেজনা উৎসাহ
মধ্যম—	{ বর্ণনা বিবরণ উপাখ্যান
নিম্ন—	{ শোক শান্তি ভক্তি প্রেম পবিত্রতা বিনয় বিস্ময়
অতিনিম্ন—	{ ভয় চিন্তা নিরাশা অধীরতা

যতি ।

সরল—	{ শান্তি ভক্তি সহানুভূতি সম্মান সুখ
সবিরাম—	{ শোক আহ্লাদ আদর দুর্বলতা
অবিরাম—	{ আদেশ ক্রোধ ধিকার ভৎসনা উল্লাস

প্রকার ।

(১) সাধারণ স্বরী—	{ সরলমাত্রা { শোক শান্তি শ্রদ্ধা ভক্তি মধ্যম মাত্রা { বিবরণ উপাখ্যান উপদেশ পূর্ণ মাত্রা { উৎসাহ উল্লাস

(২) গম্ভীর স্বর—	{ সরলমাত্রা { প্রার্থনা সম্মান আনুগত্য মধ্যম মাত্রা { সাহস সম্ভাষণ বিস্ময় পূর্ণ মাত্রা { উত্তেজনা বীরত্ব আদেশ ভয়

(৩) রূপকধর	স্বল্পমাত্রা	{ নিরাশা ভয় আশঙ্কা	(৪)	ভারস্বর	{ ভীতি ক্রোধ আহ্বান
	মধ্যম মাত্রা	{ ঘৃণা দ্বेष হিংসা	(৫)	ভগ্নস্বর	{ ভয় বিস্ময়
	পূর্ণ মাত্রা	{ ক্রোধ মিহির অবজ্ঞা	(৬)	অনুনাসিক ধর	{ উপহাস বিদ্রুপ বাক্য

গতি ।		বেগ ।	
উর্ধ্বগ	{ বিস্ময়কর বিষয় আনন্দদায়ক" ভীতিসঞ্চারক" উত্তেজনাপূর্ণ"	অতিদ্রুত	{ আহ্বাদ উত্তেজনা মত্ততা
নিয়গ	{ শোকপূর্ণবিষয় আশীর্ব্বাদ শাস্তিবচন সিদ্ধান্ত উপসংহার	দ্রুত	{ আনন্দ হাস্য কৌতুক
বক্ষুর	{ উপহাস বিদ্রুপ হাসির কথা	সাধারণ	{ বর্ণনা বিশ্লিষ্ট
		ধীর	{ প্রার্থনা মহত্ব গৌরব জঃথ
		অতিধীর	{ উপাসনা বিস্ময় ভীতি শোক

বিয়াম ।	অঙ্গভঙ্গী ।
স্বর—{ আনন্দ উত্তেজনা	চক্ষুতে—{ আনন্দ শোক ক্রোধ ভয় হুণা
মধ্যম—{ বিবরণ বর্ণনা	ওষ্ঠে—{ হাসি কান্না হুণা ক্রোধ
দীর্ঘ—{ বৈরাগ্য শোক শান্তি	হস্তে—{ নিষেধ আহ্বান প্রস্থান ইত্যাদি ইত্যাদি

স্বরের গ্রাম, যতি প্রভৃতির দ্বারা স্বরের বিরূপ ভঙ্গী বুঝাইতেছে
নিম্নে তাহার আভাস প্রদত্ত হইল :—

গ্রাম—স্বরের উচ্চত্ব বা নীচত্বকে স্বরের গ্রাম বলে । দূর হইতে কাহাকেও ডাকিতে
হইলে অতি উচ্চ স্বরে ডাকিতে হয় । নিরাশা ও অবসাদ আসিলে স্বর নীচ হইয়া পড়ে ।

যতি—বিষয় বিশেষ বা বাক্য বিশেষ একটু অধিক বা কম জোরে উচ্চারণ করিতে হয় ।
শোকের সময় যতি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া যায় । অনেক সময় শব্দ বিশেষও জোরে উচ্চারণ
করিতে হয় । এইরূপ জোরে বা ধীরে উচ্চারণ করাই যতির কার্য্য ।

প্রকার—গম্ভীর, রুদ্ধ, অনুনাসিক ভেদে স্বরের নানা প্রকার বা রকম আছে ।

গতি—কোন কোন বিষয় বর্ণনার সময় প্রথমে ধীরে ধীরে বলিতে বলিতে ক্রমেই স্বরের
মাত্রা উচ্চ করিতে হয় । আবার কখন কখন উচ্চস্বরে আরম্ভ করিয়া স্বর নামাইয়া
আনিতে হয়, এইরূপ স্বরের উঠা নামাকে স্বরের গতি বলে ।

বেগ—কোন কোন বাক্য অতি দ্রুত আবার কোন কোন বাক্য ধীরে ধীরে উচ্চারণ
করিতে হয় ; ইহাই স্বরের বেগ ।

বিয়াম—কোন কোন বিষয় অনর্গল বলিয়া যাইতে হয়, আবার কোন কোন বিষয়
খানেক খানেক বর্ণনা করিতে হয় ।

বিশ্বাস—ভাবের সহিত যোগ করিয়া বাক্যের কতকগুলি শব্দ এক সঙ্গে পাঠ করিতে হয় আবার কতকগুলি হয়ত একটী একটী করিয়া পৃথকভাবে উচ্চারণ করিতে হয় । ইহাই শব্দবিশ্বাস ।

অঙ্গভঙ্গী—বিদ্যালয় পাঠে অঙ্গভঙ্গীর তত আবশ্যকতা হয় না বলিয়া এ সম্বন্ধে অধিক লেখা আবশ্যক মনে করিলাম না । তবে অবস্থানের স্থান ভেদে অর্থাৎ শ্রোতৃবর্গের নিকট থাকিলে যে সাধারণ স্বরে ও শ্রোতৃবর্গ হইতে দূরে হইলে যে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে পাড়িতে হইবে ইহা সকলেই অবগত আছেন । পাঠে হস্ত পদাদির সঞ্চালনের তেমন আবশ্যক হয় না, কিন্তু চোখের ও ওষ্ঠের ভঙ্গীর কিঞ্চিৎ আবশ্যক । হাসি বা আনন্দের বিষয় হইলে চোখে ও ঠোঁটে তাহার ভাব (সামান্য মাত্রায়) দেখাইতে হইবে । ভয়ের কথা হইলে চোখ পলকশূন্য করিয়া, রাগের কথা বলিলে চোখ বড় করিয়া, ঘৃণার কথা হইলে জ্ব কুঞ্চিত করিয়া, আনন্দের বিষয় হইলে দৃষ্টি ঈষৎ ঢকল করিয়া, অসম্মতিতে মস্তক বামে দক্ষিণে সঞ্চালন করিয়া, সম্মতিতে মস্তক মস্তুখে পশ্চাতে ঈষৎ দোলাইয়া ভাব প্রকাশের সহায়তা করা যাইতে পারে ।

শব্দার্থ ।—অভিধানের সাহায্যে শব্দার্থ শিক্ষা করা উত্তম পদ্ধতি বটে । কিন্তু ছোট ছোট বালকেরা একে অভিধানে খুঁজিয়া শব্দ বাহির করিতে জানে না, আর তাহা জানিলেও, অভিধান লিখিত শব্দের বহু অর্থের মধ্যে কোন অর্থটী পাঠ্য অংশের উপযোগী তাহা স্থির করিতে সমর্থ হয় না । সুতরাং এই শ্রেণীর বালকদিগকে শব্দের অর্থ শিখাইয়া দিতে হয় । শব্দার্থ শিক্ষা দিতে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে :—

(১) যে সকল শব্দ বালকেরা সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকে ও যাহার অর্থ বা ভাব তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার অর্থ বলিবার আবশ্যকতা নাই । অনেক অর্থ পুস্তকে এইরূপে সমস্ত শব্দের অর্থ লেখাতে বার পয়সার পুস্তকের ‘অর্থপুস্তকের’ দাম বার আনা হইয়া থাকে । কোন অর্থপুস্তকে দেখিয়াছি, আমি=নিজে, তুমি=যাহার সহিত কথা বলা হইতেছে, কাঁদিতেছে=অশ্রু বিসর্জন করিতেছে, এইরূপ প্রায় সকল কথারই অর্থ লেখা হইয়াছে । অনেক শিক্ষক এইরূপ অর্থপুস্তক কিনিতে

প্রশ্ন দিয়া থাকেন। আবার তিনি নিজেও এইরূপ অর্থ পুস্তক খুলিয়া, নির্দিষ্ট পাঠের অর্থগুলি বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের অর্থ-শিক্ষা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপ অনাবশ্যক কার্যে সময় নষ্ট করাতেই বালকগণ নিম্নশ্রেণীতে সমস্ত দিন রাত্র খাটিয়াও পড়া মুখস্থ করিয়া উঠিতে পারে না।

(২) বালকেরা যে অংশ পাঠ করিতেছে সেই অংশের ভাব বুঝিতে পারিতেছে কি না ইহাই দেখিতে হইবে। সেই ভাব বুঝিতে যে সকল শব্দের অর্থের প্রয়োজন, কেবল তাহাই লিখাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ শব্দার্থ শিক্ষা দিবার প্রণালী সাধারণতঃ পাঁচটি :—(ক) ভঙ্গীর দ্বারা ; (খ) দ্রব্য বা তাহার আদর্শ বা চিত্রের দ্বারা ; (গ) দৃষ্টান্ত দ্বারা (ঘ) প্রতিশব্দের দ্বারা (ঙ) পরীক্ষণের দ্বারা।

(ক) “তাহারা তখন আহার করিতেছিলেন”—হাতের দ্বারা আহারের মত ভঙ্গী করিলেই বালক ‘আহারের’ অর্থ বুঝিয়া লইবে। এইরূপ চক্ষুর সাহায্যে বালকেরা যাহা শিক্ষা করে, তাহা তাহাদিগের মনে বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুই শিক্ষাকার্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করে। (খ) “ঈগল পক্ষী ছাগল ধরিয়া লইয়া গেল”—এখানে ঈগল ‘পক্ষী বিশেষ’ বলিলে বালকদিগের ঈগল বিষয়ক কোন জ্ঞান হইবে না। একখানি ঈগলের ছবি দেখাইয়া তাহার সম্বন্ধে ছুচারিটি কথা বলিয়া দিলে বালক ঈগল পাখীর কথা বেশ আনন্দের সহিত মনে করিয়া রাখিবে। “কাঠের দ্বারা খাট, পালঙ্ক প্রভৃতি প্রস্তুত হয়”—খাট অনেক বালক দেখিয়া থাকিতে পারে, পালঙ্ক অনেকেই দেখে নাই। বোর্ডের উপর পালঙ্কের ছবি অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। “আটাল, বালি ও গলি মাটির মধ্যে কোন্ কসলের পক্ষে কোনটী উপযোগী ইত্যাদি—তিন বকমের মাটি পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। পাঠের সময় বালকদিগকে ঐ সকল দেখাইতে হইবে। (গ) নম্নেহ=নীচগামী ভালবাসা ; দৃষ্টান্ত—যেমন ছেলে মেয়ের প্রতি বাপ মায়ের ভালবাসা। ভক্তি=উচ্চগামী ভালবাসা ; যেমন পিতামাতার প্রতি পুত্রকন্যার ভালবাসা। প্রণয়=সমানে সমানে ভালবাসা ; যেমন বন্ধুতে বন্ধুতে ভালবাসা। (ঘ) যে সকল দ্রব্য বা বিষয় সম্বন্ধে বালকগণের পূর্বজ্ঞান আছে সে সকল দ্রব্যাদি-প্রকাশক-শব্দের প্রচলিত প্রতিশব্দ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যথা—“মাতঙ্গ, কৃষ্ণবর্ণ,

প্রণয়" প্রভৃতির পরিবর্তে 'হাতী', 'কালরং' ও 'ভালবাসা' চলিতে পারে। অথবা কেবল বালকের শব্দের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে "কলা, কাজ, কুমাসার" পরিবর্তে কদলী, কার্ঘ্য, কুজ্জাটিকা' শব্দ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এক কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, কঠিন প্রতিশব্দ যেন একদিনে বেশী শিক্ষা দেওয়া না হয়, আর যে সকল শব্দের প্রতিশব্দ বালকগণের ব্যবহারে আসিতে পারে, কেবল তাহাই যেন শিক্ষা দেওয়া হয়। নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে দৈনিক এইরূপ প্রতিশব্দ ২৩টি, উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে ৩৪টি ও মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণীতে ৪১টির অধিক শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। প্রতিশব্দ শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যবহারও শিক্ষা দিতে হইবে। "বানর কলা খাইতেছে, বানর রক্তা বড় ভালবাসে;—শীতকালে কুমাসা হয়, কুজ্জাটিকায় আঁধার হয়"—ইত্যাদি রূপ বাক্য রচনা করিয়া বালকগণ শব্দ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যবহার শিক্ষা করিবে। শিক্ষক প্রথমে দুই একটি বাক্য রচনা করিয়া আদর্শ দেখাইয়া দিবেন। মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণীতে প্রতিশব্দ শিক্ষা দিবার সময় মধ্যে মধ্যে অসমরকোষ প্রভৃতি হইতে এক আধটা শ্লোক বা শ্লোকাংশ বলিয়া দিলে বালকেরা আগ্রহের সহিত মনে করিয়া রাখিবে। এইরূপ প্রয়োজনীয় কতকগুলি শব্দের (যথা—চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যাৎ, জল, বায়ু ইত্যাদি) প্রতিশব্দ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বটে। উত্তম গদ্য রচনায় ও পদ্য রচনায় এ সকলের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। (৩) "বায়ু অতি স্বচ্ছ পদার্থ"—এখানে স্বচ্ছ কথার প্রতিশব্দ বলিয়া দিলে বালক কিছুই বুঝিতে পারিবে না। "প্রকৃতিবাদ"—অভিধানে স্বচ্ছ কথার এই সকল অর্থ লিখিত আছে—"নির্মল, শুভ্র, পরিষ্কার" কিন্তু এই সকল প্রতিশব্দের কোন কথার দ্বারাই গ্রন্থকারের ভাব পরিস্ফুট হইবে না। "যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায়" বলিলেও বালক উত্তমরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না। জানালার ভিতর দিয়া দেখা যায়, ছিদ্রের ভিতর দিয়া দেখা যায়, তবে কি জানালা ও ছিদ্র 'স্বচ্ছ' ? এই সকল শব্দ শিক্ষায় শিক্ষকের নিজের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এখানে পরীক্ষণের সাহায্যে বালকের মনে স্বচ্ছের ভাব অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। একটু জলের ভিতর একটা পয়সা ফেলিয়া দেখাও, পয়সা দেখা যাইতেছে, কিন্তু ছধের বাটীর ভিতর পুয়াসা ফেলিলে দেখা গেল না। জল স্বচ্ছ। একখানা কাচের অপর পার্শ্বে একটা কলম রাখিয়া দেখাও যে বেশ কলম দেখা যাইতেছে, কিন্তু সোঁটের অপর পার্শ্বে রাখিলে দেখা গেল না। কাচ স্বচ্ছ। কাচ অপরিষ্কৃত হইলে কি জল ঘোলা হইলে তেমন স্বচ্ছ থাকে না। ধোঁয়া কি কুমাসা যুক্ত হইলে বায়ুও তেমন স্বচ্ছ থাকে না। খুব কুমাসা হইলে অল্প দূরের লোকও দেখিতে

পাওয়া যায় না । পরিষ্কার বায়ু স্বচ্ছ বলিয়া আমরা অনেক দূরের পদার্থও দেখিতে পাই । ভাববাচক ও গুণবাচক শব্দগুলি, সেই গুণ বা ভাবযুক্ত বস্তুর সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে । “কৃষ্ণবর্ণ” শব্দের অর্থ, বর্ণের অভাব বলিলে বালকের কালবর্ণের বোধ হইবে না । কাল বস্তু দেখাইয়া ‘কাল’ বুঝাইবে ।

(৩) উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণীতে সন্ধি, সমাসযুক্ত শব্দগুলির বিভাগ করিয়া অর্থ শিক্ষা দিতে হইবে । অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলিয়া দিলে শব্দ বুঝিতে বালকগণের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে । বালকগণের মোটামুটি রকমের তদ্বিত কৃতের জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় । অনেক স্থলে কেবল মৌখিক আলোচনায় বালকগণকে এগুলি বেশ শিখিতে দেখা যায় । যেকোন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহার কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—

পুত্র = পুং নরকবিশেষ, ত্রৈ ভ্রাণ করা—যে শ্রাদ্ধাদির দ্বারা পুং নামক নরক হইতে পিতাকে ভ্রাণ করে, সেই পুত্র—(পুন্নামো নরকাং যস্মাৎ ভ্রায়তে পিতরং সূতঃ)

শ্মশান = ‘শ্ম’ শব্দ, ‘শান’ শয়নস্থান । শব্দ অর্থাৎ মৃত দেহের শয়নের স্থান । (শ্ম শব্দের শব্দ প্রোক্তঃ শানং শয়নমুচ্যতে)

ভুক্তি = ‘ভূ’ অভাব, ‘ভিক্ষা’ ভিক্ষার পদার্থ ।—যে সময়ে ভিক্ষার পর্যাপ্ত অভাব অর্থাৎ পাওয়া যায় না । (ভিক্ষায়াঃ প্রায়ো ভূত্বাপ্যভূৎ)

(৪) নূতন শব্দগুলি শিক্ষা দিবার সময় বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া কর্তব্য পরে পুনরালোচনার সময়, সেই শব্দগুলির প্রতিশব্দ বা ব্যাখ্যাভাগ পুঁছিয়া ফেলিয়া, কেবল শব্দ কয়েকটি রাখিতে হইবে । পরে একটা একটা শব্দ (দর্শনীর বা পয়েন্টার দ্বারা) নির্দেশ করিয়া বালকগণের নিকট সেই সকল শব্দের প্রতিশব্দ বা ব্যাখ্যা আদায় করিতে হইবে ।

(৫) অর্থ পুস্তকের কোন আবশ্যকতা নাই । শিক্ষক মুখে মুখে শিখাইয়া দিলেই বালকগণের বেশ মনে থাকিবে । পুরাতন পাঠ মধ্যে মধ্যে পুনরালোচনা করিলে, বালকগণ শব্দার্থ আর কখনই ভুলিবে না । কেবল নূতন নূতন কথারই প্রতিশব্দ বা ব্যাখ্যা শিক্ষা

দিতে হইবে, সদা ব্যবহৃত বা পূর্ব পরিচিত শব্দের কোনরূপ অর্থাদি শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যহ ৩৪টী নূতন শব্দ শিক্ষা করিতে বালকগণ কোনই ক্লান্তি বোধ করিবে না। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, “যদি বালকগণ সেই ৩৪টী শব্দের অর্থ খাতায় লিখিয়া রাখে তাহা হইলে কেমন হয়?” মন্দ হয় না, কিন্তু নিয় শ্রেণীতে অর্থাৎ নিয় প্রাইমারী হইতে উচ্চ প্রাইমারী পর্য্যন্ত একরূপ খাতা না করিলেও ক্ষতি নাই। এই সমস্ত শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তকাদি কম। স্তূতরাং শিক্ষক যথেষ্ট পুনরালোচনার দ্বারাই বালকগণকে সমস্ত বিষয়ে উত্তমরূপ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন। বালকের কাজ বাড়াইয়া তাহার খেলার সময় কৰ্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত নয়।

ব্যাখ্যা।—বালকগণ পাঠ্যপুস্তক লিখিত প্রবন্ধ বা আখ্যায়িকার কোন কঠিন অংশের ভাব বুঝিতে না পারিলে ব্যাখ্যার আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু যে সকল প্রবন্ধে এইরূপ কঠিন (বালকের পক্ষে) অংশের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়, সে প্রবন্ধ, সে শ্রেণীর বা সে বালকের পক্ষে উপযোগী নহে। প্রতি পৃষ্ঠায় একটী কি দুইটী কঠিন অংশ, বিশেষ দোষজনক নহে। কিন্তু ইহার অধিক হইলে বালকগণ পাঠের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইবে।

(১) বিশেষ কঠিন ভাবযুক্ত কোন প্রবন্ধ পড়াইবার পূর্বে সরল ভাষায় সেই প্রবন্ধের ভাব বালকগণকে বলিয়া দিলে, তাহারা প্রবন্ধ পাঠে তত কষ্টবোধ করিবে না। কোন আখ্যায়িকার অংশ বিশেষ (যেমন অনেক গ্রন্থে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত হইয়া থাকে) পড়াইতে হইলে তাহার পূর্বভাগ বালকগণকে পাঠের পূর্বে বলিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে বালকগণ সহজে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু পূর্ণ আখ্যায়িকার অভ্যাস পূর্বে দিলে গল্পের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া, কেহ কেহ গল্পের

আভাস পূর্বে বলা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। আখ্যায়িকার কাঠিষ্ঠ, বালকগণের বুদ্ধিবৃত্তি ও শিক্ষকের শিক্ষাকৌশলের উপর এ সমস্তই নির্ভর করে। শিক্ষক এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, পূর্ণ গল্পের আভাস পূর্বে দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। এবিষয়ে কোনরূপ বাঁধাবান্ধি নিয়ম নাই।

(২) বালকগণ গল্পের ভাবের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে কি না তাহা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বা পাঠের শেষে ধারাবাহিক প্রশ্নের দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। নিম্নশ্রেণীর পাঠ্য হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিলেই শিক্ষক এরূপ প্রশ্নাদির প্রণালী বুঝিতে পারিবেন :—

“রাজা দশরথের চার পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম রাম ইত্যাদি”—প্রশ্ন, কাহার চার পুত্র ছিল? রাজা দশরথের কয় পুত্র ছিল? জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কি? রাজা দশরথের বড় ছেলের নাম কি? ইত্যাদি।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বালকগণ পাঠের বিষয় বুঝিয়াছে। বালকগণের নিকট উত্তরগুলি পূর্ণ বাক্যে আদায় করিতে হইবে। নিম্নশ্রেণীতে ইহাই যথেষ্ট ব্যাখ্যা।

(৩) উচ্চ শ্রেণীতে (উঃ প্রাঃ হইতে) বালকেরা গল্পের বা প্রবন্ধের সারাংশ নিজ ভাষায় রচনা করিয়া মৌখিক বা লিখিত উত্তর দিবে। সম্পূর্ণ গল্প বা প্রবন্ধ বৃহৎ হইলে শিক্ষক তাহার অংশবিশেষ লিখিতে বা বলিতে আদেশ করিতে পারেন। বালকেরা বলিতে বা লিখিতে না পারিলে, তাহাদিগের স্মরণ শক্তির সাহায্যার্থ, বোর্ডে স্মৃতিপত্রানুযায়ী বিষয়ের অংশসমূহ লিখিয়া দিবে। সেই স্মৃতিপত্র অনুসরণ করিয়া বালকেরা গল্প বা প্রবন্ধ রচনা করিবে। প্রবন্ধের অন্তর্গত উত্তম উত্তম শব্দ বা বাক্যাংশ বোর্ডে লিখিয়া, সেগুলি বালকগণকে নিজ রচনায় ব্যবহার করিতে আদেশ করিলে, নূতন শব্দ শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে।

(৪) কোন প্রবন্ধাদিতে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা কোন প্রসিদ্ধ গল্প বা আখ্যায়িকার বিবরণ ঘটিত কোন বিষয়ের উল্লেখ থাকিলে, শিক্ষক সেই বিষয়টী সংক্ষেপে ছাত্রগণকে বলিয়া দিবেন ও বালকগণ যাহাতে স্বীয় রচনাতে ঐ বিবরণ বিবৃত করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন ।

(৫) কোন অংশ বালকগণের পক্ষে কঠিন ভাববিশিষ্ট হইলে, শিক্ষক, তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবেন বা উত্তম কৌশল-সম্পন্ন প্রশ্নের দ্বারা বালকগণের দ্বারাই সেই ভাব উদ্ধার করাইয়া লইবেন । যথা :—

“জীবন মরণের সমষ্টি মাত্র,”—এই অংশের ভাব বুঝাইয়া দিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রকার প্রশ্নের দ্বারা বালকগণকে ভাব-উপলব্ধি বিষয়ে সাহায্য করা যাইতে পারে :—

প্রঃ । মানুষের আয়ু কত দিন ? উঃ । ৬০।৬৫ বৎসর ।

প্রঃ । এ ৬০।৬৫ বৎসর পরে কি হয় ? উঃ । মানুষের আয়ু শেষ হইয়া যায় ।

প্রঃ । আয়ু শেষ হইলে কি হয় ? উঃ । মানুষ মরিয়া যায় ।

প্রঃ । তোমার বয়স কত ? উঃ । ১৪ বৎসর ।

প্রঃ । মনে কর তোমার যদি ৬৪ বৎসর পর্য্যন্ত আয়ু থাকে, তবে তোমার আর কতদিন আয়ু আছে ? উঃ । ৫০ বৎসর ।

প্রঃ । তাহলে তোমার আয়ুর ১৪ বৎসর শেষ হইয়াছে । আয়ু শেষ হওয়ার নামই যদি মৃত্যু হয়, তবে তোমার সম্পূর্ণ মৃত্যু না হউক ১৪ বৎসরের মত মৃত্যু হইয়াছে । আগামী বৎসর আর এক বৎসরের মৃত্যু হইবে বা আয়ু শেষ হইবে । এইরূপ এক এক বৎসরের আয়ু শেষ হইতে হইতে, একে একে সমস্ত আয়ুই কুরাইয়া যাইবে । তাহলেই এই একটু একটু মৃত্যু সমষ্টিকেই আমরা জীবন বলিয়া থাকি ইত্যাদি । (ছাত্রদিগের বয়স ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইতে পারে বা আরও পরিষ্কার বুঝান আবশ্যক হইতে পারে ।)

(৬) পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্রের অন্তর্গত উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যা লিখিতে হয় । এইরূপ লিখিত ব্যাখ্যা দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে ।

গ্রন্থকারের উহ্য ভাব পরিস্ফুট করাই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য। শব্দ পরিবর্তনের নাম ব্যাখ্যা নহে। এমন কি অনেক সময় ব্যাখ্যায় শব্দ পরিবর্তনেরও আবশ্যকতা হয় না। শব্দ পরিবর্তন করিয়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক সময় বালকেরা লেখকের সুনির্বাচিত শব্দের পরিবর্তে কতকগুলি বিকল্পী শব্দ ব্যবহার করিয়া একটা কদর্য ভাষার সৃষ্টি করিয়া বসে। ইহাতে ব্যাখ্যা না হইয়া বরং ব্যভিচার হয়।

“প্রকাশ্য শত্রু অপেক্ষা ছদ্মবেশী বন্ধু অধিকতর ভয়ঙ্কর।” এই অংশের ব্যাখ্যা লিখিত হইলে, ছদ্মবেশী বন্ধু যে কেন অধিকতর ভয়ঙ্কর তাহাই বুঝাইয়া দিতে হইবে। ‘প্রকাশ্য’ ‘শত্রু,’ ‘ছদ্মবেশী’ ‘বন্ধু’ প্রভৃতি কথা পরিবর্তন না কবিলেও চলিতে পারে। যথা—
“প্রকাশ্য শত্রু প্রকাশ্য ভাবে আক্রমণ করে, সুতরাং পূর্বে হইতেই তাহার হস্ত হইতে নিজকে রক্ষা করিবার উপায় নির্ধারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি বন্ধুর ভাণ করিয়া প্রথমে বিশ্বাসী হয় ও পরে গোপনে শত্রুতা সাধন করে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার কোনই উপায় নাই। এই জন্য ছদ্মবেশী বন্ধু অধিকতর বিপদজনক।”

পরীক্ষার কাগজে সাধারণতঃ এই পরিমাণ ব্যাখ্যা লিখিলেই চলিতে পারে। কোন কোন পরীক্ষক বলেন যে, তাঁহারা মুদ্রিত এক লাইনের ব্যাখ্যায়, পরীক্ষা-কাগজ-লিখিত ৫ লাইনের অধিক লম্বা ব্যাখ্যা পছন্দ করেন না। তবে যে অংশের ব্যাখ্যা করিতে হইবে তাহাতে ভাবের সংক্ষেপত্ব অধিক হইলে, কোন লাইনের ব্যাখ্যায় ৭৮ লাইনও লেখা যাইতে পারে। ফল কথা খুব লম্বা ব্যাখ্যা পরীক্ষা কাগজে বর্জনীয়।

আর একটী দৃষ্টান্ত,—কোন পরীক্ষক চারুপাঠ ৩য় ভাগ হইতে নিম্ন লিখিত অংশের ব্যাখ্যা করিতে দিয়াছিলেন :—

“যেমন সুধাময় পূর্ণচন্দ্রের মনোহর জ্যোতিঃ সুবিস্তৃত সিঁদুসলিলে ও তদীয় তটে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পরম বসনীয় শোভা প্রকাশ করে, সেইরূপ আগাদিগের ককণাময় পরম পিতার মহিমা চন্দ্রগার অনুপম অমৃতরস এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্বস্থানে পরিলিপ্ত হইয়া তাঁহার অত্যাশ্চর্য অনির্বচনীয় কীর্তি অহর্নিশ প্রকাশ করিতেছে।” (নম্বর ১০)

নিম্নের তিনটি ব্যাখ্যা নর্মাল স্কুলের ছাত্রগণের পরীক্ষা কাগজ হইতে গৃহীত হইল :—

(১) “যেমন অমৃতপূর্ণ পূর্ণিমার চন্দ্ৰের মনোরম কিরণভাল বিস্তীর্ণ সমুদ্রজলে ও সমুদ্রতীরে পতিত হইয়া উত্তম শোভার বিকাশ করে, তদ্রূপ আগাদিগের দয়ার মাগর ভগবানের সৃষ্টিকৌশলের অতুলনীয় স্বধারম এই অনন্ত বিশ্বের সকল স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া সর্বদা তাঁহার বিশেষকর ও বাক্যাতীত মহত্ত্ব প্রচার করিতেছে।”

ইহাকে ব্যাখ্যা বলে না, ইহা শব্দ পরিবর্তন মাত্র। তবে পরীক্ষার্থী শব্দ পরিবর্তনে একটা বিস্তীর্ণ ভাষার সৃষ্টি করে নাই বলিয়া দয়ালু পরীক্ষক ১০ এর মধ্যে ৩ নম্বর দিয়াছেন।

(২) “পূর্ণচন্দ্র যেমন সর্বদা সমভাবে জ্যোতি বিস্তার করিয়া থাকে, কবণাময় স্বধর তদ্রূপ বিশ্বরাজ্যের ভড় অজড় নির্বিশেষে সমস্ত পদার্থে সমান কবণা বিস্তার করিয়া থাকেন। পূর্ণচন্দ্রের কবণ যেমন সকলেব মনের বিষমতা দূর করিয়া প্রফুল্লতা প্রদান করিয়া থাকে, ভগবানের করুণা সেইরূপ সকল পদার্থের মৃত্যাব দূর করিয়া অমৃতভাব প্রদান করিয়া থাকে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিয়তই ভগবানের কবণার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।”

পূর্বাপেক্ষা এ ব্যাখ্যা কতক ভাল। পরীক্ষার্থী উপমান ও উপমেয় গুলিকে পৃথক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থকারের বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহারের সার্থকতা বুঝাইতে পারে নাই। ইহার মূল্য ১০ এর মধ্যে ৫।

(৩) “চন্দ্রকিরণ যেমন সমুদ্রের সর্বাংশে সমভাবে পতিত হইয়া থাকে, ভগবানের করুণা তদ্রূপ বিশ্বজগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে প্রতিনিয়ত সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। চন্দ্রকিরণে যেমন প্রাণিগণ উৎফুল্ল, ভগবানের মহিমায়, সেইরূপ বিশ্বরাজ্য সঞ্জীবিত।”

এখানে সমুদ্র ও সমুদ্রতটের উল্লেখ করিবার সার্থকতা এই যে, কেবল তদ্রূপ স্থানেই চন্দ্রকিরণ সর্বত্র সমান ভাবে পতিত হয়। নগর, বন, পর্বত প্রভৃতি স্থানে চন্দ্রকিরণ পতিত হইলেও, নগরের গৃহাদির মধ্যে, বনের বৃক্ষরাশির অন্তরালে ও পর্বতের গুহাভ্যন্তরে তাহা প্রবেশ করিতে পারে না। ভগবানের করুণায় কেহই বঞ্চিত

হই না বলিয়া, তাঁহার করুণাব সহিত সমুদ্রপৃষ্ঠ-পতিত চন্দ্রালোকের তুলনা সম্ভব হইয়াছে ।

চন্দ্র হইতে সুখদায়িনী সুখা নামক একপ্রকার অমৃত রসের ক্ষরণ হইতেছে (কবিকল্পনা) । এই জন্মই চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত প্রকৃতি অতি মনোহর । তবে গগনে আরও কোটি কোটি চন্দ্রতারকা আছে, আমাদের চন্দ্রের সুখার সহিত সেই সমস্ত চন্দ্রতারকার সুখাব উপমা চলিতে পারে । কিন্তু ভগবানের কবণা হইতে যে মঞ্জীবনী অমৃতরস (অর্থাৎ ভগবানের কৃপা) ক্ষরিত হইতেছে, তাহার আর উপমাভবন নাই । এই জন্মই বলা হইয়াছে ‘অনুপম অমৃতরস ।’

কীর্ত্তি—কার্য্যে প্রকাশিত হয় । কিরণজালে জড়িত হইয়া প্রকৃতি যখন নব শোভা ধারণ কবে, কেবল তখনই চন্দ্রের কীর্ত্তি প্রকাশিত হয় । কবিগণ চন্দ্রের এই অস্থায়ী কীর্ত্তি কলাপ বর্ণনা করিয়া থাকেন । কিন্তু ভগবানের চিরস্থায়ী কবণার কীর্ত্তি মানুষেব বর্ণনাতীত । চন্দ্র কেবল বজনীযোগেই কিরণ বিতরণ করে, কিন্তু কবণাময়ের কবণা অহর্নিশ বিতরিত হইতেছে ।

এইরূপ ব্যাখ্যা ৯ নম্বরের উপযুক্ত । নগর, বন, পর্ব্বত থাকিতে, সমুদ্র ও সমুদ্রতটের উল্লেখ করা হইয়াছে কেন, অমৃতরস অনুপম কেন, অহর্নিশ শব্দের স্বার্থকতা কি, উপমের উপমানের সহিত সম্বন্ধ কি—এই সমস্ত ইহাতে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কেবল ‘অখিল ব্রহ্মাণ্ড’ শব্দের স্বার্থকতা দেখান হয় নাই বলিয়া ১ নম্বর কম ।

[পদচ্ছেদ পদার্থোক্তি বিগ্রহ বাক্যযোজনাঃ ।

আক্ষেপস্ত সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

পদচ্ছেদ অর্থাৎ বাক্যের অন্বয়, পদার্থোক্তি অর্থাৎ পদের দ্বারা ব্যক্ত বিশেষ অর্থ, বিগ্রহ অর্থাৎ যুক্ত শব্দাদি বিচ্ছেদ করিয়া অর্থ বিচ্ছাদন, বাক্যযোজনা অর্থাৎ সমস্ত বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত ভাবার্থ, আক্ষেপের সমাধান অর্থাৎ উক্ত বাক্যের বিবন্ধে সম্ভাবিত আপত্তি থাকিলে তাহার নিরসন—ব্যাখ্যার এই পঞ্চ লক্ষণ ।]

সময় সময় পাঠ্যপুস্তকান্তর্গত কোন কোন অংশ বালকদিগের নিকট ব্যাখ্যা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে । যথা—“ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ” বা “আমরা যাহা করি ও ভাবি ঈশ্বর তাহা জানিতে পারেন ।” এইরূপ

অংশ, বস্তু বা সাধারণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইবার উপায় নাই। এখানে বালকদিগের মনে একটা অন্ধবিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ‘লজ্জাবতী-লতা’ হইতে “সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে, মেঘে ঢাকা” ইত্যাদিরূপ অংশের ভাবও ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীর ১২।১৪ বৎসরের বালকের সহজ বোধগম্য নহে। এখন উপর উপর ভাব গ্রহণ করিয়া যাউক, যয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত ভাবের মধ্যে আপনা হইতে নিগূঢ় ভাব প্রবেশ করিতে পারিবে। বালকদিগকে যতদূর সম্ভব বুঝাইয়া দিতে হইবে, আর যাহা তাহাবা বুঝিতে অক্ষম, তাহা জানিবার জন্য তাহা-দিগের বাগ্মতা বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে।

সাহিত্যে ব্যাকরণ।—ছোটাবিটি ব্যাকরণের কথা মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করা মন্দ নহে। যে সকল শ্রেণীতে ব্যাকরণ পড়ান হয় না, সে সকল শ্রেণীতে (যথা নিঃ প্রাঃ শ্রেণী) বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, কর্তা, কৰ্ম্ম, ক্রিয়া, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। এ সকল বিষয়ের সূত্র শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা নাই, কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয় বোধ করাইয়া দেওয়াই আবশ্যক। নির্দিষ্ট পাঠ্যের তালিকায় ব্যাকরণের কথা উল্লিখিত না থাকিলেও, ব্যাকরণের ঐ সকল সূত্র বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। ব্যাকরণ শিক্ষায় উত্তম ভাষার কতকগুলি প্রধান লক্ষণের পরিচয় হইয়া থাকে। আর ঐ সকল বিষয় দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দেওয়াও কঠিন ব্যাপার নহে। উচ্চ শ্রেণীতে সময় মত সমাস, তৎকৃত, ক্রুৎ প্রভৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

অভিধান।—উচ্চ শ্রেণীর বালকদিগকে অভিধান দেখিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। একটা কঠিন কথা পাইলে যে কোন বালককে সেই শব্দের অর্থ বাহির করিতে আদেশ করিবে। শব্দের বহু অর্থ লেখা থাকে। কোন অর্থ পাঠের সহিত মিলিবে, তাহা বালকেরাই প্রথমে নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিবে। অভিধানে কেমন অকারাদি ক্রমে

কথাগুলি সাজান থাকে, তারপর আকার, ইকার, ও ককারাদি ক্রমে ফলাগুলিই বা কোন্টার পর কোন্টা লিখিত থাকে, তাহা ছুটার দিন বালকগণকে শিক্ষা দিলেই তাহারা বেশ বুঝিতে পারিবে। না পারিলে শিক্ষক বলিয়া দিবেন। এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস করাইলে বালকেরা অভিধান ব্যবহার কবিতো শিখিবে। শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক ছাড়া, বালকগণকে অন্যান্য পুস্তক পড়িতেও উৎসাহিত করিতে হইবে। স্বদেশী বা বিদেশী যে কোন ভাষায়ই হউক অনেক গ্রন্থাদি পাঠ না করিলে, ভাষায় কখনই অধিকার জন্মে না। কেবল বিদ্যালয়ের পাঠ্য পড়িয়া কেহ কখন কোন ভাষায় পাণ্ডিত্যলাভ করিতে পারেন নাই।

সাহিত্য পাঠনার আদর্শ।—সাধারণতঃ সাহিত্য পাঠনায় বিদ্যালয়ে এই কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়া থাকে :—(১) পাঠ (২) শব্দার্থ (৩) ব্যাখ্যা (৪) পাঠ সংশ্লিষ্ট ব্যাকরণাদি। কোন কোন শিক্ষক প্রথমে শব্দার্থ ও ব্যাখ্যাদি শিক্ষা দিয়া পরে পাঠ শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে প্রবন্ধের অর্থ বোধ হইলে পাঠ সহজেই স্মরণ হয়। কেহ কেহ প্রথমেই পাঠ শিক্ষা দেওয়া সুবিধাজনক মনে করেন। যাহা হউক কিরূপে পাঠ শিক্ষা দিতে হইবে, তাহা যখন লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না, তখন আর এ বিষয়ে তর্কযুক্তি প্রদর্শন বৃথা। তবে কেমন করিয়া শব্দার্থ ব্যাখ্যা প্রভৃতির শিক্ষা দিতে হইবে নিয়ে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল।

নিম্ন প্রাথমিকের প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী উপলক্ষ করিয়া এই পাঠনার আদর্শ রচিত হইয়াছে; নিম্ন প্রাথমিকের বালকদিগকে ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা নাই। প্রকৃত ব্যাখ্যা তত সহজ জিনিষ নয়, নিম্ন প্রাথমিকের ছাত্রের আয়ত্তের বাহিরে। যদি শব্দের অর্থ, বাক্যের ভাব এবং সর্বোপরি প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে, তবেই তাহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট।

(নিম্নলিখিত পাঠনার আদর্শ ভূদেব বাবু "শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব" হইতে গৃহীত হইল । ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আদর্শ আর কোথায় পাইবে ?)

শিক্ষক । পড় ।

বালক । "এই ভূমণ্ডলে এবস্থিধ বহুতর মূর্জ জীৱ জন্ত আছে, যে তাহারা মানবজাতির কখন কোন অপকার করে না" (নীতিবোধ) ।

শি । ভূমণ্ডল শব্দের অর্থ কি ? বা । ভূমণ্ডল শব্দের অর্থ পৃথিবী । (বালক না পারিলে শিক্ষক বলিয়া দিবেন ও বোর্ডে লিখিবেন)

শি । এবস্থিধ ? বা । এসম—এই প্রকার (বোর্ডে লিখন)

শি । এবস্থিধের বিপরীত অর্থ বুঝায়, এসম শব্দ কি ?—এবস্থিধ মানে এই প্রকার—তাহার বিপরীত অর্থাৎ এই প্রকার নয়—অন্য প্রকার ?

বা । অন্য প্রকার—অন্যবিধ । (বোর্ডে লিখন)

শি । মানবজাতি বলিলে মনুষ্যেব কোন জাতি বুঝায় ? ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য ?

বা । মানবজাতি বলিলে মানুষেব সকল জাতিকেই বুঝায় ।

শি । তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহাকে কি জাতিভেদ বলে না ? বা । হাঁ, তাহাকেও জাতিভেদ বলে ।

শি । হিন্দু, ইংবাজ, মোগল, পাঠান—ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ ?

বা । তাহাকেও জাতিভেদ বলে ।

শি । তবে যখন সমুদয় মনুষ্যকে এক জাতি বলা যায়, তখন মনুষ্যের সহিত কাহার প্রভেদ করিয়া ঐরূপ কহা যায় ।

বা । তখন অন্য জীব জন্তুর সহিত প্রভেদ করিয়া মনুষ্যকে এক জাতি বলা যায় ।

শি । অন্য জীব জন্তুর সহিত প্রভেদ করিয়া সমুদয় মনুষ্যকে এক জাতি কহে ; মনুষ্যের মধ্যেও পরস্পর প্রভেদ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির নাম হয় ; আর আমরা এক ধর্মাবলম্বী এবং এক ভাষাভাষী, আমাদের মধ্যেও যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভেদ তাহার নামও জাতিভেদ । কিন্তু ইহার আর একটা নাম আছে, জান ?

বা । (নিরন্তর) শি । ইহাকে বর্ণভেদও বলে । আচ্ছা, অপকার শব্দের অর্থ কি ?

বা । অপকার অর্থ অনিষ্ট, মন্দ, হানি । (বোর্ডে লিখন)

শি । অপকারের বিপরীত কি ?

বা । উপকার (বোর্ডে লিখন)

- শি। আচ্ছা, তুমি পড়িলে—“আমাদিগের কখন কোন অপকার করে না, এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব অনেক আছে”—‘কখন’ অপকার করে না কি ?
- বা। কখন অপকার করে না—অর্থাৎ কোন সময়ে একটুও হানি করে না।
- শি। তবে কখন কখন অনুপকার করে এমন ক্ষুদ্র জন্তু আছে ? তাহার দুই একটীর নাম বল।
- বা। বিছা—বোলতা—ভিমকল।
- শি। হাঁ, বৃশ্চিক, বরটা, ভূঙ্গ (বোর্ডে লিখন)। ইহারা কোন সময় আমাদিগের অপকার করে ?—ইহারা কখন হানিকর হয় ?
- বা। উহাদের গায়ে হাত দিলেই উহারা কামড়ায়।
- শি। গায়ে হাত দিলে উহারা কামড়ায় কেন, বলিতে পার ?
- বা। উহারা ভয় পায়। উহাদের লাগে।
- শি। ভয় পায় অথবা ক্রোধ হয় এই উভয়ই উহারা দংশন করে ; আর উহাদিগকে ভয় বা ব্যথা না দিলে উহারা দংশন করে না। তবে গোবিন্দ, তোমার নিকট সে দিন যে বোলতাটি আনিয়াছিল তাহাকে কি জন্তু মারিতে উদ্যত হইয়াছিলে ?
- বা। পাছে আমাকে কামড়ায় এই উদ্বেগে মারিতে গিয়াছিলাম।
- শি। অতএব যে সকল জন্তু কখন কখন আমাদিগের অনুপকার করিতে পারে, আমরা অগ্রেই তাহাদিগকে মারিতে বা স্থানান্তর করিতে উদ্যত হই। আচ্ছা,—কখন কোন অপকার করে না—‘কোন অপকার’ কি ?
- বা। একটুও অপকার করে না।
- শি। অর্থাৎ অল্প মাত্রায়ও অপকার করে না। তা হ’লে অল্প অল্প অপকার করে এমন ক্ষুদ্র জন্তু আছে ? কয়েকটির নাম কর ত ?
- বা। মশা, মাছি, উকুন।
- শি। হাঁ, মশক, মক্ষিকা, মৎকুণ (বোর্ডে লিখন) ইহারা মানুষকে উদ্ভাপিত করে—এই জন্তুই মনুষ্যেরা উহাদিগকে নষ্ট করে। আচ্ছা, কখন কখন অপকার করে এমন ক্ষুদ্র বস্তুর নাম করিয়াছ, আর অল্প মাত্রায় অনিষ্ট করে এমন কতকগুলির নাম করিলে, এখন কোন অপকার করে না এমনই দুই একটি ক্ষুদ্র জন্তুর নাম কর ত ?
- বা। এমন অনেক আছে, নাম জানি না।
- শি। প্রাণী-বিদ্যা বলিয়া একটি শাস্ত্র আছে, তাহা পাঠ করিলে নানাক্রম জীব জন্তুর আকার, প্রকার, নাম, ব্যবহার জানিতে পারিবে। আমাদিগের সর্বতোভাবে অনপকারী এমন দুই একটির নাম তোমাদিগের জানা আছে—এইক্ষণে পূরণ

হইতেছে না—একটীর নাম প্রজাপতি—প্রজাপতি কখন আমাদেব কোন অপকার করে না—আর উহার কি মনোহর দৃশ্য—কি কোমল শরীর । যাহারা উহাদের পক্ষচ্ছেদ করিয়া ভূদর্শা করে তাহারা কি নিষ্ঠুর ।

বা । গঙ্গাফড়িঙ্ক কখন কাহারও মন্দ কবে না ।

শি । প্রজাপতি ও গঙ্গাফড়িঙ্ক—দুইটি হইল ।

বা । আশুলা ।

শি । (একটি বালক আশুলায় গরল হয় বলিলে, ঈষৎ হাস্য সহকারে) তবে তিনটি হইল না ।

বা । টিকটিকি ।

শি । এই তিনটি হইল ।—এইরূপ সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ আছে । ভাস, জিজ্ঞাসা করি, যে সকল ক্ষুদ্র প্রাণী কখন কখন মানুষের অপকারী হয়, মানুষেরা ভয়প্রযুক্ত তাহাদিগকে বিনাশ করে ; আর যাহারা সর্বদা অন্ন অন্ন বিরক্ত করে, মতা করিতে না পারিয়া তাহাদিগকেও আমরা মারিয়া ফেলি ; কিন্তু প্রজাপতি প্রভৃতি যেগুলি কোন অনিষ্ট করে না বালকেরা উহাদিগকে কেন যত্ননা দেয় আর বিনাশ করে ? এই নিষ্ঠুরতা বালকদিগের কিসের দোষ ?

বা । উহা তাহাদিগের স্বভাবের দোষ ।

শি । ঠিক বলেছ ; ইহার পর আর কি আছে পড় ।

বা । “কিন্তু কোন কোন লোক স্বভাবতঃ এমন নিষ্ঠুর যে, দেখিবামাত্র ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র জীবকে নানা প্রকারে ক্লেশ দেয় এবং উহাদিগের প্রাণ বধ করে ।”

শি । এই স্থানে ‘স্বভাবতঃ’ এমন নিষ্ঠুর, কেন বলিয়াছে বুঝিতে পারিলে ? ইত্যাদি ।

“এমন করিয়া পড়াইতে গেলে এক পাঠেই সমুদায় দিন শেষ হয়, আর এক বৎসরেও একখানি বহি সমাপ্ত হয় না”—যদি কেহ এমনত আপত্তি করেন, তাহার উত্তর এই যে, এক্ষণ একটি পাঠ পড়াইলে একশত-পাঠের কার্য্যকারী হয় এবং নীচ্র অপঠিত অংশ বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে । এই প্রণালী মতে পুস্তকের প্রথম দুই তিনটি প্রবন্ধ পড়াইতে যদি ৪ মাস সময় লাগে, তবে পুস্তকের অবশিষ্ট নয় দশটি (মনে কর) প্রবন্ধ পড়াইতে এক মাস সময় লাগিবে । কাজেই সময়ের অভাব হইবার আশঙ্কা নাই ! অপরন্তু পড়ার মত পড়া হইবে ।

২ । ব্যাকরণ ।

আবশ্যিকতা ।—ভাষা শিক্ষার পক্ষে ব্যাকরণ বিশেষ আবশ্যিক নহে । ব্যাকরণ না পড়িয়াও অনেক লোকে শুদ্ধ ভাষায় বা সামান্য ভুল ভাষায় কথাবার্তা কহিয়া থাকে । অনেক লোক ব্যাকরণ না পড়িয়া উত্তম ভাষায় প্রবন্ধাদিও রচনা করিতে পারেন । তবে ব্যাকরণ শিক্ষা কোন কোন কারণে অত্যন্ত আবশ্যিক বটে । ব্যাকরণ শিক্ষা করিলে বলিতে বা লিখিতে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না, নূতন নূতন শব্দ গঠনের শক্তি জন্মে এবং রচনা করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ।

শিক্ষাদানের কথা ।—ছোট ছোট বালকগণকে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া একটু শক্ত কাজ, সন্দেহ নাই । কিন্তু শিক্ষক তেমন বিচক্ষণ ও ধৈর্য্যশীল হইলে কার্য্য তত কঠিন বলিয়া বোধ হইবে না । তবে খুব নীচের শ্রেণীতে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে । নিম্ন-প্রাথমিকের উচ্চ শ্রেণীতে ব্যাকরণের শিক্ষা আরম্ভ করা যাইতে পারে ।

স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জন বর্ণ, কণ্ঠ্যবর্ণ, তালব্য বর্ণ—প্রভৃতি ব্যাকরণসম্মত প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই, কি প্রথমে পদের সূত্রাদিও শিক্ষা দিবার আবশ্যিকতা নাই । কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা পদপরিচয় করানই প্রথমে আবশ্যিক । সর্ব প্রথমে ‘বিশেষ্য পদ’ দৃষ্টান্ত দ্বারা কেবল বস্তু, ব্যক্তি ও জাতিবাচক বিশেষ্যই শিক্ষা দিতে হইবে ।

বিশেষ্য ও ক্রিয়া ।—গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যাদি নিঃ প্রাঃ শ্রেণীতে শিক্ষা না দিলেও চলিতে পারে । অতি সহজেই বালকদিগের বস্তুবাচক বিশেষ্যের পরিচয় হইয়া যাইবে । বালকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে যে ‘বস্তু’ বিশেষ্য নহে,—বস্তুর ‘নাম’ বিশেষ্য । বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত দিতে হইবে । বিশেষ্য বোধ হইলেই সামান্য সামান্য

ক্রিয়াপদ শিক্ষা দিতে হইবে। ‘বালক পড়িতেছে’—বালক কি করিতেছে? ‘পড়িতেছে’। এখানে ‘পড়িতেছে’কে ক্রিয়াপদ বদে। ‘যত্ন লিখিতেছে’—যত্ন কি করিতেছে? ‘লিখিতেছে’। এখানে ‘লিখিতেছে’ ক্রিয়াপদ। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া ২৪ দিন বিশেষ্য ও তাহার ক্রিয়াপদ শিক্ষা দিতে হইবে। তারপর ছই শব্দ যুক্ত (ভু কু যোগে) ক্রিয়াপদের শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। যথা—বকু গান করিতেছে; ‘বকু কি করিতেছে?’ ‘গান করিতেছে’ এখানে ‘গান করিতেছে’ ক্রিয়াপদ। এইরূপ ব্রাহ্মণ জ্ঞান করিতেছে, মিজি রং করিতেছে, ফজী বাতাস করিতেছে, দর্জি সেলাই করিতেছে, টুন্স খেলা করিতেছে, থোকা প্রেসাব করিয়াছে, বাথ হালুম হালুম করিতেছে, বানর কিচির মিচির করিতেছে, গরু হাষা হাষা করিতেছে ইত্যাদি। ‘কে করিতেছে?’ ‘ব্রাহ্মণ, মিজি, ফজী, দর্জি করিতেছে’ এখানে ব্রাহ্মণ, মিজি, ফজী, দর্জি, কর্তা—যে করে তাহাকে কর্তা বলে। এইরূপে কর্তা কথাটা শিখান যাইতে পারে। এ সমস্ত অবশ্য এক দিনে শিখাইতে বলিতেছি না। কেবল পদ্ধতি নির্দেশ করিয়া যাইতেছি। বালকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণাশক্তির পরিমাণ বুঝিয়া যতদিন আবশ্যক, ততদিনে শিক্ষা দিতে হইবে। নিম্ন শ্রেণীতে (নিঃ প্রাঃ প্রভৃতি) প্রতিদিন একসঙ্গে ১০ মিনিটের অধিক কাল ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া কখনই কর্তব্য নহে। উক্তরূপে—রাগা হইয়াছে, খাওয়া হইয়াছে, বিছানা হইয়াছে, ইত্যাদি ভূ ধাতুর ক্রিয়াপদ শিক্ষা দিতে হইবে। বাঙ্গালায় ভু, কু নিম্নায় ক্রিয়াপদই অধিক, সুতরাং বালকগণের ক্রিয়াপদের পরিচয় পাইতে বিশেষ কষ্ট বা বিলম্ব হইবে না। এই সমস্ত ক্রিয়ার কেবল মৌখিক আলোচনা করিলে হইবে না। বোর্ডে লিখিয়া দিয়া, বালকগণের দ্বারা ক্রিয়াপদগুলি চিহ্নিত করাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু এক কথা মনে রাখা উচিত যে, কখনই কঠিন বা ‘জটিল প্রশ্ন করিয়া বালকগণকে ভীত

বা বিরক্ত করিতে হইবে না—শিক্ষার প্রারম্ভে এই কথা মনে রাখা কর্তব্য ।

ক্রিয়াপদের অন্ত্য্য আকারগুলিও এই সঙ্গে শিক্ষা দিতে পারা যায় । করিয়াছিল, হইয়াছিল, হইবে, করিবে ইত্যাদি ভূ, ক্ত যুক্ত ক্রিয়া দেখিলেই বালকগণ অতি সহজে ক্রিয়াপদ বুঝিয়া লইতে পারিবে । তবে কালের বিষয় এ সময়ে বলিবার আবশ্যকতা নাই ।

কর্ম্যপদ ।—অগ্রে বিশেষণ কি অগ্রে কর্ম্মকারকের পদ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য—এ বিষয়ে মতভেদ আছে । যাহা হউক শিক্ষক নিজের সুবিধা বুঝিয়া অগ্রে যাহা পছন্দ করেন তাহাই শিক্ষা দিবেন । আমি নিজে কর্ম্মপদ শিক্ষা দিয়া যল লাভ করিয়াছি বলিয়া, অগ্রে কর্ম্মপদ শিক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করিতেছি । ‘খোদাই ভাত খাইতেছে’—এখানে বিশেষ্যপদ কয়টি আছে ? ‘খোদাই আর ভাত ।’ কে খাইতেছে ? খোদাই খাইতেছে—তবে কর্ত্তা কে ? ‘খোদাই’ কর্ত্তা । কি খাইতেছে ? ভাত খাইতেছে—ভাত কর্ম্ম । ‘যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্ম,’ এরূপ সূত্রাদি বলিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই । তবে যদি বালকগণ বুঝিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে আপত্তিরও কোন কারণ নাই । কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ দৃষ্টান্ত দিতে হইবে । ‘খোদাই বই পড়িতেছে’—কে পড়িতেছে—কি পড়িতেছে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া কর্ত্তা আর কর্ম্মপদ পরিচয় করান যাইতে পারে । কোন্ ক্রিয়ার কর্ত্তা বা কোন্ ক্রিয়ার কর্ম্ম, আপাততঃ সে সমস্ত বলিবার আবশ্যক নাই । কেবল কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়াপদের পরিচয় হওয়াই আবশ্যক ।

বিশেষণ ।—বিশেষণ শিক্ষার প্রথমে কেবল বিশেষ্যের বিশেষণই শিক্ষা দিতে হইবে । গুণবাচক বিশেষণগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ । দুইটি বালকের নিকট হইতে দুখানি ছোট বড় স্লেট বা পুস্তক বা পেন্সিল লইয়া টেবিলের উপর রাখ । এখন জিজ্ঞাসা কর ‘কপূর কোন্ স্লেট

আর পান্নুর কোন্ স্লেট ?’ হয়ত বালকেরা কেহ এ প্রশ্নের উত্তরে বলিবে “রূপুর নাম লেখা স্লেট কি পান্নুর স্লেটেব এক কোণ ভাঙা ।” কিন্তু শিক্ষক যদি পূর্বে হইতে সাবধান হন, তবে তাঁহার মনোগত উত্তর পাইতে পারেন । স্লেট কি পেন্সিল দুইটী পাশাপাশি রাখিয়া, ২৩ বার অক্ষুর দ্বারা কি অল্প কোন প্রকারে মাপের ভঙ্গি দেখাইলেই বালকেরা বুঝিবে যে শিক্ষক মহাশয় ছোট বড় মাপ করিতেছেন । তখন কাহার কোন্ স্লেট জিজ্ঞাসা করিলেই— “রূপুব বড় স্লেট, পান্নুর ছোট স্লেট”—এইরূপ উত্তর পাইবারই সম্ভাবনা । এইরূপ দুইটী বালককে দাঁড় করাইয়া—“কে লম্বা, কে খাট” জিজ্ঞাসা করিলেই—“শান্তি লম্বা, সাধন খাট” এইরূপ উত্তর পাওয়া যাইবে । “কে কাল, কে ফরসা ; কে শান্ত, কে ছুট্ট” ইত্যাদি—প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে । প্রশ্নের উত্তরগুলি বোর্ডে নিম্নলিখিত প্রকারে লেখা আবশ্যক :-

বড় স্লেট	ছোট স্লেট
লম্বা ছেনে	খাট ছেনে
কাল ছাতা	সাদা ছাতা
লাল কাগজ	সবুজ কাগজ ।

বালকগণ ইহার মধ্যে প্রথমে বিশেষ্য পদগুলি নির্দেশ করিবে । তাৎপর্য যে সকল কথায় দুইটী বিশেষ্যকে পৃথক করিয়া দিতেছে, সে কথোগুলি লক্ষ্য করিবে । এই সমস্ত কথাকে ‘বিশেষণ’ কহে । এইরূপ বহুতর দৃষ্টান্ত দিলেই সহজে গুণবাচক বিশেষণের বোধ হইবে । বালকেরাও যাহাতে এইরূপ কর্তৃক্রিয়াযুক্ত, বিশেষ্য বিশেষণযুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা করিতে পারে এ বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবে । তাহার পর সংখ্যাবাচক বিশেষণ শিক্ষা দিতে হইবে । একটা কলম, দুইখানি পুস্তক, পাঁচটা গরু ইত্যাদি । প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতির ব্যবহারও এইরূপে শিক্ষা দিবে । শ্রেণীতে প্রথম বালক, দ্বিতীয় বালক, তৃতীয় বালক বা স্কুলে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী,

দ্বিতীয় মান, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ ইত্যাদি কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সুতরাং বালকগণের পক্ষে ইহার ব্যবহার শিক্ষা শক্ত হইবে না । তবে যে সকল কথা তাহারা জানে না বা সাধারণতঃ ব্যবহার করে না, যেমন পঞ্চদশ, বিংশ ইত্যাদি, সেরূপ শব্দের ব্যবহার শিক্ষা দিবার আপাততঃ আবশ্যকতা নাই ।

ইহার পর ক্রিয়ার বিশেষণ ও বিশেষণের বিশেষণ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে । “সুরেন তাড়াতাড়ি লিখিতেছে”—সুরেন কেমন করিয়া লিখিতেছে ? হয়ত এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ বলিবে “কলম দিয়া লিখিতেছে” । কিন্তু যদি শিক্ষক ‘তাড়াতাড়ি লিখিতেছে’ এই বাক্যাংশ বলিবার সময়, হাতের দ্বারা—তাড়াতাড়ি লিখিবার ভঙ্গ প্রদর্শন করেন, তবে বালকগণ উত্তরে সম্ভবতঃ ‘তাড়াতাড়ি লিখিতেছে’ এই কথাই বলিবে ।—“ধীরেন্ ধীরে ধীরে লিখিতেছে”—কেমন করিয়া লিখিতেছে ? ধীরে ধীরে লিখিতেছে । “বুলু জোরে দৌড়াইতেছে” ।—কেমন করিয়া দৌড়াইতেছে ? জোরে দৌড়াইতেছে ।—এইরূপ কৃষ্ণ খুব ছুট, কামিনী বেশ সুন্দর, সাগরের মেয়ে মিশামিশে কাল, মিথ্যা বলা অতি অন্তায় কার্য্য, উপেন বাবু বড় ভাল মানুষ, ইত্যাদিরূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশেষণের বিশেষণও শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে । কিন্তু যদি এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে বালকগণ ক্রিয়ার বিশেষণ কি বিশেষণের বিশেষণ উত্তমরূপ ধারণা করিতে পারিতেছে না, তবে এ সকল উচ্চ প্রাইমারীর প্রথম বর্ষে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে ।

সর্ব্বনাম ।—‘আমি, তুমি, সে’ এই তিনটি সর্ব্বনাম ও এই সকল সর্ব্বনামের কর্ম্ম কারক ও সম্বন্ধ পদগুলি বালকদিগকে সহজেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে । শ্রেণীতে যত বালক আছে সকলকেই ‘তুমি বলিয়া ডাকিতে পারি, কিন্তু ‘হরি’ বলিয়া কেবল হরিকেই ডাকিতে পারি ; হরি বলিলে অন্য আর কোন বালকই উত্তর দিবে না । ‘হরি’

এক জনের নাম, কিন্তু ‘তুমি’ সকলেরই নাম। এই জন্য ‘তুমি’ এই কথাকে ‘সর্বনাম’ বলে। এইরূপে ‘আমি, সে’ কথা দুটি বুঝাইয়া দিতে হইবে। তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা করিয়া ক্রমে সর্বনামের কর্ম ও সম্বন্ধ পদ শিক্ষা দিবে। ‘আমি তোমাকে মারিব, সে আমাকে দেখিতেছে ইত্যাদি’ দৃষ্টান্তের দ্বারা (বিশেষ্যের কর্ম পদ শিক্ষা দিবার পদ্ধতিতে) সর্বনামের কর্ম পদ শিখাইতে হইবে। সর্বনামের সম্বন্ধ পদ শিক্ষা দিবার সময়ে প্রথমে বিশেষ্যের সম্বন্ধ পদ বুঝাইতে হইবে। “রামের পুস্তক, খোকাব লাটীম, ছলুর জামা” ইত্যাদি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সম্বন্ধের ভাব বুঝাইতে পারা যায়। এ পুস্তক কার? রামের। এই পুস্তকের সঙ্গে কেবল রামেরই সম্বন্ধ, অন্য কাহারও নহে। এ জামাটা কার? ছলুর। এ জামার সঙ্গে কেবল ছলুরই সম্বন্ধ। ‘সম্বন্ধ’ কথাটির অর্থ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলে বালকেরা সহজে সম্বন্ধ বুঝিবে। তারপর সম্বন্ধ পদের শেষ বর্ণ ‘র’ হইয়া থাকে, এইরূপ একটা মোটামুটি সংকেতও বুঝিতে পারিবে। এখন “আমার, তোমার, তাহার, আমাদিগের, তোমাদিগের, তাহাদিগের” প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। সর্বনামের কর্মকারকে শেষ বর্ণ ‘কে’ ইহা বুঝিলে কর্মকারকের একটা আন্দাজ করিতে পারিবে। এই সমস্ত সর্বনামের পদ নিম্ন গ্রাইমারীর উচ্চ শ্রেণীতেই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

কাল।—ইহার পর ক্রিয়ার তিন কাল শিক্ষা দিলেই, নিম্ন-প্রাথমিকের ব্যাকরণ শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। বোর্ডের উপর নিম্নলিখিত বাক্য ৩টি লিখিয়া দাও :—

দাদা পাঠশালায় পড়িয়াছিল।

আমি পাঠশালায় পড়ি।

খোকা পাঠশালায় পড়িবে।

“আমি এখন পড়ি ; দাদা আগে পড়িত, এখন আর পড় না ; থোকা বড় হইলে পাড়বে—এখন সে পড়িতে পারে না।” এই প্রকারে ক্রিয়াপদগুলির অর্থের বিভিন্নতা বুঝাইতে হইবে। তিন চারিদিন এইরূপ নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে ক্রিয়ার বিভিন্ন অর্থ বুঝাইতে পারিলে, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের একটা জ্ঞান জন্মিবে। প্রথমে বর্তমান, অতীত, কথাগুলি না শিখাইয়া ‘এ কাজটা এখন হইতেছে, এ কাজটা পূর্বে হইয়া গিয়াছে, আর এ কাজট পবে হইবে,’ এইভাবে ‘এখন’ ‘পূর্বে’ ও ‘পবে’ এই সকল কথা দ্বারা ক্রিয়াপদগুলি ভিন্ন করিতে শিক্ষা দিলে ভাল হয়। পবে বেশ অভ্যাস হইয়া গেলে, ‘বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ’ কথা তিনটির অর্থ বুঝাইয়া দিয়া, শিখাইয়া দিলেই চলিবে।

যদি কোন শিক্ষক নিম্নপ্রাথমিক শ্রেণীতে এতদূর শিখাইতে না পারেন, তবে তিনি কিছু বাদ দিতে পারেন। কিন্তু নাম, জাতি ও বস্তুবাচক বিশেষ্য, গুণ ও সংখ্যাবাচক বিশেষণ, সাধারণ ক্রিয়াপদ ও কর্তা কর্ম শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই কর্তব্য—নির্দিষ্ট পাঠ্য তালিকায় বাকরণশিক্ষার কথা থাকুক আর নাই থাকুক। নিম্নপ্রাথমিক শ্রেণীতে যাহা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল, যদি উক্ত শ্রেণীতে তাহার কোন কোন অংশের শিক্ষা না হইয়া থাকে, তবে প্রথমে উচ্চপ্রাথমিকের প্রথম বর্ষে সেই সকলের আলোচনা করিতে হইবে।

কারক ।—তার পর করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ কাবক শিক্ষা দিতে হইবে। “ফটিক ছুরি দিয়া হাত কাটিয়াছে”—কে কাটিয়াছে? ফটিক। ‘ফটিক’ কর্তা—যে করে সেই কর্তা। কি কাটিয়াছে? হাত কাটিয়াছে। ‘হাত’ কর্মকারক—মহাতে কর্ম ঘটে তাহাই কর্মকারক। এখানে হাতের উপরই কাটার কর্মটি হইয়াছে (ঘটিয়াছে)। সূত্রাং হাতই কর্মকারক। ফটিক কি করিয়াছে? কাটিয়াছে। ‘কাটিয়াছে’—ক্রিয়া। যে কথার দ্বারা কিছু করা বুঝায় তাহাই ক্রিয়া—এখানে

‘কাটিয়াছে’ কথায় কাটান কাজ করা বুঝাইতেছে সেইজন্য ‘কাটিয়াছে’ ক্রিয়া । এইরূপে পূর্বের জ্ঞানের পুনরালোচনা করিয়া, তার পর ‘করণ’ বুঝাইতে হইবে । শিক্ষা কেবল আলোচনার উপরই নির্ভর করে ।—‘ছাত্রগণকে ইহা একবার বলিয়া দিয়াছি, আর বলিবার আবশ্যক নাই,’—ইহাই মনে করিয়া যে সকল শিক্ষক নিশ্চিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই কৃতকার্য হইতে পারেন না । পুনরালোচনাই জ্ঞানোপার্জননের প্রকৃষ্ট পন্থা । তার পর, কি দিয়া হাত কাটিয়াছে ?—ছুরি দিয়া । যা দিয়া কোন কাজ করা যায় তাহাকে করণ বা করণকারক বলে ।—এখানে ছুরি করণ কারক । এইরূপ গগণ কলম দিয়া লিখিতেছে, পুঁটি বাঁটি দিয়া তরকারী কুটিতেছে, নশী সিপু দিয়া মাছ ধরিতেছে, ইত্যাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা করণ বুঝাইতে হইবে । ‘দিয়া’ কথার ব্যবহার শিক্ষার পরে, অনুরূপ বাক্য রচনা করিয়া, ‘দ্বারা’ কথার দ্বারাও যে করণ কারক বাক্ত হয় তাহা বুঝাইবে । সম্প্রদান বুঝাইতেও ঠিক এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে । “ইন্দু ভিক্ষুককে পয়সা দিয়াছে”—কে দিয়াছে, কি দিয়াছে প্রভৃতির আলোচনা করিয়া তাহাকে দিয়াছে জিজ্ঞাসা কর । ‘ভিক্ষুককে’ দিয়াছে—যাহাকে কিছু দেওয়া অর্থাৎ দান করা যায়, তাহাকে ‘সম্প্রদান’ বলে । সম্প্রদান কথাটির অর্থও উত্তমরূপে বুঝাইতে হইবে । কথাটির অর্থ বুঝিলে “অধিকা বাবু বরকে কতটা সম্প্রদান করিলেন”—এইরূপ ছই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । দাবী পরিত্যাগ করিয়া দান করাকে সম্প্রদান বলে । ইহার পর অপাদান কারকের শিক্ষা দিতে হইবে । সূত্র মুখস্থ করাইবার প্রয়োজন নাই, কেবল কারকের ব্যবহার শিক্ষা দিবে । “গাছ থেকে আম পড়িল”—কি পড়িল ? আম । ‘আম’ কর্তা ইত্যাদির আলোচনা করিয়া “কোথা থেকে পড়িল” জিজ্ঞাসা কর । “গাছ থেকে” । আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিতে হইবে । “পূর্ণর মা নদী থেকে জল আনিতেছে,

যদি বাজার হইতে মাছ আনিয়াছে” ইত্যাদি নানারূপ দৃষ্টান্তে ‘থেকে ও হইতে’ ব্যবহার করিয়া বুঝাইয়া দাও যে, যে সকল শব্দের সঙ্গে ‘থেকে বা হইতে’ থাকে তাহাদিগকে অপাদান কারক বলে। শেষে অপাদানের অর্থ বুঝাইতে পারিলে ভাল হয়। কেবল অপাদানের নহে, প্রত্যেক দৃষ্টান্তের সমস্ত পদগুলিরই পরিচয় করাইবে। এইরূপে অধিকরণও বুঝাইতে হইবে। “লিলী বিছানায় ঘুমাইতেছে—“কোথায় ঘুমাইতেছে? বিছানায়। “পুকুরে মাছ আছে”—কোথায় মাছ আছে? পুকুরে। “শিক্ষক চেয়ারে বসিয়া আছেন, খাঁচার পাখী আছে” ইত্যাদি নানারূপ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে হইবে যে যাহাতে কোন জিনিস থাকে, তাহাকে ‘অধিকরণ’ কারক বলে। প্রথমে কেবল স্থানবাচক অধিকরণ শিক্ষা দিতে হইবে। পরে কালবাচক। বিষয়, ব্যক্তি, ভাব, দ্বিতীয় বর্ষে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। “ও ভাই এদিকে এস; মতি, তুমি পড়; হরি, আমাকে ভাল কর” ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা সম্বোধন পদ বুঝাইতে হইবে। যে কথায় কাহাকেও সম্বোধন করা অর্থাৎ ডাকা যায় তাহাকে সম্বোধন পদ বলে। শিক্ষক নিজে যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দিবেন, এবং বালকগণের নিকট হইতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত আদায় করিবেন। কেবল সুসঙ্গত দৃষ্টান্তের উপরই ব্যাকরণ শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ইহার পর বচন শিক্ষা দিয়া দুই একটা শব্দের রূপ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বালকদিগের যখন কারকের জ্ঞান হইয়াছে তখন শব্দরূপ শিখিতে বিলম্ব হইবে না। তবে প্রথমা দ্বিতীয়া প্রভৃতি কথা ব্যবহার না করিয়া কর্তা, কর্ম, করণ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিলেই চলিবে। “রাম চামচ দ্বারা দুধ খাইতেছে” এখানে রাম কর্তা, চামচ দ্বারা খাইতেছে—চামচ করণ। দুধ খাইতেছে—দুধ কর্ম। শব্দরূপ শিক্ষার পরে অকর্মক (খুকী হাসিতেছে) সকর্মক (দাদা চাঁদ দেখিতেছে) দ্বিকর্মক (তুমি আমাকে কি কথা বলিলে, মা খোকাকে ভাত খাওয়াইতেছেন, পণ্ডিত

মহাশয় ছাত্রগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন) কথা তিনটি অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিবে । তার পরে ছই তিনটি ধাতুর রূপ শিক্ষা দিবে । ‘আমি করিতেছি’ ‘তুমি করিতেছ’ ‘সে করিতেছে’ ; ‘আমি করিয়াছি,’ ‘সে করিয়াছে’ ‘তুমি করিয়াছ’, ‘আমি করিব’ ‘তুমি করিবে’ ‘সে করিবে’ ইত্যাদি ।

এখন অব্যয় (বাহার বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ, কারকাদি কিছুই নাই যেমন শব্দ তেমনই থাকিয়া যায় অর্থাৎ বাহার ব্যয় নাই) শব্দগুলি শিক্ষা দিলেই উচ্চ প্রাথমিকের প্রথম বর্ষের কার্য্য একরূপ শেষ হইল । কিন্তু যদি সুবিধা হয় তবে পূর্ব্বক বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া প্রভৃতি শিক্ষা দিবার সময় যাহা যাহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে । যথা—গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য । একটা ফুল হাতে করিয়া—“এই ফুলটা বেশ সুন্দর”—এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা কর, এই ফুলের কি গুণ আছে ? বালকেরা নানাবিধ উত্তর দিবে সন্দেহ নাই । কিন্তু মনোমত উত্তর পাইবার জন্য শিক্ষককেই প্রথমে প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ই উল্লেখ করিতে হইবে । এই ফুলটার কি গুণ আছে ? সৌন্দর্য্য ! সোণা খুব চকচকে । সোণার কি গুণ আছে ? চাকচিক্য । শ্যামাকান্ত খুব বলবান । শ্যামাকান্তের কি গুণ আছে ? বল । ইত্যাদিরূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা গুণবাচক বিশেষ্য বুঝাইতে হইবে । এই প্রকার “তঁাহার আগমনে সকলে সুখী হইল”—তঁাহার কোন (ক্রিয়ায়) কার্য্যে সকলে সুখী হইল ? — “আগমনে” । ইত্যাদিরূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শিক্ষা দিতে হইবে । ইহার পর, ইহা, তাহা, কে প্রভৃতি সর্ব্বনাম এবং সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া শিক্ষা দিলেই প্রথম বর্ষের কার্য্য সূচরু হইল ।

স্বর ও ব্যঞ্জন ।—উচ্চ প্রাথমিকের দ্বিতীয় বর্ষে বালকগণকে (বিনা সাহায্যে উচ্চারিত) হ্রস্ব স্বর, দীর্ঘ স্বর, সমান স্বর ও স্বরের সাহায্যে

উচ্চারিত ব্যঞ্জনবর্ণ বুঝাইয়া দিবে। অ, আ প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে আর কোনরূপ বর্ণের সাহায্য আবশ্যক করে না; কিন্তু ক, খ বলিতে ‘অ’কারের সাহায্য প্রয়োজন; অ, ই প্রভৃতি পাঁচটীকে হ্রস্ব স্বর (অর্থাৎ উচ্চারণ একটু খাট রকমের) বলে। আর আ, ঐ উ প্রভৃতি আটটীকে দীর্ঘ (অর্থাৎ উচ্চারণ একটু লম্বা) স্বর বলে। শিক্ষককে দীর্ঘ ও হ্রস্বের উচ্চারণ-পার্থক্য দেখাইয়া দিতে হইবে। তারপর অ আ, ই ঐ, উ, ঊ, ঋ ঋ, এ ঐ, ও ঔ প্রভৃতি প্রত্যেক জোড়াকে সমান স্বর বলে, কারণ তাহারা আকারে ও উচ্চারণে অনেকটা এক রকমের।

তারপর ব্যঞ্জনবর্ণের পাঁচটী বর্ণ ‘ক খ পাঁচটী কবর্ণ, চ ছ পাঁচটী চবর্ণ ইত্যাদি এবং ঘ র ল ব অন্তঃস্ববর্ণ, শ য স হ উষ্মবর্ণ, ইহাই বলিয়া দিবে। কণ্ঠ্য তালব্য প্রভৃতি বর্ণের বিভাগ (আবশ্যক হইলে) মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণীতে শিক্ষা করিতে পারে।

সন্ধি।—ইহার পর বর্ণ বিশ্লেষণ (যথা ব্রহ্ম = ব + র্ + অ + হ্ + ম + অ) শিক্ষা দিয়া সন্ধি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবে। এ সন্ধি শিক্ষাতেও সূত্র না বলিয়া প্রথমে কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারাই সন্ধি বুঝাইতে হইবে। পরে বালকদিগের দ্বারা সূত্র প্রস্তুত করাইয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক দৃষ্টান্ত বোর্ডে লিখিয়া দিবে। যথা—

ঘন + অন্ধকার = ঘনান্ধকার

নীল + অম্বর (কাপড়) = নীলাম্বর।

এইরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া, অকারের পর অকার (অর্থাৎ নীল শব্দের ল বর্ণে অ আছে) থাকিলে, দুই শব্দ যোগ করিলে অ উঠিয়া গিয়া, ‘লয়ে’ আকার হইল, ইহাই উত্তমরূপে দেখাইয়া দিতে হইবে। বোর্ডে অনেক দৃষ্টান্ত লিখিয়া দিয়া বালকদিগের দ্বারা এইরূপ সংযোগ করাইতে হইবে। তারপর “কুশ + আসন, ঘন + আগার” প্রভৃতি অকারের পর অকার, দয়া + অর্ণব (সমুদ্রে), লতা + অগ্র এইরূপ অকারের পর অকার; তারপর

“মহা + আশয়, বিছা + আলয়” প্রভৃতি আকারের পর অকার দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিবে। বালকদিগের কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মিলে বোর্ডে এইরূপ একটা সংক্ষেপ সঙ্কেত লিখিয়া দিবে —

$$\left. \begin{array}{l} \text{অ + অ} \\ \text{অ + আ} \\ \text{আ + অ} \\ \text{আ + আ} \end{array} \right\} = \text{আ}$$

এই প্রণালীতে ইকার, উকার, ঋকার বিষয়ক দৃষ্টান্ত শিক্ষা হইলে, তাহাও বোর্ডে সংক্ষেপে উক্ত প্রকারে লিখিবে। এখন সমস্তের একটা সূত্র শিখাইয়া দাও—“সমান স্বর পরে থাকিলে পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয়, পরের স্বর উঠিয়া যায়।” তারপর অস্থান দৃষ্টান্ত দ্বারা আর কতকগুলি সন্ধির বিষয় পূর্ব প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া, তাহারও সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে।
যথা :—

$$\left. \begin{array}{l} \text{অ + ই} \\ \text{অ + ঈ} \\ \text{আ + ই} \\ \text{আ + ঈ} \end{array} \right\} = \text{এ}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{অ + উ} \\ \text{আ + উ} \\ \text{অ + ঊ} \\ \text{আ + ঊ} \end{array} \right\} = \text{ও ইত্যাদি}$$

এখন একটা সংক্ষেপ সূত্র শিক্ষা দাও “য কি আকারের পর, ই ঈ থাকিলে এ, উ ঊ থাকিলে ও ঋ ঌ থাকিলে অর, এ ঐ থাকিলে ঐ এবং ও ঔ থাকিলে ঔ হয়।” এইরূপে কোন উচ্চ প্রাইমারীর ব্যাকরণ দৃষ্টে সন্ধির বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। যে সকল সন্ধি উচ্চ প্রাইমারীর ছাত্রদিগের উপযোগী, উঃ প্রাঃ ব্যাকরণে সেই সকল সন্ধি দেওয়া থাকে। এ বিষয়ে তারিণীশঙ্কর সান্যালের ‘প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ বা তদ্রূপ অন্য কোন পুস্তকের অনুসরণ করিলে চলিবে। এক

কথা বলা হয় নাই—সন্ধি শিক্ষায় যে সকল দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হইবে, বালকেরা সম্ভবতঃ তাহার অনেক শব্দ সম্বন্ধেই অনভিজ্ঞ। এইজন্য সন্ধি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ব্যবহৃত শব্দের অর্থ শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। সাধারণ বাক্যকথন ভাষায় সন্ধি সমাসযুক্ত পদ ব্যবহৃত হয় না। বিশেষতঃ অশিক্ষিত গ্রাম্য গৃহস্থের ঘরে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহাতে শব্দের সংখ্যা নিতান্তই কম। নিত্য প্রয়োজনীয় আহার বিহারাদির পরিচালনার্থ যে সকল শব্দের ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন, কেবল সেইগুলিরই কোনরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই সকল কারণে সন্ধি সমাস একটু উপরের শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া যুক্তি। প্রায়ই সংস্কৃত পদের সন্ধি সমাস হইয়া থাকে। কিছুদিন সাধুভাষার আলোচনা না করিলে ও সংস্কৃত শব্দের ভাণ্ডার বৃদ্ধি না পাইলে, সন্ধি সমাস শিক্ষায় কোন ফল হয় না।

সমাস।—সন্ধি শিক্ষার পর, প্রথম দৃষ্টান্তের সাহায্যে সমাস শিক্ষা দিবে। প্রথমে সমাস কাহাকে বলে তাহার সূত্র মুখস্থ না করাইয়া কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে হইবে। যথা :—

বৃদ্ধ যে পুরুষ = বৃদ্ধপুরুষ

ঠাকুর (পূজনীয়) যে দাদা = ঠাকুরদাদা

মহান যে জন = মহাজন

ডেপুটী (ছোট) যে ম্যাজিষ্ট্রেট = ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট

বট যে বৃক্ষ = বটবৃক্ষ

ছোট যে লাট (প্রভু) = ছোটলাট

ইত্যাদি নানারূপ দৃষ্টান্ত বোর্ডে লিখিয়া দিয়া বলিতে হইবে যে “ছই পদ একত্র হইয়া একটা অর্থ বুঝাইলেই সেই ছই পদে সমাস হয়।” বৃদ্ধ, মহান, বট, ঠাকুর, ডেপুটী, লাট” এগুলি একটা একটা গুণ বুঝাইতেছে। এগুলি কি পদ? বিশেষণ। আর পুরুষ, জন, বৃক্ষ, দাদা, লাট এগুলি কি পদ? বিশেষ্য পদ। এইরূপ বিশেষ্য বিশেষণে যে সমাস হয় তাহাকে কর্মধারয় সমাস কহে। সন্ধি সমাসের প্রধান উদ্দেশ্য অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করা। ‘মহান্ যে জন’ বলিলে যে ভাব প্রকাশিত হয়, ‘মহাজন’ বলিলেও ঠিক সেই ভাবই প্রকাশিত হইল। কম শব্দের

দ্বারা বেশী শব্দের কাজ হইল ।

এইরূপ বহুব্রীহি সমাসও দৃষ্টান্ত দ্বারা শিখাইতে হইবে । যথা :—

পীত অম্বর (কাপড়) যাহার = পীতাম্বর (কৃষ্ণ)

শূল পানিতে (হাতে) যাহার = শূলপানি (শিব)

পদ্ম নাভিতে যাহার = পদ্মনাভ (বিষ্ণু)

এখানে ‘পীতবর্ণ কাপড়’, ‘শূল ও পানি’, ‘পদ্ম ও নাভিকে’ না বুঝাইয়া কৃষ্ণ, শিব ও বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে । যে যে পদে সমাস করা যায়, সেই সেই পদের অর্থ না বুঝাইয়া, যাহাতে অত্র কোন একটা বিশেষ অর্থ বুঝায়, তাহাকে “বহুব্রীহি” সমাস কহে । এইরূপে উপপদ শিক্ষা দিতে হইবে । যথা :—

পক্ষে জনো যে = পক্ষজ (পদ্ম ; শৈবালাদি নয়)

জলে চরে যে = জলচর (জলচর জীব ; নৌকা প্রভৃতি নয়)

ঘর পোড়ায় যে = ঘরপোড়া (হনুমান ; কেহ ঘর পোড়াইলে

তাহাকে ঘরপোড়া বলে ; পোড়া ঘর নয়)

যে সমাস বহুব্রীহির মত, কিন্তু একটা ধাতুর সহিত যুক্ত হয়, তাহাকে উপপদ সমাস কহে । উপপদ শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিবে । বালকেরা কর্মধারয়, বহুব্রীহি ও উপপদ সমাসে প্রায়ই গোলমাল করিয়া থাকে । এই তিনটির পার্থক্য দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিবে । কারকের বোধ হইলে তৎপুরুষ সমাস বুঝিতে কষ্ট হইবে না । ধন্দ্ব সমাস সহজ । অব্যয়ীভাব প্রভৃতির আপাততঃ আবশ্যকতা নাই ।

সমাসের নামগুলির অর্থ বুঝাইয়া দিলে বালকেরা আমোদ পাইবে ও সমাসের ভাব অতি সহজে মনে করিয়া রাখিতে পারিবে । একটা দৃষ্টান্ত দিলেই শিক্ষকগণ আমার কথা বুঝিবেন । মনে করুন বহুব্রীহি সমাস শিক্ষা দিচ্ছেন । “বহুব্রীহি” শব্দের অর্থ বলুন । ‘বহু’ অনেক ‘ব্রীহি’ অর্থ ধান । এখন যেমন টাকা পরমা হইয়াছে, সেকালে এত টাকা

পয়সার আমদানী ছিল না । যাহার বেশী ধান থাকিত তাহাকেই লোকে বড় মানুষ বলিত । 'এইরূপ অনেক ধানের মালিক দেখিলেই লোকে বলিত "ইনি বহু ব্রীহির মালিক ।" শেষে এই বাক্য সংক্ষেপ হইয়া হইল "ইনি বহুব্রীহি", এইরূপে যাহার বহু ব্রীহি আছে তাহাকেই 'বহুব্রীহি' বলা হইত । "বহুব্রীহি" কথার অর্থ অনেক ধান—কিন্তু যখন এই কথায় অনেক ধান না বুঝাইয়া অনেক ধান বিশিষ্ট লোক বুঝাইতে লাগিল, তখন এইরূপ বহুব্রীহি পদের মত পদকে সাধারণ পদ হইতে পৃথক করিয়া এই প্রকার পদগুলির বহুব্রীহি নাম রাখা হইল ।

তার পর স্ত্রী-প্রত্যয়, তদ্ধিত ও কুৎ কিছু কিছু শিক্ষা দিলেই উচ্চ প্রাইমারী শ্রেণীর ব্যাকরণ শিক্ষা শেষ হইল । আজকাল ইংরেজী অনুকরণে পদপরিচয় বা পদব্যাখ্যা অর্থাৎ পার্জিং বাঙ্গালা ব্যাকরণে প্রবেশ করিয়াছে । ইচ্ছা করিলে শিক্ষকেরা ইহাও শিক্ষা দিতে পারেন । ইহাতে ব্যাকরণ শিক্ষার উত্তমরূপ পরীক্ষা হইয়া থাকে । গল্পবিধান, যত্নবিধান ও চিহ্নপ্রকরণ ঐকতলিপির সঙ্গে শিক্ষণীয় । মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণীদ্বয়ে এই সমস্ত বিষয়ই অধিক মাত্রায় শিক্ষা করিবে । মধ্য বাঙ্গালার উপযুক্ত কোন বড় ব্যাকরণ হইতে শিক্ষা দিতে হইবে । কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে উচ্চ প্রাইমারীর জন্ত যাহা নির্দিষ্ট হইল ঐ সকল বিষয়ের পুনরালোচনা করিলেই মধ্য বাঙ্গালার বালকগণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে । যাহা হউক এ বিষয় শিক্ষক বা পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচনী-কমিটীর বিবেচ্য । তবে এক কথা বলা আবশ্যক যে মধ্য বাঙ্গালার দ্বিতীয় বর্ষে একটু ছন্দ অলঙ্কার শিক্ষা দিতে পারিলে ভাল হয় । ছন্দ অলঙ্কারের সূত্র নহে, কেবল সামান্য সামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র । ছন্দের মধ্যে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর দুই ভাগ করিয়া নিম্নলিখিত ছন্দগুলির দৃষ্টান্ত দিলেই চলিবে :—

মিত্রাক্ষর—(মিত্রাক্ষরী) পয়ার, পর্যায়, মধ্যম, মালতী, একাবলী, লঘুতোটক, দীর্ঘ-তোটক, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী ; (অমিত্রাক্ষরী) গান, ছড়া ।

অমিতাক্ষর—(মিতাক্ষরী)—মাইকেলের মেঘনাদ যধ, (অমিতাক্ষরী) রাজকুমার ও গিরিশচন্দ্রের নাটকাদি ।

অলঙ্কারের মধ্যে, নিম্নলিখিত অলঙ্কারগুলি মধ্য বাঙ্গলা শ্রেণীতে শিক্ষণীয় :—

শব্দালঙ্কার—অনুপ্রাস ও যমক ।

অর্থালঙ্কার—উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অর্থান্তরম্বাস, গির্দর্শন, দৃষ্টান্ত, অপহৃতি, ব্যতিরেক, স্বভাবোক্তি, অতিশয়োক্তি এবং বিশেষোক্তি ।

ব্যাকরণ শিক্ষাদানে আর এক কথা মনে রাখা উচিত । প্রথম প্রথম ব্যাকরণে ব্যবহৃত (বিশেষ) শব্দগুলি ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত । বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি শব্দ সাধারণ ভাষায় অপ্ৰচলিত । সেইজন্য বস্তুবাচক শব্দ, নামবাচক, গুণবাচক, কার্যবাচক ইত্যাদিরূপ (শিক্ষকের সুবিধামত) কথা প্রস্তুত করিয়া লইলে বালকগণের বুঝিতে কষ্ট হইবে না । 'সন্ধি' না বলিয়া 'শব্দ জুড়িবার রীতি' এইরূপ বলাই সুবিধাজনক । তারপর যখন একটু বিষয়বোধ হইয়া যাইবে, তখন বিশুদ্ধ শব্দ শিখাইয়া দিতে হইবে ।

৩ । রচনা ।

ব্যাকরণ শিক্ষার সঙ্গেই রচনা শিক্ষা আরম্ভ হইয়া থাকে । যখন ভাষা শিক্ষা রচনা শিক্ষার সাহায্য ব্যতীত পূর্ণ হয় না, তখন রচনা শিক্ষার জন্য পৃথক সময়ের ব্যবস্থা থাকা ভাল ।

বাক্য রচনা ।—প্রথমে ব্যাকরণের প্রণালী অনুসরণ করিয়া কেবল কর্তা ক্রিয়াযুক্ত বাক্য রচনা করিতে শিক্ষা দিবে । বোর্ডে কতকগুলি বিশেষ্যপদ লিখিয়া দিবে, বালকেরা একে একে গিয়া তাহাতে ক্রিয়াপদ যুক্ত করিয়া আসিবে :—

ঘোড়া

দৌড়াইতেছে

গাছ

পাখী

যত্ন

বালকেরা ‘দৌড়াইতেছে’, ‘নড়িতেছে’, ‘উড়িতেছে’, ‘খেলিতেছে’ ইত্যাদিরূপ ক্রিয়াপদ যোগ করিয়া আসিবে। তারপর বিশেষ্যের সহিত বিশেষণ যোগ করিতে শিক্ষা দাও। পূর্ববৎ বোর্ডে লিখিয়া দাও :—হাতী, ফুল, বাড়ী, পুস্তক। বালকেরা ‘কাল’, ‘লাল’ ‘বড়’ ‘উত্তম’ প্রভৃতি রকমের বিশেষণ যোগ করিল। এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস হইলে কেবল বিশেষ্য লিখিয়া দিয়া তাহার সহিত বিশেষণ ও ক্রিয়া যোগ করিতে শিক্ষা দাও। যথা :—

হলদে পাখী উড়িতেছে

হাতী

ফুল

বালকেরা ‘হাতীর’ সহিত ‘দুষ্ট ও দৌড়াইতেছে’, ‘ফুলের’ সহিত ‘লাল ও ফুটিয়াছে’ যোগ করিয়া দিল। কিন্তু এক বিষয়ে একটু সাবধান হইতে হইবে। বাক্য রচনাকালে বালকেরা অর্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, অনেক সময় কেবল ব্যাকরণের দিকেই লক্ষ্য রাখে। হয় ত কেহ লিখিয়া বসিল ‘লাল হাতী হাসিতেছে’, ব্যাকরণ-গত কোন ভুল নাই বটে, কিন্তু এইরূপ বাক্যের ভাব অসঙ্গত বলিয়া, সম্পূর্ণ বাক্যই অশুদ্ধ। সাধারণতঃ বাক্য রচনা করিতে বলিলেই, হয় ‘রাম’, না হয় ‘শ্রাম’, এই দুইজনের একজনকে কর্তা ঠিক করিয়া, যত ক্রিয়াপদ আছে, সমস্তই ইহাদের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। ‘গান করিতেছে’, ‘সেলাই করিতেছে’, ‘দৌড়াইতেছে’, ‘শুইয়া আছে’—এইরূপ ক্রিয়াপদে অবশ্য ‘রাম’, ‘শ্রাম’ দিলে অর্থ উত্তম না হউক, এক রকম কাজচলা মত হয়, কিন্তু ‘হাসা হাসা ডাকিতেছে’, এইরূপ ক্রিয়ার সঙ্গেও ‘রাম শ্রামকে’ যুক্ত করিতে ছাড়ে না। বালকদিগকে সুন্দর ও সঙ্গত উত্তরের ধারা দিতে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে আর এক উপকার এই হইবে যে, তাহাদের চিন্তাশক্তি ও যুক্তিশক্তির যথেষ্ট অনুশীলন হইবে। ‘রাম গান করিতেছে’ না বলিয়া, ‘পাখী গান করিতেছে’ বলিলে

বাক্যটির দ্বারা কেমন একটা সাধারণ সত্য ঘটনা বিবৃত হইল । ‘রাম গান করিতেছে’ বলিলে সেরূপ কিছু বুঝিতে পারা যায় না । ‘রাম কে ? সে কি গান করিতে জানে ? কেন গান করিতেছে ?’ যদি রামের সম্বন্ধে আমরা পূর্বে এত বিষয় জানিতাম, তবে ‘রাম গান করিতেছে’ বলিলে কিছু বুঝিতে পারিতাম । কিন্তু কেবল রাম গান করিতেছে বলিলে সেরূপ কিছুই বোধ হয় না । সেইরূপ ‘বালিকা (কি দর্জী) সেলাই করিতেছে’, ‘ঘোড়া দৌড়াইতেছে’, ‘রোগী শুইয়া আছে’, এইরূপ সঙ্গত উত্তর হওয়াই বাঞ্ছনীয় । তবে বালকেরা প্রথমে এতদূর পারিয়া উঠিবে না, কিন্তু এই আদর্শের দিকে তাহাদিগের লক্ষ্য রাখিতে শিক্ষা দিবে ।

ইহার পর একটি একটি বিশেষ্যপদ বলিয়া দাও ও সেগুলিকে একে একে কৰ্ম্ম করিয়া, এক একটি বাক্য রচনা করিতে বল । মনে কর, ‘বাঘ’ লিখিয়া দিলে । এক বালক উত্তর করিল ‘রাম বাঘ খাইয়াছে ।’ ইহাতে ব্যাকরণ-গত কোন ভুল নাই, কিন্তু এরূপ উত্তর মূলেই ভুল । এই বাক্য সঙ্গত ভাবযুক্ত নহে । ভাব লইয়াই বাক্য । যেখানে ভাব হইল না, সেখানে বাক্যও হইল না । যদি বাক্যই না হইল, তবে তাহার ব্যাকরণ লইয়া কি হইবে ? অতঃপর এক বালক লিখিল ‘শ্রাম বাঘ ধরিতেছে’ ; তারপর ‘যজ্ঞ বাঘ দেখিতেছে’, পূর্বাপেক্ষা এরূপ বাক্য কিছু ভাল । তবে পরীক্ষায় ইহাতেও পূর্ণ নম্বর পায় না । ‘শিকারী বাঘ মারিতেছে’ এইরূপ বাক্যই পরীক্ষকেরা পূর্ণ নম্বরের উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন । তবে ঘটনা বিশেষের সহিত যুক্ত হইলে সমস্ত বাক্যই সঙ্গত হইতে পারে । ছুৰ্ত্তিক্ষের সময় মধ্যপ্রদেশের লোক একবার বাঘ খাইয়াছিল । সেই ঘটনার উপলক্ষে ‘রামদীন বাঘ খাইয়াছিল’ এ কথা সঙ্গত । ‘শ্রাম’ অর্থে যদি আমরা সেই সার্কাসের শ্রামাকান্ত চট্টো-পাধ্যায়কে বুঝি, তবে তাহার পক্ষে বাঘ ধরা অসঙ্গত নয় । বাঘ

দেখাটা অনেক সময়েই সম্ভব হইতে পারে । কিন্তু শিকারীর পক্ষে বাঘ মারা একটা সাধারণ রীতিসম্মত কার্য্য বলিয়া, এই শেষ বাক্যই উত্তম ।

ব্যাকরণের সাধারণ দৃষ্টান্ত দিবার সময় ব্যাকরণের নিয়মের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখায় ভাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় না । কিন্তু রচনার সময় ভাব ও ব্যাকরণ উভয় দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে । এইরূপে ক্রিয়ার বিশেষণ ও তিনকাল-প্রকাশকক্রিয়াপদগুলির ব্যবহার শিক্ষা দিতে হইবে । কিছুদিন এইরূপ বাক্যরচনা শিক্ষার পর ছোট ছোট গল্পের রচনা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক ।

গল্প রচনা ।—কোন পুস্তক হইতে এইরূপ আনন্দজনক একটা গল্প পাঠ কর বা নিজে এইরূপ একটা সরল গল্প রচনা করিয়া বালকগণকে শুনাও (শ্রীযুক্ত আসান উল্লাহ কৃত কিংডারগার্টেন গ্রাইমার) :—

“একটা ছেলে ভারি পেটুক । পেট ভরিয়া গেলেও সে খাইতে ছাড়ে না । এইরূপে খাইতে খাইতে তার খুব পেটের অস্থখ হইল । একদিন কবিরাজের নিকট ঔষধ আনিতে গেল । কবিরাজ মহাশয় তাহার খাওয়ার কথা শুনিয়া তাহাকে শুইতে বলিলেন । সে শুইলে পর, কবিরাজ মহাশয় তাহার চোখে ঔষধ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন । বালক বলিল “আমার পেটের অস্থখ, চোখের নয় ।” কিন্তু কবিরাজ মহাশয় বলিলেন “না, তোমার চোখের অস্থখ, পেটের নয় । আমি তোমার চোখ ভাল করিয়া দিলেই তোমার পেট সারিবে ।”

এই গল্পটী বলা হইলে শিক্ষক বালকদিগের নিকট হইতে ধারাবাহিক প্রশ্ন করিয়া গল্পের সমস্ত বিষয় আদায় করিয়া লইবেন । যথা :—

প্রঃ । পেটুক বালক পেট ভরিয়া গেলেও কি করিত ?

উঃ । পেটুক বালক পেট ভরিয়া গেলেও খাইত ।

বালকেরা পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিবে । শিক্ষক আংশিক উত্তর, বা গ্রাম্য কি অসাড় ভাষার উত্তর গ্রহণ করিবেন না । সেরূপ উত্তর করিলে, তিনি শুদ্ধ করিয়া দিবেন ও সেই বালকের নিকট হইতে পুনরায় শুদ্ধ উত্তর আদায় করিবেন ।

প্রঃ । খাইতে খাইতে তাহার কি হইল ?

উঃ । এইরূপ খাইতে খাইতে তাহার পেটের অস্থখ হইল । পেটের অস্থখ হইলে সে কবিরাজের নিকট ঔষধ আনিতে গেল ।

প্রঃ । কবিরাজ মহাশয় তাহার কথা শুনিয়া কি করিলেন ? ইত্যাদি ।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরগুলি শেষে স্নেটে বা কাগজে লিখিলেই ধারাবাহিক গল্প হইয়া যাইবে । প্রথমে কিছুদিন মুখে মুখে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে । বেশ অভ্যাস হইয়া গেলে শেষে স্নেটে বা কাগজে লিখিতে শিক্ষা দিবে । ইহার পর কেবল গল্প পড়িয়া শুনাইবে, আর প্রশ্ন করিবার আবশ্যক নাই । বালকেরা গল্পের বিষয় মনে রাখিয়া নিজের ভাষায় রচনা করিবে । পুস্তকস্থিত গল্পে বালকগণের অনুকরণের উপযুক্ত কোন সুন্দর শব্দ বা বাক্যাংশ থাকিলে সেগুলি (বেশী নয়) বোর্ডে লিখিয়া দিবে ও সেই শব্দগুলি বালকগণকে নিজ নিজ রচনায় ব্যবহার করিতে বলিবে । গল্প রচনায় ‘কথামালা, দ্বৈপ্যের গল্প,’ প্রভৃতি পুস্তকের সাহায্য লইবে । এইরূপ গল্প রচনা অভ্যাস হইয়া গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনী (প্রথমে দেশীয় লোকের) পড়িয়া শুনাইবে । কালীময় ঘটক কৃত চরিতাষ্টক ও শতচন্দ্র বিদ্যারত্ন কৃত চরিতমালার সাহায্য লইবে । বালকেরা নিজের ভাষায় সেগুলি বর্ণনা করিবে । তারপর অল্পাংশ ঐতিহাসিক বিবরণ রচনা করিতে দিখাইবে ।

প্রবন্ধ রচনা — বর্ণনাত্মক রচনা সহজ, কিন্তু ভাবাত্মক রচনা শক্ত । সেইজন্য প্রথমে কেবল বর্ণনাত্মক রচনাই শিক্ষা দিবে । বালকদিগকে (মধ্য বাঙ্গালা ২য় শ্রেণী হইতে) কল্পনা করিয়া কোন স্থানের বর্ণনা লিখিতে বলিবে । “তোমার গ্রাম বা কোন বাজার, কি এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইবার পথ, কি কোন উৎসব বর্ণনা করিয়া রচনা লেখ” — এইরূপ প্রশ্ন করিবে । কিন্তু প্রথমে লিখিবার ধারা ও উপকরণ বলিয়া না দিলে বালক লিখিতে পারিবে না । সেইজন্য কিছুদিন নিম্নলিখিত প্রশ্নালীতে বোর্ডে রচনার ধারা লিখিয়া দিবে :—

বিষয়—নিজ গ্রামের বর্ণনা।

- ১। গ্রামের নাম—সেই নাম হইবার যদি বিশেষ কোন কারণ থাকে, তবে সে কারণ।
- ২। কোন্ জেলায়—সহর হইতে কত দূরে—কোন্ নদী বা রেলের ধারে। চতুঃ-সীমা।
- ৩। গ্রাম, পাহাড়, বন, বিল, নদী প্রভৃতি যে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে তাহার বর্ণনা। গ্রামের সাধারণ স্থাৱ্য।
- ৪। গ্রামের চাষবাসের অবস্থা, জমি কি পরিমাণে উর্বরা, কি কি ফসল জন্মে।
- ৫। লোকসংখ্যা—কোন্ জাতি প্রধান, লোকের অবস্থা, ব্যবসায়, বাণিজ্য।
- ৬। ডাকঘর, কাছারি, স্কুল, হাসপাতাল, মন্দির, মসজিদ, বাজার, হাট প্রভৃতির বর্ণনা।
- ৭। গ্রাম ক্রমশঃ উন্নত বা অবনত হইতেছে? তাহার কারণ।

বর্ণনাত্মক রচনার অভ্যাস হইয়া গেলে (মধ্য ১ম শ্রেণীতে) মধ্যো মধ্যো সহজ ভাবাত্মক রচনা অভ্যাস করাইবে। কিন্তু ইহাতেও প্রথম প্রথম রচনার ধারা বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে। যথা :—

স্বাস্থ্যরক্ষা।

- ১। কিরূপ ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তি বলা যায়? স্বাস্থ্যের সুখ ও স্বাস্থ্যভঞ্জে দুঃখ।
- ২। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম :—
 - (ক) নির্মল বায়ু সেবন।
 - (খ) লঘুপাক দ্রব্য ভক্ষণ ও আহারের নিয়ম করণ। (আহারের অব্যবহিত পরে পাঠ না করা)
 - (গ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।
 - (ঘ) পরিশ্রম ও ব্যায়াম। দিবানিত্রা ও অধিক নিত্রা না যাওয়া।
 - (ঙ) নির্দোষ আশোদ উপভোগ।
 - (চ) ছুর্ভাবনার বশ না হওয়া। সকল সময়েই সৎকার্য্যে ব্যাপ্ত থাকা।
 - ৩। স্বাস্থ্যরক্ষা না করিতে পারিলে সাংসারিক সুখলাভের পক্ষে কি ব্যাধাত হয়।

রচনার নিয়ম ।—এইরূপ রচনা লিখিতে বালকগণকে নিম্ন-লিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

১। যে বিষয়ের রচনা লিখিতে হইবে, সে বিষয় সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিবে মনে করিয়াছ, তাহা প্রথমে পৃথক কাগজে ধারাবাহিকরূপে সংক্ষেপে লিখিয়া রাখ (উপরোক্ত দৃষ্টান্তের অনুরূপ) ও সেই ধারা অবলম্বন করিয়া রচনা লেখ ।

রচনা লিখিবার সংক্ষিপ্ত ধারা এইরূপ :—

- (১) প্রথমে বিষয়টির সাধারণ অর্থ ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করিবে ।
- (২) পরে তাহার ভালমন্দ দুই দিক দেখাইবে । (৩) তারপর সে সম্বন্ধে কি কি করা কর্তব্য, তাহা মন্তব্য আকারে প্রকাশ করিবে ।

২। রচনার ভাষা সরল হওয়া বাঞ্ছনীয় । বাক্য দীর্ঘ না হওয়াই ভাল । সরল ভাষায় রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য বেশ মধুর । অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে । বালকেরা অনেক সময় সুদীর্ঘ সমাসযুক্ত কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়া থাকে । সেরূপ চেষ্টাও আবশ্যিক সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার একটা সময় আছে । এন্ট্রান্স স্কুলের প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণীর ও নর্মাল স্কুলের ছাত্রগণ এরূপ চেষ্টা করিলে বিশেষ অগ্রাঘ হয় না । কিন্তু তাহাদের পক্ষেও সরল ভাষায় রচনা লেখা বাঞ্ছনীয় । আজকাল সরল ভাষাই পণ্ডিতগণের পছন্দ । কঠিন ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিতে হইলে, কঠিন ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ পড়া আবশ্যিক । তাহা না হইলে ভাষা আয়ত্ত হয় না । “ঝড়ে কলাগাছগুলি, পুকুরের ভিতর পড়িয়া গিয়া, পচিয়া উঠিয়াছে ।” এই ব্যাপার বর্ণনায় এক বালক লিখিয়াছে—“বাতাভিহত কদলী বৃক্ষ সকল (সীতার বনবাসে পড়া) জলে পড়ে পচে পচে গেছে ।”

৩। রচনায় উদাহরণ দিতে হইলে, লোক-প্রসিদ্ধ ঘটনা, গল্প বা উপাখ্যানের উল্লেখই বাঞ্ছনীয় । কিন্তু এই উদাহরণ স্বল্প কথায় ও বিষয়ের

উপযোগী করিয়া বিবৃত করিবে । একটী দৃষ্টান্তে ৪।৫ লাইনের অধিক লেখা উচিত নহে । মনে কর, ‘পরোপকার, সম্বন্ধে রচনা লিখিতে হইবে । ক্ষুদ্রের দ্বারাও যে মহতের উপকার হইয়া থাকে, ইহাই দেখাইবার জন্য, রামায়ণ হইতে দৃষ্টান্ত দিবে মনে করিয়াছ । এইরূপ লেখ :—“বনের পশু বানরের সহায়তায় রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন । অতি ক্ষুদ্র কাঠিড়ালীরাও সমুদ্রে সেতু বন্ধনরূপ কার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল ।” ইহাই যথেষ্ট । রামচন্দ্র কেন বনে আসিলেন, কোন্ রাস্তায় গেলেন—পঞ্চবটী বনে কি হইল—কিরূপে বালীবধ হইল প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক । ঐ বিষয়ে আর একটা দৃষ্টান্ত :—“ক্ষুদ্র ইন্দুরও একদিন জাল কাটিয়া দিয়া, সিংহকে ব্যাধের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল” (ঈমপের প্রসিদ্ধ উপকথা হইতে গৃহীত) । অনেক বাগক রচনার কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্য দৃষ্টান্তগুলি অযথা লম্বা করিয়া ফেলে । রচনায় লেখার পরিমাণ দেখা হয় না, লেখার ভাব ও ভাষা দেখা হয় ।

৪ । পরীক্ষার কাগজে লিখিত রচনায়, কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বচন বা পদ্যাংশ উদ্ধৃত করা বিশেষ আবশ্যক বোধ করিলে, ১ লাইন কি ২ লাইনের অধিক উদ্ধৃত করিবে না । আর এক রচনায়, অতি সঙ্গত বাক্য, উক্ত সংখ্যায় ২টির অধিকও উদ্ধৃত করিবে না ।

৫ । রচনায় “হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আর আলোচ্য থাকিও না” বা “আমি বিদ্যাবুদ্ধিহীন—আমার রচনা লেখা ধুষ্টতা”—ইত্যাদিরূপ বাক্য লেখা নিষেধ । কোন সভায় বক্তৃতা করিতে বা রচনা পাঠ করিতে হইলে, এ সমস্তের ব্যবহার চলিতে পারে ; কিন্তু বিদ্যালয়ের রচনায় এরূপ লিখিতে নাই ।

৬ । রচনায় শৃঙ্খলা অবলম্বন করা কর্তব্য । বিষয়ের এক একটী ভাগ পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে (প্যারাগ্রাফে) লিখিতে হইবে ।

৭ । এক কি দেড় ঘণ্টার পরিমাণ সময়ে যে রচনা লিখিতে হয়

তাহাতে ৫০।৬৫ লাইনের অধিক লেখা সম্ভব নহে । পরীক্ষার কাগজে এইরূপ দীর্ঘ রচনাই যথেষ্ট । ই ঘণ্টার রচনার পক্ষে ২০।২৫ লাইন লিখিলেই চলিতে পারে । পরীক্ষা-কাগজে যেরূপ রচনা লিখিতে হইবে, নিম্নে তাহার একটি আদর্শ প্রদত্ত হইল :—

অধ্যবসায় ।

অবিশ্রান্ত উদ্যোগ ও পরিশ্রমেব সহিত কোন কর্ম নিৰ্বাহ করিবার জন্ত যে যত্ন ও চেষ্টা তাহাকে অধ্যবসায় বলে । অবলম্বিত-কাৰ্য্য-সাধনতৎপর ব্যক্তিকেই অধ্যবসায়ী কহে । অধ্যবসায়ী ব্যক্তি কোন কার্য্য অসম্পন্ন বা অর্দ্ধসম্পন্ন করিয়া রাখিতে পারেন না । প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যের প্রত্যেক অংশ সুসম্পন্ন করিতে না পারিলে তাহার মন স্থির হয় না । অধ্যবসায়ী ব্যক্তিকে সময়নিষ্ঠ হইতে হইবে, আলস্য পরিত্যাগ করিতে হইবে । অলস ব্যক্তিও যত্ন চেষ্টা করিলে অধ্যবসায়ী হইতে পারে ; অধ্যবসায় অভ্যাসের ফল । অধ্যবসায়ী ব্যক্তি সঙ্কল্পিত কার্য্য নিৰ্বাহের জন্ত অবিচলিত যত্ন করিয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন । ‘যতনে রতন মিলে’—এ বাক্য পরীক্ষিত সত্য । সংসার-স্থখের উপকরণ ধন, মান ও যশ—অধ্যবসায়লব্ধ ।

ছই বেলা স্নানোত্তর রন্ধন ও গৃহসংস্কার কার্য্য নিৰ্বাহ করিয়াও, অবিশ্রান্ত যত্ন ও চেষ্টায় বিদ্যালয়গর প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন । কর্ম্মক্ষেত্রেও তিনি অধ্যবসায় গুণে বেক্ষপ ধন, মান ও যশ লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয় । অধ্যবসায়রূপ গুণ থাকিলে জীবনের সকল বাবসায়েরেই সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

স্বটেল্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস কয়েক বার যুদ্ধে পরাস্ত লইয়া নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন । এমন সময় একদিন দেখিলেন যে একটা উৰ্ণনাভ ছয়বার চেষ্টাতেও গৃহ-প্রাচীরে সূত্র সংলগ্ন করিতে পারিল না বলিয়া, সপ্তমবার চেষ্টায় বিরত হইল না । তিনি এই ক্ষুদ্র কীটের নিকট অধ্যবসায় শিক্ষা করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ও শেষে জয়যুক্ত হইলেন ।

কার্য্যের প্রারম্ভ দেখিয়াই আগাদিগের নিরাশাহ হওয়া কর্তব্য নহে । এমন অনেক কষ্টক আছে, যাহা দেখিতে ভয়ানক বোধ হয় বটে, কিন্তু আটিয়া ধরিলে ভাঙ্গিয়া যায় । সংসারের পথ সরল নহে—পাহাড় পর্বত ও গর্ত্ত গহ্বর পরিপূর্ণ । উত্থান, পতন জীবনের সহচর । কেবল অধ্যবসায়ের গুণেই সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জীবন-পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এই জন্ত কি বিজ্ঞালয়ে, কি সংসাবক্ষেত্রে, সর্বদাই অধ্যবসায়ের অনুশীলন আবশ্যক।

প্রশ্ন। শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র অমুচ্ছেদ (প্যারাগ্রাফ) লিখ।

এরূপ প্রশ্নের উত্তরে সাধারণতঃ ১৫।২০ লাইনের অধিক লিখিবার আবশ্যকতা হয় না। কিন্তু এরূপ রচনা বালকেরা কঠিন মনে করে। কারণ এই ১৫ লাইনের মধ্যে অতি আবশ্যকীয় কথাগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে পুরিয়া দিতে হইবে। উদাহরণাদি বা উদ্ধৃত বাক্য একবারেই থাকিবে না। উপরন্তু ভাষা আড়ম্বরশূন্য ও সংযত হইবে। নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উক্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিত হইল :—

“শিক্ষা বালক বালিকাদিগকে কার্যোপযোগী করে। সুশিক্ষা নিজেব কার্য বা অপরের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার শক্তি বিধান করে। এইজন্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণই রাজ-কার্য বা অপর কার্যে অধিকতর আদৃত। যাঁহার শিক্ষা যতদূর উন্নত তাঁহার পদোন্নতি তদনুযায়ী হইয়া থাকে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে শিক্ষিত লোকই বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা শিক্ষার গুণে অবলম্বিত ব্যবসাতে উদ্ভাবনী বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন। শিক্ষিত ও গুণী ব্যক্তি বহু সুখের অধিকারী, যথা—উত্তম পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠ, সঙ্গীতচর্চা, চিত্রানুশীলন ইত্যাদি। শিক্ষিত ব্যক্তিগণই ভদ্রসমাজে প্রবেশলাভ করিতে পারেন। শিক্ষাই মানুষকে নানা গুণে অলঙ্কৃত করে। এই শিক্ষার গুণেই একজন আর একজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই শিক্ষার গুণেই এক জাতি অপর জাতির শাসনকর্ত্তা। সুশিক্ষা মনের সঙ্গীর্ণতা বিনষ্ট করে, কুসংস্কার দূরীভূত করে ও মানুষকে ধর্মপরায়ণ করে।”

পত্র রচনা।—পত্রের ভাষা সরল হইবে। পত্রে কঠিন ভাষা কখনই বাবস্তত হয় না। ইহা ছাড়া পত্রে একজনকে সম্বোধন করিয়া বিষয় বিবৃত হইয়া থাকে, কিন্তু রচনায় কোন ব্যক্তি বিশেষকে সেরূপ সম্বোধন করা হয় না। পত্রে এইজন্ত সম্বোধনসূচক কতকগুলি পদেরও ব্যবহার হইয়া থাকে।

পর পৃষ্ঠায় একখানি পত্রের আদর্শ প্রদত্ত হইল :—

শ্রীহরি ।

বরিশাল ।

৬ই আষাঢ়, ১৩১৪ বাং ।

শ্রীশ্রীচরণকমলেমু—

বাবা, আমি কাল সন্ধ্যার সময় এখানে পৌঁছিয়াছি । গাড়ীতে অনেক লোক হইয়াছিল । রাজে একটুকুও ঘুসাইতে পাবি নাই । শ্রীমারে সকালবেলা ঘুসাইয়াছিলাম । আমাদের সহযাত্রী এক ভদ্রলোকের একটা শীল ট্রাঙ্ক শ্রীমার হইতে চুরি হইয়া গেল । একজন ভদ্রবেশধারী লোক নাকি রাজে শ্রীমারে তাঁহার পাশে শুইয়াছিল । শেষ রাজে সেই লোকটা বাক্স লইয়া পলাইয়াছে । ভদ্রলোকটা কিছুই টের পান নাই । শ্রীমার রাজে চাঁদপুর ঘাটেই বাঁধা ছিল । এই কথা শুনিয়া আমি ট্রাঙ্কের সঙ্গে এক দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি বিছানার নীচে রাখিয়া ঘুসাইলাম । মাসীমা আমার এইরূপ দড়ি বাঁধার কথা শুনিয়া বলিলেন যে, চোরের যেমন বুদ্ধি, তাহাতে আমার দড়ি কাটিয়া নাকি বাক্স লইয়া যাইতে পারিত । পুলিশের এত গোলমাল সত্ত্বেও চোরে কেমন চুরি করিতেছে ।

আজ স্কুলে গিয়াছিলাম । ভর্তি হইতে ৭।০ টাকা লাগিয়াছে । হেড্‌ মাস্টার বাবু খুব ভাল লোক । তিনি আপনাকে চিনেন । যিনি গণিত শিক্ষা দেন, তিনি অঙ্কগুলি বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন । ষ্টক আরম্ভ হইয়াছে । ডিস্কাউন্ট পর্য্যন্ত পাবনাতেই পড়িয়া আসিয়াছি । স্বতরাং আমার কোন অসুবিধা হইবে না ।

মাসীমার নিকট যা যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে জানিলাম সাধন, রূপ, পান্নু, লিলি ভাল আছে । টুন্স কোলাঘাটে দিদিমার কাছে আছে—সেও ভাল আছে । ইহাদের সঙ্গে আর পূজার পূর্ব্বে দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই । এই অক্টোবর পূজাব ছুটি আরম্ভ হইবে । এখনও অনেক দেবী । আমরা সকলে ভাল আছি । ইতি

সেবক

শ্রী—

দলিলাদির রচনা শিক্ষা দিবার আবশ্যিকতা ।—কেহ কেহ বলেন, বালকগণকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিলে, তাহাদিগকে কেহ সাংসারিক কাজকর্মের ঠকাইতে পারিবে না । একথা কতক সত্য হইতে পারে, কিন্তু আবার দলিলাদির নানারূপ ঘোরফের শিখাইয়া অতর্কিত ঠকাইবার

একটা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়াও অসম্ভব নহে। দলিলের ভাষার প্রতি অক্ষর মানবের চাতুরীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দৃষ্টান্ত—“আমি, কি আমার ওয়ারিস কি স্থলাভিষিক্তগণ যদি অস্বীকার করি বা করে তাহা না মঞ্জুর”। এর অর্থ কি? অর্থাৎ একটা কাজ করিয়া তাহা অস্বীকার করাও রীতি আছে। কিন্তু “আমি এই ক্ষেত্রে তাহা করিব না” এই দলিলে তাহাই প্রতিজ্ঞা করিতেছি। দলিলের ছত্রে ছত্রে এই কথা যে “আমি এইরূপ ছলনা করিতে পারি, কিন্তু তাহা করিব না।” সুতরাং দলিল লিখাইতে গিয়া যাহাতে ছলচাতুরী শিক্ষা দেওয়া না হয় সে বিষয়ে সাবধান হইবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় দলিল।—ছাত্রদিগকে বিক্রয় কবালা, পাট্টা, কবুলিয়ত, হাওনোট, কর্জপত্র, রেহানী তমঃস্বক, ওকালতনামা প্রভৃতি ৬৭ রকমের দলিল লেখা শিখান যাইতে পারে। তবে এই সকল দলিলের বিষয় ও ভাষা যথাসম্ভব সরল হওয়া আবশ্যিক। নানারূপ ঘোর-ফেরযুক্ত বা অনেকরূপ সম্বন্ধযুক্ত জটিল দলিল লিখাইতে চেষ্টা করিয়া সময় নষ্ট করিও না।

শিক্ষাদানের ধারা।—এক বালককে অগ্র বালকের নিকট তাহার সেট কি ছাতা, কি পুস্তক বিক্রয় করিতে বল। মনে কর, রামচন্দ্র দাস, যত্ননাথ সেনের নিকট তাহার সেট বিক্রয় করিল। যত্ন, রামকে ১২টা পয়সা দিল। এখন যত্নকে বল, “এই সেট যে রামের, তাহা মধু, ইয়াসিন ও প্রিয়নাথ জানে; কিন্তু ইহারা আজ স্কুলে আসে নাই। কাজেই এই সেট বিক্রয়ের কথা জানিল না। তাহারা যদি কাল তোমাকে চোর বলিয়া ধরে, তবে তুমি কি করিবে?—তুমি যে, কিনিয়া লইয়াছ, একথা যদি তাহারা বিশ্বাস না করে? তাই রামের কাছে থেকে একখানা কাগজ লিখে নাও।” রামের দ্বারা একখানা কাগজ লিখাইয়া লও। মনে কর, রাম এইরূপ লিখিয়া দিল, “আমি যত্নর কাছে সেট বিক্রয় করিলাম।

(দস্তখত) রাম । “এ কাগজ দেখিয়া লোকে বিশ্বাস নাও করিতে পারে । অনেক যত্ন আছে, এ সেট এই যে, যত্নর কাছে বিক্রয় করিতেছে, তার প্রমাণ কি ? তাই তোমার নামটি পুরা করিয়া লিখিয়া লও ।” রাম আবার লিখিল, “আমি যত্নাথ সেনের নিকট সেট বিক্রয় করিলাম । (দস্তখত) রাম” । “এ কোন রাম বিক্রয় করিয়াছে ?” দস্তখতও পুরা করিয়া লেখাও । “রামচন্দ্র দাস” । “আচ্ছা, এই গ্রামেই ত আর এক যত্নাথ সেন আছে, এখন এই সেট যে সেই যত্নাথের নিকট বিক্রয় করা হয় নাই, তার প্রমাণ কি ? কাজেই যত্নর পিতার নাম লেখ ।” রাম পুনরায় লিখিল, “আমি এই সেট শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র সেনের পুত্র যত্নাথ সেনের নিকট বিক্রয় করিলাম । (দস্তখত) শ্রীরামচন্দ্র দাস” । “কেশব-পুরের ঈশানচন্দ্র সেনের পুত্রের নামও যত্নাথ সেন, কাজেই গ্রামের কথাও উল্লেখ কর ।” এইরূপে জেলা, থানা প্রভৃতির আবশ্যকতা শিক্ষা দিতে হইবে । আর এইরূপ কোন্ রামচন্দ্র দাসের নিকট হইতে ক্রয় করা হইল, তাহারও পরিচয় থাকা আবশ্যক । কাজেই শেষে রসিদখানা এইরূপ দাঁড়াইবে :—

শ্রীযুক্ত যত্নাথ সেন, পিতার নাম ঈশানচন্দ্র সেন, জাতি বৈষ্ণব, সাকিন চণ্ডীপুর, জেলা নদীয়া, বরাবর—

আমি শ্রীরামচন্দ্র দাস, পিতার নাম শ্রীমদনচন্দ্র দাস, জাতি কায়স্থ, সাকিন হরিশপুর, জেলা পাবনা, এই স্বীকার করিতেছি যে আমি আপনার নিকট তিন আনা পাইয়া আমার সেট বিক্রয় করিলাম । তারিখ ১৫ই পৌষ, ১৩১৪ বাং ।

শ্রীরামচন্দ্র দাস ।

এই প্রণালীতে দলিলের পাঠ শিখাইতে হইবে । দলিলে লিখিত ইংরেজী ও পার্শি কথাগুলির অর্থ শিখাইয়া দেওয়া উচিত । মিন্নলিখিত শব্দগুলি আবশ্যক মত শিখাইলেই চলিবে :—

জমিদারী, তালুক, পত্তনি, ইজারা, প্রজা, খাজনা, জোত, লাখিরাজ, ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, পীরোত্তর, কিস্তি, বাস্তু, খামার, মাঠান, শালিজমি, হুনাঙ্গমি, আউল, স্বেয়ল, দুয়েল,

চাহারাম, পতিতজমি, জলকর, শীকস্তি, পয়স্তি, পাট্টা, কবুলিয়ত, কবলু, খত, তমঃসুক, রেহান, বন্ধক, মোরসী, কায়েমী, জরিপ, জমাবন্দি, চৌহদ্দি, নক্সা, উত্তরাধিকারী, বকলম, মোকাম, সাকিন, গ্রাম, পরগণা, থানা, জেলা, ডিষ্ট্রিক্ট, রেজেষ্ট্রারী ষ্ট্যাম্প । পার্শ্ব শব্দ ক্রমেই বাদ দেওয়া হইতেছে । পেছরে ও জওজে প্রভৃতি কথার চলন উঠিয়া যাইতেছে । ওয়ারিসান কথার পরিবর্তে উত্তরাধিকারী ও পেশার পরিবর্তে বাবসায় লেখা হইয়া থাকে । বাহাল, তবিয়াত, কচায়েন, দরবস্তহকুক প্রভৃতি অনেক কথা একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে ।

নিম্নে সরল দলিলের একখানি আদর্শ প্রদত্ত হইল :—

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ সিংহ, পিতার নাম মৃত গোলকচন্দ্র সিংহ, জাতি কায়স্থ, ব্যবসায় চাকুরী, সাকিন রমানাথপুর, থানা বিষ্ণুপুর, জেলা বীরভূম, বরাবরোধু—

লিখিতঃ শ্রীরাজীবলোচন রায়, পিতার নাম মৃত গৌরগোবিন্দ রায়, জাতি বৈদ্য, ব্যবসায় চিকিৎসা, সাকিন বেঙ্গতলা, থানা নন্দিগ্রাম, জেলা বীরভূম, ভূমি বিক্রয় কবলা পত্রসিদ্ধ কার্যকাণ্ডে, আমার কন্ঠার বিবাহের জন্ত টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতে আমি আমার নিজ গ্রামের অন্তর্গত নিম্নের চৌহদ্দিহিত অনুমান ২৥ বিঘামত এক খণ্ড মোরসী জমি মহাশয়ের নিকট ৫০০ পাঁচ শত টাকা লইয়া বিক্রয় করিলাম । অতঃ হইতে মহাশয় আমার স্বত্ব স্বত্বান হইয়া এই জমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগদখল করিতে থাকুন । আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ এই জমিতে কোনরূপ দাবী দাওয়া করিতে পারিব না ও পারিব না । মূল্যের সমস্ত টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া স্বহস্ত শরীরে ও সরল মনে এই বিক্রয় কবলা লিখিয়া দিলাম । ইতি তারিখ ২৭শে চৈত্র, সন ১৩১৪ সাল ।

চৌহদ্দি ।

পূর্বে রামকুমার চক্রবর্তীর বসন্ত-বাড়ী, দক্ষিণে বহুনাথ দেব বাগান, পশ্চিমে হরিলাল ঘোষ ও কেশবলাল ঘোষের মাঠান জমি, এবং উত্তরে মনাই নদী । এই চৌহদ্দির মধ্যে অনুমান ২৥ বিঘা জমি ।

লেখক	সাক্ষী
শ্রীরোহিণীলাল অধিকারী	শ্রীবামনদাস রায়
মাং চুর্গাপুর	মাং হরদবাড়ী
	শ্রীইয়াগিন আলি
	মাং নাজিরা

কথোপকথন ।—বালকগণ যদি নিজ নিজ জেলার প্রচলিত বাক্যকথনের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতার ভাষা অনুকরণ করে,

তবে বাক্যকথনের সঙ্গে সঙ্গে রচনারও যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে, কারণ পুস্তকাদি সমস্তই কলিকাতার ভাষায় রচিত। শিক্ষক নিজে কলিকাতার ভাষায় কথা বলিবেন, আর ছাত্রগণকেও সেই ভাষায় কথা বলিতে অভ্যাস করাইবেন। আর এক কথাও মনে রাখা কর্তব্য যে, ভিন্ন ভিন্ন জেলার শিক্ষিত সম্প্রদায় একত্র হইলে, তাঁহারা সকলেই কলিকাতার ভাষায় কথাবার্তা বলিয়া থাকেন। সুতরাং শিক্ষিত সমাজে মিশিতে হইলেও কলিকাতার ভাষায় কথা বলিতে অভ্যাস করা কর্তব্য। বক্তৃতা, কথকথা, অভিনয় প্রভৃতিতে কলিকাতার ভাষাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

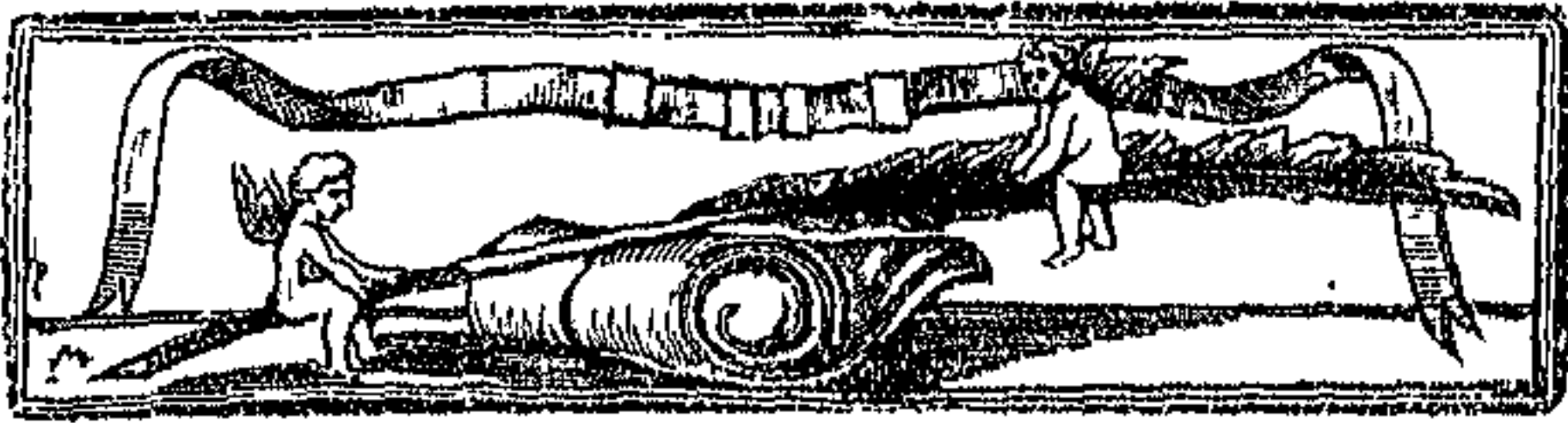
গীহারী এই মতের বিরুদ্ধ, তাঁহাদিগের চিন্তার জন্ম চন্দ্রনাথ বসু লিখিত “বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি” নামক পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল :—

“কলিকাতা অঞ্চলের ভাষাই সমস্ত বাঙ্গালীর আদর্শ ভাষা হওয়া উচিত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় নদীয়ার ভাষাই বঙ্গের আদর্শ ভাষা বলিয়া গণ্য হইত। অতএব কলিকাতার ভাষাকে এখন বঙ্গের আদর্শ ভাষা জ্ঞান করিলে, আমাদের রীতি ও ইতিহাসসম্বন্ধত কার্যাই করা হইবে। সুতরাং পূর্ববঙ্গ যদি কলিকাতার ভাষাকে আদর্শ বলিয়া স্বীকার করেন, এবং তাহারই রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তাহা হইলে গৌরবহানি বা হীনতা ঘটিল ভাবিয়া তাঁহার মনঃকষ্ট পাইবার কারণ থাকিবে না। রাজধানীর সম্মান সকল দেশেই আছে, সকল লোকেই করে। বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রকৃত সাহিত্যে পরিণত করিতে হইলে, উহাকে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির একতামাধক শক্তি করিয়া তুলিতে হইলে, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ সমস্ত বঙ্গকে এক ভাষায় কথা কহিতে হইবে। এক জাতির মধ্যে ভাষার প্রভেদ, সাংঘাতিক প্রভেদ। এ প্রভেদ তুলিয়া দিতে সময় আবশ্যক, অনেককে অনেক কষ্টও পাইতে হইবে। তথাপি এ প্রভেদ আমাদিগকে তুলিয়া দিতেই হইবে।”

প্রত্যেক ভাষায় দিন দিন উপন্যাসের সংখ্যা এতবৃদ্ধি হইতেছে যে লেখ্য ভাষা ও কথ্য ভাষার সম্মিলন অবশ্যস্বাভাবী। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে অনেক প্রবন্ধ কথোপকথনের প্রণালীতে লিখিত হইতেছে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই কথোপকথন

প্রচলনের উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিয়া লেখা ভাষাতেই / কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কথোপকথনের ভাষাকে ক্রমশঃ মার্জিত করিয়া লেখা ভাষার দিকে উঠাইয়া লইতে হইবে ও লেখা ভাষাকে ক্রমশঃ সহজ বোধ্য করিয়া কথ্য ভাষার দিকে নামাইয়া আনিতে হইবে— ইহাই বর্তমান সময়ের সাহিত্যিকগণের অভিমত। ইহা না করিতে পারিলে লেখা ভাষা চিরদিনই সাধারণের পক্ষে অবোধ্য থাকিয়া যাইবে ও সাধারণের মধ্যে ভাষার সাহায্যে জ্ঞান প্রচারের বাধা জন্মাইবে। বর্তমান সময়ে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন প্রভৃতি লেখকগণের পুস্তকাদিতে ভদ্রবরের স্ত্রীপুরুষের কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাই আদর্শ করিতে হইবে।

প্রভাত বাবুর পুস্তক হইতে একটি কথ্যভাষার বাক্য গ্রহণ করা যাউক :—“মেয়ের বিয়ের জন্ত কত জমালে ?”—ইহাই বর্তমান বাক্যকথন ভাষার আদর্শ। ইহা বাঙ্গলা, সংস্কৃত অপভ্রংশ ও যাবনিক ভাষার শব্দে রচিত। বর্তমান সময়ের লেখাভাষার আদর্শে এইবাক্য এইরূপ দাঁড়াইবে :—“মেয়ের বিবাহের জন্ত কত জমা করিলে ?” এখন উর্দু, পার্শি, ইংরাজী শব্দ লেখা ভাষাতেও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দে সন্ধি সমাস করাও আর তেমন দোষের বলিয়া ধরা হয় না। ইংলণ্ডেশ্বর, মেগাক্রান্ত, কবালানুযায়ী প্রভৃতি শব্দ ভাষায় চলিয়া গিয়াছে। সাবেকী বাঙ্গলায় (বিজাসাগর যুগের) যাবনিক শব্দ ব্যবহার বিধিবিরুদ্ধ ছিল। উদ্ধৃত বাক্য সাবেকী বাঙ্গলায় লিখিতে হইলেন এইরূপ হইবে :—“কন্য়ার বিবাহের জন্ত কত সঞ্চয় করিলে ?”



চতুর্থ প্রকরণ—গণিত বিষয়ক ।

১। পাটীগণিত ।

পাটীগণিত শিক্ষার উপকারিতা ।—(১) বিচারশক্তিকে বলবতী করে । ‘এক আর এক দুই’, ‘দুই আর এক তিন’, সমান সংখ্যার সহিত সমান সংখ্যা যোগ করিলে ফলও সমান সংখ্যাই হয়, ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্যাস বিচার মনকে বৃহৎ বিচারের পথ প্রদর্শন করে । (২) সত্য নির্ধারণের সহায়তা করে । অসত্যের একরূপ প্রবল শক্তি আর কিছুই নাই । ৪ হইতে ২ বাদ দিলে ২ ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে না, $৩ \times ৫ = ১৫$ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না । এ সমস্ত সত্য সর্ব দেশে, সর্ব সময়ে এবং সর্ব বিষয়েই সমভাবে প্রযোজ্য । এ সত্যের পরীক্ষাও অতি সহজ, অল্পবুদ্ধি বালকও সহজে পরীক্ষা করিয়া এ বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে পারে । (৩) মনোযোগ বৃদ্ধির বিশেষ সাহায্য করে । একটু অমনোযোগী হইলেই প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে । (৪) আত্ম-শক্তির বোধ জন্মায় । একটু কঠিন অঙ্ক কসিতে সমর্থ হইলেই ‘বালকের কমন একটু আনন্দ হয় ; সে বুঝিতে পারে যে তাহারও বুদ্ধিশক্তি কঠিন’

বিষয় নির্ধারণে সক্ষম। সাংসারিক কাজকর্মে ইহার যে প্রকার আবশ্যকতা, তাহার বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। প্রতাহই প্রতি সংসারে সামান্য বাজার খরচ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আয়-বায়ের হিসাব এই পাটীগণিতের সাহায্যেই পরিচালিত হইতেছে। আবার ব্যবসায়, বাণিজ্য, বিজ্ঞান আলোচনায়, জটিল শিল্পে পাটীগণিতই প্রধান সতায়।

পাটীগণিত শিক্ষাদানে কয়েকটি কথা।—নূতন শিক্ষক প্রতিপত্তি লাভের প্রত্যাশায় কঠিন অঙ্ক দ্বারা বালকগণকে বিব্রত করিতে চেষ্টা করেন। বালকেরা না পারিলে তিনি নিজে কসিয়া দিয়া বাহাদুরী লাভ করিয়া থাকেন। এই রোগ মধ্য মধ্যে পুরাতন শিক্ষকেও দেখিতে পাওয়া যায়। বালককে কঠিন অঙ্ক কসিতে দিয়া, তাহার অঙ্কশাস্ত্রানুশীলনের প্রবৃত্তি নষ্ট করিয়া দিতে নাই। আবার অনেক শিক্ষক ও পবীক্ষকের ছেলে ঠকান একটা রোগ আছে। বালককে শিখাইতে হইবে, ঠকাইতে হইবে না; সে কি জানে, তাহারই পরীক্ষা করিতে হইবে; সে কি জানে না, তাহার পরীক্ষা করিতে হইবে না। অনেক বালক শিক্ষকের দোষে অঙ্কশাস্ত্রে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। সকল বালক জটিল অঙ্ক কসিতে সক্ষম হয় না বটে, তবে সুবিবেচক পরীক্ষকগণ পরীক্ষায় যেরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাহাতে শতকরা ৯৯ জন ছাত্রকে যে সহজেই উত্তীর্ণ করান বাইতে পারে, ইহাতে আর ভুল নাই। আবার সময় সময় শিক্ষকগণ বালকগণকে কেবল নিযুক্ত রাখিবার জন্তই একটা স্ববৃহৎ গুণ বা ভাগের অঙ্ক দিয়া কার্যাস্তরে গমন করেন। ইহাতেও বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। বালকেরা স্বভাবতঃ চঞ্চলপ্রকৃতি, অধিকক্ষণ এককার্যে মনোনিবেশ করিয়া রাখিতে পারে না; সুতরাং অঙ্কের প্রতি একটা বিরক্তি জন্মে। এই জন্ত কঠিন ও জটিল অঙ্ক খুব সাবধানে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ভারপর শিক্ষকের অসাবধানতায় আর একটা দোষ ঘটিয়া থাকে। এক বালক অপর এক বালকের অঙ্ক নকল করিয়া শিক্ষককে ঠকাইতে চেষ্টা করে। বাহাতে এক বালক অল্প বালকের কোনরূপ সাহায্য না পায়, সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম প্রভৃতি বালকগণকে একটা অঙ্ক, ও দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি বালকগণকে তদ্রূপ অপর একটা অঙ্ক কসিতে দিলে পরস্পরে নকল করিতে পারে না। অথবা এক বেঞ্চের উপরেই প্রথম এক জনকে এক মুখে ও দ্বিতীয় জনকে অপর মুখে (প্রথম জনকে উত্তর মুখ করিয়া দ্বিতীয়কে দক্ষিণ মুখ করিয়া, ইত্যাদি) বসাইলেও নকল নিবারণ করা যায় বা যদি সেটে অঙ্ক কষার ব্যবস্থা হয়, তবে একটু ফাকে ফাকে দাঁড় করাইয়া দিলেও বেশ

হয় । কোন প্রকৃতির যাহাতে নকলের সুবিধা না পায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে । “নকল করিও না” বলিয়া উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা নকলের সুবিধা না দেওয়াই শ্রেয়ঃ । নকলে বালকের আত্মশক্তি নষ্ট হইয়া যায় । তবে আবশ্যক হইলে এক বালক অপর বালককে প্রকৃষ্টভাবে সাহায্য করিতে পারে । বালকেরা বালকের নিকট মন খুলিয়া নিজের অভাব জানাইতে পারে ও বালকেরাও বালকের অভাব সহজে বুঝিতে পারে । এইজন্য অনেক সময় শিক্ষকের ব্যাখ্যা অপেক্ষা বালকের সহপাঠী অপর বালকের ব্যাখ্যা তাহার মনঃপূত হইয়া থাকে ।

একটি নূতন নিয়ম শিখাইয়া বালকগণকে সেই নিয়মের সহজ সহজ যথেষ্ট অঙ্ক কমান আবশ্যক । প্রথম অবস্থায় জটিল অঙ্ক সর্বথা পরিত্যজ্য । প্রথম চার নিয়ম শিক্ষার পরে যখন ভগ্নাংশাদি কসিতে আবশ্য করিবে, তখন প্রথম চারি নিয়মের জটিল অঙ্ক মধ্যে মধ্যে কমান যাইতে পারে । জটিল অঙ্কের প্রচুর পরিণক বুদ্ধি আবশ্যক । তারপর জটিল অঙ্ক কসাইবার সময়ও, সহজ বাছিয়া লইতে হইবে । একেবারে বিয়ম জটিল অঙ্ক দিয়া বালকের বুদ্ধিভ্রম জন্মান উচিত নহে । আবার জটিল তক্ষে, অধিক পরিমাণ কঠিন গুণ ভাগ থাকা অত্যাশ । যেখানে বুদ্ধির অধিক আবশ্যক, সেখানে পরিশ্রমের মাত্রা কম হওয়া বুদ্ধিসঙ্গত । “রাম যদুর নিকট হইতে ৫৩৮৮৮/৩৯ কড়া কর্জ করিয়া ২ দিন ১৫৮/৮ গড়া করিয়া ও আর একদিন ৫০০০/১১ শোধ করিল । তাহার আর কত দেনা রহিল ।” এই অঙ্কে বুদ্ধি ও পরিশ্রম দুইই আবশ্যক । এই অঙ্কে পণ, কড়া, গড়া বাদ দেওয়াই বুদ্ধি-সঙ্গত । অন্ততঃ পক্ষে কড়া ও গড়া বাদ দেওয়া ত নিতান্তই আবশ্যক ।

বালকদিগের বয়স দৃষ্টে অঙ্কের ব্যবস্থা করিতে হইবে । নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে শত, উচ্চ প্রাথমিকে হাজার ও ছাত্রবৃত্তিতে লক্ষের অধিক সংখ্যা দ্বারা গুণ ভাগ করাইবে না । এইরূপ অত্যাশ অঙ্ক সম্বন্ধেও ব্যবস্থা করিয়া লইবে ।

পাটীগণিতের পুস্তকে যেরূপ ধারাবাহিকরূপে কঠিন হইতে কঠিনতর অঙ্ক মাজান থাকে বা এতি পরিচ্ছেদে যতগুলি অঙ্ক থাকে তাহার যে সমস্তই সেই শৃঙ্খলাক্রমে কসাইতে হইবে তাহার কোন আন্যায়কতা নাই । অঙ্কগুলি শ্রেণীর উপযোগী দেখিয়া বাছিয়া লইবে ও বিদ্যালয়ের সময় বিনোদনায় যতগুলি অঙ্ক কসাইতে পারিবে তাহা নির্ধারণ করিয়া লইবে ।

কি জটিল, কি সরল—অনেকগুলি অঙ্ক কসাইয়া বালকগণকেও তদ্রূপ অঙ্ক প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিতে হইবে । একদিনে নানা রকমের অঙ্ক না কসাইয়া এক রকমের

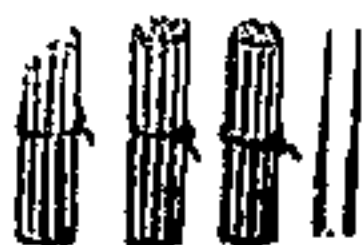
অনেকগুলি অঙ্ক কমান আবশ্যক । নিম্ন প্রাথমিকে প্রত্যাহ অঙ্ক/টা উচ্চ প্রাথমিকে ৪৫ মিনিট ও ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ১ ঘণ্টা অঙ্ক কসাইলেই যথেষ্ট হইবে ।

বাড়ীতে অঙ্ক কসিতে দিলে নিম্ন প্রাথমিকের ছাত্রগণকে ১টা, উচ্চ প্রাথমিকের ছাত্রগণকে ২টা ও ছাত্রবৃত্তির ছাত্রগণকে ৩টার অধিক দেওয়া উচিত নহে । বাড়ীতে কঠিন অঙ্ক কসিতে দিবে না । বাহাতে স্বল্প-সময়ে সুশৃঙ্খলার সহিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া একেবারেই সঠিক উত্তর সমাধান করিতে পারে সেইরূপ ভাবে বালকগণকে উৎসাহিত করিবে । (বালকগণের অঙ্কের খাতার নমুনা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

সংখ্যা লিখন ও পঠন ।—সংখ্যা শিক্ষা দ্বিবার পদ্ধতি কিণ্ডার-গার্টেন ও ধারাপাত প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে । লিখন ও পঠনের কথাও উক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে । কাঠী, বীজ, ফুল পাতা প্রভৃতির দ্বারা শিখাইলে যে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ফলপ্রদ হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই । শিক্ষক কাঠী, ফুল ও পাতার সাহায্যেই বালকগণকে এক শতকের অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দিবেন । যথা—৩২ লেখ

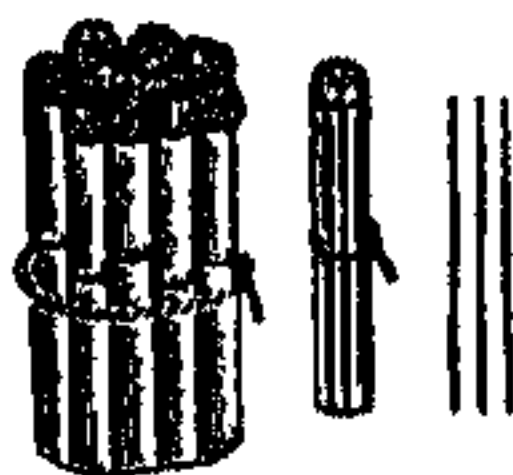
কাঠীর দ্বারা

অঙ্কের দ্বারা



৩২

১১৩ লেখ



১১৩

৫১, ৫২, ৫৩ চিত্র ।—কাঠীর দ্বারা অঙ্ক লেখা ।

তারপর শিক্ষক এইরূপ কাঠীর বা পাতার গুচ্ছের দ্বারা সংখ্যা সাজাইয়া বালকগণকে পড়িতে বলিবেন ও অঙ্কের দ্বারা লিখিতে বলিবেন । এই

প্রণালীতে শতকের সংখ্যা পর্যন্ত শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে । তাহার পরে বস্তু ছাড়িয়া কেবল সংখ্যার সাহায্যেই শিক্ষাদান চলিতে পারে ।

সোজাসুজি ১, ২, ৩, ৪ লেখা যেমন শিক্ষা দিবে, সেইরূপ ২, ৪, ৬, ৮ প্রভৃতি জোড় ও ১, ৩, ৫, ৭.....প্রভৃতি বিজোড় সংখ্যা পড়া ও লেখা শিখাইবে । তারপর ৪, ৮, ১২, ১৬.....প্রভৃতি অঙ্কের (চারবার করিয়া) পড়া শিখাইবে । ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫.....তিন তিন করিয়া ও ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫ প্রভৃতি অঙ্ক পাঁচ পাঁচ করিয়া পড়াইবে । এইরূপ গণনা অভ্যাস হইলে কড়া, গণ্ডা, পণ, ক্রান্তি প্রভৃতির শিক্ষাদান খুব সহজ হইবে ।

শতকের সংখ্যাপাতে প্রথম প্রথম কাঠীর সাহায্য লওয়া যাইতে পারে কিন্তু হাজারের শিক্ষায় কাঠীর আবশ্যকতা নাই । একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটী—সংখ্যাপাতের এই ধারা প্রচলিত । কিন্তু কার্য্যে এ ধারা বা নাম অবলম্বিত হয় না । সেই জন্য এই ধারা পরিত্যাগ করিলে কার্য্যের সুবিধা হইবে । এখন একক, দশক, শতক, হাজার, দশ হাজার, লক্ষ, দশ লক্ষ, কোটী—এইরূপ সংখ্যাপাত কার্য্যে প্রচলিত । সুতরাং ইহাই শিখাইতে হইবে ।

গ্রাব সাহেবের প্রণালী ।—গ্রাব সাহেবের প্রণালী অবলম্বনে সংখ্যা শিক্ষা দিলে, প্রথম হইতেই যোগাবয়োগ ও গুণভাগের কতকটা আভাস দিতে পারা যায় । অনেক শিক্ষক এই প্রণালীকে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন । তবে সকল প্রণালীর প্রয়োগই শিক্ষকের পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে । যাহা হউক, নিম্নে গ্রাব সাহেবের প্রণালী বিবৃত হইল :—

‘এক’ শিক্ষা দিবার প্রণালী ।

১। একটা কাঠি হাতে লও, এক হাত তোল, একটা আঙ্গুল দেখাও, একখান স্ট্রট, রাখ, ইত্যাদি ।

সেউটের উপর একটা দাগ কাট, একটা বিন্দু আঁক, একটা ফেঁগের চিহ্ন দাও, ইত্যাদি। ব্ল্যাক বোর্ডেও ঠিক সেউটের অনুরূপ চিহ্নাদি কর।

২। তোমার টেবিলের উপর একটা কাঠী রাখ; তুলিয়া লও কয়টা থাকিল ?

সেউটে একটা দাগ কাট, মুছিয়া ফেল, কয়টা দাগ থাকিল ?

৩। বালকগণকে ব্ল্যাক বোর্ডের নিকট যাইতে বল। একটা দাগ কাটিতে বল। তারপর '১' লেখা দেখাইয়া দাও ও লেখাইয়া লও। (লেখা শিক্ষা দিবার প্রণালী ২৪• পৃষ্ঠায় দেখ)

‘দুই’ শিক্ষা দিবার প্রণালী।

১। প্রত্যেকেই একটা করিয়া কাঠী লও—ডেস্কের উপরে রাখ, আর একটা লও, আগের কাঠীর পাশে রাখ। কয়টা কাঠী ?

সেউটে একটা দাগ কাট, পাশে আর একটা দাগ কাট—কয়টা দাগ কাটিলে ?

ব্ল্যাক বোর্ডে একটা দাগ কাট; আর একটা দাগ কাট—কয়টা দাগ ?

একবার হাততালি দাও, আর একবার হাততালি দাও—কয়বার হাততালি দিলে ?

২। গণনা—ডেস্কের উপর একটা কাঠী রাখ, একটু দূরে এক সঙ্গে আর দুইটা কাঠী রাখ। এখন গণ (বাম হইতে ডান দিকে) ‘এক’, ‘দুই’ (ডান হইতে বাম দিকে) দুই, এক।

সেউটে এইরূপ দাগ কাট | | |, পড়।

বোর্ডেও এইরূপ দাগ কাট আর পড়।

৩। যোগ—ডেস্কের উপর পাশাপাশি দুইখানি কাঠী রাখিয়া হিজ্যাসা কর, কয়খানি কাঠী রাখা হইয়াছে ? একখান কাঠী, আর একখান কাঠীতে কয়খান কাঠী হয় ? উত্তর—“একখান কাঠী আর একখান কাঠীতে দুইখান কাঠী হয়।” দুইখান পুস্তক। সেউটে পেন্সিল প্রভৃতির দ্বারাও এইরূপ অনুরূপ করিবে। সেউট ও ব্ল্যাক বোর্ডে পাশাপাশি দুইটা দাগ কাট। এই একটা দাগ, আর এই একটা দাগ, কয়টা দাগ হইল ? বিন্দু ও অশ্রুচিহ্নের দ্বারাও এইরূপ পরীক্ষা করিবে।

৪। নিয়োগ—ডেস্কের উপর দুইটা পয়সা রাখ, একটা তুলে লও, কয়টা পয়সা থাকিল ? উত্তর—একটা পয়সা থাকিল। দুইটা পয়সা থেকে একটা পয়সা তুলে নিলে, কয়টা পয়সা থাকে ? উত্তর—দুইটা পয়সা থেকে একটা পয়সা গেলে, একটা পয়সা থাকে।

এইরূপ অঙ্কান্ত্র প্রদেয় দ্বারা । সেটের উপর দুইটা দাগ কাট ; একটা মুছিয়া ফেল, কয়টা থাকিল ? দুইটাই মুছিয়া ফেল, কয়টা থাকিল ? উত্তর—একটাও থাকিল না ।

৫ । গুণ—একটা পয়সা রাখ, আর একটা পয়সা রাখ । একটা পয়সা ক'বার বাখিলে ? উত্তর—‘একটা পয়সা দুবার রাখিলাম ।’ সেট ও বোর্ডে দাগ কাটিয়া ইত্যাদিরূপ প্রশ্ন করিবে । ১কে দুইবার লইলে ২ হয় ।

৬ । ভাগ—ডেস্কের উপর দুইটা পয়সা রাখ । দুইটা বালককে ডাকিয়া দুইজনকে দুইটা পয়সা দাও । রাম কয়টা পয়সা পাইয়াছে ? যত্ন কয়টা পয়সা পাইয়াছে ? দুইটা পয়সা যদি দুইজন বালকে ভাগ করিয়া লয়, তবে এক এক জনে কয়টা করিয়া পায় ?

৭ । তুলনা—রামকে একটা পয়সা দাও আর যত্নকে দুইটা পয়সা দাও । রামের একটা পয়সা ? যত্নের ? রামের চেয়ে যত্নের কয়টা বেশী ? দুই, একের চেয়ে কত বেশী ? যত্নের চেয়ে রামের কয়টা কম ? এইরূপ দাগ কাটিয়া সেটে ও বোর্ডে দেখাও ।

৮ । কাজের হিসাবে যোগ—রাম ক'বার একটা করিয়া সন্দেশ খায় ? সকালবেলা একটা সন্দেশ খায়, আর সন্ধ্যাবেলা একটা । সে কয়টা সন্দেশ খায় ?

নিয়োগ—রামের দুইটা মার্বেল ছিল—একটা পুকুরের মধ্যে পড়িয়া গেল—আব কয়টা রহিল ?

গুণ—যত্ন সাছ ধব্তে গেল—দুইবার এক পুঁটীমাছই পাইল—সে কয়টা পুঁটী ধরেছিল ?

ভাগ—দুইজন বালক যদি দুইটা কুল ভাগ করিয়া নেয়, তবে এক একজনের ভাগে কয়টা করিয়া কুল পড়ে ?

এই প্রকার প্রত্যেক রকমের অন্ততঃ ১০টা দৃষ্টান্ত প্রস্তুত করিয়া বালকগণকে শিক্ষা দান কর ।

৯ । ‘দুই’ অঙ্কের লেখা শিখাও । প্রথমে এইরূপ ১. দুই খণ্ড করিয়া তার পর একত্রে ২ ।

১০ । $+$ $-$ $\times$ $\div$ $=$ চিহ্নগুলির অর্থ সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া বোর্ডে ও সেটে এইরূপ অঙ্কাদি কসাও :-

দাগের দ্বারা

$$1 + 1 = 2$$

$$2 - 1 = 1$$

$$1 \times 2 = 2$$

$$2 \div 2 = 1$$

অঙ্কের দ্বারা

$$1 + 1 = 2$$

$$2 - 1 = 1$$

$$1 \times 2 = 2$$

$$2 \div 2 = 1$$

‘ছয়’ শিখাইবার প্রণালী।

১। সূচনা।

(ক) এক লাইনে ৬ খানি কঠী মাজাও। বাম হইতে ১, ২, ৩ ইত্যাদি পড় ও ডাইন হইতেও সেইরূপ পড়।

(খ) সেট বা ব্ল্যাক বোর্ডে ৬টি দাগ কাট ।।।।।।—বাম ও দক্ষিণ হইতে গণনা কর।

(গ) ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ অঙ্কগুলি বোর্ডে লেখ। বাম হইতে ও ডাইন হইতে পড়।

২। যোগ।

১+১	১+২	১+৩	১+৪	১+৫
২+১	২+২	২+৩	২+৪	
৩+১	৩+২	৩+৩		
৪+১	৪+২			
৫+১				

৩। বিয়োগ।

১-১				
২-১	২-২			
৩-১	৩-২	৩-৩		
৪-১	৪-২	৪-৩	৪-৪	
৫-১	৫-২	৫-৩	৫-৪	৫-৫
৬-১	৬-২	৬-৩	৬-৪	৬-৫

৪। বিশ্লেষণ।

১+১+১+১+১+১=৬	৬=২+২+১+১
২+১+১+১+১=৬	৬=২+২+২
৩+১+১+১=৬	৬=১+২+৩
৪+১+১=৬	৬=৩+৩
৫+১=৬	৬=৪+২

৫। গুণ ।

১×১	২×১	৩×১	$৩ \times ১ \times ২ = ৬$
২×১	২×২	৩×২	$১ \times ২ \times ৩ = ৬$
৩×১	২×৩		$২ \times ৩ \times ১ = ৬$
৪×১			
৫×১			
৬×১			

৬। ভাগ ।

$২ \div ২ = ১,$	$৩ \div ৩ = ১$	$৪ \div ৪ = ১$
$৩ \div ২ = ১, ১$ অবশিষ্ট	$৪ \div ৩ = ১, ১$	$৫ \div ৪ = ১, ১$
$৪ \div ২ = ২,$	$৫ \div ৩ = ১, ২$	$৬ \div ৪ = ১, ২$
$৫ \div ২ = ২, ১$ অবশিষ্ট	$৬ \div ৩ = ২$	
$৬ \div ২ = ৩$		ইত্যাদি

৭। বিবিধ প্রশ্ন ।

১। রামের দুইটি পয়সা, যদুর দুইটি পয়সা, হরির দুইটি পয়সা আছে। সকলের পয়সা একত্র করিলে কয়টা পয়সা হয় ?

২। ৬টি কলা কিনিয়াছিলাম, ২টি বাদরে খাইয়াছে আর ১টি ইন্দুরে খাইয়াছে। যতটা কলা আছে ?

৩। ৬টি মার্বেল তিনজনকে ভাগ করিয়া দেও প্রত্যেককে কটা কুরিয়া পাইল ?

৪। আমার ৫টি পেন্সিল ছিল—তার ২টি হারাইয়া গেল—১টি ভাঙ্গিয়া গেল—বার আমি ৪টি কিনিলাম। এখন কয়টি পেন্সিল আছে ? ইত্যাদি

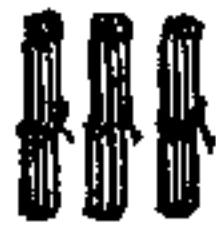
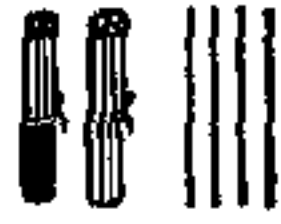
৮। মৌখিক ভগ্নাংশ ।

২ এর $\frac{১}{২} = ১$	২ এর $\frac{১}{২} = ১$	$১ \times ১ =$ কত ?
৩ " $\frac{১}{৩} = ১$	৩ " $\frac{১}{৩} = ১$	$২ \times ১ =$
৪ " $\frac{১}{৪} = ১$	৪ " $\frac{১}{৪} = ১$	$৩ \times ১ =$
৫ " $\frac{১}{৫} = ১$	৫ " $\frac{১}{৫} = ১$	$৪ \times ১ =$
৬ " $\frac{১}{৬} = ১$	৬ " $\frac{১}{৬} = ১$	

এইরূপে ১। ও ২। দ্বারা গুণও শিখাইতে পারা যায়।

বুদ্ধিমান শিক্ষকগণ এই তিন অঙ্কের প্রণালী দৃষ্টে অস্থায়ী আঁ, শিক্ষার প্রণালী নির্ধারণ করিয়া লইতে পারিবেন ।

কাঠির সাহায্যে যোগ বিয়োগ শিক্ষা ।—টেবিলের উপর



কতকগুলি কাঠি ছড়াইয়া রাখ । বালকগণকে একটা একটা করিয়া গণনা করিতে বল । দশটা হইলেই একটা করিয়া আটাঁ বাঁধিতে বল । কতগুলি হইল ? (মনে কর) ৫ আটাঁ, আর ৩টা ;—৫ আটাঁতে ৫০, আর ৩টা, ৫৩ । তারপর পার্শ্বের চিত্র অনুসারে কাঠি সাজাইয়া দাও ও যোগ করিতে বল ।

আলুগা কাঠিগুলি ক্রমে ক্রমে গণিয়া আটাঁ বাঁধ । এক আটাঁ হইল ও ৩ খান আলুগা থাকিল । এখন এই আটাঁর সহিত আর আটাঁগুলি একত্র করিলে, আটটা আটাঁ হইল ।

৫৪ চিত্র ।—কাঠির দ্বারা যোগ । আট আটাঁ আর তিনটা, ৮৩ হইল । তারপর বোর্ডে ঐরূপ চিত্র দ্বারা আটাঁ আর কাঠি আঁকিয়া দাও এবং যোগ করিতে বল । এবার বোর্ডে যোগ-শেষ-রেখার নীচে, যোগফল লিখিতে বল । যথা—



৫৫ চিত্র ।—কাঠির দ্বারা যোগফল ।

অঙ্ক দ্বারাও ৮৩ লিখিতে বল । বিয়োগ শিক্ষাও এইরূপে দেওয়া যাইতে পারে । টেবিলের উপর কাঠি ছড়াইয়া রাখ, কতগুলি কাঠি আছে গণ— ১২টা কাঠি লইলাম, কয়টা থাকিল ? নিম্নের চিত্রানুসারে কাঠি সাজাও ।



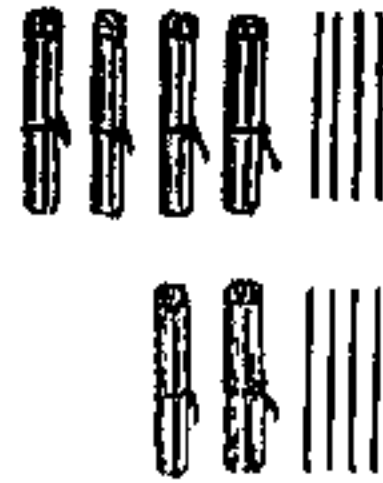
৫৬ চিত্র ।—কাঠির দ্বারা অঙ্ক সাজান ।

৩টি কাঠী সরাও—কয়টি কাঠী থাকিল ? ১৩টি কাঠী সরাও, কয়টি কাঠী থাকিল ? ২৩টি কাঠী সরাও—কয়টি কাঠী থাকিল ? ৮টি কাঠী সরাও—কয়টি কাঠী থাকিল (এবার একটি দশের আঁটা খুলিতে হইবে) ? বোর্ডে কাঠী ও আঁটার চিত্র কর । যথা—



৫৭ চিত্র ।—কাঠির চিত্রে বিয়োগ ।

ইহা হইতে ১৩টি কাঠী লইলে কয়টি থাকিবে দেখাও । ৭টি কাঠী লইলে কত থাকিবে ? ইত্যাদি । তারপর বোর্ডে নিম্নলিখিতরূপ চিত্র অঙ্কন কর, যথা—



৫৮ চিত্র । কাঠির দ্বারা বিয়োগ ।

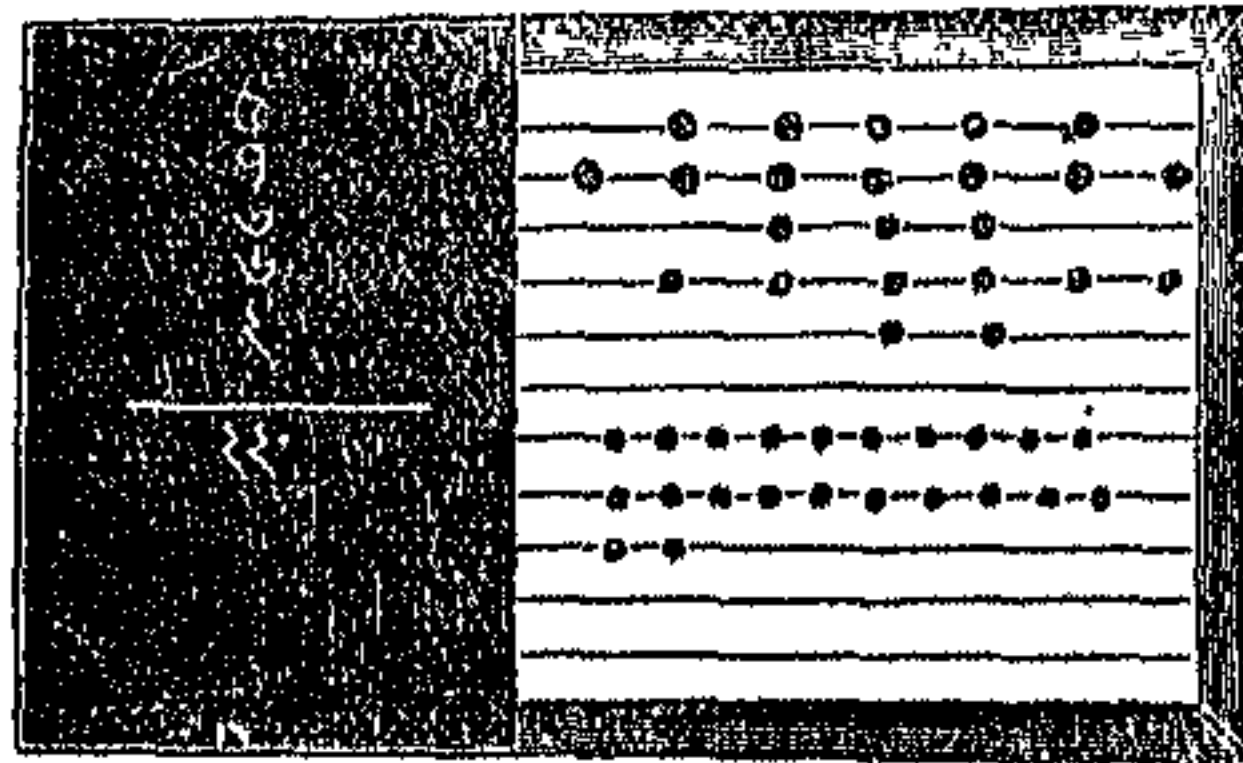
নীচের লাইনে যত কাঠী আছে, উপরের লাইন হইতে তত কাঠী বাদ দিতে হইবে । প্রথমে উপরের ৪টি আল্গা কাঠী ও নীচের ৪টি আল্গা কাঠী মুছিয়া ফেল । ৪টি কাঠী বাদ গেল । নীচে ২টি আল্গা কাঠী থাকিল । তারপর নীচের দুইটি দশের আঁটা ও উপরের দুইটি দশের আঁটা মুছিয়া ফেল । উপরে দুইটি দশের আঁটা থাকিল । যথা :—



৫৯ চিত্র।—বিয়োগ ফল ।

এখন উপর হইতে আরও দুইটা আলগা কাঠী সরাইতে হইলেই একটা আঁটা খুলিতে হইবে। নীচের দুইটা ও উপরের দুইটা পুঁছিয়া ফেল। এক আঁটা ও আটটা কাঠী অবশিষ্ট রহিল। এইরূপে নানা প্রকারে কাঠী সাজাইয়া ও চিত্রাঙ্কন করিয়া যোগ ও বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

বলফ্রেম বা গুঁটীকা যন্ত্রের সাহায্যে যোগ বিয়োগ শিক্ষা।—বলফ্রেম বা গুঁটীকা যন্ত্র নিম্নলিখিতরূপে একটি কাঠের আসবাব :—



৬০ চিত্র—বলফ্রেম বা গুঁটীকা যন্ত্র ।

এক অংশে তত্ত্ব লাগান ও কাল রং করা। তার উপর চকের দ্বারা অঙ্ক লিখিতে পারা যায়। অপর অংশে তার লাগান—তাহার মধ্যে কতকগুলি কাঠের গুঁটা পরান।

এই গুঁটিগুলি সরাইয়া বাম দিকের তত্তা-লাগান-অংশের পশ্চাতে রাখিতে পারা যায় । পশ্চাৎ হইতে সরাইয়া, ইচ্ছানুসারে গুঁটিগুলিকে সম্মুখে আনিতে পারা যায় । চিত্রে প্রথম লাইনে পাঁচটি, দ্বিতীয় লাইনে সাতটি, তৃতীয় লাইনে তিনটি, চতুর্থ লাইনে ছয়টি ও পঞ্চম লাইনে দুইটি গুঁটিকা সরাইয়া আনা হইয়াছে । কতগুলি গুঁটি হইল বালককে গণিতে বল । অপর অংশে, অঙ্কের দ্বারা সেইরূপ লিখিত হইয়াছে । ডানদিকে গুঁটার দ্বারা ও বাম দিকে অঙ্কের দ্বারা যোগফল দেখান হইয়াছে । এই যন্ত্রের সাহায্যে, এক সময়ে জবোর ও সংখ্যার দ্বারা যোগ শিখাইতে পারা যায় । এইরূপেই বিয়োগ শিক্ষা দিতে হইবে ।

(বালক যোগে ভুল করিয়াছে । ২২ স্থানে ২৩ হইবে ও একটা গুঁটি সবিবে ।)

যোগ, বিয়োগ শিক্ষাদানের সাধারণ রীতি ।—কর গণনা করিয়া হিসাব করা ভাল অভ্যাস নহে । যোগের নামতা, অন্ততঃ দশের ঘর পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত । ৭ আর ৫ এ বার, ৯ আর ৬ এ পনর—এই রকম মুখে মুখেই বলিয়া ফেলিবে । যোগের নামতা শিখাইলে বিয়োগ শিক্ষারও সুবিধা হয় । ৬ আর ৪ এ দশ—দশ হইতে ৪ গেলে যে ৬ থাকিবে, তাহা আর পৃথক্ করিয়া শিখাইতে হইবে না ।

কাঠির সাহায্যে যে যোগ শিক্ষার প্রণালী বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতেই সমস্ত কথা বলা হইয়াছে । কেবল “হাতে থাকল দুই”—এই ‘দুই’ কি তাহা বলা হয় নাই । ‘দুই’ অর্থাৎ দুইটি দশের আট বা দুই দশ ; সেইরূপ শতকের ঘরের হইলে দুইটি শতকের আট বা দুই শ । ইহাও কাঠির সাহায্যে বেশ বুঝান যাইতে পারে ।

যে সকল বিয়োগের উপরে বড় রাশি ও নীচে ছোট রাশি থাকে তাহা শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন নয় ।

$$\begin{array}{r} \text{যথা—(১)} \quad \begin{array}{r} ৯ \\ ৬ \\ \hline ৩ \end{array} \quad (২) \quad \begin{array}{r} ৭৪ \\ ৩২ \\ \hline ৪২ \end{array} \quad \begin{array}{r} ৭০ \\ ৩০ + \\ \hline ৪০ \end{array} \quad \begin{array}{r} ৪ \\ ২ \\ \hline ২ \end{array} \quad \begin{array}{r} ৭ \\ ৩ \\ \hline ৪ \end{array} \quad \begin{array}{r} ৪ \\ ২ \\ \hline ২ \end{array} \end{array}$$

কেবল দ্বিতীয় অঙ্কে ইহাই বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, ৭৪, ৭০ আর

৪ ; এবং ৩২, ৩০ আর ২ ; ৭০ হইতে ৩০, ও ৪ হইতে ২/বাদ দিয়া এই অঙ্কের ফল পাওয়া যাইবে । ৭৪ হইতে ৩২ বাদ দিয়া যে ৪ লেখা যায় তাহা ৪০ এর ৪ ।

যেখানে উপরের স্থানে ক্ষুদ্র ও নীচে বড় রাশি থাকে, সেইখানে বিয়োগের প্রণালী শিক্ষা দেওয়া একটু কঠিন । ৭৫ হইতে ৪৮ বিয়োগ করিতে হইবে । কাঠীর দ্বারা ৭৫ সাজাও, তাহা হইতে দশকের ৪টা আটা সরাও । ৪০ বাদ দেওয়া হইল । এখন আলগা ৫টা কাঠী হইতে, ৮টা কাঠী লওয়া যায় না । কাজেই একটা দশের আটা খুলিয়া লও । আলগা ১৫টা কাঠী হইল । ইহা হইতে ৮টা সরাও । ২টা দশের আটা আর ৭টা কাঠী অর্থাৎ ২৭ থাকিল । এইরূপ অঙ্কের দ্বারা শিক্ষা দিবার সময়ও বামের ঘর হইতে একটা দশ সরাইয়া লওয়া হইল, ইহাই মনে রাখিতে হইবে । যথা—

৭৫	৬	১৫
৪৮	৪	৮
২৭	২	৭

৭ হইতে এক দশ সরাইয়া যে ৫ এর সত্ত্বিত যোগ করিতে হইল তাহা বুঝাইয়া দিবে । এই জন্ত উপরে ছোট অঙ্ক থাকিলে তাহাতে ১০ যোগ করিয়া নীচের অঙ্ক অপেক্ষা বড় করিয়া লইতে হয় । ৫ থাকিলে পনর, ৬ থাকিলে ষোল, ৭ থাকিলে সতর, ইত্যাদি অঙ্কের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে ।

যখন বামের অঙ্কের এক দশক সরাইয়া লইলাম, তখন সে অঙ্কেরও এক করিয়া গেল । সুতরাং ৭ কে ৬ মনে করিয়া, তাহা হইতে ৪ বিয়োগ দিয়া, ২ নামাইলাম । এ প্রণালীতে ২।১ দিন অঙ্ক কমান যাইতে পারে । এ প্রণালী * বুঝিবার পক্ষে সহজ ও বুঝাইবার পক্ষে সহজ ; কিন্তু সকল সময় কাজের পক্ষে সুবিধাজনক নহে । যথা—

*. সে কালের পাঠশালার গুরু মহাশয়েরা উপরের লাইনের দশকাদির অঙ্ক হইতে এই দশক সরানকে 'উপর ছাটা', ও নীচের লাইনে ১ যোগ করাকে 'নীচে আটার' নিয়ম বলিতেন ।

$$\begin{array}{r} ৪০০২ \\ ৩৬৫৭ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ৩৮৯১২ \\ ৩৬৫৭ \\ \hline ৩৮৫ \end{array}$$

এই সমস্ত শূন্যের স্থান পূরণ করিয়া লইতে হইলে ৪০০০ হইতে ১০০০ সরাইয়া, তাহা হইতে ১০০ সরাইয়া, তাহা হইতে আবার ১০ সরাইতে হইবে। অনেক হিসাব বাধিয়া গেল। সেই জন্য উপরের অঙ্ক হইতে এক বাদ না দিয়া নীচের অঙ্কে এক যোগ করিয়া লওয়াই সুবিধা। ইহাও বালক-গণকে এক রকমে বুঝাইতে পারা যায়। সেই পূর্বের অঙ্কে, ৭ কে ৬ মনে করিয়া, তাহা হইতে ৪ বাদ দিয়া, ২ রাখিয়াছিলাম। আর ৭কে ৭ই রাখিয়া, ৪কে ৫ মনে করিয়া, ৭ হইতে বাদ দিলেও ২ থাকে। সুতরাং উপর হইতে ১ বাদ দেওয়াতে যে ফল, নীচের অঙ্কে ১ যোগ করাতেও সেই ফল। কাজেই নীচে যোগ করিয়া করাই সুবিধা। এইরূপ নীচে যোগ করিবার সময়ই আমরা বলিয়া থাকি “৮ আর ৭এ পনের পাঁচ; হাতে থাকিলে ১”। উপরের ৫ কে ১৫ মনে করায় যে ১ দশ বেশী ধরা হইয়াছে তাহার পূরণার্থ হাতে ১ (দশ) রাখিয়া নীচের দশকের ঘরে যোগ করিয়া লই। উপর নীচে সমান সংখ্যা যোগ করিলে বিয়োগ-ফলের কোন তারতম্য হয় না। বালকেরা সহজে না বুঝিলে, বুঝাইবার জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিও না—কেবল এই প্রণালীতে অঙ্ক কসাইয়া যাও। আগে কৌশল অভ্যস্ত হইয়া যাউক, শেষে কারণ আপনিই বুঝিবে।

আমাদিগের সাংসারিক কাজ কর্মে যোগের আবশ্যিকতা মর্দ্যাপেক্ষা অধিক। সাংসারিক হিসাব, দোকানের হিসাব, জমিদারীর খাতা পত্র, আফিস আদালতের ফারম, বাবসায় বাণিজ্যের হিসাবে কেবল যোগ—বড় বড় যোগ। সুতরাং বালকের বাহাতে তাড়াতাড়ি ও একবারে ভুল না করিয়া যোগ করিতে পারে, সেই রূপ শিক্ষাদান আবশ্যিক। এ বিষয়ে বিলাতী স্কুলের শিক্ষা উন্নত—সাহেবের ছেলেরা যত তাড়াতাড়ি সাধারণ যোগ গুণ করিতে পারে আমাদিগের ছেলেরা তাহা পারে না। আমরা বালক-দিগকে এমন কঠিন অঙ্ক শিখাইতে চেষ্টা করি, যাহা তাহাদিগের কোন দিন কাজে আসিবে না। মিডিল সার্ভিসের স্তর শক্ত পরীক্ষা আর নাই। এই মিডিল সার্ভিসে

২৪টি (মিশ্র ও অমিশ্র) যোগের অঙ্ক কথিতে দেওয়া হয়—সময় আধঘণ্টা—নম্বর ১০০ ।
অবশ্য এই যোগগুলি খুব বড় বড়—এক একটা অঙ্কে অন্ততঃ ২০টি সংখ্যা । আমাদিগের
কোন পরীক্ষায় যোগ অঙ্ক নাই—আমরা "বিচিত্র গঠন দেউল ও পবন নন্দন" লইয়াই
ব্যস্ত ।

যোগ শিক্ষার বর্তমান ধাৰা বদলাইতে হইবে । যাহাতে কম সময়ে
অধিক কাজ করা যায় তাহার মত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক ।

একটি দৃষ্টান্ত ।—

ডাহিনের স্তম্ভের নীচ দিক হইতে আবস্ত কর । এই ভাবে যোগ

৩৭৪৬ করিতে থাক—৭, ১৫, ১৮, ২৪ (সাবধান—১ আর ৬এ

৮৭৪৩

৭, ৭ আর ৮এ ১৫, ১৫ আর ৩এ ১৮, ১৮ আর ৬এ

৬৯৭৮

১২৫৬

৩০২১

একেবারেই ৭, ১৫, ১৮, ২৪ এইরূপ গণিয়া যাও), ৪

২৩৭৪৪ নামাও হাতের ২ পরের স্তম্ভের নীচে যোগ করিয়া ৪, ৯,

১৬, ২৪ এইরূপ গণিয়া যাও ও ৪ নামাও ইত্যাদি । ইহাতে বার আনা
সময় কম লাগিবে ।

আফিসের খাতা পত্রে লম্বা লম্বা যোগ কসিবার সময়, কেরানীরা এক
কৌশল অবলম্বন করেন । যেখানে একশত হয় সেখানে পেনসিলে একটা
শত অঙ্ক লিখিয়া রাখেন যথা—

২

৮ + ৪ + ৭ + ৯ + ৬ + ৫ + ৮ + ৭ + ৯ + ৪ + ৬ + ৮ + ৭ + ৯ + ৮ + ৯

= ১১৪

এখানে শেষের দিক হইতে যোগ করিতে করিতে ৭এর নিকট আসিয়া
১০২ হইল । এই ২ পেনসিল দিয়া ৭এর উপর লিখিয়া রাখা হইয়াছে ।
ইহার পর এই ২এর সঙ্গে অপর অঙ্কগুলি আবার যোগ করিতে আরম্ভ
করা হয় । ইহাতে শতকের সংখ্যা আগা গোড়া বহন করিতে হয় না—
অথচ দ্বিতীয় বার পরীক্ষা করিবারও সুবিধা হয় ।

কেহ কেহ বড় বড় যোগ দেখা মাত্র করিয়া ফেলেন। ইহা কেবল অবিরাম অভ্যাসের ফল—কোন মঙ্গলশক্তির নয়।

পণ্ডিতেরা অষ্ট্রিয়া প্রথাতে বিয়োগ শিক্ষা দানই এখন উত্তম বলিয়া মনে করেন। আমরা পূর্বে—

$$\begin{array}{r} ৯১৮ \text{ হইতে} \\ ২৭৫ \text{ বিয়োগ} \\ \hline ৬৪৩ \end{array}$$

করিবার সময় ৮ হইতে ৫ গেলে কত থাকে এইরূপ হিসাব করিতাম। এখন সেরূপ না বলিয়া ৫ আর ৩এ ৮, এই বলিয়া একেবারেই ৩ নামাই, তারপর ৭ আর ৪এ এগার বলিয়া ৪ নামাই ও ৩ আর ৬এ ৯ বলিয়া ৬ নামাই। প্রায় এক কথাই—এখন বিয়োগ না করিয়া যোগ করি। ইহাতে কাজ একটু তাড়াতাড়ি হয়। মিশ্র বিয়োগে এই নিয়মে খুবই সুবিধা হয়।

গুণন।—নামতাই গুণনের প্রাণ। বালকগণকে উত্তমরূপে নামতা শিখাইতে হইবে। নিম্ন প্রাইমারীতে ১০ এর ঘর পর্যন্ত, উচ্চ প্রাইমারীতে ১৬এর ঘর পর্যন্ত এবং ছাত্রবৃত্তিতে ২০ এর ঘর পর্যন্ত নামতা শেখা নিতান্তই দরকার। অনেক পাঠশালায় নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতেই ২০এর ঘর পর্যন্ত নামতা শেখান হইয়া থাকে। ডাক পড়িয়া নামতা শেখা উত্তম পদ্ধতি। তবে নামতা শিক্ষা দানের পূর্বে প্রণালীর একটু পরিবর্তন করিলে মন্দ হয় না। বোধ হয় শিক্ষা একটু সহজও হইতে পারে। প্রথমে ১০ এর ঘর নামতা শিখাও, খুব সহজে শিখিবে ও আমোদ পাইবে। তারপর ৫ এর ঘর। ইহার পর ২, ৪, ৮। তারপর ৩, ৬, ৯। সর্ব শেষে ৭ এর ঘর। বালকগণকে নামতা প্রস্তুতের প্রণালী শিখাইবে। মনে কর, ৪ এর ঘর নামতা প্রস্তুত করিতে হইবে। ৪ দুই বার যোগ করিয়া লিখিল $৪ \times ২ = ৮$, ৪ তিন বার যোগ করিয়া লিখিল $৪ \times ৩ = ১২$

ইত্যাদি। এইরূপে মধ্যে মধ্যে এক এক ঘর নামতা (বিশেষ যে ঘর তাহাদের মুখস্থ হয় নাই) সেটে প্রস্তুত করিতে বলিবে।

৪ × ৩ যে ৩ × ৪ এর সমান তাহা বুঝান আবশ্যক হইতে পারে। ৪ তিন বার যোগ করিলে যাহা হয়, ৩ চারবার যোগ করিলেও তাই; অথবা ১২টী বালককে প্রথমে ৪ জন করিয়া ৩ লাইনে দাঁড় করাও। (ক চিত্র)

$$\begin{array}{cccc} \wedge & \wedge & \wedge & \wedge \\ \wedge & \wedge & \wedge & \wedge \\ \wedge & \wedge & \wedge & \wedge \end{array}$$

(ক চিত্র)

$$\begin{array}{cccc} < & < & < & < \\ < & < & < & < \\ < & < & < & < \end{array}$$

(খ চিত্র)

৪ জন করিয়া ৩ লাইনে ১২ জন হইল। এগুন বালকগণকে 'ডাহিনে ফের' (right turn) আদেশ কর। এবারে ৩ জন করিয়া ৪ লাইন হইল (খ চিত্র); কিন্তু বালকের সংখ্যা সেই ১২। সুতরাং $৪ \times ৩ = ৩ \times ৪$ ।

এক অঙ্কের দ্বারা, এক অঙ্কের গুণন শিখান সহজ। এক অঙ্ক দ্বারা একাধিক অঙ্কের গুণন শিখানও সহজ, তবে একটু বুঝাইয়া দিতে হয়। যথা—

$$\begin{array}{r} ৩৭ \\ ৫ \\ \hline ১৮৫ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ৩০ \mid ৭ \\ ৫ \mid ৫ \\ \hline ১৫০ + ৩৫ \end{array}$$

উপরের অঙ্কের স্থানীয় মান লিখিয়া ৫এর দ্বারা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে গুণ করিয়া গুণফল যোগ করতঃ বুঝাইয়া দিবে। দশের দ্বারা অনেকগুলি অঙ্কে গুণ করিয়া দেখাইয়া দিবে যে সেই সেই অঙ্কের পীঠে একটা শূন্য দিলেই, দশের দ্বারা গুণের কাজ শেষ হয়। তারপর ২০ ও ৩০এর দ্বারা কতকগুলি সংখ্যাকে গুণ করিয়া শিখাইতে হইবে। যথা—

$$\begin{array}{r} ৪৬৭ \\ ২০ \\ \hline ৯৩৪০ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ৪৬৭ \\ ১০ \\ \hline ৪৬৭০ \\ ২ \\ \hline ৯৩৪০ \end{array}$$

এখানে ২০কে তাহার উৎপাদক সংখ্যায় বিভক্ত করিয়া গুণ করা

হইল । সূত্রাং ২০, ৩০ প্রভৃতি দ্বারা গুণ করিতে হইলে ২, ৩ ইত্যাদি দ্বারা গুণ করিয়া—ডানদিকে একটা শূন্য বসাইয়া দিলেই হইল । ইহার পর ছই সংখ্যা দ্বারা গুণ শিখাইতে হইবে ।

৩২৭	৩২৭
৪৬	৪৬
১৯৬২ ৬বার ৩২৭	১৯৬২
১৩০৮০ ৪০ বার ৩২৭	১৩০৮
১৫০৪২ ৪৬ বার ৩২৭	১৫০৪২

৬এর দ্বারা গুণ করিয়া পরে ৪০এর দ্বারা গুণ করা হইল । দশকের সংখ্যা দ্বারা গুণ করিবার সময় যে আমরা কেন ডাহিনের এক ঘর সরাইয়া অঙ্ক লিখিতে আরম্ভ করি, তাহা এইরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে । এখানে ৪এর দ্বারা গুণ করার অর্থ—৪০এর দ্বারা গুণ । সূত্রাং এককের ঘরে যে শূন্য পড়িবে তাহা না লিখিলেও চলে; কারণ কোন সংখ্যাকে শূন্যের সহিত যোগ করিলে বা না করিলে, ফলের কোন পরিবর্তন হয় না । আর এক কথা, যে রাশি দ্বারা গুণ করা যায় তাহাকে ‘গুণক’, আর যে রাশিকে গুণ করা যায় তাহাকে ‘গুণ্য’ কহে—ইহা বালকদিগকে শিখাইয়া দিতে হইবে ।

(১) উৎপাদকের সাহায্যে গুণের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যিক । যথা—

২৪৩কে ১৬ দিয়া গুণ কর

(১)	২৪৩	(২)	২৪৩
	৪		৮
	৯৭২		১৯৪৪
	৪		২
	৩৮৮৮		৩৮৮৮

২৪৩কে ১৯ দিয়া গুণ কর

(১)	২৪৩		২৪৩
	৬		২
	১৪৫৮ ৬বার ২৪৩		৪৮৬ ২বার ২৪৩
	৩		৯
	৪৩৭৪ ১৮বার ২৪৩		৪৩৭৪ ১৮বার ২৪৩
	২৪৩ ১বার ২৪৩		২৪৩ ১বার ২৪৩
	৪৬১৭ ১৯বার ২৪৩		৪৬১৭ ১৯বার ২৪৩

ইহা ছাড়া গুণের কতকগুলি সহজ সহজ নিয়ম জানা থাকিলে মুখে মুখেই অনেক অঙ্ক কষা যায়।

(২) দুই সংখ্যার রাশির দ্বারা এক লাইনে গুণ করিবার দ্বারা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক। যথা—৫৪কে ৩২ দিয়া গুণ করিতে হইবে।

$$\begin{array}{r} ৫৪ \\ ৩২ \\ \hline ১০৮ \\ ১০৮০ \\ \hline ১৭২৮ \end{array}$$

পদ্ধতি।—প্রথমে এককে এককে গুণ— $৪ \times ২ = ৮$,

এককের ঘরে এই ৮ নামাও। তার পর $৫ \times ২ = ১০$, এবার ৮এর পাশে ২ নামাও, হাতে থাকিল ২; তার পর $৩ \times ৫ + ২ = ১৭$ নামাইলে গুণফল হইল ১৭২৮। আর একটা দৃষ্টান্ত—

$$\begin{array}{r} ১৬৩ \\ ২৪ \\ \hline ৩২৬৪ \end{array}$$

পদ্ধতি।— $৩ \times ৪ = ১২$ এর ২ নামাও, হাতে থাকে ১।

তার পর $৬ \times ৪ + ৩ \times ২ + ১ = ৩১$, ১ নামাও, হাতে থাকে ৩। তার পর $১ \times ৪ + ৬ \times ২ + ৩ = ১৯$, ৯ নামাও, হাতে থাকে ১। এখন $১ \times ২ + ১ = ৩$ এই তিন নামাইলে গুণফল হইবে ৩২৬৪।

(৩) যদি কোন সংখ্যাকে ১০, ১০০, ১০০০ প্রভৃতি দিয়া গুণ করিতে হয়, তবে সেই সংখ্যার ডাহিন দিকে গুণকের শূন্য সংখ্যা লাগাইয়া দিলেই হইল। কিন্তু যদি ২০, ৩০, ৪০০, ৫০০০ প্রভৃতি সংখ্যার দ্বারা গুণ করিতে হয়, তবে প্রথমে শূন্য লাগাইয়া তাহাকে ২, ৩, ৪, ৫ প্রভৃতি শূন্যের বাম দিকস্থ সংখ্যার দ্বারা গুণ করিতে হইবে। যথা—

$$৫৬ \times ১০ = ৫৬০$$

$$৫৬ \times ২০ = ৫৬০ \times ২ = ১১২০$$

$$৫৬ \times ১০০ = ৫৬০০$$

$$৫৬ \times ৪০০ = ৫৬০০ \times ৪ = ২২৪০০$$

(৪) ১০এর অধিক ও ২০এর কম যে কোন দুই সংখ্যাকে গুণ করিতে হইলে, একটা সংখ্যাকে অপর সংখ্যার এককের সহিত যোগ করিয়া তাহার ডাহিনে শূন্য বসাত্ত এবং এই ফলের সহিত উক্ত দুই সংখ্যার একক দুইটা গুণ করিয়া যোগ কর। যথা—

$$১৮ \times ১৪ = (১৮ + ৪) \times ১০ + ৮ \times ৪ = ২৫২$$

(৫) যদি দুই সংখ্যার দুইটা অঙ্কের একক বা দশকের সংখ্যাটি

সমান হয়, তবে একক সংখ্যা দুইটি গুণ কর ও এই গুণফলের একক সংখ্যাটি লেখ । তারপর অসমান সংখ্যা দুইটির যোগ ফল, একটি সমান সংখ্যার দ্বারা গুণ করিয়া তাহার সহিত হাতে যাহা আছে তাহা যোগ করিয়া নামাও ও পরে হাতে যাহা থাকে তাহার সহিত দশকের দুইটি সংখ্যার গুণফল যোগ করিয়া নামাও । যথা—

৯৭	দশকের অঙ্ক সমান	৭৪	এককের অঙ্ক সমান
৯২		২৪	
৮৯২৪		১৭৭৬	

(৬) যদি এককের অঙ্ক দুইটি সমান হয় ও দশকের দুইটি অঙ্ক যোগ করিলে দশ হয়, তবে দুইটি দশকের অঙ্ক গুণ করিয়া তাহার সঙ্গে একটি এককের অঙ্ক যোগ কর এবং ইহার ডাহিনে এককের গুণফল বসাত্ত । যথা— $৭৪ \times ৩৪ = ৭ \times ৩ + ৪$ ইহার ডাহিনে $১৬ = ২৫১৬$

(৭) যে কোন দুই অঙ্কের সংখ্যাকে ১১ দিয়া গুণ করিতে হইলে, সেই দুই অঙ্কের মধ্যে উক্ত দুই অঙ্কের যোগ ফল লেখ । যথা $৪৩ \times ১১ = ৪৭৩$ (মধ্যের অঙ্কটি অপর দুই অঙ্কের যোগ ফল) কিন্তু যদি এই যোগ ফল ৯ এর বেশী হয় তবে শতকের ঘরে হাতের ১ যোগ করিবে । যথা— $৯৫ \times ১১ = ১০৪৫$

(৮) যদি এককের অঙ্কের যোগফল ১০ হয়, আর দশকের অঙ্ক সমান, তাহা হইলে এককের অঙ্ক দুইটি গুণ করিয়া ফল লিখিয়া রাখ । তারপর একটি দশকের অঙ্কের সঙ্গে ১ যোগ করিয়া তাহার সহিত অপর দশকের অঙ্ক গুণ করিয়া বামে লেখ । যথা— $৬৭ \times ৬১ = ৪২২১$

(৯) যে কোন সংখ্যাকে ১১ দিয়া গুণ করিবার সহজ উপায় । প্রথমে সেই সংখ্যার শেষ অঙ্কটি লেখ । তারপর এই শেষ অঙ্কের সঙ্গে ঠিক ইহার পূর্ব অঙ্ক যোগ করিলে যে ফল হয় তাহা নামাও ও হাতে যাহা থাকে দ্বিতীয় তৃতীয় অঙ্কের যোগ ফলের সহিত যোগ করিয়া নামাও । এইরূপে শেষ কর, যথা— $১২৩৪৫৬৭৮ \times ১১ = ১৩৫৮০২৪৫৮$

(১০) যে দুই সংখ্যার শেষ অঙ্ক ৫ তাহা গুণ করিবার প্রথা ।—
প্রত্যেক সংখ্যার ৫ এর পূর্বে যে অঙ্ক আছে তাহার যোগফলের অর্দ্ধেকের
সঙ্গে সেই দুই অঙ্কের গুণফল যোগ কর এবং ইহার ডাহিনে ২৫ লাগাইয়া
দাও । যথা $৮৫ \times ৬৫ = ৭ + ৮ \times ৬$ ইহার শেষে $২৫ = ৫৫২৫$ । কিন্তু
যদি পূর্ক অঙ্কের যোগফল জোড় না হইয়া বিজোড় হয়, তবে ঐ বিজোড়ের
এক বাদ দিয়া তার অর্দ্ধেক লইবে এবং ২৫ না লাগাইয়া ৭৫ লাগাইবে ।
যথা— $১০৫ \times ৩৫ = ৬ + ১০ \times ৩$ ইহার শেষে $৭৫ = ৩৬৭৫$

(১১) কোন সংখ্যাকে ৯, ৯৯, ৯৯৯, প্রভৃতি সংখ্যার দ্বারা গুণ
করিতে হইলে, গুণকে যে কয়েকটা নয় আছে তাহা গণিয়া ততগুলি শূন্য
গুণো লাগাও ও তাহা হইতে গুণক বাদ দেও । যথা—

$$৩৫৮ \times ৯৯ = ৩৫৮০০ - ৯৯ = ৩৫৭০১$$

(১২) ৫ দিয়া গুণ করিতে হইলে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ২ দিয়া ভাগ
কর, ২৫ দিয়া গুণ করিতে হইলে ১০০ দিয়া গুণ ৪ দিয়া ভাগ, ১২৫ দিয়া
গুণে ১০০০ দিয়া গুণ ৮ দিয়া ভাগ ।

অনেক বিদ্যালয়ে এখন আর পূর্ক রীতিতে গুণ শিখান হয় না ।
নূতন রীতি এইরূপ :—

এখানে প্রথমে ৪ দিয়া গুণ না করিয়া ২ দিয়া গুণ করা হইয়াছে ।
তারপর ৫ ও শেষে ৪ দিয়া । ইহাতে এই লাভ হয় যে মর্কোচ্চ অঙ্কের

$$\begin{array}{r} ৩১৬ \\ ২৫৪ \\ \hline ৬৩২ \\ ১৫৮০ \\ ১২৬৪ \\ \hline ৮৯১৬৪ \end{array}$$

দ্বারা গুণ করিয়া প্রথমেই একটা ফলের আভাস
পাওয়া যায় । এখানে প্রথমে দুই দিয়া গুণ করিয়া যে
৬৩২ ফল হইয়াছে তাহাতে দুইটা গুণ্য যোগ করিলে
(কারণ এখানে $২ = ২০০$) মোটামুটি ফল পাওয়া
যাইবে । এইজন্ত কেহ কেহ এই প্রথাকে উত্তম

প্রথা বলেন । পূর্ক প্রথার সহিত ইহার বিশেষ প্রভেদ নাই । যে অঙ্কের
দ্বারা গুণ করিবে গুণফল সেই অঙ্কের নীচ হইতে লিখিতে আরম্ভ করিবে—
এই কথা মনে রাখিলেই নূতন প্রথাতে অঙ্ক কমা যাইবে ।

আমাদিগের দেশের একটা গুণের পদ্ধতি ছিল । সেটা লীলাবতীর নিয়ম । সেটীও বেশ—তবে একটু লটখট । মনে কর লীলাবতীর প্রথাতে ৩১৬কে ২৫৪ দিয়া গুণ করিতে হইবে । এখন অঙ্কগুলি এই ঘর কাটিয়া সাজাইয়া লও :—

	৩	১	৬	
				১
				১
৮	১		৩	৫
	৫	৫	০	
০	১		২	৪
	২	৪	৪	
	২	৬	৪	

গুণফল একক হইলে কর্ণ রেখার নীচে, দশক হইলে একক কর্ণ রেখার নীচে ও দশকের অঙ্ক কর্ণ রেখার উপরে লিখিতে হয় । তারপর কর্ণ রেখা ক্রমে যোগ করিলে গুণফল পাওয়া যায় ।

ভাগ—গুণ যেমন যোগের সহজ উপায়, ভাগ তেমন বিয়োগের সহজ উপায়, তাহাই প্রথমে বুঝাইয়া লইতে হইবে ।

উদাহরণ ।—৮এর মধ্যে ২ কত বার আছে ?

৮	
২	একবার
৬	
২	দুইবার
৪	
২	তিনবার
২	
২	চারবার
০	

৮এর মধ্যে ২ চারি বার আছে ।
এইরূপে আরও কয়টা সহজ সহজ অঙ্ক
কসাইতে হইবে ।

বিয়োগের ফল সহজে বাহির করার নাম ভাগ—ইহাই দেখাইয়া দিবে ও বুঝাইয়া দিবে। ভাগ অঙ্ক সহজে লিখিবার ধারা—

$$\begin{array}{r} ২) ৮ (৪ \\ \underline{৮} \end{array}$$

প্রথমে অবশ্য এক অঙ্কের দ্বারা ভাগ শিখাইবে। আবার যে সকল অঙ্ক অবশিষ্ট থাকে প্রথমে সেগুলি দিবে না। তারপর দুই অঙ্কের কথা—

$$\begin{array}{r} ৩) ৬৯ (২৩ \\ \underline{৬} \\ ৯ \\ \underline{৬} \end{array} \quad \begin{array}{r} ৩) ৬০ (২০ \\ \underline{৬০} \end{array} \quad \begin{array}{r} ৩) ৯ (৩ \\ \underline{৯} \end{array} \quad \begin{array}{r} ২০ \\ \underline{৬} \\ ২৬ \end{array}$$

এই বারে ৬৯কে ৬০ আর ৯এ (স্থানীয় মান) বিভক্ত করিয়া, ৩এর দ্বারা পৃথক পৃথক ভাগ দিয়া দেখাইবে। তারপর অবশিষ্টের কথা। এবারও প্রথমে বিয়োগের প্রথাই ব্যাখ্যান আরম্ভ করিবে। যথা—৯এর মধ্যে ২ কতবার আছে?

$$\begin{array}{r} ৯ \\ ২ \\ \hline ৪ \\ ২ \\ \hline ৫ \\ ২ \\ \hline ৩ \\ ২ \\ \hline ১ \end{array}$$

৯ এর মধ্যে ২ চারি বার আছে ; কিন্তু তবুও এক থাকিয়া যায়। ৯টা পয়সা ৪ জন বালককে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দাও। একটা পয়সা থাকিয়া যায়। এর নাম অবশিষ্ট। এখন ৯কে ২ দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্ট লিখিবার রীতি দেখাও।

$$\begin{array}{r} ২) ৯ (৪ \\ \underline{৮} \\ ১ \end{array}$$

এইরূপ কতকগুলি অঙ্ক কসাইয়া, পরে দুই অঙ্কের যে সকল ভাগে অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ অঙ্ক আরম্ভ করিবে। কিন্তু তাহারও প্রথমে

দশকে যেন অবশিষ্ট না থাকে । প্রথম এককে অবশিষ্ট, পরে দশকাদিতে ;
যথা—

(১) ৩) ৬৮ (২২

৬

—

৪

৬

—

২

(২) ৩) ৭৯ (২৬

৬

—

১৯

১৮

—

১

দ্বিতীয় অঙ্কে দশকের ৭, ৩ দ্বারা ভাগে মিলিল না । ১০ অবশিষ্ট থাকিল, তাহার সহিত ৯ যোগে ১৯ হইল । এইরূপে বুঝাইতে গেলে বালকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, ১০ অবশিষ্ট রাখিবার কারণ কি, ১০কে ৩ দ্বারা বেশ ভাগ করা যায় । ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, আমরা ৭ কে ভাগ করি নাই । ৭ দশ অর্থাৎ ৭০কে ভাগ করিয়াছি । ৩ দ্বারা ভাগ করিলে এক এক ভাগে ২ দশ অর্থাৎ ২০ করিয়া পড়ে । অবশিষ্ট ১০কে আর ২ দশ করিয়া ভাগ করা যায় না । কাজেই সেই সঙ্গে ৯ যোগ করিয়া যে ১৯ হইল, তাহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিয়া, প্রত্যেক ভাগে ৬ একক হইল, ১ অবশিষ্ট রহিল । যদি শিক্ষক ৭ খান দশ টাকার নোট ও ৯ টী টাকা আনিয়া বালকগণকে ভাগ করিতে বলেন, তবে তাহারা এ অঙ্ক বেশ বুঝিবে । অভাবপক্ষে দশের আঁটীর দ্বারাও বেশ বুঝান যাইবে । ৩ ভাগ করিতে গেলেই, এক এক ভাগে প্রথমে দুইটি করিয়া দশের আঁটী পড়িবে । আর যে আঁটী থাকিবে, তাহা না খুলিয়া ভাগ করা যাইবে না ।

এক কথা বালকগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, আমরা দ্রব্যকে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করি । দশটি হাতীকে ৫ দিয়া ভাগ অর্থাৎ ৫ ভাগে ভাগ করা যায়, কিন্তু ১০টা হাতীকে ৫টা হাতী দিয়া ভাগ করা যায় না । ভাজা ও ভাজক কাঠাক বাহন ভাজাও সমান দিবে ।

ভাগের পূর্বরীতি ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে । এখন আর ডাইনের দিকে টান দিয়া ভাগ ফল লিখিবার রীতি নাই । ভাগ ফল ভাজ্যের উপরে লেখার রীতি হইয়াছে । যথা—

$$\begin{array}{r}
 81 \overline{) 286} \\
 \underline{278} \\
 8 \\
 \underline{81} \\
 5
 \end{array}$$

ইহাতে এক সুবিধা এই হয় যে কোন্ কোন্ অঙ্কের ভাগ হইল তাহার বেশ একটা হিসাব থাকে ।

কিন্তু বর্তমানে ভাগের ইটালীয় প্রথাই উত্তম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । এই প্রথাকে ভাগের সংক্ষিপ্ত প্রথাও বলে । যথা—

$$\begin{array}{r}
 81 \overline{) 286} \\
 \underline{278} \\
 8
 \end{array}$$

এই অঙ্কে গুণ ও বিয়োগের কাজ এক সঙ্গেই করা হইয়াছে । ৪১ একে ৪১, ৬৮ হইতে বিয়োগ করিয়া ২৭ হইল তার পিঠে ৪ আনা হইল । তারপর $81 \times 6 = 286$ কে গুণের সঙ্গে সঙ্গে ২৭৪ হইতে বিয়োগ করিয়া যে ২৮ পাওয়া গেল তাহার পিঠে ৭ লাগান হইল । এবারে ৭ বার দিলে মিলিয়া গেল ।

প্রথম প্রথম এই প্রথা একটু কষ্টকর মনে হইতে পারে কারণ এই প্রথায় অঙ্ক করা আনাদিগের অভ্যাস নাই । কিন্তু একবার অভ্যাস হইয়া গেলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে এই প্রথায় সময় ও কাগজ দুই অনেক কম লাগিবে ।

উৎপাদকের সাহায্যে ভাগ শিখান আবশ্যক । সকল পাটীগণিতেই এই নিয়ম দেখান হইয়াছে ।

মিশ্র নিয়ম—টাকা, আনা প্রভৃতির অঙ্কগুলি শিখাইতে হইলে প্রথমে বালকগণকে মুদ্রাগুলি দেখান দরকার। আর তাহার ব্যবহার শিখানও দরকার। ধারাপাতেব অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে।

ইংরাজী মিশ্র নিয়ম শিক্ষা করা অপেক্ষা, আমাদের দেশী নিয়ম শিক্ষা করা সহজ। আমাদের ধারাপাতের অঙ্কগুলি বেশ বুদ্ধি বিবেচনা ও কৌশলে গঠিত। কিন্তু সকল ধারা অপেক্ষা, ফরাসী মেট্রিক ধারাই সর্বোৎকৃষ্ট। অনেক সভ্যদেশে এই মেট্রিক ধারা প্রচলিত হইয়াছে। কেবল ইংরাজ জাতি কুসংস্কারবশতঃ তাহাদিগের পুরাতন ধারা ধরিয়া আছেন বলিয়া, আমাদের দেশেও ইংরাজী ও আমাদের পুরাতন ধারা চলিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে যেক্রপ ভাবে মেট্রিক ধারা গৃহীত হইতেছে, তাহাতে ইংরাজ জাতি যে আর অধিক কাল তাহাদিগের সেই পুরাতন জটিল ধারা ধরিয়া থাকিতে পারিবেন, তাহা বোধ হয় না।

টাকা পয়সা বিষয়ক মিশ্র নিয়মই প্রথম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এই নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে ১ টাকায় কয় সিকি, কয় আনা, কয় পয়সা ইত্যাদি ভাগ করিয়া দেখান আবশ্যক। তারপর ২ টাকায় কত সিকি হয়, কত আনা হয়, কত পয়সা হয় ইত্যাদি।

এই সমস্ত অঙ্ক বালকেরা গুণ করিয়া কসিতে শিখিবে। আর ঐরূপ, এত পয়সায় কত আনা, সিকি, টাকা; এত আনায় কত সিকি ও টাকা; এত সিকিতে কত টাকা ইত্যাদি ভাগ করিয়া কসিতে শিখিবে। এইরূপে মণ, সের, বিঘা, কাঠা বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে।

যোগের প্রথমে কেবল টাকা, আনা দিয়া আরম্ভ করিবে, তারপর গুণা ও কড়া। দুই চারিটা অঙ্ক পাই দিয়াও কসাইবে, কারণ এখন কড়া উঠিয়া গিয়াছে। কতগুলি আনা একত্র করিয়া কত সিকি (চোক) হইল আর কতগুলি সিকি একত্র হইলে কত টাকা হইল, ইহা বুঝিতে পারিলেই যোগ শিক্ষা হইল। বিয়োগে একটু কষ্ট আছে; যথা—নিম্নলিখিত অঙ্কে :—

$$\begin{array}{r} ৫৮/০ \\ ২৮/০ \\ \hline ২৮৮/০ \end{array}$$

এখানে এক আনা আর দুই আনা হইলেই তিন আনা মিলে, তাহা সহজেই বুঝা গেল। কিন্তু দুই সিকি থেকে কেমন করে তিন সিকি বাদ দেওয়া যায়? সেই যেমন অমিশ্র বিয়োগের সময় এক দশ সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল, এবারেও সেইরূপ ৫ হইতে ১ টাকা বা চারি সিকি সরাইতে হইয়াছে। তাহা হইলে উপরে ৬ সিকি হইল, তাহা হইতে এখন তিন সিকি বাদে, তিন সিকি নাগিল। ৫এর স্থানে ৪ থাকিল, তাহা হইতে ২ বিয়োগ করিলে ২ নাগিল। এ হইল “উপর ছাঁটা” নিয়ম। কিন্তু এ সকল অঙ্ক “নীচে আঁটার” নিয়মে কসাই সুবিধা। এই ‘নীচে আঁটার’ নিয়ম অমিশ্র বিয়োগে যে রূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এখানেও তাহাই প্রযুক্ত। তারপর গুণের কথা। ৫৮/৬কে ৫ দিয়া গুণ করিবার পূর্বে, ৫৮/৬কে ৫ বার লিখিয়া যোগ করিয়া দেখান কর্তব্য। দুই অঙ্ক দ্বারা গুণ করিতে হইলে, সেই অঙ্কটিকে ভাগ ভাগ করিয়া নিলে অনেক সময় হিসাবের সুবিধা হয়। মনে কর, ৫৮/৬ গুণকে ৪২ দিয়া গুণ করিতে হইবে। এখন ৫৮/৬কে প্রথমে ৬ দিয়া গুণ করিয়া, সেই গুণফলকে ৭ দিয়া গুণ করিলেই ৪২ দ্বারা গুণ করার ফল হয়। যদি ৪৭ দিয়া গুণ করিতে হয়, তবে প্রথমে ৫ দিয়া গুণ করিয়া, সেই গুণফলকে ৯ দিয়া গুণ করিলে ৪৫ দ্বারা গুণ করার কাজ হইল। তারপর ৫৮/৬কে ২ দ্বারা গুণ করিয়া, সেই গুণফল ৪৫ দ্বারা গুণ করিয়া যে ফল হইয়াছে তাহার সহিত যোগ কর। ৪৭ দ্বারা গুণের কাজ হইল। যথা :—

$$\begin{array}{r} ৫৮/৬ \\ ৫ \\ \hline ২৯৮/১০ \\ ৯ \\ \hline ২৬২৮/১০ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ৫৮/৬ \\ ২ \\ \hline ১১৬/১২ \\ ২৬২৮/১০ \\ ১১৬/১২ \\ \hline ২৭৪/২ \end{array}$$

একেবারে ৪৭ দিয়া গুণ করিতে হইলে, ৬কে ৪৭ দিয়া গুণ করিয়া

যত গণ্ডা হইল, তাহাকে ২০ দিয়া ভাগ করিয়া আনা বাহির করিতে হইবে, ইত্যাদিরূপ প্রণালী সময় সময় কষ্টকর বলিয়া মনে হয়। আর ৫, ৯, ২ দিয়া বেশ মুখে মুখে গুণ করা যায়। যাহা হউক, দুই রকম প্রণালীই শিক্ষা করিতে হইবে। মিশ্র পুরণের আর একটা রীতি প্রচলিত আছে। ৫৮/৬কে ১০ দিয়া গুণ করিবে এবং উহার ডানদিকে ৫৮/৬কে ৭ দিয়া, এবং ১০ দ্বারা পুরণের ফলকে ৪ দিয়া গুণ করিয়া, যোগ করিলেই ফল নির্ণীত হয়। যথা :—

$$\begin{array}{r} ৫৮/৬ \times ৭ = ৪০৮/২ \quad ৭এর গুণফল \\ ১০ \\ \hline ৫৮/৬ \times ৪ = ২৩৩/২ \quad ৪এর গুণফল \\ ২৭৪/২ \quad ৪৭এর গুণফল \end{array}$$

ভাগ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নাই।

জমা খরচ ।—প্রথম ক্রমপে সংসারের বাজার খরচ লিখিতে হয়, তাহাই লিখাইতে হইবে। বালককে একটা টাকা বা এক টাকার পয়সা দাও। পয়সা দাও বা পয়সার পরিবর্তে তেঁতুলের বিচি দিয়া বল, সেগুলিই যেন পয়সা। তুমি নিজে দোকানী সাজ। বালকের নিকট (মনে কর) ১/৫ পয়সার মাছ, ১/১০ পয়সার চাউল, ২১০ পয়সার পান, ১/০ আনার লক্ষা, ২৫ পয়সার আলু ইত্যাদি বিক্রয় করিলে। এখন বালককে হিসাব লিখিয়া দিতে বল। কেমন করিয়া লিখিয়া দিবে বলিয়া দিও না—বালক কি করে তাহাই দেখ। বালক অবশ্য তার মত একটা লিখিয়া আনিবে। সেই সময় তুমি বোর্ডে বা বালকের স্টেটে হিসাব লিখিবার একটা সহজারা দেখাইয়া দিবে। এইরূপে ধীরে ধীরে কঠিন বিষয় লিখাইতে হইবে। মিসদারী ও মহাজনো কাগজ পত্রের মধ্যে অনেকগুলি এমন কঠিন আছে যে তাহা বালকগণকে সহজে বুঝাইতে পারা যায় না। এ সকল নিজে বসায় বাণিজ্য না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। তবে সহজ সহজ কাগজগুলি বুঝাইয়া দিতে পারা যায়। বাজার খরচ লেখা, ঘোপার হিসাব—

লেখা, জমির ধানের হিসাব লেখা ও মজুর খাটাইবার হিসাব লেখা প্রত্যেক বালক বালিকারই জানা উচিত ।

অগিদারী কাগজের মধ্যে দাখিলা, চিঠা, জমাবন্দি ও মহাজনী কাগজের মধ্যে জমাখরচ (রোকড়) ও খতিয়ান শিক্ষা দিলেই চলে ।

গ. সা. গু. ও ল. সা. গু. — গুণনীয়ক ও গুণিতক কথা দুইটি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে । ১৬ কে ৪ দিয়া ভাগ করিলে কিছুই থাকে না ; ৪, ১৬ এর গুণনীয়ক আর ১৬, ৪ এর গুণিতক । তারপর “সাধারণ” কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা বলা আবশ্যক । ১৮ আর ১২ এই দুই রাশির সাধারণ গুণনীয়ক ২ ; ২ দ্বারা উক্ত দুই রাশিকেই ভাগ করা যায় । ৩৩ ইহাদের সাধারণ গুণনীয়ক । কারণ ৩ দ্বারাও দুইটি রাশিকে ভাগ করা যায় । সেইরূপ ৬৩ একটি সাধারণ গুণনীয়ক । আর কোন সাধারণ রাশি দ্বারা ১৮ ও ১২ উভয় অঙ্কেই ভাগ করিয়া মিলান যায় না । ৯ দিয়া ১৮ কে ভাগ করা যায় বটে, কিন্তু ১২ কে ভাগ করিয়া যায় না । সুতরাং ৯ সাধারণ গুণনীয়ক হইল না । এখন ২, ৩, ৬ কেবল এই তিনটি রাশিই সাধারণ গুণনীয়ক হইল । ইহাদের মধ্যে এই সকলের অপেক্ষা বড় । ভাল কথায় ‘বড়’কে ‘গরিষ্ঠ’ বলে । অতএব ‘৬’ ১২ ও ১৮এর গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক । আবার ৩ ও ৪ এই দুই রাশির দ্বারাই ২৪কে ভাগ করিলে মিলিয়া যায় । অতএব ‘২৪’ ৩ ও ৪ এই দুই রাশির সাধারণ গুণিতক । এইরূপ, এই দুই রাশি দ্বারা ৩৬কে ভাগ করিলে মিলিয়া যায় । ১২কে ভাগ করিলেও মিলিয়া যায় । সুতরাং ১২, ২৪, ৩৬ সকল রাশিই ৩ ও ৪ এর সাধারণ গুণিতক । ১৮কে ৩ দিয়া ভাগ করিলে মিলে, কিন্তু ৪ দ্বারা ভাগ করিলে মিলে না । অতএব ১৮ সাধারণ গুণিতক হইল না । তাহা হইলে ১২, ২৪, ৩৬, ৪৮ প্রভৃতিই ৩ ও ৪ এর সাধারণ গুণিতক । এখন ইহার মধ্যে ১২ সকলের ছোট । ১২এর ছোট এমন আর কোন রাশিই নাই যাহাকে ৩ ও ৪ দিয়া ভাগ করিলে

ভাগশেষ থাকিবে না ; ৯কে ৩ দিয়া ভাগ করিলে মিলে, কিন্তু ৪ দিয়া ভাগ করিলে মিলে না । আর ৮কে ৪ দিয়া ভাগ করিলে মিলে, কিন্তু ৩ দিয়া ভাগ করিলে মিলে না । সুতরাং ১২ই সকলের ছোট সাধারণ গুণিতক । ছোটকে ভাল কথায় ‘লঘিষ্ঠ’ বলে । ‘১২’ ৩ ও ৪ এর ‘লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক’ ।

এই সময়ে বালকগণকে কতকগুলি সাধারণ ভাগের নিয়ম শিখাইয়া দেওয়া কর্তব্য । যথা—যুগ্ম রাশিকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে মিলিয়া যায়, যে রাশির শেষে ৫ বা ০ থাকে তাহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায়, যে রাশির অঙ্কগুলির যোগফলকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায় সে রাশিকে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে মিলিয়া যাইবে ইত্যাদি ।

গ. সা. গু. ও ল. সা. গু. অঙ্ক কসিবার যে কৌশল পাঠ্যগণিতে লিখিত আছে, তাহা ছাড়া আর কোন সুবিধাজনক কৌশলই নাই । তবে সেই কৌশলে অঙ্ক কসিলে কেন যে ফল পাওয়া যায়, তাহা বলা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহার যুক্তি বালকেরা এমতাবস্থায় বুঝিতে পারিবে না । সুতরাং সে চেষ্টা করা বৃথা । কেবল অঙ্ক কসিবার কৌশল শিখাইয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে ।

ভগ্নাংশ ।—কোন ইনস্পেক্টার একটী নূতন স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া শিক্ষককে ভগ্নাংশ শিক্ষা দিতে আদেশ করেন । শিক্ষক ২ খান সমান কাঠী আনিয়া, একখানিকে অসমান ৩ অংশে বিভক্ত করতঃ, তাহার এক খণ্ড হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন “এই একখান আস্ত কাঠী ; আর এই এক এক খণ্ড উহার ভগ্ন অংশ বা ভগ্নাংশ ।” তারপর তিনি বোর্ডে এইরূপ লিখিলেন “একটী পূর্ণ দ্রব্যের যে কোন অংশকে ভগ্নাংশ কহে ।” ইনস্পেক্টার পরিদর্শন-পুস্তকে লিখিয়া গেলেন “অভিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত না করিলে সাহায্য দেওয়া যাইবে না ।” অনেক শিক্ষকেরই এরূপ ভুল বিশ্বাস আছে । ভগ্নাংশ ভগ্ন অংশ বটে, কিন্তু সমান সমান

ভগ্ন অংশ, অসমান নহে। ৩ খান সমান কাঠী লও। প্রত্যেক খানি যেন ২ ফুট করিয়া লয়া। এক খানি আস্ত রাখ, এক খানিকে সমান তিন ভাগে (৮ ইঞ্চ করিয়া) ভাগ কর, আর এক খানিকে অসমান ৩ অংশে ভাগ কর। যথা—

(১)————— আস্ত বা সমস্ত কাঠী

(২)————— সমান অংশ বা ভগ্নাংশ

(৩)————— অসমান অংশ বা খণ্ডাংশ

প্রথম খানি “সমস্ত” কাঠী; দ্বিতীয় চিত্রে সমস্ত কাঠীর “ভগ্নাংশ”; তৃতীয় চিত্রে সমস্ত কাঠীর “খণ্ডাংশ” সূচিত হইয়াছে।

ভগ্নাংশ শিক্ষা দানের পক্ষে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া বিশেষ ফলপ্রসূ—

একটা আলুকে (গোলাকার হইলেই ভাল) সমান ভাগে কাট।

এখন এই প্রণালীতে বুঝাইতে আরম্ভ কর :—

১। আমার বাম হাতে আলুর অর্ধেক, ডান হাতে আলুর অপর অর্ধেক।

২। এখন দুই হাতের দুই অর্ধেক একত্র করিলাম, কি হইল? উঃ—আস্ত একটা আলু হইল।

৩। এই আস্ত আলু হইতে অর্ধেক সরাইলাম, হাতে কি থাকিল? উঃ—অর্ধেক থাকিল।

৪। তাহা হইলে একটা ডি নিষের অর্ধ বাদ দিলে (অর্ধ খণ্ড সরাইলে) কত থাকে? উঃ—অর্ধেক থাকে।

৫। আবার দুই অর্ধেক একত্র করিয়া যোগ করিলে কত হয়? উঃ—এক হয়।

আবার প্রত্যেক অর্ধ অংশকে দুই ভাগ কর। সম্পূর্ণ আলুটি চার অংশে বিভক্ত হইল। বালকদিগকে এখন দেখাও।

১। এখন আলুর কয় ভাগ হইল? উঃ—এখন আলুর চার সমান ভাগ হইয়াছে।

২। এখন চারি ভাগ এক সঙ্গে করিলাম, কি হইল? এখন আবার ১টা আলু হইল।

৩। এখন এই আলু থেকে চার ভাগের ১ ভাগ সরাইলে, কি থাকিল? চার ভাগের তিন ভাগ থাকিল।

৪। এখন চার ভাগের দুই ভাগ সরাইলে, কত থাকিল? চার ভাগের ২ ভাগ থাকিল।

৫। অর্ধেক সরাইলে যে রূপ হইয়াছিল, এখনও তাহাই হইল কিনা? তবে অর্ধেক বা, চার ভাগের ২ ভাগও তাই।

৬। এই চার ভাগের তিন ভাগ সরাইলে কত থাকিল?

৭। এই বার, এই ১ ভাগের সঙ্গে, আর এক ভাগ যোগ করিলাম, কত হইল? এবারে ৪ ভাগের ২ ভাগ বা অর্ধেক হইল।

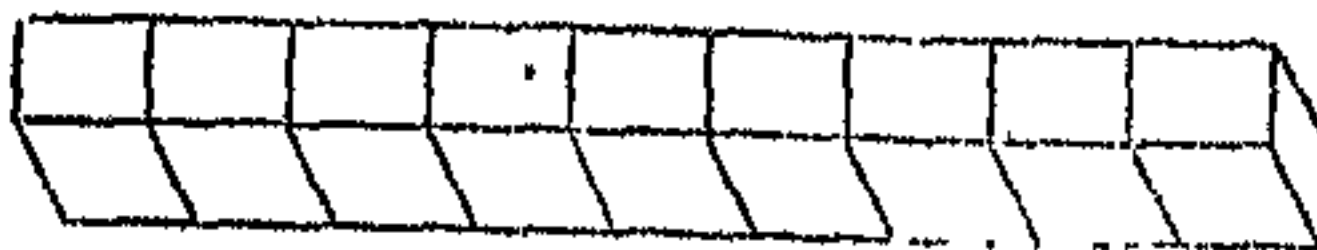
৮। এই বারে, চার ভাগের দুই ভাগের সঙ্গে আর এক ভাগ যোগ দিলে কত হইল? চার ভাগের তিন ভাগ।

৯। এই বারে, চার ভাগের তিন ভাগের সঙ্গে আর এক ভাগ যোগ দিলাম, ইত্যাদি।

এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ মুখে মুখে শিখাইতে পারা যায়। এইরূপ শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$ প্রভৃতি অঙ্ক লেখা শিক্ষা দিতে হইবে ও যখন প্রশ্ন করিবে, যে ‘আলুর চার ভাগের তিন ভাগ ও চার ভাগের এক ভাগ যোগ করিলাম, কত হইল?’—তখন বোর্ডেও লিখিতে হইবে।

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \text{কত}$$

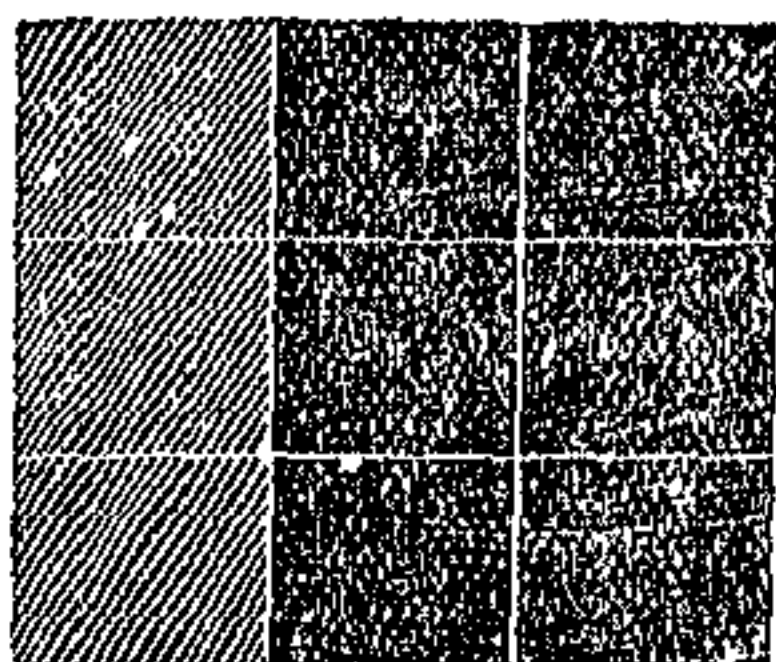
বাগকেরা উত্তরের স্থান পূর্ণ করিবে। কাঠী বা কাগজের টুকরা ভাগ করিয়াও এইরূপ শিক্ষা দেওয়া চলে। এই প্রণালীতে অন্ততঃ ৫-এর ভগ্নাংশ পর্যন্ত মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। স্কুলে যদি কিওয়ারটার্টেন বাক্স থাকে তবে নিম্নলিখিতরূপে ছক সাজাইয়া ভগ্নাংশ শিক্ষা দেওয়া যায়।



৬১ চিত্র।—ছকের সাহায্যে ভগ্নাংশ।

এইরূপে ৯টা ছক সাজান হইল। এই সমস্তটাকে একটা অর্থাৎ একখান বেঞ্চ মনে করা হইল। এই বেঞ্চকে ৯ সমান ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এখন ইহা হইতে ১টা বা ২টা করিয়া ছক তুলিয়া লও বা যোগ কর আর বালকগণকে প্রশ্ন কর। সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডের উপর লিখিয়াও দেখাও। কিণ্ডারগার্টেন বাবুস না থাকিলে এইরূপ কতকগুলি মাটির ছক করিয়া লইলেও চলে।

লব ও হর কথা দুইটির অর্থ বুঝাইবে ও কোন্টীকে লব বলে আর কোন্টীকে হর বলে, দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিবে। বোর্ডে নিম্নের চিত্রানুরূপ চিত্র করিয়া বুঝাইবে :—

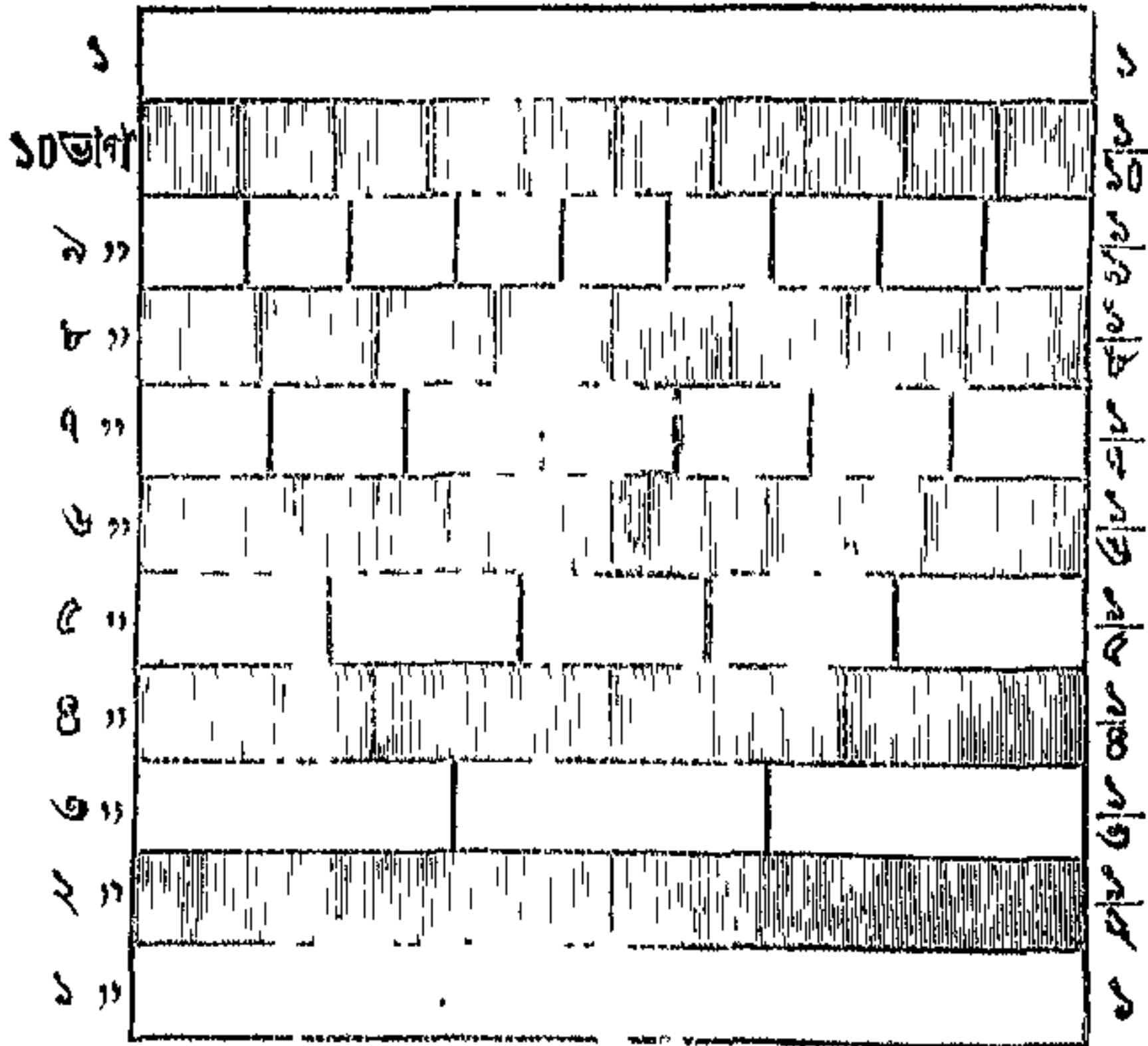


৬২ চিত্র।—চিত্রের সাহায্যে লব হর শিক্ষা।

এই ক্ষেত্রটিকে ৯ সমান অংশে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক অংশ $\frac{1}{9}$ । সাদা অংশ $\frac{3}{9}$ । কাল অংশ $\frac{6}{9}$ । এইরূপ বোর্ডের উপর অঙ্কানু অংশ চকের দ্বারা রঙ করিয়া বালকগণকে $\frac{1}{9}$, $\frac{2}{9}$, $\frac{3}{9}$ প্রভৃতি বুঝাইতে ও শিখাইতে হইবে।

অধিকৃত ভগ্নাংশ শিক্ষা দিতে হইলে এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে :—৬১ চিত্রের মত ৯টা ছক সাজাও। মনে কর, ২ খানা আস্ত বেঞ্চকে ৯ সমান অংশে ভাগ করা হইয়াছে। সমস্ত জিনিষটা $\frac{2}{9}$ অর্থাৎ ২ ভাগের ২। এখন আরও দুইটা সমান ছক আনিয়া এই কল্পিত বেঞ্চের উপর রাখ। এখন $\frac{4}{9}$ এইরূপ ভগ্নাংশ দাঁড়াইল অর্থাৎ সম্পূর্ণ

একখান বেঞ্চ, আর $\frac{1}{2}$ ভাগ বেঞ্চ, ইহাই লিখিবার সময় $\frac{1}{2}$ বা $1\frac{1}{2}$ লেখা হইয়া থাকে । প্রকৃত ও অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কাহাকে বলে, এখন শিখাইয়া দাও । তাবপর ভগ্নাংশের সামান্য সামান্য বিষয় নিম্নের অনুরূপ চিত্রের সাহায্যে বুঝাও :—

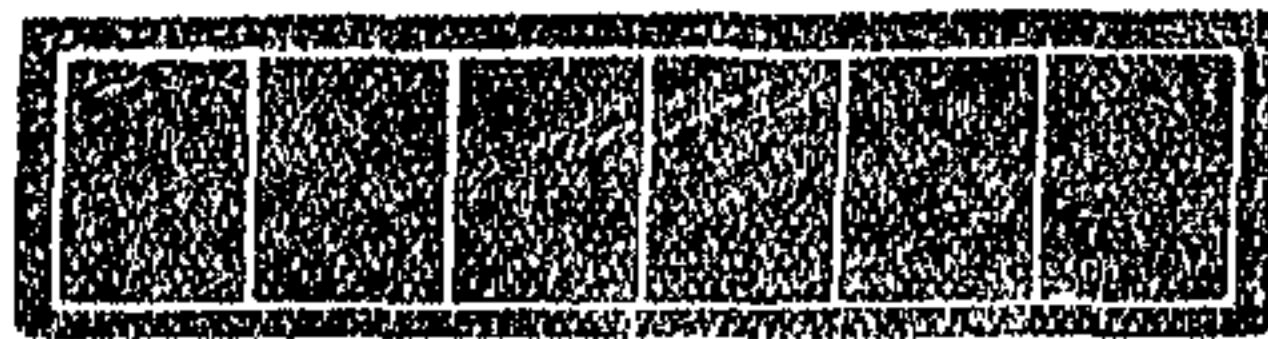


বোর্ডে এইরূপ একটি চিত্র আঁক অথবা একখানি বড় কাগজে এইরূপ একটি চিত্র আঁকিয়া রাখ, কারণ বোর্ডে এইরূপ চিত্র স্মরণ করিয়া আঁকিতে শ্রেণীর অনেক সময় নষ্ট হইবে । এখন এই চিত্রের সাহায্যে ছোট ছোট যোগ বিয়োগ বুঝাইয়া দাও ।

প্রশ্ন । এই চিত্রে $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$ দেখাও । $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ কতখানি স্থান দেখাও, $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} =$ কত ? $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ কত হয় ? $\frac{3}{4}$ হইতে $\frac{1}{4}$ বাদ দিলে কত থাকে চিত্রে দেখাও । $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ যে 1 এর সমান তাহা চিত্রে দেখাও । ইত্যাদি—

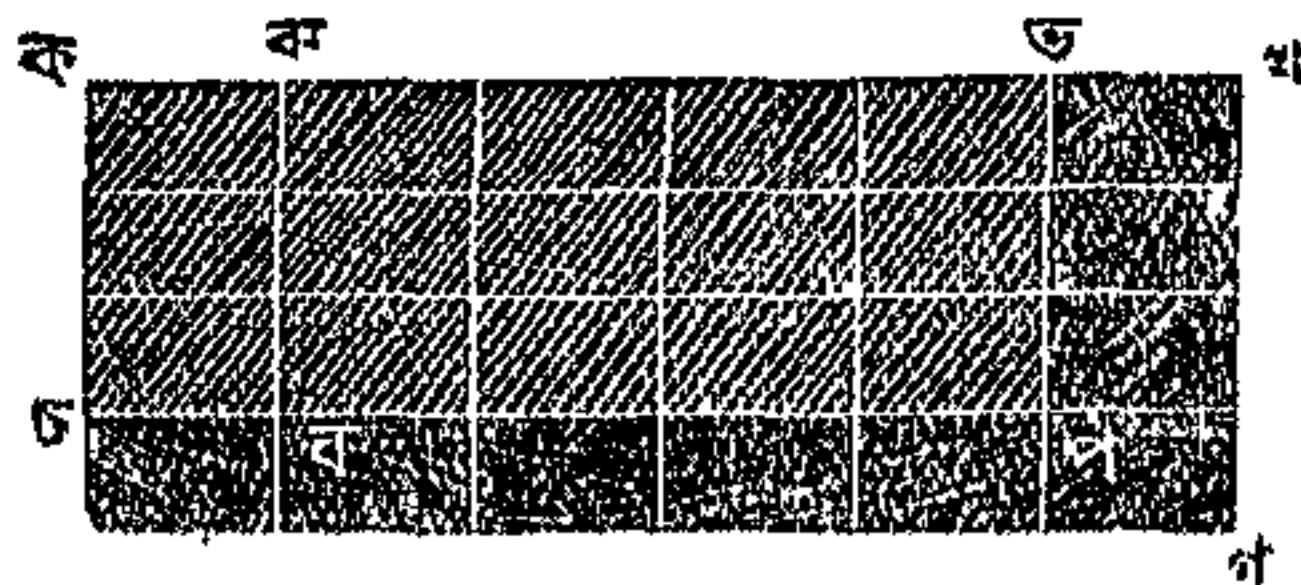
$\frac{1}{2} \times 2 =$ কত ?

নিম্নের চিত্রে একটা আস্ত জিনিষকে (মনে কর, একখণ্ড কাগজকে) ৬ সমান ভাগ করা হইয়াছে। এক একটা অংশ ক্ষেত্রের $\frac{1}{6}$, আর দুইটা অংশ ক্ষেত্রের $\frac{2}{6}$ । এইরূপ দুই অংশকে আবার ২ বার নিতে হইবে। তাহা হইলে ২ট ২টা করিয়া ৪টা অংশ হইল। সুতরাং ৪টা ঘর সমস্ত ক্ষেত্রের $\frac{4}{6}$ । আবার ক্ষেত্রকে ৩ ভাগ করিলে, এই ৩ ভাগের ২ ভাগে, পূর্বের ৬ ভাগের ৪ ভাগ থাকে। কাজেই $\frac{4}{6}$ ক্ষেত্রের যে অংশ, $\frac{2}{3}$ ও তাই। $\therefore \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$ ।



৩৭ চিত্র।—ক্ষেত্রের ভগ্নাংশ।

২ এর $\frac{1}{2} =$ কত ? সমান দুইটা ক্ষেত্রকে ৬ ভাগ করিয়া বুঝান যাইতে পারে।



৩৮ চিত্র।—ক্ষেত্রের সাহাবো ভগ্নাংশের গুণ।

$\frac{1}{2}$ এর $\frac{1}{2} =$ কত ?

কথগরি ঘেন আর একখণ্ড কাগজ। এবারে লম্বালম্বী ৬ ভাগে ও আড়াআড়ি ৪ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে (৪ ও ৬ আমাদের অক্ষের হর বলিয়া ৪, আর ৬ ভাগে ভাগ করা হইল)। এখন দেখ, কচহখ সমস্ত ক্ষেত্রের ৪ ভাগের ৩। আবার কচববা, কচহখ এর $\frac{1}{2}$ অর্থাৎ $\frac{3}{4}$ ক্ষেত্রের

উ ; এইরূপে কচপভ ক্ষেত্রাংশ (সাদা দাগ চিহ্নিত অংশ) $\frac{৩}{৪}$ ক্ষেত্রাংশের $\frac{৫}{৬}$ এই অংশই আমাদের অঙ্কের উত্তর । সমস্ত ক্ষেত্র ২৪ অংশে বিভক্ত হইয়াছে ; কচপভ অংশে ১৫ ভাগ আছে । তাহা হইলে কচপভ অংশ ২৪ ভাগের ১৫ ভাগ । সূত্রাং

$$\frac{৩}{৪} \text{ এর } \frac{৫}{৬} = \frac{১৫}{২৪} = \frac{৫}{৮} ।$$

তারপর ভগ্নাংশের ভাগ । প্রথম ভাগের কার্যটি সংক্ষেপে বুঝাইয়া লও । ধর, যেন (১২ ÷ ৪) এই অঙ্ক । ইহার অর্থ কি ? ইহার অর্থ এই যে ১২ এর মধ্যে ৪ কতবার আছে, তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে । তাহা হইলে ($\frac{৬}{৬} + \frac{৩}{৬}$) ইহার অর্থও এই যে, কোন একটি জিনিষের $\frac{৬}{৬}$ অংশের মধ্যে সেইরূপ জিনিষের $\frac{৩}{৬}$ অংশ কতবার আছে, তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে । ৬৪ চিত্র দেখ ।

ক চ হ খ সমস্ত চিত্রের $\frac{৩}{৪} = \frac{৩}{৪}$ অংশ আর ক ঘ ম ভ ঐ চিত্রের $\frac{৩}{৪} = \frac{৩}{৪}$ অংশ । আবার ক ঘ ম ভ সমস্ত চিত্রের ২০ ভাগ ও ক চ হ খ সমস্ত চিত্রের ১৮ ভাগ । সূত্রাং $\frac{৩}{৪}$ কে $\frac{৩}{৪}$ দিয়া ভাগ করা যে কথা, ২০কে ১৮ দিয়া ভাগ করাও সেই কথা ; কাজেই ($\frac{৬}{৬} + \frac{৩}{৬}$) = $\frac{৩}{৪} = ১\frac{৩}{৪}$ (অর্থাৎ ১ বার ও $\frac{৩}{৪}$ বার আছে) ।

এখন এক কথা এই যে, ভাগে ভাজকের লব ও হর উল্টাইয়া গুণ করি কেন ? এ কথা মোটামুটি তাবে এমনি করিয়া বুঝাইতে পার :—($\frac{৬}{৬} + \frac{৩}{৬}$) যখন $\frac{৩}{৪}$ এর সমান প্রমাণিত হইল আর ($\frac{৬}{৬} \times \frac{৩}{৪}$) ও যখন $\frac{৩}{৪}$ এর সমান, তখন ($\frac{৬}{৬} + \frac{৩}{৬}$) = ($\frac{৬}{৬} \times \frac{৩}{৪}$) = $\frac{৩}{৪}$ । আর যদি তোমার ছাত্তেরা ঐকিন্য়মাদি শিখিবার পর তোমাকে এই প্রমাণ করে, তবে এমনি করিয়া বুঝাও ($\frac{৬}{৬} + \frac{৩}{৬}$) এই অঙ্কের অবশ্য এমন একটি ভাগফল হইবে যাহার সহিত $\frac{৩}{৪}$ গুণ করিলে $\frac{৬}{৬}$ হয়, কারণ ভাগফল ও ভাজকে গুণ করিলে যে ভাজ্য মিলে—একথা আমরা জানি ।

তাহা হইলে সেই ভাগফলের $\frac{৫}{৬} = \frac{৫}{৬}$ ।

” ” ” ” ” $\frac{৫}{৬} = \frac{৫}{৬}$ এর $\frac{৫}{৬} = \frac{৫}{৬} \times \frac{৫}{৬}$

” ” সেই ভাগফল $= \frac{৫}{৬} \times \frac{৫}{৬} = \frac{৫ \times ৫}{৬ \times ৬}$

কিন্তু $\frac{৫ \times ৫}{৬ \times ৬} = \frac{৫}{৬} \times \frac{৫}{৬}$ $\therefore \frac{৫}{৬} \div \frac{৫}{৬} = \frac{৫}{৬} \times \frac{৫}{৬}$ ।

ভগ্নাংশের বড় বড় অঙ্ক কসিবার প্রণালী বিষয়ে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয় । বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ প্রদর্শিত যে প্রণালী, তাহাই উত্তম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । বড় অঙ্ক হইলে একেবারে ধারাবাহিকরূপে সমস্ত অংশ এক সঙ্গে না কসিয়া, অংশগুলি ভিন্ন ভিন্ন কসিয়া কসিয়া তাহাদের ফল একত্র করিলেই চলিতে পারে । এই প্রণালীতে একটি অঙ্ক পরিশিষ্টে (খাতার নমুনায়) কসিয়া দেওয়া হইয়াছে ।

কিন্তু এক কথা মনে রাখিতে হইবে । বড় বড় ও সার্কাসের মত জটিল ভগ্নাংশ দিয়া বালকগণকে বিভ্রত করিবে না । যেরূপ ভগ্নাংশ কোনদিন কাজে লাগিবে না তাহা শিখাইবার আবশ্যকতা নাই । বিদ্যালয় স্কুলের ৫ম মানের সাধারণ ভগ্নাংশ এইরূপ :—

$$\frac{৫}{৬} \text{ এর } \frac{৫}{৬} + \frac{৫}{৬} \text{ এর } \frac{৫}{৬}$$

কঠিন অঙ্ক এইরূপ :—

$$\frac{১}{২} \times \frac{১}{২} \times \frac{৫}{৬} \text{ এর } \frac{৫}{৬}$$

পরীক্ষার অতি কঠিন অঙ্ক এইরূপ :—

$$\text{সরল কর :— } \frac{৫}{৬} - ২ \frac{৫}{৬} \text{ এর } \frac{৫}{৬} \times ২ \frac{৫}{৬} + \frac{৫}{৬}$$

দশমিক ভগ্নাংশ ।—এও ভগ্নাংশ, তবে এই পার্থক্য যে দশমিক ভগ্নাংশে দ্রব্যগুলিকে ১০ সমান ভাগে (বা দশের কোন

শক্তির) ভাগ করা হয় । ঐ সাধারণ ভগ্নাংশ, দশমিক নহে । $\frac{১}{১০}$ সাধারণ ভগ্নাংশও বটে, দশমিক ভগ্নাংশও বটে । নিম্নলিখিতরূপ ছ'চারিটি অঙ্কের দ্বারা অথবা সংখ্যা ও দশমিক ভগ্নাংশের ভাব বুঝাইতে পারা যায় :—

$$৬৬৬৬'৬৬৬৬ = ৬০০০ + ৬০০ + ৬০ + ৬ + ৬ + ০০৬ = '০০০৬ ।$$

দশমিকের যোগ, বিয়োগ ও গুণ শিক্ষা দেওয়া সহজ । ভাগ শিক্ষা দেওয়াও যে কঠিন তাহা নহে, তবে বালকেরা অনেক সময় ভাগফলে দশমিক স্থান নির্দেশ করিতে গোলমাল করিয়া থাকে । যখন দশমিকের স্থান বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইবে, তখন ভাজক ও ভাগফলে গুণ করিয়া পরীক্ষা করিবে । গুণ্য ও গুণকের দশমিক স্থান যোগ করিয়া, গুণফলে দশমিক চিহ্ন স্থাপন করিতে হয়, ইহা জানা আছে । যদি ভাগফলে চিহ্নিত দশমিক স্থান ও ভাজকের দশমিকের স্থানের সংখ্যা যোগ করিয়া দশমিক চিহ্ন দিলে ভাজ্যের দশমিক স্থান না মিলে, তবেই বুঝিতে হইবে, ভাগফলে দশমিকের স্থান ঠিক হয় নাই । এখন যাহাতে মিলে, ভাগফলে একরূপ স্থানে দশমিকের চিহ্ন ঠিক করিয়া দিতে হইবে । ইহা ছাড়া ভাজ্য বা ভাজকে আবশ্যিকমত শূন্য বসাইয়া দশমিক অংশ সমান করিয়া নিলেও অনেক সময় সুবিধা হইয়া থাকে ।

অসীম ও সসীম দশমিক ।—কতকগুলি অঙ্ক কসিয়া দেখাও যে সকল দশমিকই সমান হয় না ; যথা :—

$\cdot = '৪$ সসীম	কিঞ্চ $\frac{১}{১০} = ০.১$	$২৭২৭২৭ \dots$
$\frac{১}{১০} = ০.১$	$\frac{১}{১০} = ০.১$	$৫৭১৪২৮৫৭ \dots$
$\frac{১}{১০} = ০.১$	$\frac{১}{১০} = ০.১$	$৮৮৮৮ \dots$ অসীম ।

এখন দেখা যাইতেছে, যে সকল রাশির হর ২ কি ৫ বা ইহাদের কোন গুণিতক, কেবল সেই সকল রাশিকেই সসীম দশমিকে পরিবর্তিত করা যায় ।

অসীম বা পোনঃপুনিক দশমিকের নীচে ৯ লেখে কেন, এইরূপে বুঝান যাইতে পারে :—

একবার ৩ = ৩৩৩৩৩ ..

দশবার ৩ = ৩৩৩৩৩.....

এই দশবার ৩ হইতে একবার ৩ বাদ দিলে থাকে ৯ বার ৩

আবার অপর দিকে ৩৩৩৩৩ হইতে ৩৩৩৩ বাদ দিলে থাকে কেবল ৩। সুতরাং

$$৯ \times ৩ = ৩$$

হই দিক ৯ দিয়া ভাগ করিলে

$$৩ - ৩।$$

সাক্ষেতিক।—দোকানদারেরা গুণ করিয়া জিনিষের দাম হিসাব করে না। তাহারা যেকোন সঙ্কেতে জিনিষের দাম হিসাব করে, তাহাকেই সাক্ষেতিক কহে। সাক্ষেতিক হিসাব সহজ ও অনেক সময় মুখে মুখে করা যায়। সরল অবস্থায় যে ভগ্নাংশের লব ‘এক’, তাহাকেই সাক্ষেতিকের সমাংশক কহে। $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৪}$ সমাংশক, কিন্তু $\frac{২}{৩}$, $\frac{৩}{৪}$ সমাংশক নয়। সমাংশকের সাহায্যে আমরা কেবলমাত্র ভাগ করিয়া মূল্য নির্ধারণ করিয়া লই। কিন্তু অত্যাধিক ভগ্নাংশ হইলে, কেবল ভাগে কুলায় না। ভাগের পরে আবার গুণ করিতে হয়। আবার সমাংশকের হয় যত ছোট হয়, ততই কাজের সুবিধা হইয়া থাকে। যে কোন ভগ্নাংশকে আবশ্যিকমত সমাংশকে পরিণত করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) $\frac{১৩}{১০০}$ এই ‘ভগ্নাংশকে’ ‘সমাংশকে’ পরিবর্তিত করিতে লইলে, প্রথমে ইহার হরের উৎপাদক নির্ণয় করা আবশ্যিক। ১, ২, ৪, ৫, ১০, ২০—এই সংখ্যাগুলিই ১০০এর উৎপাদক। এই সকল উৎপাদকের মধ্যে ১+২+৪ যোগ করিয়া ৭ (লব) মিলান যায়। আবার ৫+২ করিলেও ৭ মিলে। এখন $\frac{১৩}{১০০}$, $\frac{১৩}{১০০}$, $\frac{১৩}{১০০}$ হইলে, $\frac{১৩}{১০০}$, $\frac{১৩}{১০০}$, $\frac{১৩}{১০০}$ এইরূপ সমাংশক

হয় ও $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৪}$ হইলে $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৪}$ এইরূপ সমাংশক হয় ; তবে কোন্ সমাংশক লইতে হইবে ? $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৪}$ লওয়াই সুবিধাজনক, কারণ তাহা হইলে, কেবল ২ দ্বারা ভাগ করিয়াই সমস্ত অঙ্ক কসা যাইবে । $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৪}$ লইলে সে সুবিধা হয় না ।

(২) $\frac{১}{৪}$ এই ভগ্নাংশকে সমাংশক ভাগে লইতে হইবে । ৩২ এর উৎপাদক ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ । এখন ১৩ মিল করিতে হইলে, ৮+৪+১ আবশ্যক । $\frac{১}{৪} = \frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৪} = \frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৪} = \frac{১}{৪}$ ।

দৃষ্টান্ত—১১/১২ এক মণের দাম ৪০ মণের দাম কত ?

এই অঙ্ক সাঙ্কেতিকের সাধারণ নিয়মে বেশ কসিতে পারা যায়। আবার ১/১২ এক টাকার কত সমাংশক, তাহা নির্ণয় কবিয়াও সহজে কসিতে পারা যায় । যথা—

$$\begin{array}{l|l} ১ টাকা ৩২০ গণ্ডা & \\ ১/১২ = ১১২ & \frac{১১২}{১২} = ৯\frac{৪}{৩} \end{array}$$

$\frac{১}{১২}$ কে সমাংশকে পরিণত করিলে $\frac{১}{১২}$, $\frac{১}{১২}$, $\frac{১}{১২}$ হয় ।

$$\begin{array}{l|l} ১/১২ এক টাকার & ৪০ \backslash \text{ এক টাকা হিঃ দাম} \\ \frac{১}{১২} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{১}{১২} \\ \frac{১}{১২} \\ \frac{১}{১২} \end{array} \right\} & \left. \begin{array}{l} ৮ \backslash \\ ৪ \backslash \\ ২ \backslash \end{array} \right\} ১/১২ হিঃ দাম \\ \hline & ৫৪ \backslash \quad ১১/১২ হিঃ দাম \end{array}$$

যদি ভগ্নাংশের মূল্য $\frac{১}{১২}$ এর অনেক বেশী হয়, তবে সাধারণ ভাবে সমাংশক নির্ণয় না করিয়া, ১ হইতে সেই ভগ্নাংশের অন্তর কত, তাহাই নির্ণয় করিয়া লইলে, অনেক স্থলে অঙ্ক কসিবার সুবিধা হয় । মনে কর, কোন দ্রব্যের মূল্য $\frac{১}{১২}$ টাকা ; এখন ১১ টাকার হিসাবে সেই জিনিষের মূল্য কত হয় তাহা বাহির করিয়া, সেই মূল্য হইতে অষ্টমাংশ বাদি দিলেই প্রকৃত মূল্য পাওয়া গেল ।

দৃষ্টান্ত—৫৮/১০ দরে ২৪০/ মণের মূল্য কত ?

$$৫৮/১০ = ৫\frac{৪}{১০} = ৫ - \frac{২}{৫}$$

সুতরাং ৬ হিসাবে দাম বাহির করিয়া তাহা হইতে ৯০ হিসাবে যে দাম হয় তাহা বাদ দিলেই হইল :—

	২৪০	এক টাকা হিসাবে দাম
	৬	
	১৪৪	৬ হিসাবে দাম
৯০, এক টাকার ৬	৩০	৯০ হিসাবে দাম
	১৪১০	৫৮৯০ হিসাবে দাম

আর একটা দৃষ্টান্ত—২১৯০ হিসাবে ৫৮৯ সেরের দাম কত ?

	২১৯০	এক সেরের দাম
	৬	
	১৪১০	৬ সেরের দাম
১/২, ১/২ সেরের ২	১০	পাই ১/২ সেরের দাম
১/২, ১/২ সেরের ২	১১	পাই ১/২ সেরের দাম
	১৪/৩	পাই ৫৮৯ সেরের দাম

দোকানদারেরা হিসাবের সকল ভগ্নাংশকে আশু পাই বা পরসা ধরিয়া লয়। এইজন্য উত্তরে পাইএর ভগ্নাংশ ধরা হয় নাই।

মিশ্র সাক্ষেতিকের অঙ্ক সরল সাক্ষেতিকের নিয়মে করা যাইতে পারে :—

দৃষ্টান্ত—৪ পাঃ ১২ শিঃ ৬ পেঃ টনের দাম হইলে, ২৫ টন ৭ হঃ ৩ কোঃ এর দাম কত ?

প্রথমে বালকগণকে বুঝাইয়া দাও যে ১ টনের মূল্য ১ পাউণ্ড হইলে, ১ হন্ডরের মূল্য ১ শিলিং, ১ কোঃ এর মূল্য ৩ পেন্স।

	পাঃ	শিঃ	পেঃ	
	২৫	৭	৩	১ পাঃ টন দরে সমস্ত জিনিষের সাম
			৪	
	১০১	১১	০	৪ পাঃ দরে সমস্ত জিনিষের দাম
১০ শিঃ, ১ পাঃ এর ২	১২	১৩	১০	১০ শিঃ " " "
২ শিঃ ৬ পেঃ, ১০ শিঃ এর ২	৩	৩	৫	২ শিঃ ৬ পেঃ দবে " "

১১৭—৮—৪২ ৪ পাঃ ১২ শিঃ ৬ পেঃ দরে সমস্ত জিনিষের দাম

ঐকিক নিয়ম।—ঐকিক নিয়ম শিখাইতে হইলে প্রথমে নিম্ন-লিখিতরূপ অঙ্ক দ্বারা আরম্ভ করিবে :—

১। (মুখে মুখে)

১টা গরুর দাম ১০, ১২টার দাম কত ?

১টা পাঁঠার দাম ২৥০, ৫টার দাম কত ?

এইরূপ কতকগুলি অঙ্ক কসাইয়া বোঝে নিয়ম লিখ :—

কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক জিনিষের দাম বাহির করিতে হইলে, ১টা ঐ জিনিষের যে দাম, সেই দামকে সেই নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা গুণ করিতে হইবে ।

২। (মুখে মুখে)

১০ গজ বনাতির দাম ৩০ টাকা, ১ গজের দাম কত ?

১২ মের সন্দেশের দাম ২৫৥০, ১ মেরের দাম কত ?

বোর্ডে এইরূপ লিখ :—যত জিনিষ কেনা হইয়াছে, তাহার সংখ্যার দ্বারা সমস্ত জিনিষের দাম ভাগ করিলেই ১টা জিনিষের দাম পাওয়া যায় ।

৩। উক্ত দুই প্রশ্নালীর সংযোগ,—বদি ১০ গজ বনাতির দাম ৩০ হয়, তবে ১ গজ বনাতির দাম ৩—ইহা জান । এখন ৫ গজ বনাতির দাম কত ?

১২ মের সন্দেশের দাম ২৫৥০ হইলে ৯ মেরের দাম কত ?

ইহার পরেই বোর্ডে অঙ্ক কসিবার দ্বারা লিখিয়া দাও ।—

১২ মের সন্দেশের দাম ২৫৥০

১ " " " ২৫৥০ ÷ ১২ = ২৮০

৯ " " " ২৮০ × ৯ = ২৫২০

কেবল এই ঐকিক নিয়মের অঙ্কেই নহে, সকলরূপ অঙ্ক শিখাইবার সময় প্রথম খুব সরল সরল অঙ্ক কসাইবে ।

অনুপাত ও সমানুপাত ।—খুব সরল অঙ্কের দ্বারা আরম্ভ কর :—

১ টাকার সহিত ২ টাকার সম্পর্ক কত ? ১ টাকা ২ টাকার অর্ধেক, ২ টাকা ১ টাকার দ্বিগুণ ।

২ টাকার সঙ্গে ৪ টাকার সম্পর্ক কি ? উত্তর পূন্যমত ।

১০ টাকার সঙ্গে ২০ টাকার সম্পর্ক কত ? ইত্যাদি ।

বোর্ডে লিখ ৩, ৬, ১২ ইত্যাদিরূপ ভগ্নাংশের দ্বারাও ঐ সম্পর্ক প্রকাশিত হইয়া থাকে । লিখিয়া দাও যে ২ ÷ ১, ৪ ÷ ২, ২০ ÷ ১০ ইত্যাদির দ্বারাও ঐ সকল কলই পাওয়া যায় ।

তারপর বুঝাইয়া দাও, ৪ ÷ ২ এই অঙ্ক সংক্ষেপে ৪ : ২ এইরূপেও

লেখা হয় । : এইরূপ চিহ্নের দ্বারা, চিহ্নের ভিত্তয় পার্শ্বস্থ অঙ্কের যে কি সম্পর্ক তাহা নির্ণয় করিতে হইবে, ইহাই বুঝায় । ইহাকেই সমানুপাত বলে । এখন বুঝাইয়া দাও যে—

২ : ৪ যে সম্পর্ক, ৩ : ৬ এও সেই সম্পর্ক, ইহাকেই সমানুপাত বলে ।

২ : ৪ যে সম্পর্ক, ৩ : ৯ সেই সম্পর্ক নহে, ইহা সমানুপাত নহে ।

তারপর দেখাইয়া দাও যে সমান সম্পর্কবিশিষ্ট অনুপাতগুলি এইরূপে লিখিত হইয়া থাকে :—

$$২ : ৪ :: ৩ : ৬$$

(অর্থাৎ, $২ + ৪ = ৩ + ৬$)

:: চিহ্নের ক্ষুদ্র চারিটি বিন্দু দ্বারা দুইটি রেখার (সমান বোধক =) চারিটি প্রান্ত বিন্দুমাত্র সংক্ষেপে চিহ্নিত হইয়া থাকে । এখন বুঝাইতে পারা যাইবে যে, সমান সম্পর্কবিশিষ্ট দুইটি অনুপাতের ১ম ও ৪র্থ এবং ২য় ও ৩য় রাশি গুণ করিলে ফল সমান হয় ; যথা—

$$২ \times ৬ = ৪ \times ৩ ।$$

ত্রৈরাশিক ।—এখন ত্রৈরাশিক বুঝাইতে আরম্ভ কর । যে সমানুপাতের তিনটি রাশি মাত্র জানা আছে, তাহাকেই ত্রৈরাশিক কহে । তিনটি রাশি জানা থাকিলে আগরা চতুর্থ রাশি বাহির করিয়া লইতে পারি । কারণ আগরা জানি যে সমানুপাতের ১ম ও ৪র্থ রাশি গুণ করিলে যে ফল হয়, ২য় ও ৩য় রাশি গুণ করিলেও তাহাই হইবে ।

দৃষ্টান্ত—২টা গরুর দাম ৪ টাকা, ৩টার দাম কত ?

$$২ : ৪ :: ৩ : কত ?$$

অর্থাৎ ২এর সহিত ৪এর যে সম্পর্ক, ৩এর সহিত কোন্ রাশির সেই সম্পর্ক ?

$$২ \times কত = ৪ \times ৩ \quad ১২$$

৩×৪ হইল ১২, এখন ২এর সহিত কত গুণ করিলে ১২ হইবে ? ১২কে ২ দ্বারা ভাগ করিলেই জানিতে পারি । $১২ \div ২ = ৬$ তাহা হইলে

$$২ : ৪ = ৩ : ৬$$

কাজেই আমরা ২ : ৪ :: ৩ : কত ?—এই অঙ্ক কসিতে হইলে প্রথমে ৪ এর সহিত ৩ এর (অর্থাৎ মধ্যের ২ রাশির) গুণ করিয়া যে ফল হয়, তাহাকে প্রথম রাশি দ্বারা ভাগ দিয়া থাকি । যথা—

$$\text{কত} = \frac{৩ \times ৪}{২} = ৬ ।$$

তারপর ত্রৈরাশিকের রাশিগুলি সাজান সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দেওয়া আবশ্যিক । কতকগুলি সহজ সহজ অঙ্ক কমান হইলে, নিম্নলিখিতরূপ আরও কতকগুলি অঙ্ক কসাইতে হইবে । তাহা হইলে বালকেরা রাশি সাজান বুঝিতে পারিবে ।

ত্রৈরাশিক অঙ্কে সমান সমান বিষয় জাপক রাশিগুলি পাশে পাশে বসাইতে হয় ।

গরু	গরু	টাকা	টাকা
২ :	৩ ::	৪ :	ক

ইহাতেও মধ্যের দুই রাশি মধ্যের থাকিল ও পার্শ্বের দুই রাশি পার্শ্বের থাকিল । মধ্যের দুই রাশি ৪ × ৩ হইলে যে ফল হয়, ৩ × ৪ হইলে তাহাই হয় । সুতরাং এইরূপ সাজাইলে ফলের কোন পরিবর্তন হয় না ।

তারপর এইরূপ দৃষ্টান্ত—৫ জন লোকে ৩ বিঘা জমির ধান কাটিতে পারে, ১০ জন লোকে কত বিঘা জমির ধান কাটিবে ? একেবারে অঙ্ক না কসিয়া আগে ফলের আন্দাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । ৫ জনে যে কাজ করে, ১০ জনে তাহার বেশী কাজ করিবে । সুতরাং অঙ্কের ফল বড় হইবে ।

জন	জন	বিঘা	বিঘা
৫ :	১০ ::	৩ :	ক

$$\text{ক} = \frac{১০ \times ৩}{৫} = ৬ \text{ বিঘা ।}$$

আবার অষ্টকপ দৃষ্টান্ত—৫ জন লোকে ১২ দিনে একটা কাজ করে, ১০ জন লোকে কত দিনে সেই কাজটা করিবে ? ৫ জন লোকের যত দিন লাগিবে, ১০ জনের নিশ্চয়ই তার চেয়ে কম দিন লাগিবে, সুতরাং ফল ছোট হইবে । ১০ অপেক্ষা ৫ ছোট, ১২ অপেক্ষাও ফল ছোট হইবে । ১০ এর সহিত ৫ এর যে সম্পর্ক, ১২ দিনের সহিত ফলেরও সেই সম্পর্ক হইবে ।

জন	জন	দিন	দিন
১০ :	৫ ::	১২ :	ক

$$ক = \frac{৫ \times ১২}{১০} = ৬ \text{ দিন।}$$

৫ : ১০ :: ১২ : ক এইরূপ লেখা হইলে ভুল হইত। কারণ ৫ জনের দ্বিগুণ ১০ জন, কিন্তু ১২ দিনের দ্বিগুণত আর ফল হইতে পারে না, ইত্যাদিরূপ বুঝাইয়া দিবে।

ফল বেশী হইলে কিরূপে সাজাইতে হইবে আর কম হইলেই বা কিরূপে সাজাইতে হইবে, তাহা উক্ত দুই প্রকারের কতকগুলি অঙ্ক কসাইলেই বুঝিতে পারিবে।

সুদকষা।—সুদকষা, ডিসকাউন্ট ও কোম্পানির কাগজের অঙ্ক বালকেরা সাধারণতঃ ভীষণ শক্ত বলিয়া মনে করে। ইহার কারণ এই—অনেক শিক্ষক এই সকল অঙ্ক সম্বন্ধীয় ব্যাপার বালকগণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া না দিয়া, একেবারেই অঙ্ক কসিতে দিয়া থাকেন। বালকেরা ইহার ভাবের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। কেহ কেহ কৌশল মাত্র অবলম্বন করিয়া ২৪টি অঙ্ক কসিয়া থাকে। কিন্তু অনেক বালক এ সকল অঙ্ক শক্ত বলিয়া চেষ্টাও করে না। উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলে শতকরা ৯৫ জন ছাত্র যে অনায়াসে এই সকল অঙ্ক কসিতে সমর্থ হইবে তাহাতে ভুল নাই। এইরূপে বুঝাইয়া দিন।

ঘরের যেমন ভাড়া আছে, টাকারও তেমনি ভাড়া আছে। যত্নর বাড়ীতে রাম বাবু থাকেন; তিনি যত্নকে মাসে ২০/- করিয়া ভাড়া দেন। হরি মাইতীর বাড়ীতে ইন্দু বাবু চড়েন; ইন্দু বাবু হরি মাইতীকে মাসে ১৫/- করিয়া ভাড়া দেন। তেমনি চুনী পোদ্দারের টাকা, কালী বাবু নিয়া চুনীকে মাসে মাসে সেই টাকার ভাড়া দেন। ১/- টাকার ভাড়া মাসে ১০ পয়সা। কালী বাবু চুনীর কাছ হইতে ১০/- নিয়াছেন, মাসে কত ভাড়া দিয়া থাকেন? ৫ মাসে কত ভাড়া হইল? ১৫ দিনে কত ভাড়া হইল? ইত্যাদিরূপ প্রশ্ন করিয়া শিক্ষা আরম্ভ করিবে। এই টাকার

ভাড়া কেই সুদ বলে। জিনিষপত্র ভাড়া করিয়া আনিলে, যেমন সেই জিনিষ ফেরৎ দিতে হয়, টাকা কর্জ করিলেও সেই টাকা ফেরৎ দিতে হয় এবং সেই টাকার সুদ বা ভাড়াও দিতে হয়।

তারপর দৃষ্টান্ত—মাসে ১২ টাকার সুদ ২০, ১০ টাকার এক মাসের সুদ কত? ৮ মাসের সুদ কত? এক বৎসরের সুদ কত? মাসে ২০ হিসাবে ১০ টাকার সুদ কত? ২০ টাকার সুদ কত? ৫০ টাকার সুদ কত? ১০০ টাকার সুদ কত? ঐ হিসাবে ১০০ টাকার এক মাসের সুদ কত? ৩ মাসের সুদ কত? ১ বৎসরের সুদ কত?

সাধারণতঃ এই এক বৎসরের ১০০ টাকার সুদকেই সুদের 'হার' বলে। (শতকরা শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দাও)।

ছোট ছোট অনেকগুলি সহজ অঙ্ক কসাইলেই বালকগণের বোধ জন্মিবে। একবার বিষয়টী বুঝিতে পারিলে আর কঠিন অঙ্ক কসিতে কষ্ট বোধ করিবে না। তাড়াতাড়ি করিয়া বালকগণকে এক দিনেই পণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিও না। অন্ততঃ ৫৭ দিন কেবল সহজ অঙ্কই কসাইবে, তবে তাহাদের বুদ্ধি খুলিবে।

ডিস্কাউন্ট।—ব্যবসায় বাণিজ্যে বণিকগণ সকল সময় নগদ টাকা দিয়া জিনিষ ক্রয় করিতে পারে না। মনে কর, মথুর কুণ্ডুর পাটের কারবার আছে; মথুর পাট কিনিয়া গুদাম বোঝাই করিতেছে; কিনিতে কিনিতে তাহার তহবিলে টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আরও পাট ক্রয় করা দরকার। এমন সময় শিবু সা এক নৌকা পাট নিয়া উপস্থিত। মথুর শিবুর নিকট হইতে বাকী করিয়া সেই পাট কিনিয়া রাখিল। দাম ও মাস পরে পরিশোধ করিবে বলিয়া স্বীকার করিল। পাটের দাম ৩০০ টাকা স্থির হইল। মথুর দামের টাকা ৬ মাস পরে দিবে স্বীকার করিল, শিবু এই ৬ মাসের সুদের দাবী করিল। তখন বাজারের অন্ত্যান্ত কারবারিগণ শতকরা ৩ টাকা

করিয়া ক্ষুদ্র দেয়। ক্ষুদ্রাংশ সেই হিসাবে ৩০০ টাকার ৬ মাসের ক্ষুদ্র ৪৮০ হইল। এখন মথুর শিবকে এই মর্মে একখানা হাতটিঠা লিখিয়া দিল যে, ৬ মাস পরে সে শিবকে ৩০৪৮০ দিবে। এই যে ৪৮০ টাকা বেশী দিতে হইতেছে, ইহাকেই ডিসকাউন্ট বলে। এও ক্ষুদ্র বিশেষ। কিন্তু যদি মথুর শিবকে এখনই টাকা দিতে পারে, তবে আর ক্ষুদ্র দিতে হইবে না। ক্ষুদ্রাংশ ৬ মাস পরে যে দাম বাবদ ৩০৪৮০ দিতে হইত, এখন (বর্তমান কালে) সে মূল্য ৩০০ টাকাতাই হইয়া যায়। অতএব ৬ মাস পরে দেয় ৩০৪৮০ টাকার (শতকরা ৩ হিসাবে) বর্তমান মূল্য ৩০০। গ্রামের বা সহরের পরিচিত ব্যবসায়িগণের কারবারের দৃষ্টান্ত দিতে পারিলে, বালকগণের নিকট বিশেষ প্রীতিপদ হইবে। ফল কথা, প্রথমে অঙ্ক কসাইবার জন্ত বিশেষ তাড়াতাড়ি না করিয়া, পূর্বে বালকগণকে বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে সহজ অঙ্ক কসাইবে।

কোম্পানীর কাগজ।—গভর্ণমেন্টেরও যে টাকা কর্জ করিবার আবশ্যকতা হয়, তাহা বালকেরা জানে না। তাহাদের বিশ্বাস, যখন গভর্ণমেন্টের টাকার কল আছে, তখন ইচ্ছামত প্রস্তুত করিয়া লইলেই হইল। বালকগণকে বুঝাইতে হইবে যে গভর্ণমেন্টের আয়ের একটা সীমা আছে। প্রজারা যে বাৎসরিক খাজানা দেয় ও গভর্ণমেন্টের যে অগ্রাণুরূপ কারবারে বাজে আয় হয়, তাহাই গভর্ণমেন্টের বাৎসরিক আয়। আর সোণা, রূপা, তামা প্রভৃতি গভর্ণমেন্টকেও অর্থ দিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। এখন কি অবস্থায় গভর্ণমেন্টকে কর্জ করিতে হয়, তাহা বলা দরকার। যখন যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হয় বা বহুদূর বিস্তৃত রেলপথ বা সেতু নির্মাণ করিতে হয় বা ভীষণ দুর্ভিক্ষাদি নিবারণের জন্ত ব্যবস্থা করিতে হয়, তখন গভর্ণমেন্টের বাধা আয়ে কুলায় না। কাজেই টাকা কর্জ করিবার আবশ্যক হয়।

গভর্ণমেন্ট গেজেটে বিজ্ঞাপন দেন যে ৫০০০০০০ (মনে কর) টাকা কর্জ করা আবশ্যিক । শতকরা ৩ হিসাবে সুদ দেওয়া হইবে । প্রজাদের মধ্যে যাহারা অবস্থাপন্ন, তাহারা গভর্ণমেন্টকে টাকা কর্জ দেয় । দুর্গানাথ বাবু ৫০০০০ দিলেন, হায়দারজান চৌধুরী ২০০০০ টাকা দিলেন ইত্যাদি । ইহার ৬ মাস পর পর, স্থানীয় খাজাঞ্চীখানা হইতে তাঁহাদের টাকার সুদ লইয়া আসেন । বাজে লোককে টাকা কর্জ দিলে, গভর্ণমেন্টের সুদ অপেক্ষা বেশী সুদ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু টাকা একেবারে মারা যাইবারও সম্ভাবনা থাকে । গভর্ণমেন্টকে কর্জ দিলে টাকা মারা যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই । আর এক কথা, বাজে লোককে টাকা কর্জ দিলে সে টাকা যেমন ইচ্ছামত আদায় করা যায়, গভর্ণমেন্টকে টাকা কর্জ দিলে, মূল টাকা ইচ্ছামত পাওয়া যায় না । আমার যখন টাকা আবশ্যক, তখন গভর্ণমেন্টের নিকট টাকা চাহিলে পাইব না, কিন্তু গভর্ণমেন্ট যখন ইচ্ছা করেন তখনই টাকা ফিরাইয়া দিতে পারেন । তবে আমার টাকার আবশ্যক হইলে গভর্ণমেন্টে-গচ্ছিত-টাকার কাগজ বিক্রয় করিতে পারি । কিন্তু কে আমার কাগজ কিনিবে, কাহার আবশ্যক আছে, তাহা ত আমি জানি না । এই জন্ত দালালের দোকান আছে । তাহারা একজনের নিকট হইতে কাগজ কিনিয়া অপরের নিকট বিক্রয় করে । তাহারা প্রতি ১০০ টাকায় ৮০ আনা করিয়া কমিশন (পারিশ্রমিক), ব্রোকারেজ বা দালালি কাটিয়া রাখে । দৃষ্টান্ত—যদি ১০০ টাকার কাগজ বিক্রয় করিবে । সে দালালের নিকট গেল । দালাল তাহাকে ৯২৫৮০ দিল ; ৮০ আনা কাটিয়া রাখিল । আবার, হরি বাবু দালালের দোকানে ১০০ টাকার কাগজ কিনিতে গেলেন । দালাল হরি বাবুর নিকট হইতে ১০০৮০ লইয়া কাগজ বিক্রয় করিল । এই যে ৮০ আনা, ইহার নামই ব্রোকারেজ বা দালালী । দালাল, কাগজ কিনিবার সময় ৮০

পাইল ও বিক্রয়ের সময়ও ৮০ পাইল। সুতরাং ১০০ টাকার কাগজ কেনা বেচায়, তাহার ১০ লাভ হইল। কোম্পানির কাগজ কেন নাম হইল, তাহাও বুঝান আবশ্যক। পূর্বে ভারত-রাজত্ব ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছিল। তাঁহারাই প্রথমে প্রজার নিকট হইতে কর্জ আরম্ভ করেন। টাকা কর্জ করিয়া কোম্পানি উত্তমর্গকে একখানি হাতচিঠা (খতের মত) দিতেন। সেই হাতচিঠাতে লেখা থাকিত—কোম্পানী অমুকের নিকট হইতে এত টাকা কর্জ করিলেন, ঐ টাকার সুদ শতকরা এত হিসাবে দিবেন; ইত্যাদি। এই কাগজের নামই লোকে কোম্পানীর কাগজ (কোম্পানী প্রদত্ত হ্যাণ্ডনোট কাগজ) বলিত। এখন যদিও কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু সাধারণের নিকট কাগজের সেই নামই আছে। এখন কোম্পানীর পরিবর্তে, ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে এই হাতচিঠা দেওয়া হয়। এই কাগজ ১০০ টাকার নোটের মত একখানি হ্যাণ্ডনোট।

তারপর, কাগজের দাম কম ও বেশী হয় কেন, তাহা বলা আবশ্যক। যখন কোম্পানী বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া প্রজা সাধারণের নিকট টাকা কর্জ প্রার্থী হইয়া থাকেন, তখন প্রজারা সহজে টাকা দিতে চাহে না বলিয়া, গভর্নমেন্টকে ১০০ টাকার কাগজ ১০০ টাকার কমে বিক্রয় করিতে হয়। রুষ-জাপান যুদ্ধের সময়, রুষকে বিপন্ন বুঝিয়া কেহ তাহাকে টাকা কর্জ দিতে অগ্রসর হইল না; রুষ গভর্নমেন্ট কাগজের দাম খুব কমাইয়াছিলেন। আমাদের দেশেও সিপাহীবিদ্রোহের সময় কাগজের দাম খুব কমিয়াছিল। ১০০ টাকার কাগজ ৮০, ৭৫ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু কাগজে ‘১০০ কর্জ করিলাম’ বলিয়াই লেখা হইয়া থাকে এবং তাহার সুদও ১০০ টাকার হিসাবেই পাওয়া যায়। আবার গভর্নমেন্টের যখন খুব স্বচ্ছল অবস্থা থাকে, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যাদির জন্য টাকার দরকার হয়, তখন আবার প্রজারা (চোর ডাকাইতের হাত হইতে ধন সম্পত্তি বাঁচাইবার জন্য) গভর্নমেন্টকে টাকা কর্জ দিয়া থাকেন।

১০০ টাকার দাম এ সময়ে বেশী হয়। ১০০ টাকার কাগজ কিনিতে ১১০, ১১৫ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়। কিন্তু কাগজে ১০০ লেখা থাকে ও সুদও ১০০ টাকার হিসাবেই দেওয়া হয়। ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে ১০০ টাকার কাগজ ১১৫ টাকায় কিনিয়া কি লাভ হয়? দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে হইবে। মনে কর, ১০০ টাকার সুদ ৩ টাকা। ১০০ টাকার কাগজ ১১৫ দিয়া কিনিলাম। ৫ বৎসরে ১৫ সুদ পাইলাম। যে ১৫ টাকা বেশী দিয়াছিলাম, তাহা ৫ বৎসরে উঠিয়া গেল। তারপর হইতে যে সুদ পাওয়া যাইবে, তাহা লাভ। আর টাকাও নিরাপদে থাকিল। এইরূপ এক এক অংশ বুঝাইতে হইবে আর সরল অঙ্ক কসাইতে হইবে।

বিবিধ প্রশ্ন।—জড়িত অঙ্কগুলি শিক্ষা দিবার সময়ও প্রথমে খুব সরল (অথচ জড়িত) অঙ্ক শিখাইতে আরম্ভ করিবে। ছোট ছোট সংখ্যা দিয়া এমন অঙ্ক প্রস্তুত করিয়া লইবে, যাহার উত্তর বালকেরা এক রকম মুখে মুখে দিতে পারে। আবার একটা অঙ্ক না পারিলেই যে তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝাইয়া দিবে, তাহাও উচিত নহে। বালককে অঙ্ক কসিবার দ্বারা নির্দ্বারক করিবার উপায় শিক্ষা দিবে।

দৃষ্টান্ত—এমন একটা সংখ্যা নির্ণয় কর, যাহা হইতে ৫ বাদ দিয়া অবশিষ্টের সহিত ৭ গুণ করিলে ৭০ হয়।

মনে কর, বালক কসিতে পারিতেছে না। তাহাকে একটা ছোট রাশি ধরিয়া লইতে বল—যেন ১০। তাহা হইতে একটা ছোট রাশি বাদ দিতে বল—যেন ৪; অবশিষ্ট থাকিল ৬; এই ৬কে ৩ দিয়া গুণ কর, হইল ১৮। এখন বালককে বল যে এই ৪, ৩ ও ১৮ বলিয়া দেওয়া হইল; সেই ১০ কেমন করিয়া বাহির করিবে? একটা অঙ্কের দ্বারা বুঝিবে না বা একবারেও বুঝিবে না। বিরক্ত হইলেও চলিবে না, শিক্ষকের খুব ধৈর্য্য গুণ চাই।

এক রকমের কতকগুলি অঙ্ক কসাইয়া বালকদিগকেও সেইরূপ অঙ্ক রচনা করিতে বলিবে ও তাহাদিগকে সেই স্বরচিত অঙ্ক কসিতে দিবে।

বালকগণের বিশ্বাস যে কবিতা রচনা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেহ করিতে পারে না, আর অঙ্ক রচনাও যাদব চক্রবর্তী ছাড়া আর কেহ পারে না। বিশ্বাসের একটু কারণও আছে—শিক্ষক ও পরীক্ষকগণ প্রশ্ন করিবার সময়ও কোন পাঠীগণিত দেখিয়া অঙ্ক তুলিয়া দেন—একটীও নিজে তৈয়ার করিবার কষ্ট স্বীকার করেন না। কিন্তু ইহাতে অঙ্ক জিনিষটাকে ক্রমেই একটা বিভীষিকা ঢাকিয়া ফেলিতেছে। বালকেরা যদি বুঝিতে পারে যে তাহারাও অঙ্ক তৈয়ারী করিতে পারে তবে অঙ্কের রহস্ত কমিয়াযাইবে।

অঙ্ক তৈয়ারী করিবার ছুই একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিবে ও বালকগণকে এইরূপ আদেশ করিবে :—

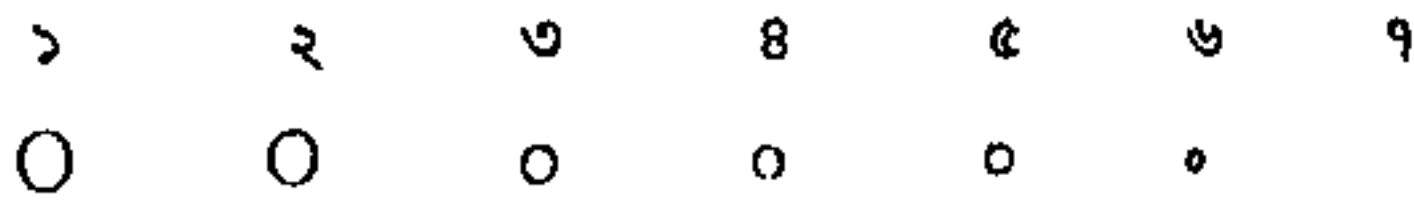
এই বিবরণের যে কোন দুইটা দিয়া, বাড়ী হইতে ২টা অঙ্ক তৈয়ার করিয়া আনিবে :—(বালকগণের বয়স অনুসারে বিষয়ের তারতম্য হইবে)—বাগানের ফুলও ফলের গাছ, মাঠে গরু ছাগল, পাঠশালার হিন্দু মুসলমান ছাত্র, গ্রামের হিন্দু মুসলমান, ক্রিকেট বা ফুটবল খেলায় ছুই দলের হারজিত, বাজারের দোকান, নগরে ভগ্ন মৃত্যু ইত্যাদি ইত্যাদি।

২। জ্যামিতি ।

জ্যামিতি শিক্ষায় লাভ।—জ্যামিতি শিক্ষায় লাভ দ্বিবিধ—ব্যবহারিক ও মানসিক। (১) ব্যবহারিক—আমরা গোলক, চৌল, সমঘন, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ প্রভৃতি নানাবিধ আকারের চিত্রাদি আঁকিতে শিক্ষা করি। ভাস্কর, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কারিকরগণের পক্ষে এই সমস্ত চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করা যে নিতান্তই প্রয়োজনীয়, তাহাতে ত কোন সন্দেহই নাই; অতএব পক্ষেও এই শিক্ষার আবশ্যিকতা আছে। যে সমতা সৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ, জ্যামিতি শিক্ষায় সেই সমতার বোধ জন্মে। (২) মানসিক—জ্যামিতির সাহায্যে আমরা নানাবিধ ক্ষেত্রের বাহু, কোণ, ক্ষেত্রফল, প্রভৃতির সম্বন্ধ অসম্বন্ধ যজ্ঞাদির দ্বারা পরিমাণ না করিয়াও, কেবল মূহুর্তি বিচারের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারি। (৩) ইহা অপেক্ষা উত্তমতর

এই ফল লাভ করি যে, জ্যামিতির আলোচনায় আমরা শৃঙ্খলাক্রমে তর্ক করিতে শিক্ষা করি এবং নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পথ বুঝিতে পারি।

জ্যামিতি শিক্ষার ধারা ।—সূত্র মুখস্থ করাইবার আবশ্যকতা নাই। একেবারেই প্রথম প্রতিজ্ঞা হইতে শিক্ষাদান আরম্ভ করা যাইতে পারে। তবে কয়েকটি সূত্রের বিষয় মাত্র শিখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বিন্দুর কথা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও। বোর্ডে এইরূপে কয়েকটি বিন্দু দাও—



৬৫ চিত্র ।—বিন্দু শিক্ষা ।

১ হইতে ৭ পর্য্যন্ত বিন্দুগুলি কেমন বড় হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট হইতে হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এই যে সর্বাপেক্ষা ছোট অদৃশ্য বিন্দু ইহাই জ্যামিতির বিন্দু। এইরূপে সূত্র দাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত কয়েকটা রেখা টান। যে রেখাটির সূত্র একেবারেই নাই, উহাই জ্যামিতির রেখা।

তবে আপাততঃ একটা সাধারণ বিন্দুর দ্বারা ‘বিন্দুর’ বিষয় এবং সাধারণ রেখা দ্বারা ‘রেখার’ বিষয় বুঝাইলেও চলিতে পারে। তারপর ‘সরল রেখা’ ও ‘বক্র রেখা’ অঙ্কন করিয়া দেখাও ও বালকদিগের দ্বারা অঙ্কন করাও। ইহার পর ত্রিভুজ—দুই বাহু সমান হইলে সমদ্বিবাহু, তিন বাহু সমান হইলে সমবাহু ইত্যাদি চিত্রগুলি কেবল অঙ্কনের দ্বারা বুঝাইয়া দিবে। বালকেরা প্রথম হইতেই একখানা স্কেল ও একটা পেন্সিল কম্পাস ব্যবহার করিতে শিখিবে। শিক্ষক বা ছাত্রকে ব্ল্যাক-বোর্ডে যে সকল ক্ষেত্র অঙ্কন করিতে হইবে, তাহা ব্ল্যাকবোর্ড-স্কেল ও কম্পাসের সাহায্যে করিবে। যেমন তেমন করিয়া চিত্রাঙ্কন নিতান্তই দোষের। প্রথম প্রতিজ্ঞা শিখাইতে উপরোক্ত সূত্র ছাড়া, বৃত্তের বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। আর জ্যামিতিতে বৃত্তই সর্বাপেক্ষা

আবশ্যক ক্ষেত্র। ইহার দ্বারাই জ্যামিতির সমস্ত মাপের কার্য্য নির্বাহ হইয়া থাকে। বালকগণকে কম্পাসের সাহায্যে বৃত্তাঙ্কন শিক্ষা দাও এবং নিজেও বোর্ডে কম্পাসের সাহায্যে বৃত্ত আঁক। কোন্ বিন্দুকে কেন্দ্র বলে, তাহা দেখাইয়া দাও। কোন্ অংশের নাম পরিধি, তাহা বলিয়া দাও; এখন স্কেলের দ্বারা মাপিয়া দেখাও, বৃত্তের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত যত রেখা টানা যায় সকলগুলিই সমান। বালকেরা নিজের নিজের বৃত্তে ঐ রেখাগুলি মাপিয়া দেখিবে। বৃত্তের মধ্যে দুইটী ব্যাসার্দ্ধ টানিয়া, তাহাদের পরিধিসংলগ্ন দুই প্রান্ত সংযুক্ত কর। একটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হইল। এইরূপে (বৃত্তের সাহায্যে) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন শিক্ষা দাও। তারপর বোর্ডে একটা রেখা টানিয়া দাও। সেইটী যেন কোন সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের একটী বাহু। এখন এই বাহুটী অবলম্বন করিয়া, একটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করিতে বল। এইরূপে রেখাগুলি লম্বভাবে, তির্য্যগ্ভাবে, ভূসমান্তর ভাবে, নানা প্রকারে আঁকিয়া দাও ও সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করিতে বল। সেগুলি যে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, তাহা না মাপিয়া প্রমাণ করিতে বল। যখন কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত সব রেখাই সমান, তখন ত্রিভুজের বাহুদ্বয় যে সমান তাহা বালকেরা না মাপিয়াই বলিতে পারিবে। এখন ‘৩ বাহু সমান’ একটী ত্রিভুজ অঙ্কন করিতে বল। একটী বৃত্তের দ্বারা এরূপ ত্রিভুজ অঙ্কন করা যখন বালকেরা কঠিন বোধ করিবে, তখন আর একটী বৃত্ত অঙ্কনের কথা বলিয়া দাও। কিন্তু কোথায় কিরূপ অঙ্কিত করিতে হইবে, তাহা প্রথমেই বলিয়া দিও না। যখন তাহারা একেবারেই না পারিবে, তখন একটু একটু করিয়া বলিয়া দিবে। বালকগণকে পুস্তক পড়িতে দিও না, মুখে মুখে শিখাইবে। সাদা-সিদে ভাবে প্রমাণ করাইয়া লইবে; কথ প্রভৃতি অক্ষরের সাহায্য লইবে না। ‘এই বাহু এই বাহুর সমান, এই কোণ এই কোণের সমান’ ইত্যাদিরূপে বাহু ও কোণ দেখাইয়া দেখাইয়া প্রমাণ করিবে।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা প্রমাণের সময়ও এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিবে। রেখার উপর (প্রথম প্রতিজ্ঞানুসারে) সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করিবার সময় কেবল প্রথম প্রতিজ্ঞার নাম করিয়া একটা যেমন তেমন ত্রিভুজ অঙ্কন করিতে দিও না। কম্পাসের দ্বারা দুইটী বৃত্ত অঙ্কন করিয়া সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করিবে। তারপর বৃত্ত দুইটী পুঁছিয়া ফেলিবে।

স্কেলের দ্বারা কেবল সরল রেখা টানিতে পারিবে এবং কম্পাসের দ্বারা কেবল বৃত্ত আঁকিতে পারিবে, কিন্তু এই দুই যন্ত্রের দ্বারা যে মাপাদি লইতে পারিবে না, তাহা বলিয়া দাও। জ্যামিতি এক রকমের খেলা; কে না মাপিয়া কেবল রেখা টানিয়া ও বৃত্ত আঁকিয়া এই সকল প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে পারে—ইহাই পরীক্ষা করা।

চতুর্থ প্রতিজ্ঞা বুঝাইবার পূর্বে কোণের বিষয় বুঝিয়া দাও। কম্পাসের দ্বারা বেশ বুঝান যাইতে পারে। একখানি কাঁচা বাঁশের কাঠী ভাজিয়া লইলেও হয়। কম্পাস বা কাঠী ফাঁক করিয়া ধর। বলিয়া দাও যে কম্পাসের দুইটী ডাল বা বাহুর মধ্যে যে ফাঁক, তাহাকেই কোণ বলে। কম্পাস আরও ফাঁক কর, কোণ বড় হইবে; কম্পাসের দুই বাহু চাপিয়া আন, কোণ ছোট হইয়া আসিবে। দুইটী কম্পাস বা দুই খানি ভাঙ্গা কাঠী লইয়া দুইটী কোণ কর। একটা কোণের উপর আর একটা কোণ রাখিয়া দুইটী সমান কি অসমান, পরীক্ষা করিতে বল। তারপর বাহুগুলি পরস্পর সমান করিয়া লও। কোণের সহিত কোণ মিল করিলে, সমান বাহুতে বাহুতে যে একেবারে সমান হইয়া মিলিয়া যাইবে, ইহা দেখাইয়া দাও। কোণ সমান না হইলে এক বাহু এক বাহুতে মিলিবে, কিন্তু আর এক বাহু মিলিবে না।

এখন তার বা কাঠীর দ্বারা দুইটী সমান ত্রিভুজ করিয়া লও। কোণও বাহু মিলিলে ভূমি যে মিলিবে তাহা দেখাও। সুতরাং ত্রিভুজ দুইটী সমান হইবে। এই প্রতিজ্ঞার যে স্থলে 'দুই সরল রেখা ক্ষেত্র বেঠেন

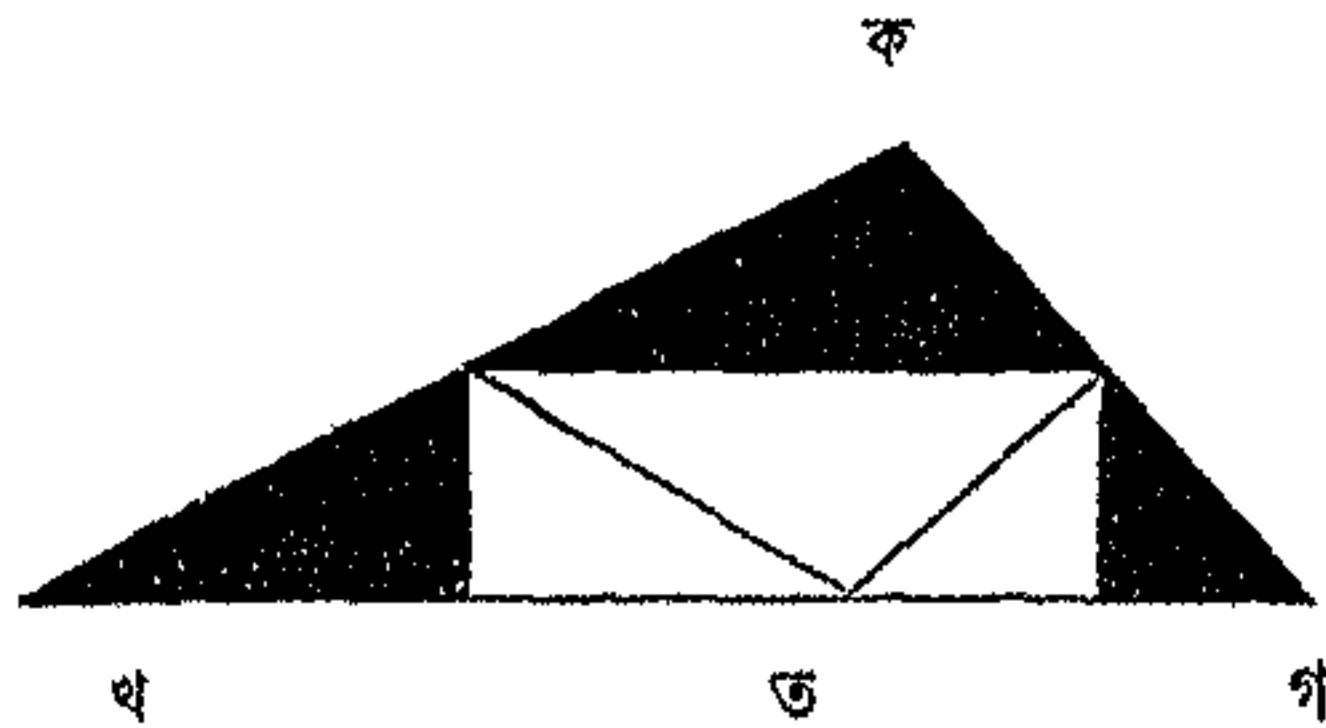
করিল' বলিয়া প্রমাণের এক অংশ কথিত হইয়াছে, তাহা প্রথম শিক্ষার সময় বাদ দিয়া যাও।

চতুর্থ প্রতিজ্ঞা উত্তমরূপে বুঝাইলেই ৫ম প্রতিজ্ঞা সহজ হইয়া আসিবে। কাগজের ত্রিভুজ কাটিয়া বা তার দিয়া ত্রিভুজ তৈয়ার করিয়া, একটার উপর আর একটা নানা প্রকারে রাখিয়া (৫ম প্রতিজ্ঞায় যেরূপ আবশ্যক), ৪র্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণ করাইয়া লও।

অন্ততঃ ২৬টা প্রতিজ্ঞা এইরূপে মুখে মুখে শিখাইবে। তারপর পুস্তক পড়াইবে।

যখন যে সূত্রের আবশ্যক হইবে, তখন তাহা বুঝাইয়া দিবে। স্বতঃসিদ্ধের বিষয়গুলি বালকেরা সহজেই বুঝিতে পারে, স্মরণার্থ প্রথমে তাহার পৃথক আলোচনা না করাই ভাল।

ব্যবহারিক প্রমাণ।—কতকগুলি প্রতিজ্ঞার উত্তমরূপে ব্যবহারিক প্রমাণ দেখাইতে পারা যায়। নিম্নে ৩২ প্রতিজ্ঞায় প্রমাণ প্রদত্ত হইল। অন্যান্য প্রতিজ্ঞার ব্যবহারিক প্রমাণ প্রায় জ্যামিতিতেই লিখিত হইয়া থাকে।



৬৬ চিত্র।—কাগজ ভাঁজ করিয়া ৩২ প্রতিজ্ঞা।

একটা কাগজের ত্রিভুজ কাটিয়া লও (সমকোণী ত্রিভুজ করিও না)। এখন কাগজ ভাঁজ করিয়া ক কোণ খগ সরল রেখার উপর পাত কর। বাম হইতে খ কোণ ও ডান হইতে গ কোণ ভাঁজিয়া আনিয়া ত বিন্দুতে

৩টী কোণ একত্র মিলিত কর । ৩টী কোণ এক রেখায় একেবারে মিলিয়া যাইবে । সুতরাং এই ৩টী কোণ ২ সমকোণের সমান ।

ব্যবহারিক জ্যামিতি ।—ব্যবহারিক জ্যামিতিতে প্রমাণাদি বা অঙ্কনের প্রক্রিয়া লিখিয়া দিতে হয় না । তবে কেবল মাত্র প্রস্তাবিত চিত্রাঙ্কন করিয়া দিলেই হইল । এই চিত্রাঙ্কনের প্রণালী ও চিত্রটী সম্পূর্ণ ঠিক হওয়া চাই । চিত্র ভুল হইলেই সমস্ত ভুল হইয়া গেল । দৃষ্টান্ত—“কোন একটি নির্দিষ্ট সরলরেখাকে সমদ্বিখণ্ডিত করিতে হইবে”—এখন একটি রেখা টানিয়া, তাহা মাপিয়া ও স্কেলের দ্বারা মধ্যবিন্দু নির্ধারণ করিয়া, কেবল মাত্র সেই মধ্যবিন্দু স্থলে একটা চিহ্ন দিলেই এই প্রশ্নের উত্তর হইল না । কারণ এইরূপ মাপের দ্বারা মধ্যবিন্দু নির্ধারণ করা সকল সময় সম্ভবপর হয় না । ৪ ইঞ্চ রেখাকে স্কেলের সাহায্যে ২ সমান ভাগে ভাগ করা যায় ; ৩ই ইঞ্চ রেখাকেও ভাগ করা যায় ; কিন্তু যদি রেখাটী ৩'৭ ইঞ্চ হয়, তবে স্কেলের সাহায্যে কেমন করিয়া উহার মধ্যবিন্দু নির্দেশ করিবে ? স্কেলে এত সূক্ষ্ম ভাগ থাকে না । এই জন্ত রেখা দ্বিখণ্ডিত করিবার একটা সাধারণ প্রক্রিয়া আবশ্যক । যথা—“নির্দিষ্ট অংশের অর্ধেক অপেক্ষা বৃহত্তর একটি অংশ অনুমান করিয়া, তাহাকে ব্যাসার্ধ ধরিয়া লও এবং নির্দিষ্ট রেখার প্রান্তদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া, দুইটী বৃত্ত অঙ্কিত কর । এই বৃত্ত দুইটী যে যে স্থলে ছেদ করিল, তাহা রেখার দ্বারা সংযুক্ত কর । সেই রেখা যেখানে নির্দিষ্ট রেখাকে ছেদ করিবে সেই বিন্দুই মধ্যবিন্দু ।” অঙ্কনের সময় সম্পূর্ণ বৃত্ত অঙ্কিত না করিয়া কেবল মাত্র আবশ্যকীয় চাপ অঙ্কন করিলেই কাজ চলিয়া থাকে বলিয়া, চাপ অঙ্কন করাই নিয়ম । কোনরূপ প্রমাণ লিখিতে বা মুখে বলিতে হয় না বটে, কিন্তু মধ্যবিন্দুটী ঠিক হইল কি না, তাহা কম্পাসের দ্বারা মাপিয়া দেখিতে হয় । কারণ পরীক্ষকগণ কম্পাসের দ্বারা মাপিয়াও পরীক্ষা করেন । সুতরাং চিত্রাঙ্কন বিশেষ যত্নের সহিত

করিতে হয়। স্কেল, কম্পাস ব্যতীত ব্যবহারিক জ্যামিতির শিক্ষা চলে না।

৩। পরিমিতি।

পরিমিতি শিক্ষার আবশ্যিকতা।—আমাদিগের দেশ কৃষি-প্রধান। জমি জমা লইয়াই আমাদের কারবার। সুতরাং জমি মাপ করিবার প্রণালী প্রত্যেকেরই শিক্ষা করা কর্তব্য।

পরিমিতি শিক্ষার আসবান।—যদি চেন কি ফিতা না থাকে, তবে একটা শক্ত দড়িতে ফুটের চিহ্ন দিয়া লইবে। আর একটা দড়িতে হাতের চিহ্ন দিয়াও লইবে। প্রত্যেক হাত বা ফুটের মাথায় কাল রং লাগাইয়া দিবে বা কাল সূতা জড়াইয়া বাঁধিবে। দড়ি দুই গাছি ১০০ ফুট ও ১০০ হাত হইলেই যথেষ্ট হইবে। ৪ হাত লম্বা সর বঁশ বা শক্ত নল ২৪টি রাখা আবশ্যক। ইহাতেও ছুরির দ্বারা ফুটের বা হাতের চিহ্ন কাটিয়া রাখিবে। ১খান ১বর্গফুট ও ১খান ১বর্গহাত তক্তাও রাখা আবশ্যক। ১ বর্গহাত বা ১ বর্গফুট জমি কতটা, তাহার একটা ধারণা করাইয়া দিতে হইবে। ঐ কাঠ দু'খানির মাঝখানে এক একখানি ছোট টুকরা কাঠ পেরেক দিয়া আঁটিয়া দিলে ধরিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কোদালী দ্বারা ২০ হাত দীর্ঘ ও ১৬ হাত প্রস্থ এক খণ্ড জমির চারিদিকে দাগ কাটিয়া রাখিবে। এক কাঠা জমিতে যে কতটা স্থান, ইহাতে তাহার ধারণা জন্মিবে।

শিক্ষাদানের ধারা।—বালকগণকে মাপিতে শিখাইবে। বেঞ্চ-খানা কত হাত লম্বা? এ ধুতিখানি, এ দড়ি গাছি, এই রাস্তাটা, এই বঁশটা এত হাত লম্বা বলিলেই, আমরা সেই সকল জিনিষের একটা আন্দাজ পাই। কারণ ধুতি, বেঞ্চ, রাস্তা, বঁশ, দড়ি প্রভৃতি সাধারণতঃ যে পরিমাণ প্রশস্ত হইয়া থাকে, তাহা আমাদিগের জানা আছে। কিন্তু এক খণ্ড জমি এক হাত লম্বা বলিলে, আমাদিগের সে জমির ধারণা হয় না। কারণ জমির প্রস্থের নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ নাই। পরিমাণ বহু প্রকারের হইয়া থাকে, সেই জন্য জমির দৈর্ঘ্যও প্রস্থ দুইই জানা আবশ্যক। ১ হাত দীর্ঘ ও ১ হাত প্রস্থ জমি যতটা, ততটা জমিই ভূমি মাপের 'একক'।

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১ হাত করিয়া হইলে তাহাকে ১ বর্গহাত কহে (১ বর্গ হাত তক্তাখানি দেখাও ; জমিতে ১ হাত দীর্ঘ ও ১ হাত প্রস্থ জমি মাপিয়া দেখাও) । এখন একখণ্ড জমি দেখাইয়া দাও ও ১ বর্গহাত তক্তা দ্বারা সেই জমিতে কত বর্গহাত জমি আছে, তাহা মাপ করিতে বল ।

৫ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত প্রস্থ একখণ্ড জমি মাপিয়া লও । সেই জমিতে কত বর্গহাত জমি আছে, তাহা তক্তা দ্বারা মাপিয়া দেখ । পরে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৫ হাত ও ৪ হাতের চিহ্ন দিয়া চিত্রের অনুরূপ সমান্তর রেখা টান বা জমির উপরে দাগে দাগে কাঠী বা দড়ি সাজাও ।

এই ক্ষেত্রে ২০টী ১ বর্গহাত ক্ষেত্র হইল । প্রত্যেকটী যে এক বর্গ হাত, তাহাও মাপিয়া দেখাও । দৈর্ঘ্যে প্রস্থে গুণ করিলে এইজন্ত ক্ষেত্রফল জানিতে পারা যায় । ফুটের দড়ি দিয়া জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপিয়া, তাহার কালি বাহির করার নিয়ম শিখাও ।

৬৮ চিত্র ।—জমির মাপ শিক্ষা ।

বিষা, কাঠা প্রভৃতি মাপের দ্বারা যে বৈধিক মাপ ও ক্ষেত্রফল উভয়ই বুঝিতে পারা যায়, তাহা বালকগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে । 'এই

জমি এক বিঘা লম্বা' বলিলে, আমরা বুঝিব যে ঐ জমি ৮০ হাত লম্বা। কিন্তু 'এই জমি এক বিঘা, বলিলে বুঝাবে যে সেই জমি ৬৪০০ বর্গহাত স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১ কাঠা বলিলে ৩২০ বর্গহাত জমি বুঝায়। ৩২০ বর্গহাত অর্থাৎ এক কাঠা জমির পরিমাণ কত রকম হইতে পারে, তাহা কেলের সাহায্যে বোর্ডে ৭টি ভিন্ন ভিন্ন চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাও ও এই অঙ্কগুলিও তাহার নিম্নে লিখিয়া দাও :—

৩২০ হাত লম্বা	×	১ হাত প্রস্থ
১৬০ " "	×	২ " "
৮০ " "	×	৪ " "
৪০ " "	×	৮ " "
২০ " "	×	১৬ " "
১০ " প্রস্থ	×	৩২ " লম্বা
৫ " "	×	৬৪ " "

তারপর বিঘায় বিঘায় গুণ করিলে যে 'বিঘা' হয়, তাহা যে প্রকৃত-পক্ষে বর্গ বিঘা, ইহা বুঝাইয়া দাও। বিঘায় কাঠায় গুণ করিলে যে কাঠা হয়, তাহা নিম্নের চিত্রানুকরণে বুঝাইতে পারা যাইবে। মনে কর, দৈর্ঘ্য ২ বিঘা ও প্রস্থ ৫ কাঠা—ক্ষেত্রফল কত? $২ \times ৫ = ১০$ কাঠা।

১ বিঘা = ৮০ হাত

১ বিঘা = ৮০ হাত

১ কাঠা = ৪ হাত

" = ৪ "

" = ৪ "

" = ৪ "

" = ৪ "

১ কাঠা	৬ কাঠা
২ "	৭ "
৩ "	৮ "
৪ "	৯ "
৫ "	১০ "

৬৯ চিত্র।—কাঠায় বিঘায় গুণ।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্র ১ বিঘা বা ৮০ হাত লম্বা ও ১ কাঠা বা ৪ হাত প্রশস্ত ।
সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রের কালি $৮০ \times ৪ = ৩২০$ বর্গহাত = ১ কাঠা ।
বড় ক্ষেত্রে ১০টি ছোট ছোট ১ কাঠার ক্ষেত্র আছে । কাজেই বিঘায়
কাঠায় গুণ করিলে কাঠা হয় । কাঠায় কাঠায় গুণ করিলে যে বর্গকাঠা
হয়, তাহাকে (১৬ বর্গহাত) ধূল বলে । ইহা ১ কাঠা জমির ২০ ভাগের
এক ভাগ । চিত্রাঙ্কন করিয়া বুঝাইয়া দাও । এইরূপে আর্য্যার অন্যান্য
অংশও বুঝাইয়া দিবে ।

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল—৬ ইঞ্চ লম্ব ও ৪ ইঞ্চ ভূমিযুক্ত একটি সমকোণী
ত্রিভুজ । ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার সময় আমরা লম্ব ও ভূমি
গুণ করিয়া তাহার অর্ধেক লই কেন ? ক্ষেত্রের সাহায্যে একখানা
কাগজ হইতে ৬×৪ ইঞ্চ এক খণ্ড কাগজ কাটিয়া লও । ইহার
ক্ষেত্রফল $৬ \times ৪ = ২৪$ বর্গ ইঞ্চ । ক্ষেত্রটিকে কর্ণরেখা ক্রমে দুইটি সম-
কোণী ত্রিভুজে ভাগ কর । ত্রিভুজ দুইটি যে সমান, তাহা একটার উপর
আর একটা স্থাপন করিয়া দেখাও । প্রত্যেকটি ত্রিভুজের লম্ব ৬ ইঞ্চ ও
ভূমি ৪ ইঞ্চ । আর প্রত্যেক ত্রিভুজ এই কাগজের আয়তক্ষেত্রের
অর্ধেক । সুতরাং ২৪ বর্গ ইঞ্চের অর্ধেক । সেই জন্য সমকোণী ত্রিভুজের
ক্ষেত্রফল লইতে $\frac{৬ \times ৪}{২}$ এই প্রণালী অবলম্বন করা হয় । আবার যখন
ত্রিভুজের যে কোন একটি কোণ হইতে বিপরীত বাহুর উপর লম্ব টানিয়া
প্রত্যেক ত্রিভুজকেই দুইটি সমকোণী ত্রিভুজ ভাগ করা যায়, তখন অন্যান্য
ত্রিভুজ সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে ।





পঞ্চম প্রকরণ—ভূগোলেতিহাস বিষয়ক ।

১। ভূগোল ।

শিক্ষার আবশ্যিকতা ।—(১) পৃথিবীর নানাস্থানে উৎপন্ন পদার্থাদির বিষয় জানিতে পারিলে ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা হয় । কোথায়, কিরূপে, কোন্ সহজ পথে যাইতে পারা যায়, তাহাও ভূগোল শিক্ষায় জানিতে পারা যায় । (২) যুদ্ধ বিগ্রহাদি পরিচালনার জন্য ভূগোলের জ্ঞান আবশ্যিক । কোন্ কোন্ পথে শত্রু আসিতে পারে, তাহাকে কোন্ কোন্ স্থানে বাধা দেওয়া যাইতে পারে, পথে নদী পর্বতাদির কিরূপ সহায়তা গ্রহণ করা যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয় ভূগোলের আলোচনায় জানা যাইতে পারে । (৩) বিজ্ঞান চর্চায় ভূগোল সহায়তা করে । নানাদেশে যে সকল অদ্ভুত বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, নদী, পর্বতাদি আছে তাহা অবগত হইয়া সেই সকল বিশেষ পদার্থের বিশেষত্বের অনুসন্ধান করা যাইতে পারে । (৪) রাজনৈতিক আলোচনাতেও ভূগোলের যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া যায় । কোন্ জাতি কিরূপ বলবান্, কিরূপ অর্থশালী, কিরূপে রাজকার্য্যে পরিচালনা করে এবং এই সকল বিষয়ে দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টন হইতেইবা তাহারা কি সহায়তা পাইয়া থাকে তাহা ভূগোল পাঠে বুঝিতে পারা যায় । (৫) মানচিত্র ও নক্সা বুঝিবার একটা ক্ষমতা জন্মে । আমাদের সাংসারিক কার্য্যে অনেক সময় এই

জ্ঞানের বিশেষ আবশ্যকতা হইয়া থাকে । (৬) পত্রিকা ও সাহিত্য পুস্তকাদি লিখিত অনেক বিবরণ ভূগোলের জ্ঞান ব্যতীত বুঝিতে পারা যায় না । (৭) ভূগোলে বালকেরা সৃষ্টিতত্ত্বের বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া ভগবন্তকর্তৃক হয় । (৮) তাহাদের কল্পনাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, বিচারশক্তি, পর্যবেক্ষণশক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি সতেজ হয় । (৯) অজ্ঞাত স্থানের বিবরণাদি জ্ঞাত হইয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করে ।

ভূগোল শিক্ষার কথা ।—পূর্বে ভূগোল শিক্ষায় শিক্ষকগণ প্রথমে পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় সাধারণভাবে শিক্ষা দিয়া, তারপর মহাদেশ, দেশ প্রভৃতির বিষয় শিক্ষা দিতেন । এইরূপে ক্রমে দেশ হইতে প্রদেশ, বিভাগ, নগর, গ্রাম প্রভৃতির বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত । কিন্তু এখন এ রীতির বিপরীত প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে । প্রথমে নিজের গ্রাম, নগরাদির বিষয়, পরে দেশ মহাদেশ ও পৃথিবীর বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় । পূর্বরীতিতে অপরিচিত মহাদেশের বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরিচিত গ্রাম, নগরে অবরোহণ করা হইত ; এখন পরিচিত গ্রাম, নগর হইতে আরম্ভ করিয়া, অপরিচিত দেশ, মহাদেশে আরোহণ করা হয় । সুতরাং বর্তমান রীতিই শিক্ষাদানের পক্ষে সুবিধাজনক । তারপর, পূর্বে সাধারণ ভূগোল ও প্রাকৃতিক ভূগোল ভিন্ন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত, কিন্তু এখন প্রায় এক সঙ্গেই শিক্ষা দেওয়া হয় । দেশের প্রাকৃতিক বাহ্য অবস্থার সঙ্গে তাহার আভ্যন্তরিক প্রাকৃতিক অবস্থাও জানিতে ও বুঝিতে পারা যায় । এই জন্য ভূগোল শিক্ষাদানের প্রারম্ভে বা সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক তত্ত্ব বোধের সাহায্যার্থ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষণের দ্বারা (“পদার্থ পরিচয়” শিক্ষাদানের রীতিতে) শিক্ষা দেওয়া নিতাস্তই কর্তব্য ।

কঠিন পদার্থ ।—কঠিন পদার্থে চাপ দিলে ছোট হয় না, কোমল পদার্থ চাপে ছোট হয় । কঠিন পদার্থে সহজে দাগ বসে না—নরমে দাগ বসে । কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট

আকার, তরল পদার্থের আকার পাতের অনুরূপ । তাপে কঠিন পদার্থ তরল হয় (মোক্ষ ও লাফা গলাইয়া দেখাও), ঠাণ্ডায় আবার শক্ত হয়, জল জমিয়া কঠিন (বরফ) হয় । কঠিন পদার্থের দ্বারা কোমলের উপর দাগ কাটা যায় । হীরক সর্বাপেক্ষা কঠিন পদার্থ । লৌহ অপেক্ষা কাচ কঠিন, কিন্তু কাচ (টুনুক) ভঙ্গুর, লৌহ (ঠমক) ঘাতমহ ।

তরল পদার্থ ।—তরল পদার্থ গড়াইয়া নীচের দিকে যায়—ফোঁটা ফোট হইয়া পড়ে—নির্দিষ্ট কোন আকার নাই—পাতারূপ আকার—ঠাণ্ডায় কঠিন হয়—তাপে বায়বীয় আকার ধারণ করে ।

বায়বীয় পদার্থ ।—বাতাস সকল স্থানেই আছে—আমরা দেখি না বটে, কিন্তু অনুভব করিতে পারি । বাতাসে গাছপালা নড়ায়—প্রবল বায়ুকে বড় বলে—জলে তাপ দিলে পাতলা হইয়া বায়বীয় আকার ধারণ করে—ঠাণ্ডা দিলেই আবার জল হয় ।

গুরু ও লঘু ।—লৌহ ভারী, কাঠ লৌহ অপেক্ষা হাল্কা—তৈল জলে ভাসে—জলের প্রোতে কাদা ভাসিয়া যায়—জল স্থির হইলে কাদা নীচে পড়ে—বাষ্প হাল্কা, উপরে উঠিয়া যায়, ধূমও হাল্কা ; বায়ু গরম হইলে পাতলা হইয়া উপরে উঠে—ঠাণ্ডা বায়ু নীচে নামে ।

সচ্ছিন্ন পদার্থ ।—শ্রায় জিনিষই সচ্ছিন্ন ; এক টুকরা ইট বা চক জলে ডুবাইলে ভায় হয়—শুক মাটি সচ্ছিন্ন—ভিজা মাটি ভেঁমন নয়, বাজী মাটি সচ্ছিন্ন—আঠাল মাটি নয় ।

মিশ্রণ ও দ্রবণ ।—কাদা জলে মিশে—লবণ জলে গলিয়া যায়, লবণ বা চিনি-মিশ্রিত জলে তাপ দিয়া লবণ বা চিনিকে পৃথক্ করা যায়, কাদা মিশ্রিত জল ছাকিয়া নিলেই কাদা পৃথক্ হয় ; এক গ্রাম জলে একটু লবণ বা চিনি গলিতে পারে, কিন্তু বেশী দিলে গড়িয়া থাকে ।

শিক্ষাদানের ধারা ।—শিশুশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে যেরূপে উচ্চ শ্রেণীতে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহার ক্রম প্রদর্শিত হইল । নিম্ন শ্রেণীতে যেরূপ কথোপকথন ছলে বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, ভূগোল শিক্ষায়ও ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে । নিম্ন শ্রেণীর উপযোগী কয়েকটি মাত্র পাঠ কথোপকথনের আদর্শে লিখিত ।

হইল । অন্যান্য শ্রেণীর উপযোগী পাঠ্যপুস্তকও এইরূপে গড়িয়া লইতে হইবে ।

আকাশ ।—আমরা যখন বাহিরে দাঁড়াই তখন মাথার উপরে সুন্দর আকাশ দেখিতে পাই । জানালার ভিতর দিয়া আকাশ দেখা যায় কি না, দেখ ত ! তোমাদের মত অন্যান্য সকল পাঠশালার বাসকেরাও আকাশ দেখিতে পায় কি না ? যাহারা অনেক দূরে থাকে, তাহারা আকাশ দেখিতে পায় কি না ? হাঁ—আমরা যেখানে যাই না কেন, সব সময়েই মাথার উপরে আকাশ দেখিতে পাই ।

আকাশে বাতাস আছে । বাতাস কেমন করিয়া বুঝিতে পারি ? বাতাস কি দেখা যায় ? গাছ পাতা নড়িলে বাতাস জানিতে পারা যায়—হাত নাড়িলে ? বাতাস দেখা যায় না, বাতাস গায়ে লাগে । এ ঘরে বাতাস আছে ? আছে । বাতাসের ভিতর দিয়া সব জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়—কাচের ভিতর দিয়াও সব জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়—বাতাস কাচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ । আকাশের আকার কেমন ? চাকুনার মত, বাটীর মত । আকাশের কোন্ ভাগ খুব উঁচু ? যে ভাগ ঠিক মাথার উপরে (টেবিলের উপর একটা কাচের বাটি উপুড় করিয়া বুঝাইয়া দাও) । কোন্ ভাগ খুব নীচু ? যেখানে আকাশ মাটির সঙ্গে লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হয় । যেখানে আকাশ মাটির সঙ্গে মিশিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেই গোলাকার স্থানকেই চক্রবাল বলে ।

আকাশের রঙ কেমন ? আকাশের রঙ নীল (আগমানী) । সব সময়েই কি নীল দেখিতে পাও ? মেঘ হইলে নীল দেখায় না । মেঘ হইলে কেমন দেখায় ? মাদা তুলার মত । মাদা মেঘ হইলে আকাশ সাদা হয়, আবার কাল মেঘ হইলে আকাশ কাল হয় । মেঘগুলি বায়ুর মত স্বচ্ছ নহে । আকাশের রঙ ঢাকিয়া ফেলে । মেঘ হইলে আকাশের চাঁদ, তারা, সূর্য্য দেখা যায় না । কাল মেঘ হইলে বৃষ্টি হয় । বৃষ্টিতে গাছপালা বাঁচে ।

আকাশে মেঘ ছাড়া আর কি কি দেখিতে পাই ? চাঁদ, তারা, সূর্য্য । সূর্য্য দিনে আলো দেয়—সূর্য্য আগুনের বলের মত—সূর্য্য উঠিলে আঁধার থাকে না—সূর্য্য না থাকিলে আঁধার হয় । সূর্য্য তাপও দেয়—মেঘ হইলে তেমনি আলোও থাকে না বা তেমনি তাপও থাকে না । সূর্য্যের রঙ হলুদে, সোণার মত । সূর্য্যের দিকে চাহিলে চোখে জ্বালা হয় ।

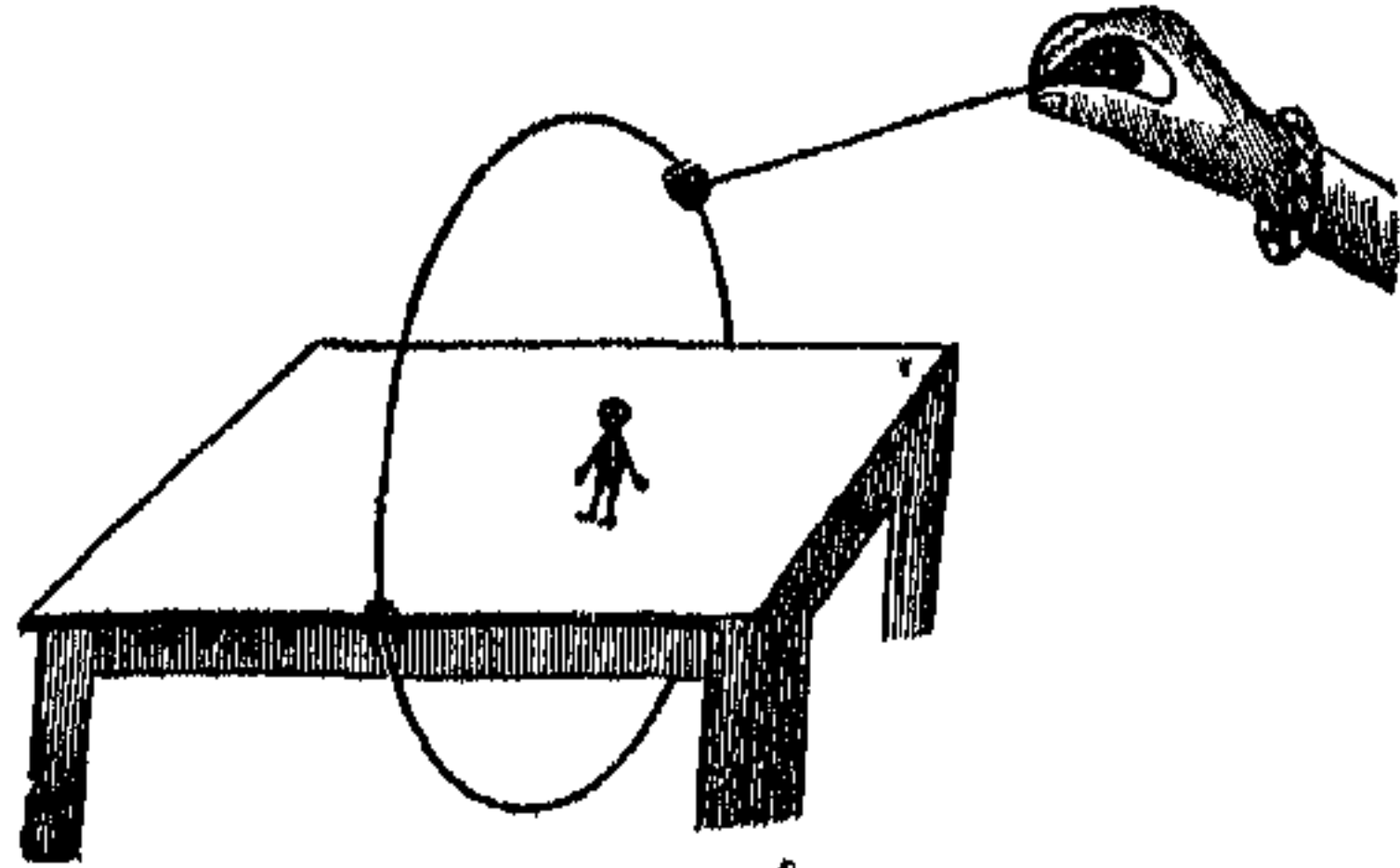
চাঁদ রাত্ৰিতে দেখা যায় । চাঁদের রঙ সাদা, রূপার মত । চাঁদের দিকে চাইলে চোখে জ্বালা হয় না । কোন কোন রাত্রে চাঁদ একেবারেই দেখা যায় না । আবার কখন

কখন তাঁদের টুকরা দেখা যায় (বোর্ডের উপর দ্বিতীয়ার, অষ্টমীর ও পূর্ণিমার চন্দ্র আঁকিয়া দেখাও) ।

আকাশে অনেক তারা আছে ; গণনা করা যায় না । কতকগুলি ছোট, আর কতকগুলি বড় । দিনেও তারা থাকে, সূর্য্যের বেশী আলোতে দেখা যায় না (একটা বাতি জালিয়া দূরে রাখিবে, দিনের বেলা বাতির আলো দেখা যায় না) ।

যেয আমাদের কাছে—সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র অনেক দূরে । তাই মেখে সূর্য্য, চন্দ্র, ঢাকা পড়ে (একখানা পুস্তক দিয়া ছাদের কোন জিনিসকে আড়ান করিয়া দেখাও) ।

সূর্য্য । —(প্রাতঃকালে বালকগণকে স্কুলের প্রাঙ্গণে সমবেত কর) এই দেখ, এখানে রৌদ্র আসিয়াছে ; এই দেখ, এখান হইতে রৌদ্র সরিয়া বাইতেছে । এখন এখানে ছায়া পড়িল, আর যেখানে ছায়া ছিল যেখানে রৌদ্র হইল ? সূর্য্য আকাশের এক স্থানেই থাকে না । নীচের দিক থেকে ক্রমেই সূর্য্য উপরের দিকে উঠিতেছে, দুপুর বেলায় (বেলা ১২টার সময়) সূর্য্য মাথার উপরে আসে । বৈকাল বেলায় আবার নীচে নামিয়া যায় (একদিন বৈকালে বালকগণকে সমবেত করিয়া দেখাও) । সূর্য্য যে দিকে উঠে তাহাকে পূর্বদিক বলে, যে দিকে ডুবিয়া যায় তাহাকে পশ্চিমদিক বলে । উঠিবার সময় ও ডুবিবার সময় সূর্য্যের রঙ লাল দেখায় । (টেবিলের উপর একটা তার, বেত



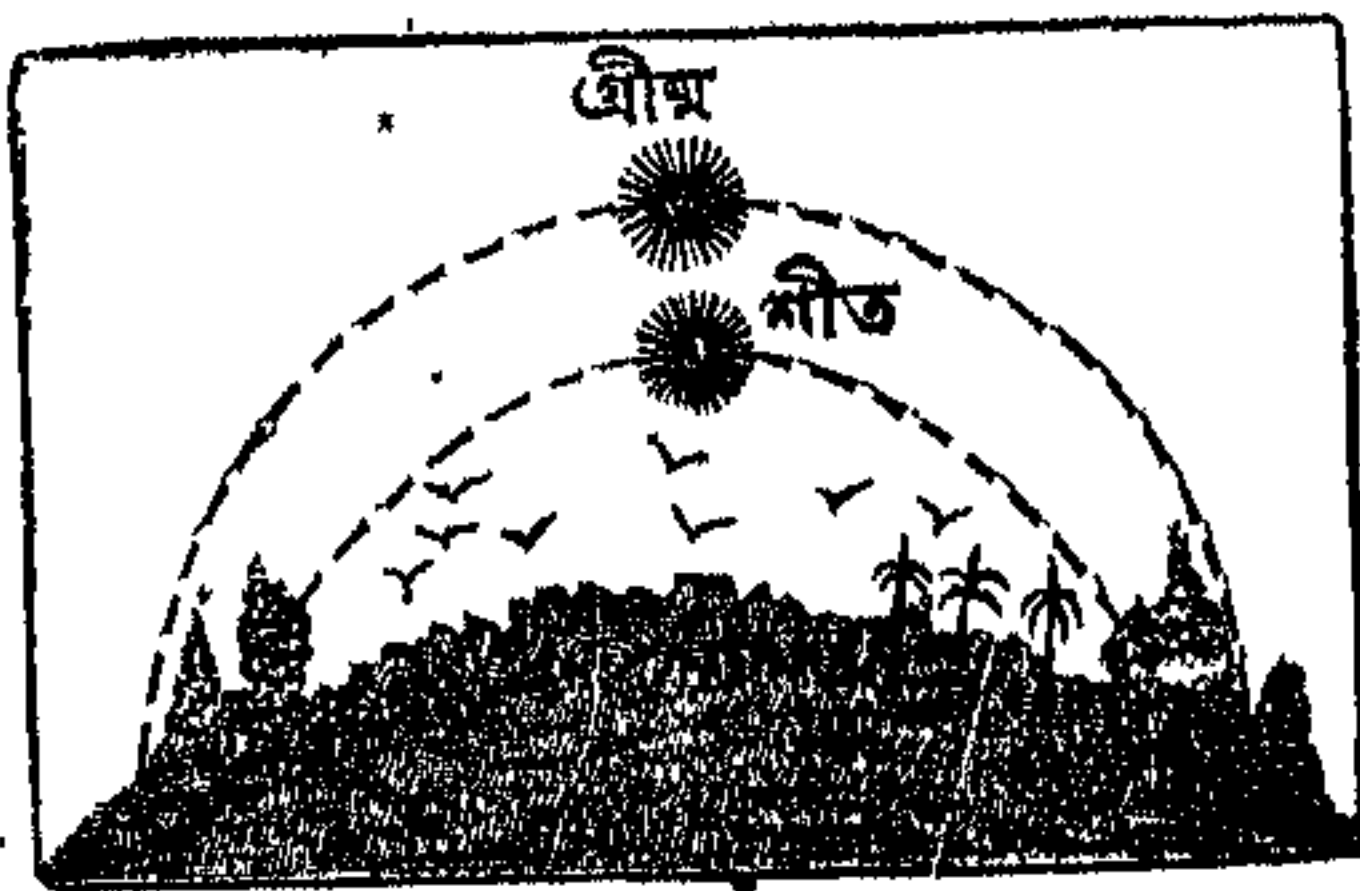
৭০ চিত্র ।—সূর্য্যের উদয়াস্ত ।

বা বাঁশের চটা গোল করিয়া বাঁধ ও একটা শলাকার মাথায় একটা ছোট আলু বিদ্ধ করিয়া তারের পাশ দিয়া ঘুরাইয়া সূর্য্যের উদয় অস্ত প্রভৃতি বুঝাইয়া দাও । সূর্য্য কেমন করিয়া নীচের দিক দিয়া ঘুরিয়া আবার পূর্বদিকে যায় তাহাও বুঝাইতে পারিবে । সূর্য্য ঘুরিয়া

য় না, পৃথিবীই ঘুরিয়া থাকে—ইহা পবে বুঝাইয়া দিবে । রেলগাড়ীতে বা নৌকাতে কান স্থানে বাইরের সময় আমরা দেখি যে, রাস্তার ধারের গাছপালা চলিতেছে । সেইকপ ঘোড় চলিতেছে বলিয়া আমরাদিগের ভুল হয়) ।

ছায়া ।—একজন বালককে বোঝে দাঁড়া কর । মাটিতে ছায়া পড়িল । কেন ? রৌদ্র আলকের শরীরের মধ্য দিয়া বাইতে পারিল না—বালকের শরীর স্বচ্ছ নহে । বালকের ছায়া বালকের মত, ঘটির ছায়া ঘটির মত; ছাতার ছায়া ছাতার মত । ম্বর অঙ্ককার কর (বা রাত্রিতে পরীক্ষা দেখাও), একটা বাতি জ্বাল, আলো মাটির উপর রাখ, একটা বালককে দাঁড়া কর, বালকের ছায়া খুব বড় দেখাইবে । আলো একটু একটু করিয়া উঠু কর—আলো মাথার উপর আন, এবারে ছায়া সর্বাপেক্ষা ছোট, বালকের পায়ের নীচে ; আবার অপর দিকে নামাইতে আরম্ভ কর, ছায়া আবার ক্রমশঃ বড় হইতে হইতে (যখন পায়ের সমস্ত্রে আলো আসিবে) খুব বড় হইল । সূর্য্যের আলোতে প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় ছায়া কি জন্ত ছোট বড় হয়, তাহা এখন বুঝাইয়া দিতে পারিবে ।

দিন ছোট বড় ।—(একটু উপর শ্রেণীর জন্ত ।) শীতকালের ১২টার সময় ছায়া যত বড় দেখায়, গ্রীষ্মকালের ১২টার সময় তত বড় দেখায় না । ইহাতে আমরা এই বুঝিতে পারি যে, গ্রীষ্মকালে ১২টার সময় সূর্য্য যত মাথার উপরে যায়, শীতকালে তত উপরে যায় না । বোর্ডের উপর নিম্নের অক্ষরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া, সূর্য্যের গ্রীষ্মকালের ও শীতকালের গতি বুঝাইয়া দাও ।



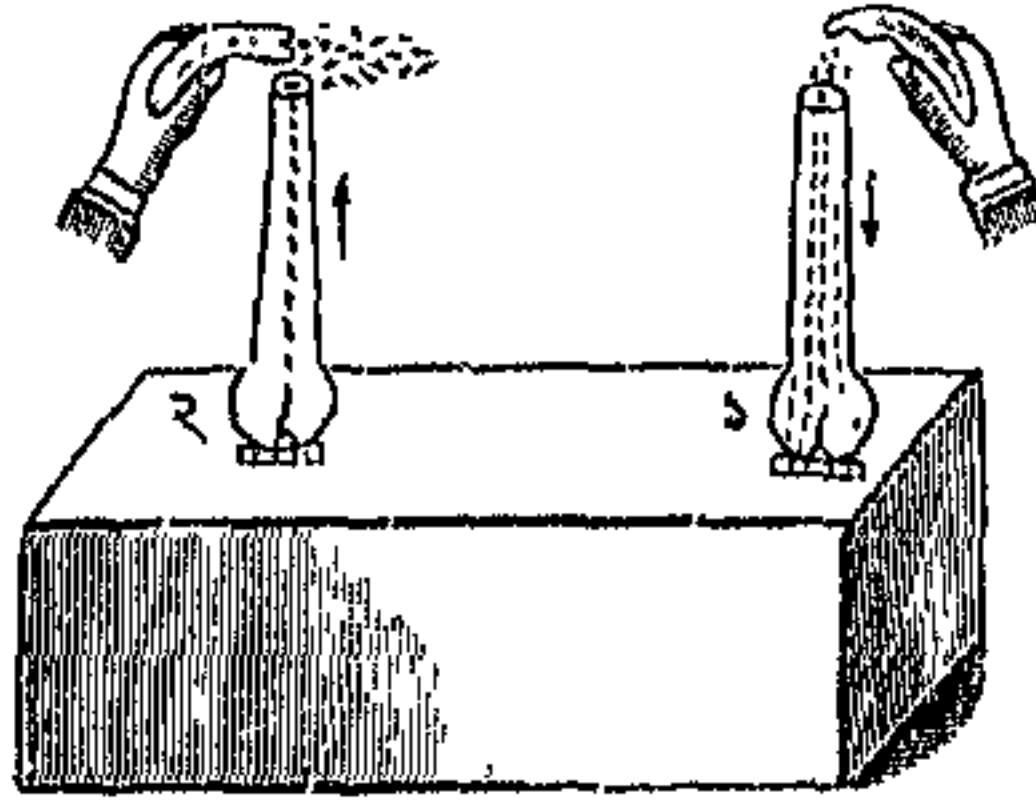
৭১ চিত্র ।—শীত ও গ্রীষ্মের সূর্য্য ।

শীতকালের সূর্যের পথ ছোট, কাজেই দিন ছোট ; আর গ্রীষ্মকালের সূর্যের পথ বড়, কাজেই দিন বড় । চিজের নির্দেশমত টেবিলের উপর দুইটা গোলাক'র তার উচুনীচু করিয়া লাগাইয়া লইলে দিন বড় রাত্রি ছোট বেশ বুঝাইতে পারা যাইবে । কি গ্রীষ্মে কি শীতে বেলা ১২টার সময় সূর্য সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে উঠে । গ্রীষ্মকালে সেই উচ্চ স্থানে আসিতে সময় বেশী লাগে বলিয়া সূর্যকে গ্রীষ্মের প্রাতঃকালেও খুব আগে উঠিতে হয় । গ্রীষ্মে ৫৥ টার সময় সূর্যোদয় হয় । শীতকালে প্রাতে ৬৥ টার সময় সূর্য উঠে, কারণ শীতকালের সূর্যের রাস্তা ছোট, একটু দেরী করিয়া উঠিলেও ক্ষতি হয় না । সূর্য-অস্ত সম্বন্ধেও এইকপ ।

মেঘ বৃষ্টি—একটা ছোট ঘটিতে অল্প জল দিয়া আগুনের গামলার উপর রাখ । ঘটির মুখ একটা ছোট মাটির সরি দিয়া ঢাকিয়া দাও, সরিতে একটা ছোট ছিদ্র কর । ছিদ্র দিয়া ধূঁয়ার মত যে পদার্থ বাহির হইতেছে তাহাকে বাষ্প বলে । বাষ্পের উপর একখানা ঠাণ্ডা সেট ধর । সেটের গায়ে বাষ্প লাগিয়া জল হইবে । সেটে একটু তাপ দাও, সেটের সেই জল আবার বাষ্প হইবে । জলযুক্ত সেট রৌদ্রে রাখ, জল শুকইয়া গেল । সূর্যাতাপেও জল বাষ্প হয় । বাষ্প বায়ু অপেক্ষা হালুকা, তাই আকাশে উঠে । অদৃশ্য বাষ্প ঠাণ্ডা লাগিলে আগে মেঘ হয়, আরও ঠাণ্ডা লাগিলে জল হইয়া পড়ে । সাধারণতঃ আকাশে চারিপ্রকার মেঘ দেখিতে পাই । (১) খুব কাল মেঘ, ইহাকে ঝোড়ো মেঘ বলে ; ভাল কথায় বৃষ্টিপ্রদ মেঘ, ইহাতেই বৃষ্টি হয় । (২) তুলাস্তূপ মেঘ, সাধারণ কথায় তুলাপেঁজা মেঘ বলে ; সাদা সাদা পেঁজা তুলার মত মেঘ । (৩) গুঁরাবলী মেঘ, চক্রবালের কাছে কাছে, প্রাতে সন্ধ্যায় দেখা যায়, লম্বা লম্বা স্তরের মত সমান্তর মেঘাবলী ; সাধারণ কথায় ইহাকে টানা মেঘ বলে । (৪) অলক মেঘ, অনেক উপরে ছাকড়া ছাকড়া (পাকা চুলের মত) ভাবে ভাসিয়া বেড়ায় ; এই জন্ত সাধারণ ভাষায় ছাকড়া মেঘ বলে ।

রামধনু ।—মুখে জল লইয়া সূর্যের দিকে মুখ করিয়া জোরে ফুৎকার করিলে রামধনুর মত নানা বর্ণের রঙ দেখায় । মেঘে সূর্যের আলো পড়িয়া এইরূপে রামধনু হয় । যে দিকে সূর্য থাকে, তার বিপরীত দিকে মেঘ থাকিলে রামধনু হয় । দ্বিপ্রহরে কখনও রামধনু দেখা যায় না । সূর্য যতই চক্রবালের নিকটবর্তী হইবে, ততই রামধনু বড় হইবে ও আকাশের সমধিক উচ্চ স্থানে দেখা যাইবে । রামধনুর রঙগুলি ঘেরাপ সাজান থাকে (যে দিন রামধনু উঠিবে) তাহা দেখাইয়া দাও । নীচের দিক হইতে উপরের দিকে এইরূপ ভাবে সাজান—বেগুনে, নীল, আসমানী, সবুজ, হলদে, কমলা, লাল ।

বায়ুর গতি ।—একটা ছোট কাঠের বাতোর একপাশ আলুগা রাখ । উপরের গিঠে দুইটা ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া দুইটা চিম্ণি বসাত । খোলা মুখের দূরে যে ছিদ্র (২নং ছিদ্র), তাহার নীচে একটা বাতি জালিয়া রাখ । একথানা ছাক্‌ড়ায় আগুন দিয়া “১” চিম্ণির উপরে ধর । আর একথানা পোড়া কাগজ “২” চিম্ণির উপরে ধর । বায়ুর গতি যেৰূপ বুদ্ধিতে পারা যাইবে, তাহা তীর চিহ্নের দ্বারা চিত্রে দেখান হইল । বায়ু গরম হইয়া উপরে উঠিলে, ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া কেমন করিয়া সে স্থান অধিকার করে, তাহাই দেখান উদ্দেশ্য । পোড়া নেকড়ার ধূম নীচের দিকে আসিবে, আর পোড়া কাগজের ধূম উপরের দিক উঠিবে ।



৭২ চিত্র ।—বায়ুর উর্দ্ধ ও নিম্নগতি ।

দিক শিক্ষা ।—সূর্যের গতি শিক্ষা দেওয়ার সময়ই বালকগণকে পূর্ব ও পশ্চিম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । সেই সময় উত্তর দক্ষিণও শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । পূর্বদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে, বামে উত্তর ও ডাহিনে দক্ষিণ থাকে । ভঙ্গী-সঙ্গীত শিক্ষাদানের প্রণালীতেও ছোট ছোট বালক-দিগকে দিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে ।

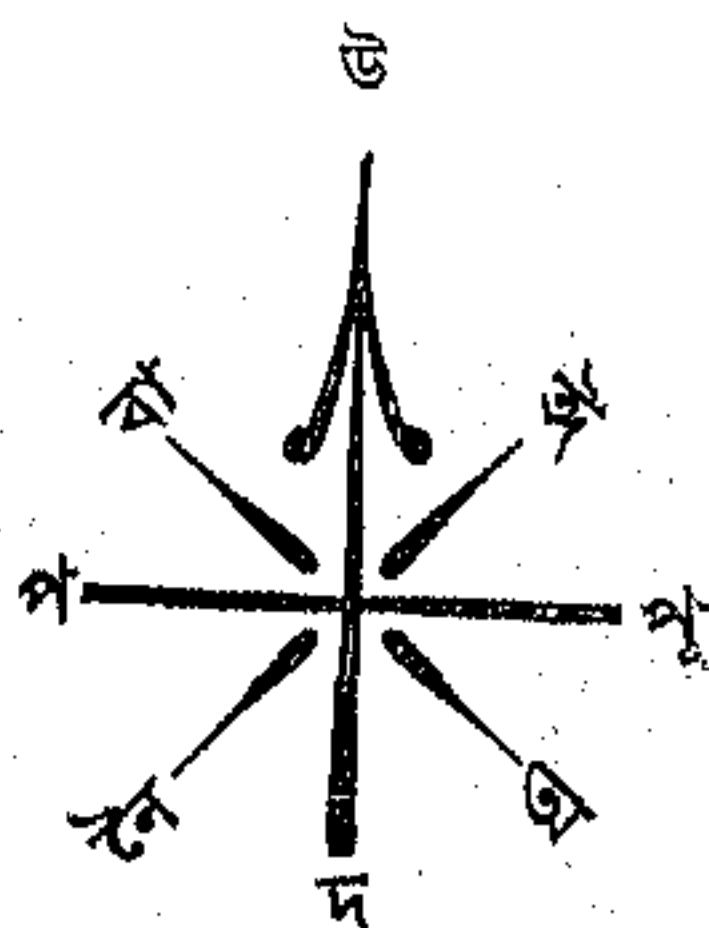
যে দিকেতে সূর্য উঠে পূর্ব তাহে বলি । (১)

পশ্চিম দিকেতে সূর্য অস্ত যায় চলি ॥ (২)

পূর্ব দিকে মুখ করি দাঁড়াইলে পর। (৩)

ডাহিনে দক্ষিণ থাকে বামেতে উত্তর। (৪)।

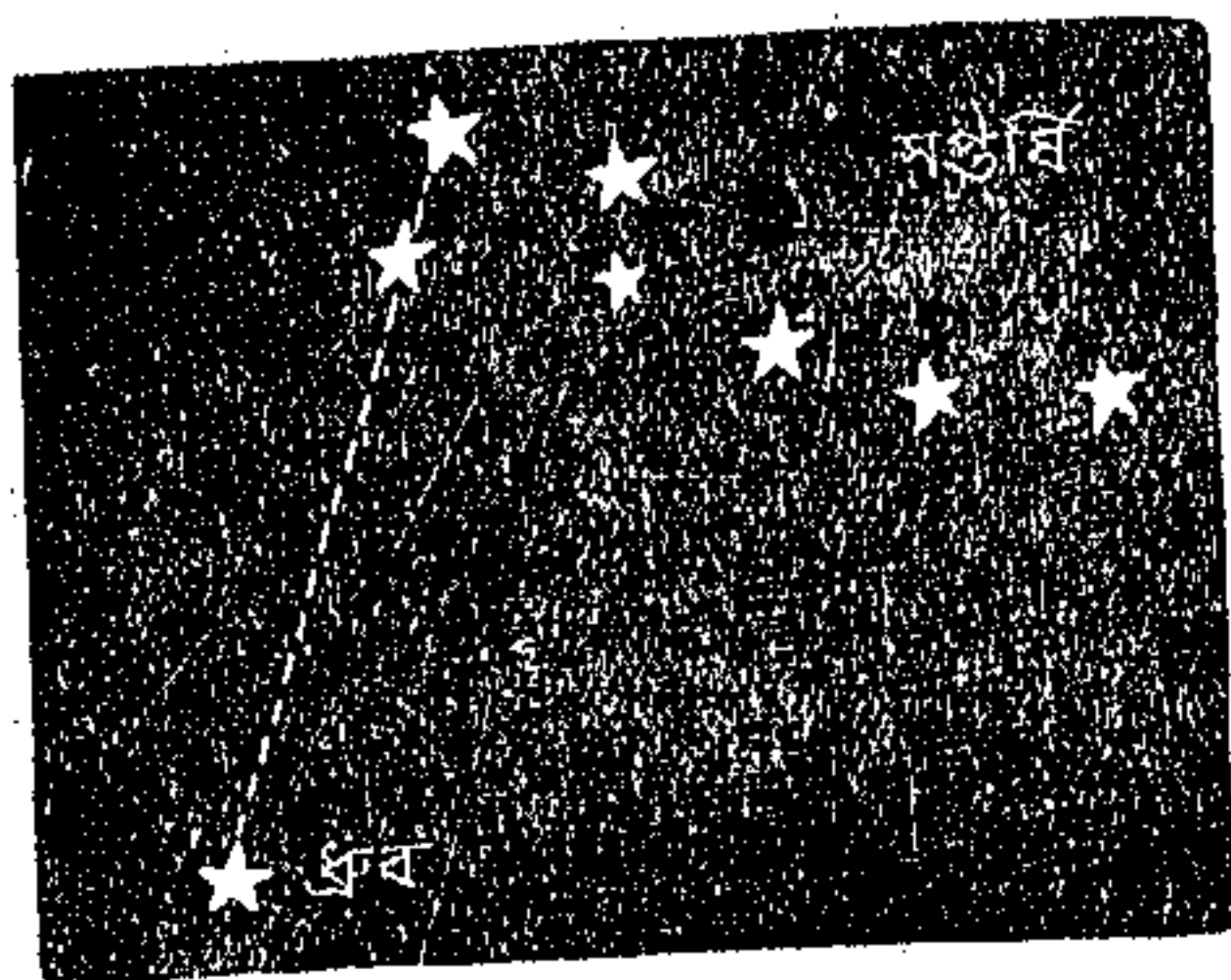
(১) সকল বালক পূর্বদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া, ডাহিন হস্তের তর্জনী দ্বারা পূর্ব-দিক দেখাইয়া সম্বন্ধে বলিবে। (২) সকলে এক সঙ্গে ডাহিনে সম্পূর্ণ ঘুরিয়া পশ্চিমদিকে মুখকরতঃ বাম হস্তের তর্জনী দ্বারা পশ্চিমদিক দেখাইয়া আবৃত্তি করিবে। (৩) সম্পূর্ণ বামে ঘুরিয়া পূর্বমুখ হইয়া হইয়া দণ্ডায়মান। (৪) ডাহিন হস্তের তর্জনী দ্বারা দক্ষিণদিক ও বাম হস্তের তর্জনী দ্বারা উত্তরদিক দেখাইয়া।



এই ৪ দিক ব্যতীত ৪টি কোণও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বা মেজেতে এইরূপ দাগ কাটিয়া রাখিলে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। দাগ কাটিবার সময় কম্পাসের সাহায্যে দিক ঠিক করিয়া লইতে হইবে। দুই তিন আনা হইলেই একটা ছোট কম্পাস পাওয়া যায়।

৭৩ চিত্র—দিকদর্শন।

যখন অন্ধকার রাত্রে চন্দ্র থাকে না, তখন কেমন করিয়া দিক ঠিক করিতে হইবে? তখন ঞ্জ নক্ষত্রের দ্বারা দিক নিরূপণ করিতে পারা যায়। ঞ্জ নক্ষত্র ঠিক করিতে হইলে সপ্তর্ষিমণ্ডল জানা আবশ্যিক। উত্তরের দিকে যে বড় বড় সাতটি নক্ষত্র (পরপৃষ্ঠার চিত্রানুরূপ) সজ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই সপ্তর্ষিমণ্ডল কহে। এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারা এক সঙ্গে এবং এইরূপ ভাবেই সর্বদা সজ্জিত থাকে। ইহার প্রথম দুইটি ক্ষত্রে এক কল্পিত রেখা দ্বারা যুক্ত করিয়া, সেই রেখাকে বর্দ্ধিত করিলে যে একটি বড় নক্ষত্রকে (প্রায়) স্পর্শ করে, তাহাকেই ঞ্জ নক্ষত্র কহে।

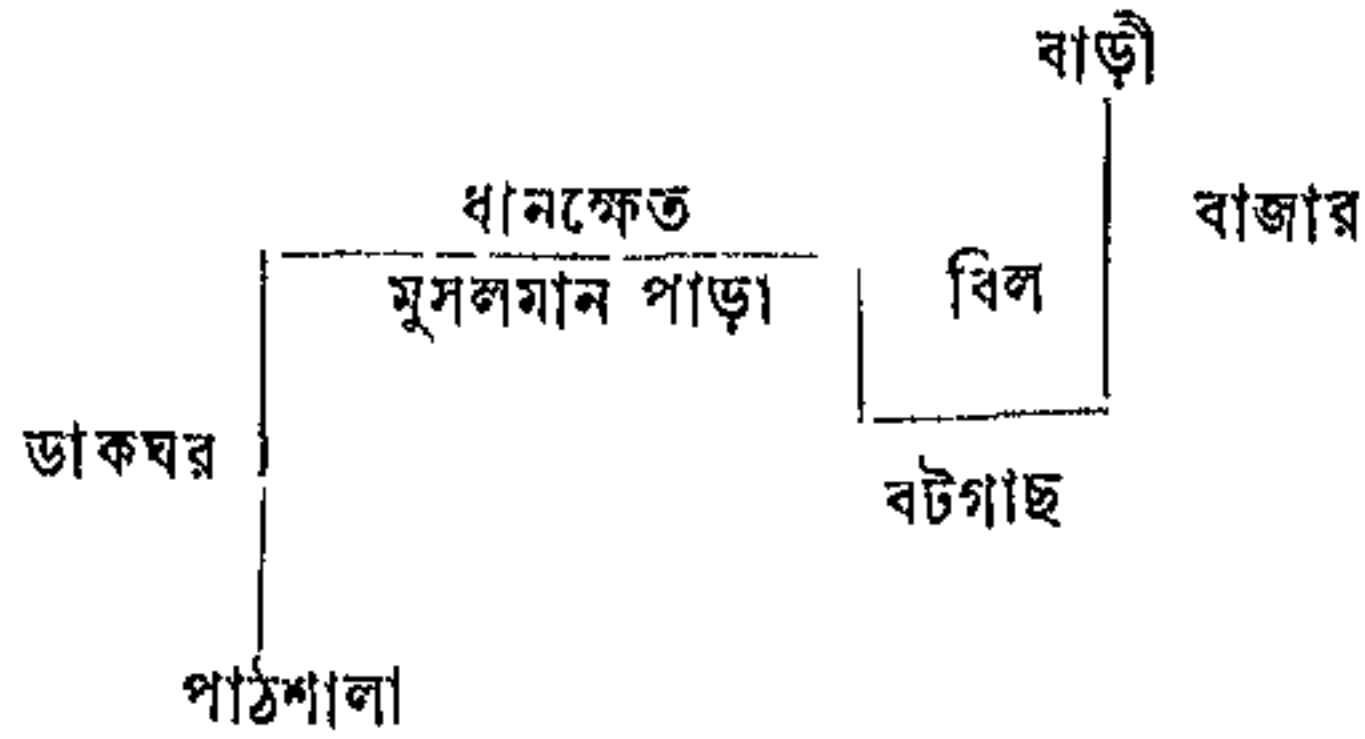


৭৪ চিত্র ।—ধ্রুব ও সপ্তর্ষিগণ্ড ।

সপ্তর্ষিগণ্ডকে বৃহৎ ঋক্ষ বা বড় ভল্লুকও বলা হইয়া থাকে । ট্রেপিজিয়ম ক্ষেত্রাকারে যে চারিটা নক্ষত্র সজ্জিত, সেইটা ভল্লুকের দেহ, আর তিনটা লেজ । এই সাতটা নক্ষত্রই ধ্রুব নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে । কিন্তু চমৎকারিত্ব এই যে, ইহার প্রথম দুইটা নক্ষত্র সংযুক্ত করিয়া, সেই রেখা বর্ধিত করিলে সকল প্রকার অবস্থাতেই ধ্রুব নক্ষত্রকে (প্রায়) স্পর্শ করিবে । যখন নক্ষত্রও দেখা যায় না তখন কম্পাস দিয়া দিক ঠিক করে ।

নক্ষত্র শিক্ষাদানের প্রারম্ভ ।—যে শ্রেণীতে প্রথম নক্ষত্র শিক্ষা দিবে মনে করিয়াছ, সেই শ্রেণীর ছাত্রগণকে তোমার টেবিলের চারিধারে দাঁড় করাও । তাহাদিগের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিকগুলির জ্ঞান আছে কি না পরীক্ষা কর । তারপর যে কোন একটি বালককে জিজ্ঞাস কর “পাঠশালা হইতে বাড়ী যাইবার সময় প্রথমে কোনদিকে যাইয়া থাক ?” মনে কর বালক বলিল “প্রথমে উত্তর দিকে যাই।” এখন তোমার টেবিলের উপর চকের দাগ দিয়া বা কোন কাগজের

উপর কালি দিয়া একটু একটু করিয়া এইরূপ নক্সা আঁকিতে আরম্ভ কর :—

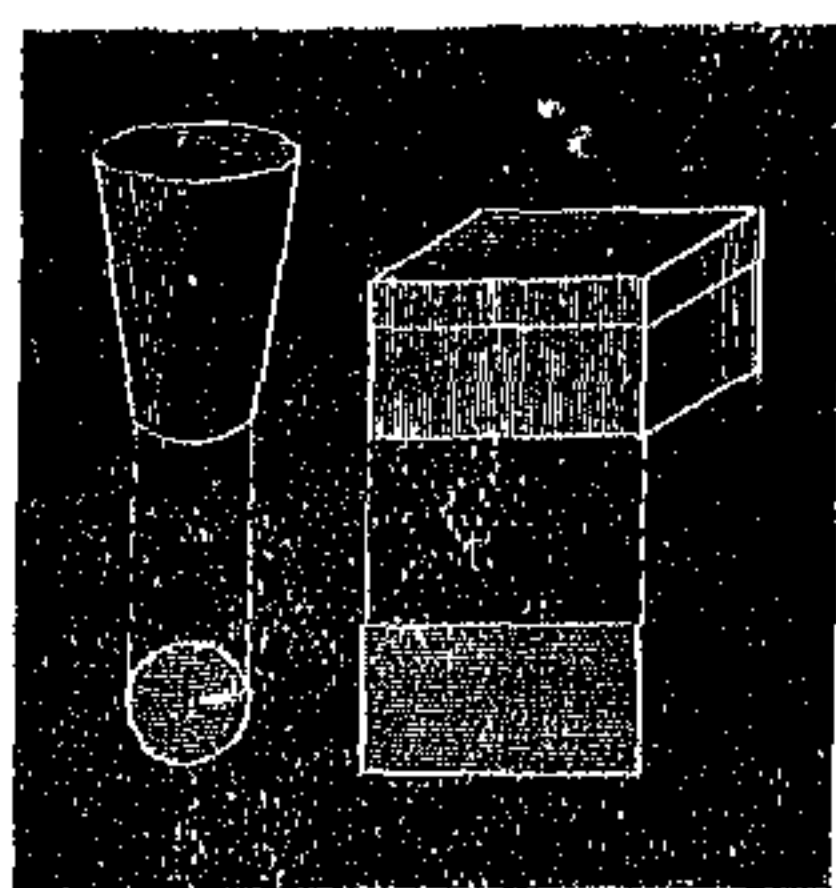


তুমি পাঠশালা হইতে প্রথমে উত্তর দিকে গেলে—এই আমি উত্তর দিকে একটা টান দিয়া সেই রাস্তা আঁকিলাম। তারপর কোন দিকে যাইবে?” “তারপর পূর্ব দিকে যাইব।” “এই আমি পূর্ব দিকের সেই রাস্তা আঁকিলাম।” “তারপর কোন দিক?” ইত্যাদিক্রমে জিজ্ঞাসা কর ও একটু একটু করিয়া তাহার বাড়ী পর্যন্ত যাইবার রাস্তা আঁক। তারপর এই বাড়ী যাইবার রাস্তার ডাহিন ধারে ও বামধারে যে যে প্রধান জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায় সেই সকল জিনিষের নাম জিজ্ঞাসা কর ও তোমার নক্সার ডাহিনে বামে সেই সকল জিনিষের নাম লিখিয়া যাও। কিন্তু এইরূপ জিনিষের সংখ্যা ৫৬টির বেশী না হওয়াই ভাল। রাস্তার যে যে অংশ অল্প অংশ অপেক্ষা দীর্ঘ, তাহা আন্দাজ করিয়া নক্সার রাস্তা একটু ছোট বড় করিলেই চলিবে।

শিক্ষক প্রথমে নক্সার এইরূপ একটী আদর্শ দেখাইবেন তারপর প্রত্যেক ছাত্রের দ্বারা, পাঠশালা হইতে তাহার নিজ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার নক্সা আঁকাইয়া লইবেন। বালকদিগের বায়ু ঈশান প্রভৃতি দিকের জ্ঞান থাকিলে আবশ্যক অনুসারে নক্সার রাস্তা তদ্রূপ করিয়া

আঁকা যাইতে পারে কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীর শিক্ষায় এই সকল কোণ বাদ দিয়া সোজা দিক ধরিয়া লইলেই শিক্ষাদানের সুবিধা হইবে ।

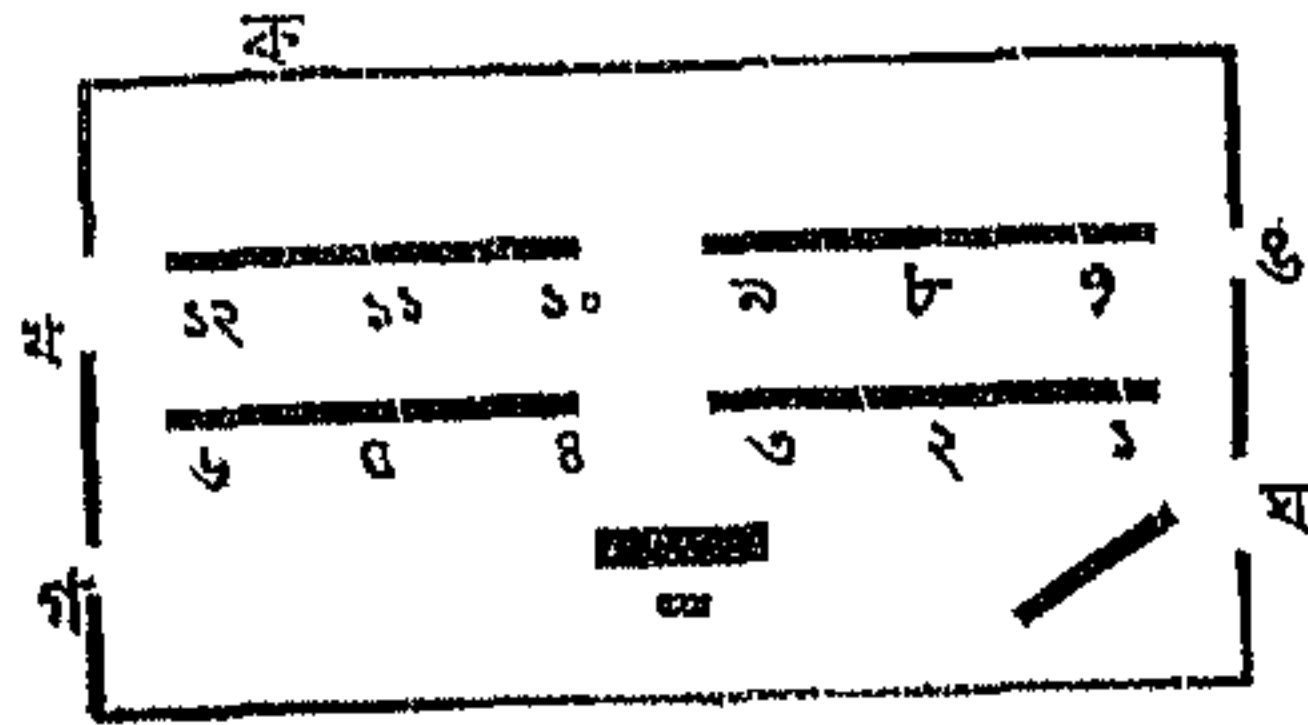
নক্সা ও প্ল্যান ।—টেবিলের উপর একটা গেলাস ও একটা বাক্স রাখ । বোর্ডে গেলাসের ও বাক্সের ছবি আঁক । জিজ্ঞাসা কর, এই চিত্র দুইটা কি কি ? একটা গেলাসের ও একটা বাক্সের ছবি । টেবিলের উপর যে গেলাস আছে তাহার পাশ দিয়া, চকের দ্বারা টেবিলের উপর দাগ কাটি, আর বাক্সের চারিধার দিয়াও তদ্রূপ কর । এই দুইটা চিত্র গেলাসের ও বাক্সের নক্সা । বোর্ডের উপরে ঐ দুই নক্সা আঁক । মাটির উপর একটা বস্তু যে স্থান অধিকার করে সেই স্থানের চিত্রকেই সেই বস্তুর নক্সা বলে । বালকগণকে টেবিলের চারিধারে দাঁড়াইতে বল । তাহাদের সম্মুখে টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া ঘরের নক্সা প্রস্তুত কর । যে দেয়াল যে দিকে, যে দরজা যে দিকে আছে, নক্সাতেও ঠিক সেই সেই



৭৫ চিত্র ।—বাক্স ও গেলাসের চিত্র ও নক্সা ।

দিকে সে সকল দেয়াল, দরজা রেখা দ্বারা চিহ্নিত কর । দরজা, জানালার স্থান ফাঁক রাখিয়া দাও । বালকগণকে নক্সার পরিচয় করাও । তুমি “গ” দরজার কাছে যাও, তুমি “ঘ” দরজা দিয়া বাহিরে যাও, তুমি “খ” জানালা দিয়া কাগজ ফেলিয়া দাও ইত্যাদি । এই পর্য্যন্ত বোধ হইলে ঐ

নক্সার মধ্যে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতি কেবল রেখার দ্বারা অঙ্কন করিয়া পরীক্ষা কর ।



৭৬ চিত্র ।—শ্রেণীর নক্সা ।

তুমি “১১” চিহ্নিত স্থানে গিয়া বস, তোমার বসিবার স্থান দেখাও, বোর্ডের কাছে যাও ইত্যাদি । এখন এই কাগজখানি বোর্ডের সঙ্গে লাগাইয়া (উত্তরের দিক উপরে রাখিয়া), বালকগণকে পূর্ববৎ পরীক্ষা কর । এই প্রকারে সমস্ত বিদ্যালয়গৃহ ও প্রাঙ্গণেব নক্সা প্রস্তুত কর । প্রথম শিক্ষাব সময় নক্সা কখনও বোর্ডে আঁকিও না । টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া যে দিকে যাহা, ঠিক সেই দিকেই তাহা আঁকিবে । প্রথমে স্কেলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন নাই ।

স্কেলের সাহায্যে নক্সা ।—উত্তরূপে বালকগণের নক্সা বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান জন্মিলে তাহাদিগের দ্বারাও ঐরূপ নক্সা প্রস্তুত করাইতে চেষ্টা করিবে । বালকেরা সম্ভবতঃ দৃষ্টির সাহায্য ঘরের দেওয়ালগুলির অনুরূপত রক্ষা করিয়া চিত্র প্রস্তুত করিতে পারিবে না । এই সময়ে স্কেলের আবশ্যকতা বুঝাইতে হইবে ।

বিদ্যালয়ে চেন কি ফিতা থাকিলে ভাল, নচেৎ দড়ির গায় ফুটের চিহ্ন দিয়া লইলেও কাজ চলিতে পারে । বালকেরা এই দড়ি দ্বারা ঘরের দৈর্ঘ্য মাপিবে । মনে কর, ১৬ ফুট হইল । এখন এই ১৬ ফুট দেওয়ালের নক্সা

কাগজে আঁকিতে হইলে ১৬ ফুট কাগজ চাই। এত বড় কাগজ সাধারণতঃ পাওয়া যায় না, আর পাইলেও তাহা ব্যবহার করা সুবিধাজনক নহে। কাজেই ১৬ ফুটকে ছোট করিয়া আঁকিয়া লইতে হয়। ১ ফুটকে ১ ইঞ্চির সমান ধরিলে, ১৬ ফুট হ'ল ১৬ ইঞ্চি ; এখন ফুট স্কেল ধরিয়া একটা ১৬ ইঞ্চি রেখা আঁকিত কর। এইরূপে ঘরের প্রস্থ আঁকিয়া লও। মনে কর, ১০ ফুট সূত্রাং ১০ ইঞ্চি রেখা টানিলেই ১০ ফুট রেখা দেখান হইবে। এইরূপে মাপিয়া দরজা জানালার স্থান নির্দেশ কর। ঘরের বিপরীত দিকের দেওয়ালগুলি যে সমান, বালকগণকে তাহা দেখাইয়া দাও। নক্সায় একটা দৈর্ঘ্যের এবং একটা প্রস্থের দেওয়াল আঁকিলেই তাহার সমান করিয়া অপর দুইটা দেওয়ালও আঁকা যাইতে পারে। যখন শ্রেণীব কক্ষ অঙ্কন শিক্ষা দেওয়ার পর প্রাঙ্গণসহ সমস্ত বিদ্যালয়ের নক্সা অঙ্কন করা আবশ্যক হইবে, তখন আবার ১ ফুটকে ১ ইঞ্চির সমান করিয়া লইলেও চলিবে না। কাজেই ১ ফুটকে $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি বা $\frac{1}{4}$ ইঞ্চির সমান করিয়া লইতে হইবে।

চার পাঁচ পয়সা করিয়া কাঠের স্কেল কিনিতে পাওয়া যায়। বাঁশের স্কেল করিয়া নিলেও বেশ হয়। মোটা কাগজের উপর দাগ কাটিয়াও কাজ চলা মত স্কেল করা যায়।

বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ ও তাহার অতি নিকটবর্তী দুই তিনটা রাস্তা কিংবা হাট বাজার পর্য্যন্ত স্থানের নক্সা বালকেরা মাপিয়া প্রস্তুত করিতে পারে। ইহার পর গ্রামেব নক্সা, শিক্ষক নিজে প্রস্তুত করিয়া দেখাইবেন বা সার্ভে অফিস হইতে ক্রয় করিয়া লইবেন।

নক্সায় স্কেল অঙ্কিত থাকে। ১ ইঞ্চি কত মাইলের সমান, তাহা লেখা থাকে। এখন এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামের দূরত্ব বালকেরা নিজের স্কেলের দ্বারা মাপিয়াই বলিতে পারিবে। বালকগণকে এইরূপ মাপ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। নদীর দৈর্ঘ্যের মাপ লইতে হইলে নক্সায় নদীর বক্র দাগের উপর সূতা বসাইয়া যাও। পরে সেই সূতা স্কেল দিয়া মাপিয়া লও।

একখানা কাগজে $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চ ফাঁকে ফাঁকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কতকগুলি সমান্তর রুল (পেন্সিল দিয়া) কাটিয়া লও। $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চ যদি ১ ফুটের সমান ধরা যায়, তবে ঐরূপ কাগজে বিনা স্কেলের সাহায্যেই নক্সা অঙ্কিত করা যায়। ঐরূপ কাগজ কিনিতেও পাওয়া যায়। ছেলেদের পক্ষে এইরূপ রুল কাটা চেক বা চারখানা কাগজ বেশ সুবিধাজনক।

বন্ধুর মানচিত্র।—একখানি তক্তা, সেট, থালা বা কলাপাতার উপরে ভিজা বালির দ্বারা গ্রামের আদর্শ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। যেখানে পাহাড়াদি আছে, সে সকল স্থান বালি দিয়া উঁচু কর; হ্রদ, বিল প্রভৃতির স্থান গর্ত করিয়া রাখ; ছুরির দ্বারা নদীর পথ কাটিয়া দেও। পুটিন দ্বারাও বন্ধুর মানচিত্রাদি বেশ দেখান যায়। আঠাল মাটিতেও উত্তম কাজ করা যায়। কেহ কেহ বালির মানচিত্র করিয়া তাহার উপর নানা বর্ণের গুঁড়া দিয়া রঙ করিয়া থাকেন। পুটিনের উপর তেলের রং বেশ ধরে, মাটির উপর জলের রঙ (গঁদের আটার সহিত মিশান) দ্বারা কাজ করিতে পারা যায়। পুটিনের কথা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। বালি বা কাদার দ্বারা বালকগণ এইরূপ বন্ধুর মানচিত্রাদি প্রস্তুত করিলে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার স্থল জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে।

সূত্র শিক্ষা।—আঠাল মাটি বা পুটিনের দ্বারা নিম্নের নক্সানুরূপ একটি আদর্শ প্রস্তুত করিয়া পাহাড়, পর্বত, নদী, হ্রদ প্রভৃতির অর্থ শিখান যাইতে পারে। একখান চারি ছয় পয়সা দামের টানের থালা আবশ্যক।

থালায় উপর জল ঢালিয়া দিলেই সাগর, হ্রদ, নদী প্রভৃতিতে জল যাইবে, স্থল ভাগ উঁচু থাকিবে। সূত্র মুখস্থ করাইবার আবশ্যকতা নাই। বালকেরা কথার অর্থ বুঝিলে ও আদর্শ দেখিতে পাইলে নিজেরাই সূত্র গড়িয়া লইতে পারিবে। না পারিলে অবশ্য সাহায্য করিতে হইবে। তারপর যে সূত্র যখন আবশ্যক হইবে, সেই সূত্র সেই সময়েই শিখাইয়া লওয়া ভাল। পূর্বের কতকগুলি সূত্র বুঝা মুখস্থ করাইয়া কোন ফল নাই। কেহ কেহ সূত্র মুখস্থ

করার আবশ্যকতা একবারেই স্বীকার করিতে চাহেন না । জিনিষের পরিচয় হইলেই হইল ॥



৭৬ চিত্র ।—বৃত্তাদি শিক্ষাদানের আদর্শ ।

শিক্ষার ধারা ।—প্রথমে গ্রামের বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে । গ্রামের বা মহকুমার বা জেলার মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ কর । বোর্ডের মধ্যস্থানে গ্রাম নির্দেশক একটা বিন্দু দাও । সেখান হইতে বাজারে যাইবার পথ অঙ্কিত কর । গ্রামে উপর কি কি জিনিস বাজারে বিক্রয় হয়, কি বারে বাজার বসে, কোন্ কোন্ গ্রামের লোক সে বাজারে আসে, অন্য স্থানে উপর কি কি জিনিস বাজারে বিক্রয় হয় এ সমস্তের আলোচনা কর । তারপর গ্রামের যে দিকে নদী যেরূপ ভাবে গিয়াছে তাহা আঁক । সে নদী দিয়া কোন্ কোন্ প্রধান গ্রামে যাওয়া যায়, নদীর স্রোত কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে যায়, বর্ষাকালে নদীর জল কতদূরে আসে, নদীতে বড় বড় কি মাছ পাওয়া যায় ইত্যাদির আলোচনা কর । পাহাড় পর্বত নিকটে থাকিলে

তাহাও আঁকিয়া দেখাও এবং সে সকল পাহাড়ে কোন্ জাতি বাস করে, কি কি রকমের বড় বড় গাছ জন্মে, পাহাড় কত উঁচু এ সকল বিষয় বলিয়া দাও। তারপর গ্রামের নিকট যে সকল বড় বড় গ্রাম আছে সে সকলের স্থান নির্দেশ কর, আর সেই সকল গ্রাম সম্বন্ধেও ছ'চার কথা বলিয়া দাও। গ্রাম হইতে কল্লনায় মহকুমায় যাত্রা কর। রাস্তার ছ'ধারে যে সকল ধানের, পাটের বা কলাইর ক্ষেত দেখিতে পাইবে তাহার বর্ণনা কর। ধান কখন বোনে, কখন কাটে, পাট ও কলাই কখন বোনে এবং কখন কাটে তাহাও সংক্ষেপে বলিয়া দাও। তারপর মহকুমায় বা জেলায় গিয়া যাহা দেখিবে তাহা বর্ণনা কর। জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট থাকে,—উকিল, মোক্তার, ডাক্তার থাকে, বড় বড় স্কুল থাকে, বড় ডাকঘর থাকে। আর সেই জেলায় যে সকল জাতি বাস করে, তাহাদের যে ব্যবসায়, যে সকল ভাল জিনিষ তৈয়ারি হয় তাহা বলিয়া দাও। নদী দিয়া জেলায় যাইতে পারা যায় কি না? রেলের রাস্তা আছে কি না? জেলার মহকুমা কয়েকটিও দেখাইয়া দাও। কোন্ মহকুমায় কোন্ ভাল জিনিষ পাওয়া যায় তাহাও বলিয়া দাও। জেলা হইতে ভিন্ন ভিন্ন মহকুমায় যেক্রমে যাইতে হয় তাহা দেখাইয়া দাও। মহকুমার হাকিমেরা জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন। আবার বিভাগস্থ কয়টি জেলা একজন কমিশনারের অধীন, তাহাও দেখাও ও বুঝাও। সেই সেই জেলায় কি কি ভাল জিনিষ পাওয়া যায়, তাহাও বলিয়া দাও। আবার কমিশনারের অধীনস্থ জেলা কয়টির মহকুমাও শিখাও। তারপর সেই প্রদেশস্থ ল্যাটের অধীনে যে সকল ডিভিসন ও সেই সকল ডিভিসনে যে সকল জেলা, কেবল তাহাই শিখাও। প্রত্যেক জেলার সর্বপ্রধান উৎপন্ন পদার্থের নামও শিখাইয়া দাও। নিজের প্রদেশ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশের সকলগুলি জেলা শিখাইবার আবশ্যকতা নাই। কেবল অন্যান্য প্রদেশের প্রসিদ্ধ ছ'চারিটি জেলার নাম

অভ্যাস করাও এবং গবর্ণর জেনারেলের অধীনে যে সকল প্রদেশ আছে তাহাদের নাম শিখাও । নিজের গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, প্রদেশের বড় বড় নদী, দেশের অতি বৃহৎ নদীগুলি শিখাইবে । পাহাড়, পর্বত, হ্রদ বিষয়েও এইরূপ মত ।

নিজের দেশ ছাড়া অন্য দেশের একটী, দুইটী, তিনটী বা চারিটী করিয়া প্রধান নগর ও সেই সকল নগর-জাত সৰ্ব্বপ্রধান দ্রব্যাদি বা আশ্চর্য্য শদার্থ জানিয়া রাখিলেই হইল । কলিকাতা হইতে পৃথিবীর প্রধান প্রধান নগর যাইতে হইলে কোন্ পথে যাওয়া আবশ্যক, তাহা দেখাইয়া দিবে । ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্ত এ সকল বিষয় বিশেষরূপে জানা আবশ্যক । অবসর হইলে বাঙালী দেশের কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুরসিদাবাদ ও দারজিলিং, আসামের গোহাটী ও শিলং এবং ভারতবর্ষের আগ্রা, দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজ, কান্ধী, ত্রীনগর প্রভৃতি জেলাগুলির বর্ণনা শুনাইলে ছেলেরা আনন্দলাভ করিবে । দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে যে সকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে তাহা শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ।

পৃথিবীর আকার ও গোলক ।—মানচিত্রাদির শিক্ষার পর গোলকের বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে । পৃথিবীর আকার গোল । অনন্ত শূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে । চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিও আকাশে ভাসিতেছে । আকাশের উপর, নীচ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি দিক্ নাই । জামালকোট বা এরণ্ড গাছের (স্থান বিশেষে ভেরেণ্ডাও বলে) ডাল ভাঙ্গিয়া একটা কচুর পাতায় তাহার রস সংগ্রহ কর । একটা খড়ের অঙ্গুরী করিয়া সেই অঙ্গুরীর সঙ্গে এই রস লাগাইয়া ধীরে ফুঁ দাও । আকাশে গোল গোল অনেক ফুঁপুড়ি উড়িতে থাকিবে । সাবান গুলিয়া একটা নলের (বা পাট কাঠির) সাহায্যেও এইরূপ ফুঁপুড়ি উড়ান যায় । বলিয়া দাও যে পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র শূন্যে এইরূপ উড়িতেছে । আমরা পৃথিবী হইতে ছুটিয়া যাই না কেন?—এ

প্রশ্ন বালকেরা প্রায়ই করিয়া থাকে। আকর্ষণের কথা তাহারা ভাল বুঝিবে না; একটা বড় হাঁড়ির গায়ে পিপীলিকা লাগিয়া থাকিলে, হাঁড়ি হাঁড়ি ঘুরাইলেও সে পিপীলিকা পড়ে না। এই দৃষ্টান্তের দ্বারাই আপাততঃ বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। জলের ভাগ বেশী, স্থলের ভাগ কম,— ইহা বালককে, গোলকে দেখাইয়া দাও।

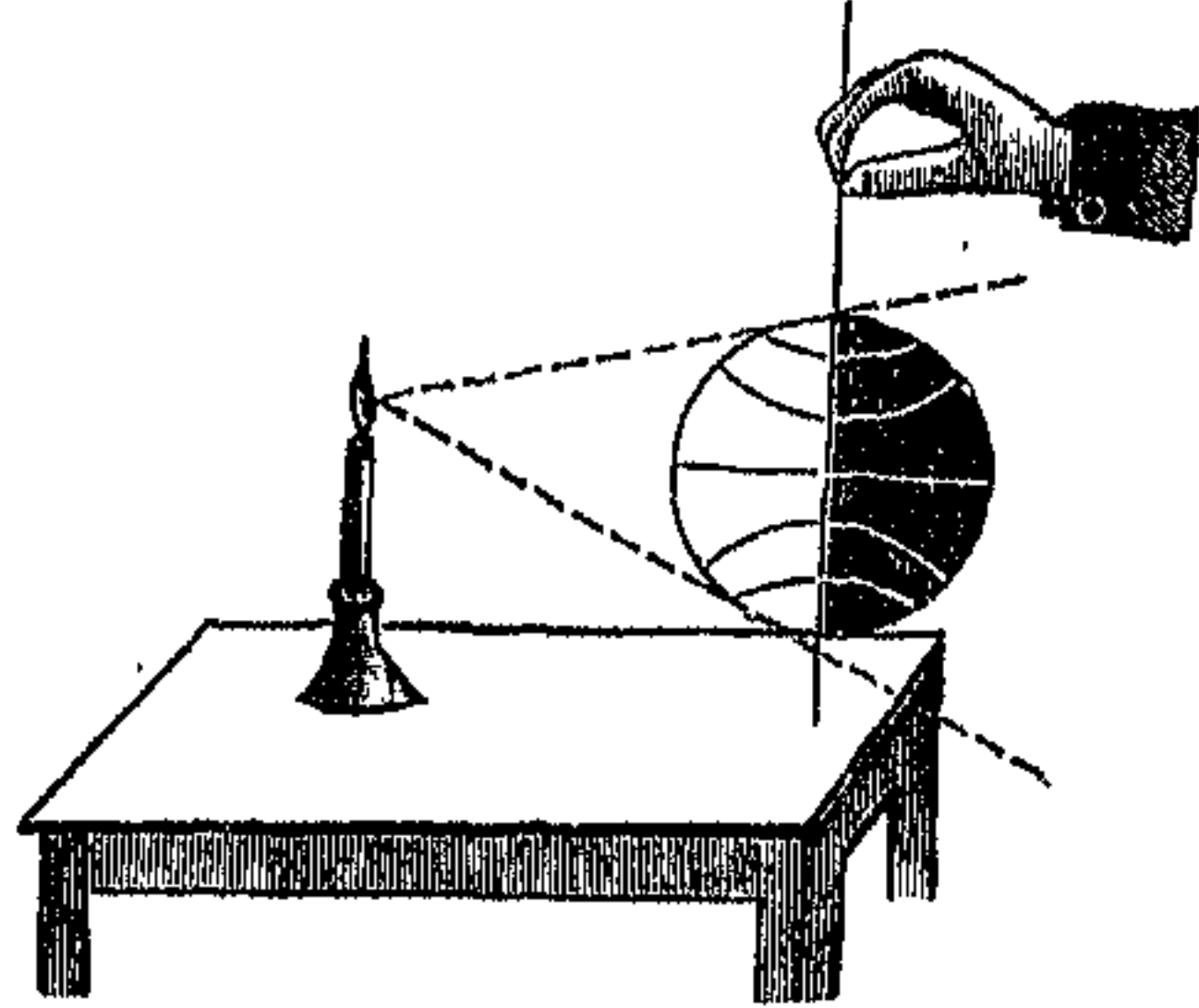
অক্ষরেখা, দ্রাঘিমা প্রভৃতি।—একটা বাতাবি লেবুর (স্থান বিশেষে জাম্বুরা বলে) বোটার দিক দিয়া অপর দিক পর্য্যন্ত একটা শলাকা বিদ্ধ কর। পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ দিক দিয়া এইরূপ শলাকা কল্পনা কর। এই কাল্পনিক শলাকাকেই মেরুদণ্ড বলে। শলাকার উপর বাতাবি লেবু ঘুরাইয়া দেখাও, পৃথিবীও এইরূপে ঘুরিতেছে। বিভিন্ন স্থানের দূরতা নির্ণয় করার জন্য গোলকের উপর কতকগুলি দাগ কাটা থাকে, উত্তর দক্ষিণ লম্বা দাগগুলিকে দ্রাঘিমা (মাধ্যাহ্নিক রেখা), আর পূর্ব পশ্চিমে অঙ্কিত সমান্তর রেখাগুলিকে অক্ষরেখা বলে। পূর্ব পশ্চিমে অঙ্কিত রেখাগুলির মধ্যে যেটা ঠিক মধ্যস্থলে, তাহাকে বিষুবরেখা বা নিরক্ষবৃত্ত বলে।

এই নিরক্ষবৃত্তকে ৩৬০ ভাগে (এক এক ভাগের নাম ডিগ্রি) ভাগ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া দ্রাঘিমার রেখাগুলি টানা হইয়াছে। নিরক্ষবৃত্তের নিকট পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ মাইল। তাহা হইলে বিষুবরেখার উপর ১ ডিগ্রি পরিমিত স্থানে $২৫০০০ \div ৩৬০ = ৬৯$, ৩৯ এত মাইল (প্রায় ৭০ মাইল) স্থান আছে। বিষুবরেখার নিকট দুইটা দ্রাঘিমার মধ্যে যতটা ফাঁক, যতই উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই এই ফাঁক কম হইয়া যায়। সুতরাং দূরত্বও কম হইয়া আসে। মেরুর নিকট সব রেখা মিলিয়া গিয়াছে। আবার প্রত্যেক দ্রাঘিমা-রেখাও ৩৬০ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়া অক্ষবৃত্তগুলি অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রীনউইচের দ্রাঘিমা-রেখাকে ০° ধরিয়া অপর সকল দ্রাঘিমা (পূর্ব পশ্চিমে) গণনা করা

হয়, ইহাও বলিয়া দিতে হইবে । ৩৬০টী রেখা টানিলে বড়ই অপরিষ্কার দেখায় বলিয়া সঙ্গীধারণতঃ ৩৬টী রেখা টানা হয় । সুতরাং ২টী দ্রাঘিমার মধ্যে ফাঁক $৬৯.৩৯ \times ১০ = ৬৯৩.৯$ (প্রায় ৬৯৪) মাইল । আবার দুইটী দ্রাঘিমার মধ্যে সময়ের তফাৎ (২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ ১৪৪০০ মিনিট $\div$ ৩৬০ = ৪ মিনিট) ৪ মিনিট, ১০টীর মধ্যে ৪০ মিনিট, ১৫টী দ্রাঘিমার মধ্যে তফাৎ ৬০ মিনিট অর্থাৎ ১ ঘণ্টা । জাপান আর কলিকাতার মধ্যে প্রায় ৫০টী দ্রাঘিমার ফাঁক । সুতরাং জাপানে সূর্যোদয় হইবার প্রায় ৩ঘণ্টা পরে কলিকাতায় সূর্যোদয় হইয়া থাকে । জাপানে যখন প্রাতঃকালে লোকজন কার্য্যে ব্যস্ত, কলিকাতায় তখন শেষ রাত্রিতে বালকগণ নিদ্রায় অচেতন । আবার কলিকাতায় সূর্যোদয়ের প্রায় ৬ ঘণ্টা পরে লাগুনে সূর্যোদয় হয় । বালকগণকে বিভিন্ন স্থানের সূর্যোদয়ের কাল নির্ণয় করিবার পদ্ধতি শিখাইয়া দিতে হইবে । ইহার পর কর্কট-ক্রান্তি, মকর-ক্রান্তি এবং শীত-গ্রীষ্মমণ্ডলগুলির পরিচয় করানও আবশ্যক । এ সমস্তই যে কাল্পনিক রেখা, বিদ্যালয়ের গোলকের উপরই অঙ্কিত থাকে, পৃথিবীর উপরে এরূপ কোনও রেখা নাই তাহাও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবে ।

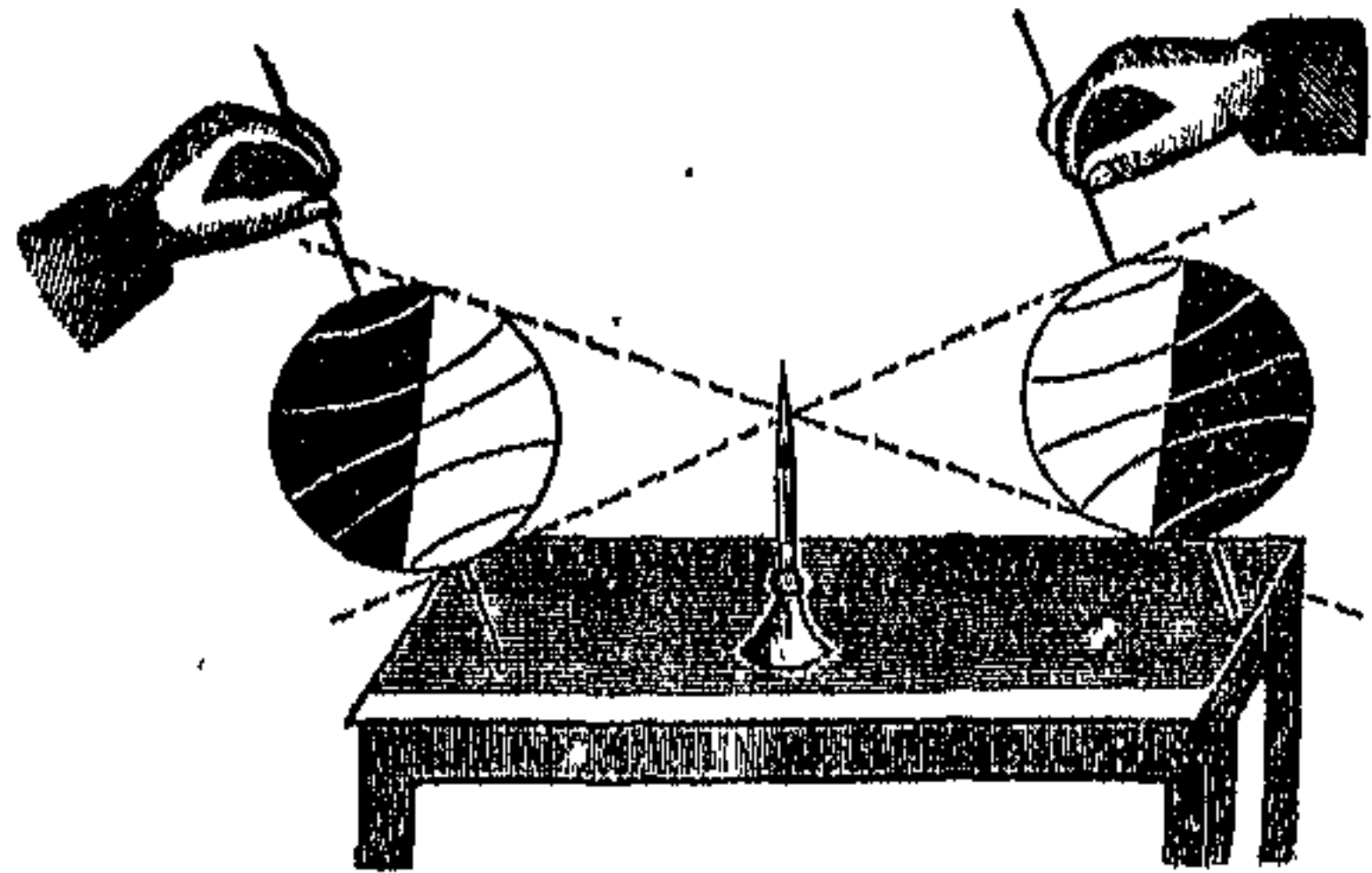
দিবা রাত্রি ।—যদি বিদ্যালয়ে গোলক থাকে ভাল, না থাকিলে একটা বাতাবী লেবুর (জাম্বুরার) মধ্য দিয়া একটা শলাকা বিদ্ধ করিয়া লও । টেবিলের উপর একটা বাতি জালিয়া রাখ । লেবুটির উপর এক স্থানে একটা আলপিন পুতিয়া রাখ, যেন সেইটী একজন মানুষ । আর চকের দ্বারা লেবুর উপর নিরক্ষরবৃত্তটীও আঁকিয়া রাখ । বাতি হইতে প্রায় দুই হাত দূরে শলাকা বিদ্ধ লেবুটী (শলাকা টেবিলের সহিত লম্বাভাবে ধরিয়া) ধীরে ধীরে ঘুরাইতে থাক । যে অংশ বাতির দিকে থাকিবে সেই অংশে আলো পাইবে, অপর অংশ অন্ধকারে থাকিবে ; আবার ঘুরাইলে অন্ধকার অংশ ধীরে ধীরে আলোতে আসিবে ইত্যাদিরূপে দ্বিপ্রহর, প্রাতঃকাল, সন্ধ্যা

প্রভৃতি বুঝাইয়া দাও। কিন্তু মেরুদণ্ডকে এইরূপ লম্বাভাবে ধরিয়া পৃথিবী ঘুরাইলে মেরুদ্বয়েও দিন ও রাত্রি সমান হয়, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাহা হয় না। যাহারা মেরুর নিকট বাস করে, তাহারা বলে যে সেখানে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত্রি। তাহা হইলে পৃথিবীকে



৭৮ চিত্র।—সমান দিন রাত।

কি রূপ ভাবে আলোকের সম্মুখে ধরিলে এইরূপ ঘটনা ঘটতে পারে তাহাই দেখা যাউক।



৭৯ চিত্র।—দিবা রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি।

৭৯ চিত্রানুক্রমে গোলকটী বামপাশে ধরিলে দেখা যাইবে যে ঐ অবস্থায় গোলক ঘুরাইলে উত্তর মেরুতে আলো যাইবে না ও দক্ষিণ মেরুতে কখনও অন্ধকার হইবে না । সুতরাং পৃথিবী সূর্য্যের সম্মুখে প্রায় ৬ মাস এই অবস্থাতে থাকে । এখন আবার গোলকটীকে আলোর অপর পার্শ্বে সরাইয়া আন । গোলক ঠিক ঐরূপেই ধরিয়া রাখ । এখন দেখিবে যে বাতির আলো উত্তর মেরুতে পড়িল, কিন্তু দক্ষিণ মেরু অন্ধকারে থাকিল ; ঘুরাইলেও আর দক্ষিণ মেরুতে আলো যাইবে না ও উত্তর মেরু অন্ধকারে পড়িবে না । সুতরাং পৃথিবী অপর ৬ মাস প্রায় এইরূপ ভাবে সূর্য্যের দিকে অবস্থান করে । নিরক্ষরবৃত্তের উভয় পার্শ্বস্থ কতক স্থানে উভয় অবস্থাতেই সম্পূর্ণ আলোক পাইয়া থাকে ; এই অংশ তাপও অধিক পরিমাণে পায় বলিয়া এই অংশকে গ্রীষ্মমণ্ডল কহে । যে অংশ অল্প অল্প আলোক ও তাপ পায় তাহা নাতিশীতোষ্ণ, আর যাহা প্রায় ৬ মাস একেবারেই তাপ ও আলোক পায় না, তাহাকে শীতমণ্ডল কহে । কর্কট-ক্রান্তি, মকর-ক্রান্তি রেখা দুইটী দেখাইয়া দাও ।

মানচিত্রে শিক্ষা ।—বালকগণকে এই সমস্ত লক্ষ্য করিতে বল :—ইউরোপের উপকূলভাগ বেশী । সমুদ্রপথে প্রায় সকল স্থানেই যাতায়াত করা যায় । এই জন্ত ইউরোপ বাণিজ্য-প্রধান । এশিয়ার উপকূলভাগ ইউরোপ হইতে কম, আফ্রিকার উপকূলভাগ বড়ই কম—অধিকাংশ স্থানই সমুদ্র হইতে দূরে । উপদ্বীপগুলি প্রায়ই দক্ষিণে বিস্তৃত, যথা—কামস্কাটকা, মালয়, ভারতবর্ষ, ইতালী, গ্রীস, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি ; কেবল ডেনমার্ক উত্তরে প্রসারিত । উপসাগরগুলিও প্রায়ই উত্তর দক্ষিণে লম্বাকৃতি—পারম্ব সাগর, শ্বাম সাগর, আড্রিয়াটিক সাগর, বাল্টিক সাগর ইত্যাদি । দেশের উপকূলভাগ প্রায়ই পর্ব্বতময়—সমুদ্রের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার সহজে পরিবর্তন ঘটে না । হিন্দুকুশ পর্ব্বতকে কেন্দ্র করিয়া এশিয়ার বড় বড় পর্ব্বতগুলি চারিদিকে ব্যাসার্দ্ধের মত বিস্তৃত

হইয়াছে। এসিয়ার মধ্যদেশ খুব উচ্চ, তাই নদীগুলি এই মধ্যদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে গড়াইয়া পড়িয়াছে ; যথা—ওবি, ইনিসি, লেনা—এই মধ্যদেশ হইতে উঠিয়া উত্তর সাগরে পড়িতেছে। ইয়াংসিকিয়াং, হংকং প্রভৃতিও এই মধ্যদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্বে প্রশান্ত সাগরে পড়িয়াছে। মিনাম, ইরাবতী, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু প্রভৃতি এইরূপে ভারত সাগরে পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণাত্য প্রদেশ আর্ঘ্যাবর্ত হইতে উচ্চ। আবার দক্ষিণাত্যের বঙ্গে উপকূল মাদ্রাজ উপকূল হইতে উচ্চ। এই জন্ত মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা প্রভৃতি মাদ্রাজ উপকূলে পড়িয়াছে। গঙ্গা ও সিন্ধুর মোহানা দুইটি খুব নীচু স্থান, এই জন্ত এই দুই নদী মোহানার নিকট অনেক মুখে বিভক্ত হইয়াছে। হিমালয় পর্বত সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত, আরব সাগর ও বঙ্গ উপসাগরের বাষ্প হিমালয় ছাড়াইয়া তিব্বতে যাইতে পারে না বলিয়া তিব্বতে বৃষ্টি হয় না। আবার আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে বেনী বৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ সমুদ্রে ঘেরা, উত্তরাংশ পর্বতে ঘেরা, শত্রু সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। কেবল পশ্চিমাংশে কয়েকটি গিরিসঙ্কট আছে ; সেই পথেই আক্রমণকারিগণ ভারতে আগমন করিয়াছিল। সাহারা মরুভূমি এককালে ভূমধ্য সাগরের অংশ ছিল, কারণ সাহারার বালুকায় সমুদ্র-জাত জীবজন্তুর যথেষ্ট কঙ্কাল পাওয়া যায়। আগ্নেয় গিরিগুলি প্রায়ই সমুদ্রের নিকট অবস্থিত। কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া আগ্নেয় গিরির শ্রেণী যাবাদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রসারিত ; আবার আর এক শ্রেণী আগ্নেয় গিরি আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। মনে হয় যেন পৃথিবী একটি আগ্নেয় গিরির মাথা পরিয়া রহিয়াছে। এইরূপে প্রাকৃতিক অবস্থার বিশেষত্বের দিকে বালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করান কর্তব্য। শীত গ্রীষ্মাদির তারতম্য বুঝিতে হইলে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা উত্তমরূপে বুঝিতে পারা আবশ্যক।

ভূগোলের পাঠ মুখস্থ করাইবার প্রণালী ।—ভূগোলের বিবরণ যেমন শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক, সেইরূপ পরীক্ষার জন্য ভূগোলের নামগুলি মুখস্থ করানও আবশ্যিক । পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া নামগুলি মুখস্থ করাইতে হইবে । নিম্নে নগর শিখাইবার প্রণালী প্রদত্ত হইল । অষ্টাশ্র পাঠও এইরূপ প্রণালীতে শিখাইবে ।

গনে কর, ইংলণ্ডের প্রধান নগর শিখাইতে হইবে । বোর্ডে ইংলণ্ডের মানচিত্র অঙ্কিত কর, এবং তাহাতে একটি একটি কবিতা নগরের চিহ্ন দাও ও নাম লেখ, এবং সেই সেই সহর সম্বন্ধে জ্ঞাত যা মোটামুটি বিবরণ বল । যথা :—(বোর্ডে অঙ্কিত মানচিত্রে লন্ডন সহরের স্থান নির্দেশ করতঃ, নগর-জাপক-বিলু চিহ্ন দিয়া ও লিখিয়া) লন্ডন সহর এইখানে—টেম্‌স নদীর উপর, আয়তনে ও ঐশ্বর্য্যে এত বড় সহর পৃথিবীতে আর নাই । আমাদিগের রাজা এই নগরে থাকেন । এইখানে পার্লামেন্ট নামক মন্ত্রী-মন্ত্রীর বৃহৎ বাড়ী আছে । (পার্লামেন্ট গৃহের ছবি দেখাও) । টেম্‌স নদীর নীচে ৮০০ শত হাত দীর্ঘ সুউচ্চ আছে :—“উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর”—লন্ডন সহর একটি বড় বন্দর, সমুদ্র হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নহে, এই সহরের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ (কলিকাতা, লন্ডন, পিকিন, চিকাগো, প্যারিস ও বার্লিন নগরের লোকসংখ্যা জানা আবশ্যিক) ।

এই লিভারপুল সহর—একটি বড় বন্দর—এইখানে তুলার আমদানি হয়—আর এখান হইতে আমাদিগের দেশে লবণ রপ্তানি হয় ।

এই ম্যানচেষ্টার সহর—আমাদিগের দেশের ব্যবহায়া ধুতি, চাদর, কাপড় এইখান হইতে আসে । এখানে অনেক কাপড়ের কল আছে । একটা বড় এঞ্জিনের সঙ্গে হাজার ছ'হাজার তাঁত জোড়া থাকে । সেই এঞ্জিনের জোরে এক সঙ্গে অনেকগুলি তাঁত চলে ও এক সঙ্গে অনেক কাপড় প্রস্তুত হয় বলিয়া বিলাতী কাপড় এদেশে আসিয়াও সম্ভায় বিক্রয় হয় (কাপড়ের কলের ছবি দেখাও) ।

এই সেফিল্ড সহর—এইখানে খুব ভাল ভাল ছুরী, কাঁচী, গুর প্রস্তুত হয় (সেফিল্ড দেখা একখানা ছুরী কি কাঁচী দেখাও) ।

এই অক্সফোর্ড ও এই কেম্ব্রিজ—এই দুইটি সহরে ইংলণ্ডের দুইটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়—অক্সফোর্ডে সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা হয় ও কেম্ব্রিজে গণিতশাস্ত্রের আলোচনা হয় । আমাদিগের আনন্দমোহন বসু (পরানুজ্ঞেপ্যের নামও কর) কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ

করিয়াছিলেন । আর আগাদিগের বহুভাষা তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হরিনাথ দে অক্সফোর্ডে শিক্ষা প্রাপ্ত ।

এই ত্রিস্টল বন্দর—এখানে রাজা রামমোহন রায়ের (রামমোহন রায়ের গল্প বল) মৃত্যু হয়—এখানে তাঁহার সমাধি-মন্দির আছে ।

এইটি গ্রিনউইচ সহর—এইখানে ইংরেজ-জ্যোতির্বিদগণের মানমন্দির আছে । হিন্দুদিগের মানমন্দির কাশীতে ছিল ।

এইরূপে আরও ৩৪টী (ডোভর, বার্মিংহাম, লিডস্, নিউকাসেল) সহরের বর্ণনা করা যাইতে পারে । ইংলণ্ডের সহিত আমরা সংশ্লিষ্ট বলিয়াই ইংলণ্ডের এতগুলি নগর শিক্ষা করা আবশ্যক । কিন্তু অত্যন্ত দেশের ২৪টী প্রধান নগর শিখিলেই যথেষ্ট হইবে ।

বোর্ডের মানচিত্রে এই সহরগুলি উত্তমরূপে লেখা হইয়া গেলে, বালকগণকে বোর্ডে লিখিত এক একটা সহরের নাম পড়িতে বল ও তাহার বর্ণনা করিতে বল । বালকগণ অবশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিবে । ম্যান্‌চেস্তারে ‘কাপড় প্রস্তুত হয়’ বলিলেই এ সহরের যথেষ্ট বর্ণনা হইল । এইরূপ সকল সহরের বর্ণনা হইয়া গেলে, সহরের নামগুলির আত্মক্ষর মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ পুঁছিয়া ফেল । লণ্ডনের ‘ল,’ লিভারপুলের ‘লি,’ ম্যান্‌চেস্তারের ‘ম্যা’ রাখিয়া অবশিষ্টাংশ পুঁছিয়া ফেল । এখন আবার বালকগণকে পূর্বের ছায় এক একটা সহরের নাম করিতে বল ও বর্ণনা করিতে বল । ইহার পর আত্মক্ষর-গুলিও পুঁছিয়া ফেলিয়া কেবল সহরের বিন্দু চিহ্নগুলি রাখ । পূর্বরূপ সহরের নাম করিতে বল ও বর্ণনা করিতে বল । তারপর বিন্দুগুলি পুঁছিয়া দাও ও বালকগণকে সহরের স্থান ঠিক করিয়া বিন্দু দিতে বল ও নাম করিতে বল । ইহার পর বালকগণকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সহরের নাম করিতে বল । এইরূপ বাহিরের চিত্র অন্তরে চালনা করিতে হয় । কিন্তু একদিন এ বিষয় শিক্ষা দিয়াই যেন শিক্ষক একথা মনে না করেন যে, ইংলণ্ডের নগর বিষয়ে তাঁহার বালকগণ পাকা হইয়া গেল । বার বার

আলোচনা না করিলে, কিছুতেই মনে থাকিতে পারে না । সুতরাং বৎসরে প্রত্যেক পাঠের অন্ততঃ (মধ্য শ্রেণীর জন্ত) ৫৭ বার আলোচনা হওয়া আবশ্যক ।

বালকগণ প্রত্যেক দিন নিজকৃত মানচিত্রে পাঠের বিষয় সন্নিবেশিত করিবে । এই জন্ত ভূগোলশিক্ষায় মানচিত্রাঙ্কন শিক্ষা নিতান্তই প্রয়োজন ।

মানচিত্রাঙ্কন ।—চিত্রাঙ্কন শিক্ষার “চিত্রানুকরণ” পদ্ধতিতে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, মানচিত্রাঙ্কনেও তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে । মুদ্রিত ভূচিত্রাবলীর মানচিত্র দৃষ্টে তদনুরূপ মানচিত্র অঙ্কন করা, চিত্রানুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে । তবে পরীক্ষার সময় মানচিত্রাঙ্কনের প্রশ্ন হইয়া থাকে, সে সময়ে কোনও আদর্শ প্রদত্ত হয় না, নিজের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই মানচিত্র অঙ্কন করিতে হয় । সে সম্বন্ধে কিছু উপদেশ আবশ্যক ।

(১) পরীক্ষার কাগজে যে মানচিত্র অঙ্কন করিতে হয়, তাহার আয়তন লম্বায় ৭ ইঞ্চ ও প্রস্থে ৬ ইঞ্চ পরিমাণ হইলেই চলিতে পারে । কাগজে প্রথমে এইরূপ মাপে চারিদিকে কালি দিয়া একটু মোটা করিয়া বর্ডার (পাড়) টানিয়া লইবে । একটী রেখা দিলেই হইবে । দুইটী রেখা দিবার প্রয়োজন নাই । কখনই বর্ডার ভিন্ন মানচিত্র আঁকিবে না । বর্ডারে যে কেবল সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে তাহা নহে, কাজেরও সুবিধা হয় । এই বর্ডারের দীর্ঘ প্রস্থ রেখা সমান্তরাল করিয়া প্রথমে একটী করিয়া অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা টানিয়া লইবে ।

(২) মানচিত্র অঙ্কনকালে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমাগুলি টানিয়া লইলে মানচিত্র অঙ্কনে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে । তবে কথা এই যে, পরীক্ষার জন্ত এত অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা মনে করিয়া রাখা সম্ভবপর নয় বলিলেও হয় । কিন্তু পরীক্ষায় সাধারণতঃ যে সকল মানচিত্র অঙ্কিত করিতে দেওয়া হয়, সে সকলের অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা মনে রাখা বিশেষ কঠিন কাজও

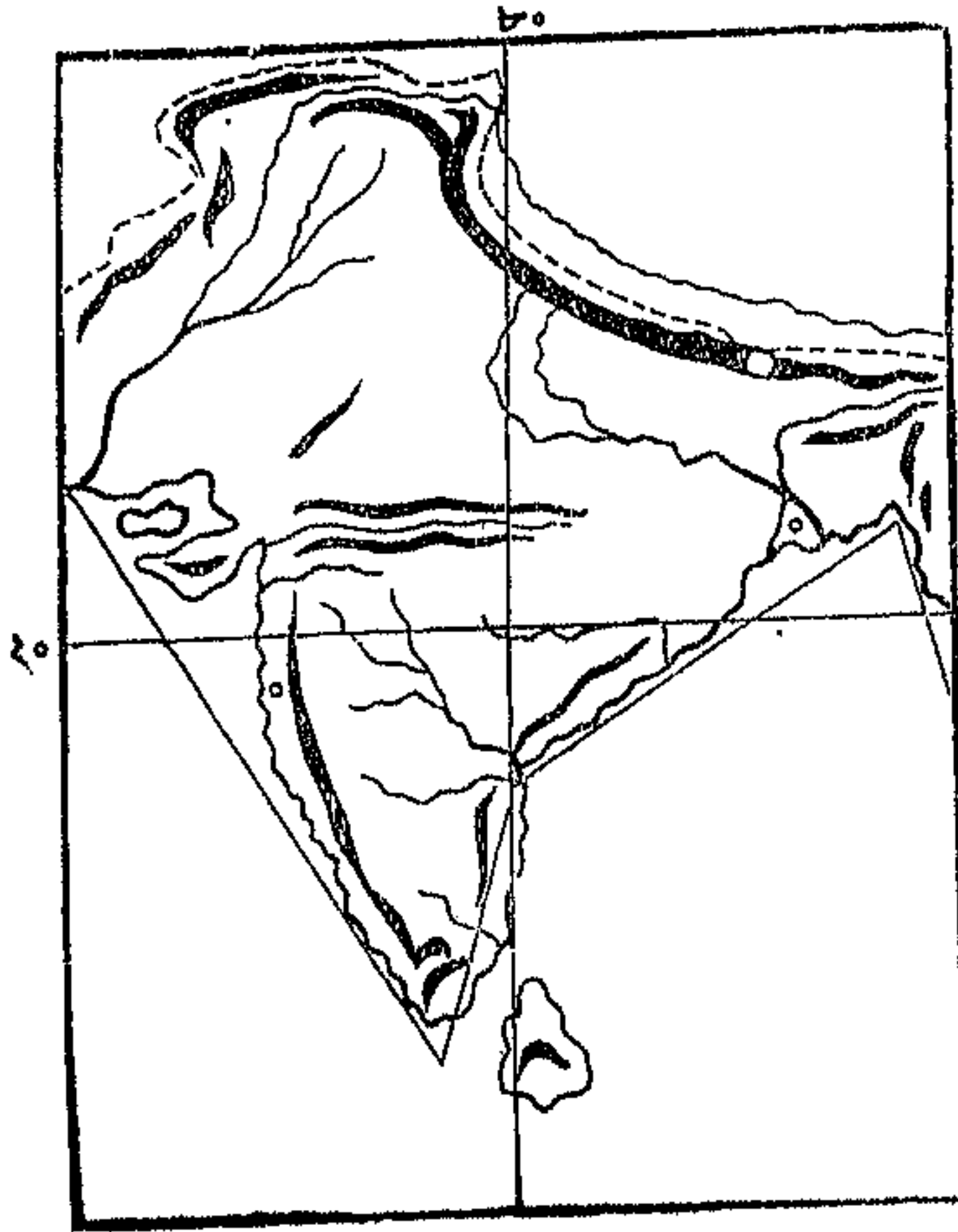
নহে। প্রত্যেক মানচিত্রের সমস্ত রেখার অঙ্ক মনে রাখিবার আবশ্যকতা নাই। কেবল ঠিক মধ্য অক্ষরেখা ও ঠিক মধ্য দ্রাঘিমা মনে রাখিলেই চলিবে। পর পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষের মানচিত্রে ঠিক মধ্য অক্ষরেখা ও ঠিক মধ্য দ্রাঘিমা মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই দুইটী ঠিক আঁকিলেই অপরগুলি দিতে পারা যায়। গ্রিনউইচ হইতে যতই পূর্বে যাওয়া যায় ততই দ্রাঘিমা ১০, ২০, ৩০, ৪০ করিয়া বাড়িয়া যায়; আবার বিষুবরেখার যতই উত্তরে যাওয়া যায় ততই ১০, ২০, ৩০, ৪০ করিয়া অক্ষরেখার অঙ্কও বাড়িয়া যায়। ইহাই মনে রাখিলে আর সকল অঙ্কই বসাইতে পারা যায়। যাহা হউক, সমস্ত অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা না টানিলেও অন্ততঃ মধ্য রেখা দুইটী অঙ্কন করা নিতান্তই আবশ্যক। আর সেই দুইটির অঙ্কও বর্ডারের বাহিরে লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা না করিলে মানচিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বর্ডারের রেখা একটু মোটা করিতে হইবে, কিন্তু অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমাগুলি খুব সরু হইবে।

মধ্য অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমাগুলি একটু সঙ্ক্ষেতে মনে রাখিতে হয়। যথা—ভারতবর্ষের মধ্য দ্রাঘিমা ৮০, অঙ্ক ২০, (দুইটী শূন্য) ; আফ্রিকায় ২০ আর ০ (এও দুই শূন্য) । দক্ষিণ আমেরিকার ৬০ আর ২০ অষ্ট্রেলিয়ার ১৩৫ আর ২৫ (দুইটী ৫), ইতালীর ১২ আর ৪২ (দুইটী ২), ইংলণ্ডের ২ আর ৫৩ (৫ আর ৩এর বিয়োগ ফল ২), চীন সাম্রাজ্যের ১০৫ আর ৩৫, জাপানের ১৪০ আর ৪০, ভূমধ্য সাগরের ১৫ আর ৩৫। পরীক্ষায় প্রায়ই এই সকল মানচিত্র অঙ্কন করিতে দেওয়া হইয়া থাকে। এ সকল ছাড়া বঙ্গদেশ ও আসামের মানচিত্র আঁকিতে দেওয়া হয় (৯০ ও ২৪, ৯৩ ও ২৫) ।

(৩) সরল রেখাদি টানিয়া মানচিত্রকে মোটাগুটী রকমের একটা সরল রৈখিক ক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিলে, আঁকিবারও সুবিধা হয় আর মনে রাখিবারও সুবিধা হয়। পর পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষের মানচিত্রের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।

সিন্ধু দেশের নিকটস্থ বর্ডার ৩ অংশে, তার নীচের অক্ষরেখা ৪ অংশে,

তার নীচের দ্রাঘিমা ৪ অংশে, ও তার উপরের অক্ষরেখাংশ ২ ভাগে ভাগ করিয়া যেকপে রেখা সংযুক্ত হইয়াছে তাহা এবং অন্যান্য বিন্দু ও রেখা লক্ষ্য কর । দুই তিন দিন দেখিয়া অভ্যাস করিলেই মনে থাকিবে । এ সমস্ত চিত্র অবশ্য প্রথমে পেন্সিলের দ্বারা খুব পাতলা করিয়া আঁকিতে হইবে । তারপর মানচিত্র শেষ হইলে রবার দিয়া অনাবশ্যক রেখা পুঁছিয়া ফেলিবে।



৮০ চিত্র ।—মানচিত্রাঙ্কন ।

(৪) মানচিত্র প্রথমে পেন্সিলে আঁকিবে, পরে কালি দিবে । সমুদ্রের ধারে একটু মোটা করিয়া দাগ দিবে । মানচিত্রের মধ্যে দেশ বিভাগ

করিতে হইলে, সে রেখাগুলি সৰু করিয়া দিবে বা বিন্দু বিন্দু করিয়া দিবে।

(৫) পর্বতের স্থানে কালির মোটা দাগ দিবে, প্রাসিক্কা শৃঙ্গের স্থান-গুলি ফাঁক রাখিবে। নদীর রেখাগুলি আঁকা বাঁকা করিয়া দিবে। নদীর রেখা উপত্যকার নিকট সৰু হইবে ও যতই সমুদ্রের নিকট আসিবে ততই একটু করিয়া মোটা হইবে। কিন্তু বেশী মোটা না হয়। নগরগুলি স্থানে এক একটা বিন্দু দিয়া রাখিবে।

(৬) নগর, নদী, পর্বতাদির নামগুলি ছাপার মত করিয়া লিখিবে। জড়া করিয়া লিখিও না। লেখা স্পন্দন না হইলে মানচিত্র ভাল দেখাইবে না। মানচিত্রের নামটী এক কোণে বড় অক্ষরে স্পন্দন করিয়া লিখিবে।

(৭) পরীক্ষার মানচিত্রে কোনরূপ রঙ ব্যবহার করিবে না। পরীক্ষক মনে করিবেন যে তুমি তাঁহাকে রঙদিয়া ভুলাইয়া, তোমার অক্ষনের ক্রটি চাকিতে চেষ্টা করিয়াছ।

(৮) মানচিত্র খুব পরিষ্কার হওয়া আবশ্যিক। রবাব দিয়া পেন্সিলের দাগ তুলিতে গিয়া কাগজের ময়লা নষ্ট করিবে না বা পেন্সিলের দাগ ধসিয়া সমস্ত কাগজ ময়লা করিবে না। যদি কোন কারণে কাগজখানি ময়লা হইয়া যায়, তবে তোমার এই ময়লা মানচিত্রের শুদ্ধ রেখাগুলির উপর একটু জোরে পেন্সিল দিয়া দাগ কাটিলে, (খাতার) নিম্নের কাগজে একটা সাদা দাগ পড়িয়া যাইবে। ময়লা কাগজখানি ভাঁজিয়া রাখ ও এই নিম্নের কাগজের দাগের উপর সাবধানে কালি দিয়া নূতন মানচিত্র অঙ্কন কর।

৯। খুব কঠিন মানচিত্র হইলেও পরীক্ষাগৃহে মানচিত্রাঙ্কনে অর্ধ ঘণ্টার বেশী সময় ব্যয় করিবে না।

ভূগোল শিক্ষাদানের ধারাবাহিক প্রণালী।—মনে কর, তুমি ত্রিহুট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জলঢুপ থানার এলাকাধীন

দিঘীরপার গ্রামস্থিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক । এখন তোমাকে যে ধারা অনুসারে ভূগোল শিক্ষা দিতে হইবে, নিম্নে তাহার ক্রম প্রদর্শিত হইল :—

- (১) প্রাঙ্গণ + খেলার স্থান + **শ্রেণীকক্ষ** + অগ্ৰাচ্ছ শ্রেণী + বাবান্দা
- (২) নদী + টিলা + পুকুর + **বিদ্যালয়** + পথ + দেবালয় + বাজার + ডাকঘর + কৃষিক্ষেত্র
- (৩) বিধানী + মাতিঘুরা + **দিঘীরপার** + গোপাতলা + কসবা
- (৪) পাথারিয়া + বড়লেখা + **পঞ্চথণ্ড** + বাহাদুরপুর — ঢাকা উত্তর ।
- (৫) রাতাবাড়ী + পাথারকাঁদি + **জলাদুপা** + কবিমগঞ্জ
- (৬) সুনামগঞ্জ + হবিগঞ্জ + **করিমগঞ্জ** + উত্তর গ্রীহট্ট + দক্ষিণ গ্রীহট্ট
- (৭) লুমাইপাহাড় + নাগাপাহাড় + **গ্রীহট্ট** + কাছাড় + খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়
- (৮) মণিপুর + সুরমা **উপত্যকা** + ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা
- (৯) মধ্যপ্রদেশ + বঙ্গদেশ + **আসাম** + বেহার উড়িষ্যা + যুক্তপ্রদেশ + পঞ্জাব + ব্রহ্ম + বোম্বাই + মাদ্রাজ + উত্তর পশ্চিম সীমান্ত + ত্রিঃ বেঙ্গলিহান
- (১০) আরব + আফগানিস্থান + ভারত সাম্রাজ্য + **ভারত সাম্রাজ্য** + পূর্ব উপদ্বীপ + তিব্বত + তুরস্ক + তুর্কিস্থান + পারস্য + চীন + জাপান + সাইবেরিয়া
- (১১) আটলানটিক + ভারতমহাসাগর + **এসিয়া** + ইউরোপ + আফ্রিকা + উঃ আমেরিকা + প্রশান্ত + উঃ মহাসাগর + দঃ মহাসাগর + দঃ আমেরিকা + ওসেনিধা
- (১২) সূর্য্য + হর্মেজ + শনি + বৃহস্পতি + পৃথিবী + শুক্র + মঙ্গল + বুধ + নেপচুন
- (১৩) কালপুরুষ ও লুক্রক + মণ্ডুর্ষি + **সৌরজগৎ** + গ্রন্থ — মেঘাদি দ্বাদশ রাশি + ছায়াপথ ইত্যাদি
- (১৪) **ব্রহ্মাণ্ড**

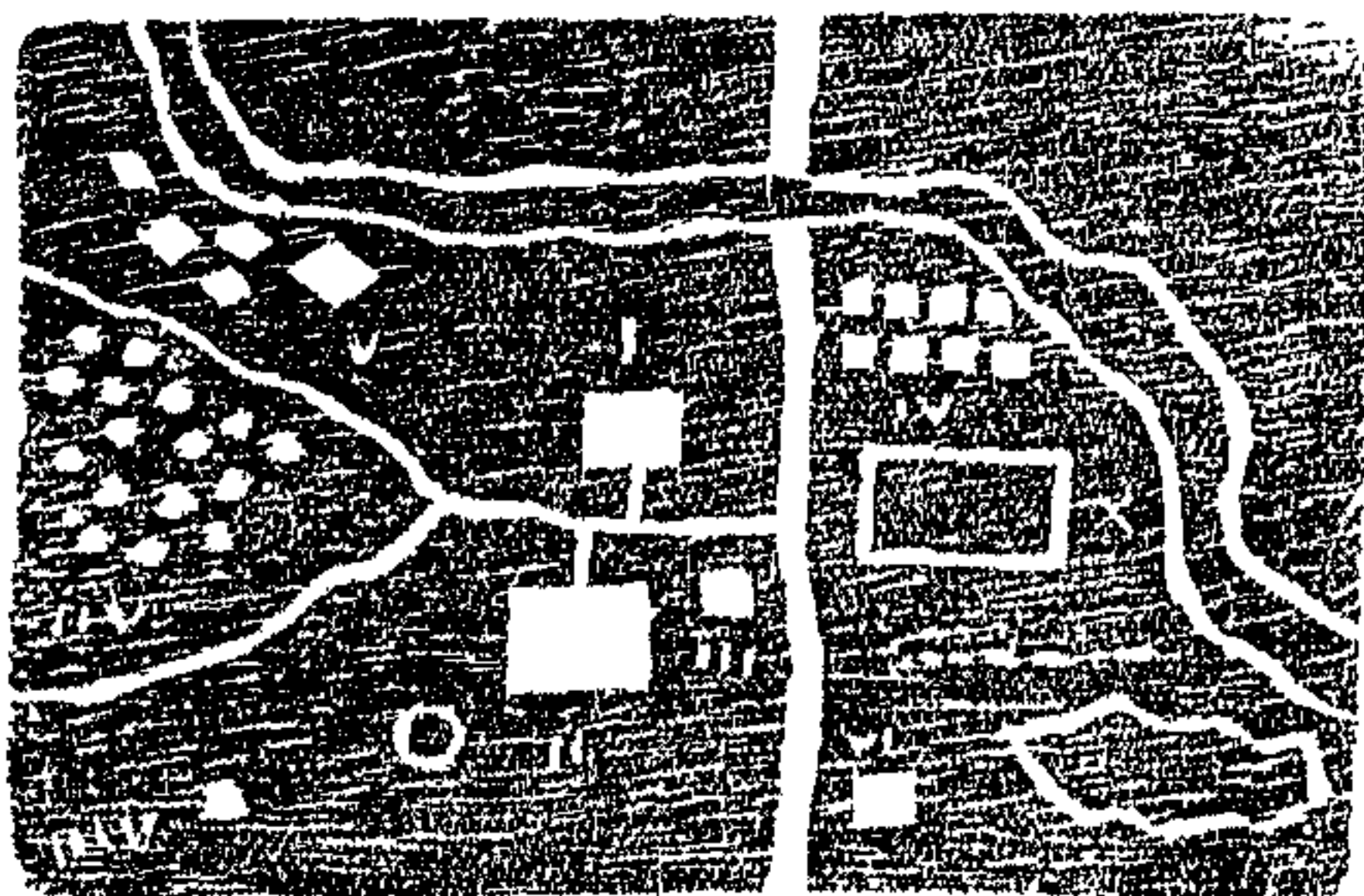
১। শ্রেণীকক্ষ — একখানা থালা বা স্টেটের উপর অল্প ভিজা বালি দ্বারা আঁস্তর (৪ ইঞ্চি মত পুরু) কর । তাহার উপর ছোট ছোট (একটু শক্ত) কাগজের মক ও লম্বা

ফালির দ্বারা বেঞ্চ সাজাও ও কাগজের অনুরূপ খণ্ডের দ্বারা চেয়ার, টেবিল, বোর্ড প্রভৃতি রচনা কর । খড় বা কাঠি ভাঙ্গিয়া দরজা জানালা প্রস্তুত কর । বড় জিনিষকে গুদ্রাকারে দেখানই ইহার উদ্দেশ্য । তারপর শ্রেণীর নক্সা প্রস্তুত কর । ৩৪০ পৃষ্ঠায় নক্সাশিল্পের প্রণালী বিবৃত হইয়াছে । ছাত্রেরাও নিজ নিজ স্টেটে ইহার অনুকরণ করিবে । তারপর এই শ্রেণীকক্ষের সহিত যোগ করিয়া অগ্ন্যস্ত্র শ্রেণী, বারান্দা, খেলার স্থান প্রভৃতি প্রস্তুত কর = বিদ্যালয় হইল ।

২ । বিদ্যালয়—স্ট্রেট বা খালার উপর বালির আস্তর কর । ছোট টুকরা কাগজ ভাঁজ করিয়া ঘরের চালের মত কর ও বালির ভিতর (স্ট্রেটের মধ্যস্থলে) পুতিয়া দাও । এই যেন তোমার স্কুল । তারপর ছোট ছোট গাছের ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া বিদ্যালয়ের যে যে স্থানে বড় বড় গাছ আছে স্ট্রেটের সেইখানে পুতিয়া দাও । অগ্ন্যস্ত্র ঘরও কাগজ দিয়া দেখাও । বালির উপর একটা পেন্সিলের দাগ দিয়া পথ দেখাও । একটু গভীর করিয়া দাগ দিয়া নদী প্রস্তুত কর । খাল, বিল প্রভৃতিও বালির মধ্যে গর্ত করিয়া দেখাইতে হইবে । টিলার স্থানে বালি (নৈবেদ্যের মত) উচ্চ করিয়া রাখ । কৃষিক্ষেত্রের স্থানে ঘাসের গুচ্ছ গুচ্ছ অগ্রভাগ সারি করিয়া পুতিয়া দাও । তারপর বিদ্যালয়ের নক্সা প্রস্তুত কর (১৬ পৃষ্ঠায় দেখ), গ্রামে কি কি কৃষি হয়, করিমগঞ্জ ও জলদ্রুপ যাইবার পথ কোন্টি, নদী দিয়া কোন্ কোন্ গ্রামে যাওয়া যায়, কোন্ সময়ে নদীর জল বাড়ে, ডাকঘর হইতে কিরূপে পত্রাদি বিলি হয়, কোন্ রাস্তায় অগ্ন্যস্ত্র জেলার পত্র যায়, কোন্ দেবতার দেবালয়, টিলার জল পড়িয়া কেমন করিয়া নদী হয়, গ্রামের বড় জমিদারের বৃণ্ডান্ত, জমিদার বাড়ীর কথা (এই পরিবারের কোন রমণী একটী থলিয়া প্রসব করেন, থলিয়া বাটীর বহির্ভাগে ফেলিয়া দেওয়া হয় ; কাকে থলিয়া ছিন্ন করে, থলিয়া হইতে দ্বাদশ শিশু বহির্গত হয়, সেই দ্বাদশ শিশুই জমিদারীর পত্তন করেন । গ্রামের বর্তমান পুকুরের নাম বার পালের দিঘী—বর্তমান জমিদার কালীকিশোর চৌধুরী), গ্রামের নানারূপ গল্প, রঘুনাথ শিরোমণির গল্প বল । বাজারে যে সকল জিনিষ বিক্রয় হয় (আমদানী রপ্তানি),—কাঁটাল, আনারস, ধান বিক্রয় হয় । এখন গ্রামের নক্সা প্রস্তুত কর = দিঘীরপার গ্রাম হইল । নিম্নলিখিত চিত্রের অনুরূপ করিয়া স্ট্রেট বা ব্ল্যাকবোর্ডে নক্সা প্রস্তুত করিলেই হইবে ।

ঘর বাড়ী সাদা চৌকর দ্বারা (I, II, III) বাজার ছোটছোট চৌকর লাইন করিয়া (IV) টিলাগুলি সাদা রঙিতনের টেকার মত করিয়া (V) বৃক্ষবন সাদা বড় বিন্দু ও কৃষিক্ষেত্র

ক্ষেত্র সাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু দ্বারা, বড় পথ সাদা মোটা লাইনে ও গলি পথ সাদা সরু লাইনে আঁকিবে। পুকুর একটা আয়তক্ষেত্র (X), বিল হাওরা এঁকাবঁকা লাইনের ক্ষেত্র, কূপ একটা ছোট বৃত্ত ; নদী দুইটা এঁকাবঁকা লাইনে আঁকিবে। যাহা মাটির নীচে, যেমন পুকুর, নদী, বিল প্রভৃতি, তাহা কেবল লাইনের দ্বারা ; আর যাহা মাটির উপরে, যেমন ঘর, বাড়ী, পাহাড়, বৃক্ষ, তাহার সমা লাইনের দ্বারা আঁকিয়া, সেই ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে চকু গমিয়া সাদা করিয়া দিবে। (কাগজে আঁকিতে হইলে পেনসিল ঘমিয়া নদী, পুকুর, কূপ প্রভৃতির মধ্যস্থল সামান্য কাল করিয়া দিবে ; গৃহ, পাহাড়, বৃক্ষাদির মধ্যে কাল করিবে না।) গভীর আলোক প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া কাল রঙ দিয়া চিহ্নিত করিতে হয়) ।



৭১ চিত্র ।—বোর্ডে গ্রামের নক্সা ।

৩। গ্রাম—দিক্খরপার গ্রামের নিকটবর্তী গ্রামের নাম শিখাও—কোন্ গ্রাম কোন্ দিকে ? প্রসিদ্ধ কয়েকটা গ্রামের বৃত্তান্ত বল ; যথা—সোপাতলায় বাহুদেবের বাড়ী, চন্দ্রায় অনেক কারবারী লোকের বাস, মাতিয়ুরা মুসলমান প্রধান গ্রাম এবং বিয়ানীতে বড় মাজার, ডাকঘর ও গঃ ইং স্কুল। অনেকগুলি গ্রামের সমষ্টিকে পরগণা বলে।

৪। পরগণা—পরগণা অনুসারে খাজানা আদায় হয়। নিকটবর্তী ও নিজ থানার অন্তর্গত কয়েকটা বড় পরগণার নাম শিখাও। বড়লেখা পরগণায় রেলস্টেশন ; ঢাকা জেলার পুরাতন বারাক, পাণের বরজ ; বাহাদুরপুরে মাইনার স্কুল, রায় বাহাদুরের বাড়ী

ইত্যাদি । এই সমস্ত পরগণা জলঢুপ খানার অধীন (বাঙ্গলা দেশের যেখানে পরগণার চল নাই সেখানে পরগণার বিষয় বাদ দেওয়া যাইতে পারে ।)

৫ । থানা—চৌকিদারের কার্য, কনেষ্টবলের কার্য, দারোগার কার্য বুঝাইয়া দাও । তাহার কমন করিয়া শাস্তি রক্ষা করে, তাহার দৃষ্টান্ত দাও । গ্রামের কোনও ছুট লোকের শাস্তি হইয়া থাকিলে, তাহার গল্প বল । জলঢুপ খানার বর্ণনা কর । জলঢুপে রেজিষ্ট্রী আফিস আছে, রেজিষ্ট্রী করার প্রণালী বল । জলঢুপের আনারস প্রসিদ্ধ । অশ্বাশু স্থানের আনারসের সহিত জলঢুপের আনারসের তুলনা কর । পাথারকান্দিতে একটা ছোট থানা আছে, সেখানে জঙ্গলী আফিস আছে—জঙ্গলী আফিসের কার্য বর্ণনা কর । এই সমস্ত থানা মিলিয়া করিমগঞ্জ মহকুমা । নক্সা দেখাও ও প্রস্তুত করাও ।

৬ । মহকুমা—অনেকগুলি মহকুমা লইয়া একটা জেলা । ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুনসেফের কার্যের বর্ণনা কর—ম্যাজিষ্ট্রেট, চোর ডাকাত প্রভৃতির দমন করেন ; মুনসেফ জমিজমা ও টাকাকড়ি বিষয়ক বিবাদ নিষ্পত্তি করেন । গ্রামের কোন মোকদ্দমার দৃষ্টান্ত দাও । করিমগঞ্জে হাই স্কুল আছে—কি কি পড়া হয়, বল । দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, ইহার বৃত্তান্ত বল । হাকালুকী হাওরের গল্প বল । বদরপুরের সিদ্ধেশ্বরের মন্দির ও বারুগীহানের মেলায় বর্ণনা কর । বদরপুর জংসন হইতে কোন্ কোন্ দিকে রেল গিয়াছে, মানচিত্রে দেখাইয়া দাও । বদরপুরের রেলওয়ে সেতুর ছবি দেখাও । ভাঙ্গায় কাঠের কারবার আছে । শ্রীহট্টের মানচিত্রে অশ্বাশু মহকুমা দেখাও ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণন কর—এই দক্ষিণ শ্রীহট্ট (মৌলবীবাজার) রাজনগরে লৌহের অস্ত্র ও রাজা সুবিদনারায়ণের বাটীর ভগ্নাবশেষ । এই সুনামগঞ্জ—ছাতকে চুণ ও কমলালেবু, অশ্বাশু গ্রামে দি, আলু, তেজপাতা—প্রচুর মৎস্য (এক এক পরমাণু আটটি বড় রোহিত মৎস্যের মাথা,) জগন্নাথপুরে রাজা বিজয় সিংহের পুরাতন বাড়ী । দেখারহাওর ও শণির হাওরের বর্ণনা কর । নবগ্রামে অদ্বৈতাচার্য্যের জন্ম । এই হবিগঞ্জ—আজগিরিগঞ্জে শুক মৎস্য, বিখ্যাত আখড়া, লক্ষ্মপুরে তাঁতির কাপড়, বানিয়াচোঙ্গে লাউড়ের বাজার বাড়ী । এই উত্তর শ্রীহট্ট—বালাগঞ্জের পাটী, সদরের বেতের জিনিষ, হাতীর দাঁতের পাটী, পাখা, চিরুণী, ফেচুগঞ্জে ষ্টিমার স্টেশন, ঢাকা দক্ষিণে শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বাটী, রণকেলির হাওর, মহালক্ষ্মীর মন্দির (পীঠস্থান) ইত্যাদি—জেলা । কাদার ঘারা বা পুটানের

দ্বারা জেলার বন্ধুর-মানচিত্র প্রস্তুত কর। (পরিশিষ্টে বন্ধুর মানচিত্রের শিক্ষাপ্রণালী পড়) — বন্ধুর মানচিত্রে ও নক্সায় কি পার্থক্য, বুঝাইয়া দাও। শ্রীহট্টের আয়তন ৫৥ হাজার বর্গ মাইল, গ্রামসংখ্যা ১০৥ হাজার, লোকসংখ্যা ২২৥ লক্ষ।

৭। জেলা—সদর ষ্টেশনের বর্ণনা কর—ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ, ডাক্তার সাহেবের ও উকীল, মোক্তার, কেরানী প্রভৃতির কি কার্য, সংক্ষেপে বলিয়া দাও। দাতব্যচিকিৎসালয়, জেলখানা (শ্রীহট্ট জেলে নানা প্রকার সুন্দর বেতের টেবিল, চেয়ার ও নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হয়), কলেজ প্রভৃতির বর্ণনা কর। শ্রীহট্টের সদরে মাজলালের দরুণা, মনা রায়ের টিলা, আলী আমজাদের ঘড়ী। শ্রীহট্টের সহিত অন্যান্য জেলার যোগ কর; যথা—কাছাড় (সদর ষ্টেশন শিলচর)—বিভাগস্থ কমিশনারের আফিস, স্কুল ইন্সপেক্টরের আফিস। চা প্রসিদ্ধ। বেত, নানারূপ কাঠ, মণিপুরী কাপড় ও বাসন পাওয়া যায়। গুরুত্বাসৈন্যের ক্যান্টনমেন্ট আছে। (৩) খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়—এই পাহাড় প্রায় ৬০০০ ফিট উচ্চ, শিলং সহর বর্তমান রাজধানী, লাট সাহেবের (লাট সাহেবের নাম বলিয়া দাও), শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের আফিস (ডিরেক্টরের নাম বল), মচমাই নদীর জলপ্রপাতের বর্ণনা কর,—উত্তম কমলালেবু পাওয়া যায়—খাসিয়া জাতির বর্ণনা কর—কমলা, তুলা, পান, আলু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। (৪) নাগা পাহাড়—পাটকই শ্রেণী; কহিমা রাজধানী, নাগা জাতির বিবরণ, তুলা, রবার, হস্তিদন্ত। (৫) লুসাই পাহাড়—অম্বর নামক প্রস্তরীভূত বৃক্ষ নির্যাস পাওয়া যায়। রাজধানী আইজল, লুসাই জাতির বিবরণ। মানচিত্রের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে। এই সমস্ত লইয়া সুরমা উপত্যকা বিভাগ—বন্ধুর-মানচিত্র প্রস্তুত কর ও তাহার সাহায্যে শিক্ষা দাও।

৮। বিভাগ—অনেকগুলি ম্যাজিষ্ট্রেট বা ডিপুটী কমিশনারের উপর একজন কমিশনার বিভাগের কর্তা—অনেকগুলি ডেপুটী ইন্সপেক্টরের উপর একজন ইন্সপেক্টর বিভাগস্থ শিক্ষার কর্তা। সুরমা উপত্যকার বর্ণনা কর। বরারেকর গতি, সুরমা কুশিয়ারায় বিভক্ত, সুরমার উপনদী (কুইগাঙ্গ, পিয়াইন, লোঙ্গা), কুশিয়ারায় উপনদী (লঙ্গাই, জুরি, মনু); খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের বর্ণনা। ছাতাচূড়া, ইটা, প্রতাপগড়; দিনারপুর পাহাড়ে প্রস্রবণ। চেরাপুঞ্জিতে অভ্যস্ত বৃষ্টি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বর্ণনা কর—৭টি জেলার নাম শিখাইয়া দাও (মানচিত্রের সাহায্যে), ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ দেখাও, প্রধান প্রধান ৩৪টি উপনদী দেখাও। যে সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে কমলা,

কেরোসিন তৈল, চা, রবার, তসর পাওয়া যায় তাহা বলিয়া দাও।
কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের কথা বল। মণিপুর স্বাধীন রাজ্য; ইংরাজরাজকে কর
দিতে হয়। রাজধানী ইম্ফল। মণিপুরী জাতির বর্ণনা কর। ধোড়া ও মহিম
প্রসিদ্ধ।

৯। প্রদেশ—আসামের চতুঃসীমা দেখাও। গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও
ত্রিহট্টবাসী প্রকৃত আসামী নয়—ইহাদের ভাষা বাঙ্গালা। আসামী ভাষার ও অহম
জাতির বর্ণনা কর। আসামের জেলাগুলির নাম শিখাও। কোন্ জেলার কোন্ জিনিষ
প্রসিদ্ধ বলিয়া দাও। প্রদেশের বঙ্গুর-মানচিত্র ও সমতল মানচিত্রে পর্বত, নদী প্রভৃতির
ও জেলার সীমা দেখাও। অনেকগুলি কমিশনারের উপর একজন লাট—অনেকগুলি
স্কুল ইন্সপেক্টরের উপর একজন ডিরেক্টর। অস্থায়ী প্রদেশগুলি মানচিত্রে দেখাও ও
কোনটি লাট, ও কোনটি চিফ কমিশনারের অধীন, তাহা শিখাইয়া দাও। প্রত্যেক
প্রদেশের রাজধানী শিখাও এবং এই কয়েকটি নগর দেখাইয়া দাও; আগ্রা
(তাজমহলের বর্ণনা কর ও ছবি দেখাও), দিল্লী (জুম্মা মসজিদ) কাশী (বিশ্বেশ্বরের
মন্দির), পুরী (জগন্নাথের মন্দির), নাসিক (পঞ্চকটা বন), করাচী বন্দর (মক্কা যাইবার
পথ) রামেশ্বর সেতুনক, অযোধ্যা। রামচন্দ্র কোন্ রাস্তায় লঙ্কায় গিয়াছিলেন, দেখাও।
কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ সহরের বিস্তারিত বর্ণনা কর ও চিত্র দেখাও।
কাশীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পৃথিবীতে অতুলনীয়, বর্ণনা কর। বিশ্ববিদ্যালয়ের
কথা বল।

১০। দেশ—অনেকগুলি প্রদেশ লইয়া একটি দেশ—বড়লাট ভারত সাম্রাজ্যের
অধিপতি—ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের প্রতিনিধি—বড়লাটের নাম বল—মানচিত্রে
শিমলা দেখাও—দিল্লী সহরের ও বড়লাটের বাড়ীর ছবি দেখাও। ভারতের প্রধান প্রধান
৩৭টা নদী ও ৪৫টা পর্বতের পরিচয় কর। রাজপুতনার মনভূমি ও চিচ্কাব্দ দেখাও।
আন্দামান দ্বীপে খুনী আসামীদিগকে দ্বীপান্তরিত করে কেন, বুঝাইয়া দাও। ভারতবর্ষের
সহিত যোগ করিয়া এশিয়ার অস্থায়ী দেশের নাম ও প্রধান নগর শিখাও। এশিয়ার খুব
বড় বড় ১০।১২টা নদী ও ৫৬টা পর্বত দেখাও। ২৪টা সাগর, উপসাগর দেখাও। চীনের
প্রাচীরের কথা বল। জাপান যুদ্ধের কথা বল।

১১। মহাদেশ ও মহাসাগর—এশিয়ার সহিত যোগ করিয়া ইউরোপ দেখাও।

ও ইউরোপের দেশগুলির রাজধানীর পরিচয় করাও । ইউরোপের ৪৫টি প্রধান নদী ও ৪৫টি পর্বত শিখাও । ইংলণ্ডের রাজধানী ছাড়া লিবরপুল, ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্মিংহাম ও টেমস্ নদী দেখাইয়া দাও । আফ্রিকার ইজিপ্ত (নীলনদী ও আলেকজান্দ্রিয়া এবং কেইরো সহ), কেপকলনি (কেপটাউন) এবং সাহারা মরুভূমি দেখাও ; পিরামিডের বর্ণনা কর ও ছবি দেখাও । ভূমধ্যসাগর কেন বলে ? আমেরিকার কানাডা, ইউনাইটেড স্টেটস, মিসিসিপি, আমেজান, আন্দিজ দেখাও । অষ্ট্রেলিয়া খুব বড় দ্বীপ । উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগরের তুবারের বর্ণনা কর । অস্ট্রাচ মহাসাগর দেখাও । কলিকাতাও বোম্বাই হইতে লঙনে আসিবার পথ দেখাও ও বর্ণনা কর । এখন পৃথিবীর আকার বর্ণনা কর—শূন্যে অবস্থান (৩৮৭ পৃষ্ঠা পড়) ।

১২ । পৃথিবী —অস্ট্রাচ গ্রহগুলির নাম কর—সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত গ্রহ ঘুরিতেছে—সূর্যের বর্ণনা কর ; সূর্য ও আটটি গ্রহ লইয়া সৌরজগৎ । আকাশে বৃহস্পতি শনি, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ দেখাইয়া দাও (অস্ট্রাচ গ্রহ সহজে পরিচয় করাইতে পারিবে না) । এইরূপ অনেক সৌরজগৎ আকাশে ভাসিতেছে । দিবা রাত্ৰের পরিবর্তন ও ঋতুর পরিবর্তন বুঝাইয়া দাও (৩৮৯ পৃষ্ঠায় পড়) । প্রতিপদাদিতে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাও । চন্দ্রের নিজের জ্যোতিঃ নাই—সূর্য-আলোকে আলোকিত । গ্রহণ বুঝাইয়া দাও ।

১৩ । সৌরজগৎ —কতকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জের পরিচয় করাও । অনেক নক্ষত্র সূর্য্য অপেক্ষা বড় । কালপুরুষ ও দুর্লক দেখাও । লুক্রক সূর্য্য অপেক্ষা ২০০০ গুণ বড় । মণ্ডলি ও ক্রব দেখাও (৩৭৯ পৃষ্ঠায় পড়), মেঘাদি দ্বাদশ রাশির পরিচয় না করাইলে সূর্য্যের দৃশ্যমান গতি বুঝাইতে পারিবে না । সকলগুলির পরিচয় করান একটু শক্ত, তবে কালপুরুষের নিকট বৃষ রাশির পরিচয় পাইলে মিথুন, সিংহ, কন্যা, বৃশ্চিক প্রভৃতি ৫৬টা রাশির পরিচয় করান যাইতে পারে ; কারণ এই সমস্ত রাশিতে অতুল্য নক্ষত্র আছে (নক্ষত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে—অতুল্য, উজ্জল, আলোজ্জল) । ছায়াপথ (বহুদূরস্থিত অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ) দেখাইয়া দাও । (যে ব্যক্তি এই ৩৩ রাশিগুলি জানেন, তাঁহার নিকট হইতে এইগুলি শিখিয়া লও । পুস্তক-লিখিত বর্ণনা পড়িয়া আকাশের নক্ষত্রের পরিচয় পাওয়া কঠিন ।)

১৪ । ব্রহ্মাণ্ড —দৃশ্য এবং অদৃশ্য সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ লইয়া ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ।

শিক্ষকগণ এই প্রণালী অনুসারে নিজ নিজ গ্রাম, মহকুমা, জেলা, বিভাগ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করিয়া ভূগোল শিক্ষা দিবেন।

২। ইতিহাস।

ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য।—ইতিহাস শিক্ষাদানের মুখ্য-উদ্দেশ্য দুইটি :—(১) অতীতের প্রতি যুগ জ্ঞান (২) স্বদেশের প্রতি অনুরাগ জ্ঞান। * ইহা ছাড়া অনেকগুলি গৌণ উদ্দেশ্যও আছে ; যথা—
 (১) কার্য্য কারণের সম্বন্ধ নির্ণয়ের দ্বারা বিচারশক্তি বৃদ্ধি করা
 (২) স্মরণশক্তিকে বৃদ্ধি করা (৩) নূতন বিষয় জানিবার ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করা
 (৪) অতীত দেশের কার্য্যকলাপ দৃষ্টে নিজের অবস্থা উন্নত করা
 (৫) কুসংস্কার বর্জন করা (৬) সংকার্য্যের প্রতি আসক্তি জ্ঞান
 (৭) মানবজাতির ক্রমোন্নতি বা ক্রমাবনতি লক্ষ্য করিয়া নিজে সাবধান হওয়া।

ইতিহাস প্রকৃত ঘটনাবলীর বিবরণ, স্মরণ্য কার্য্য কারণের পরীক্ষিত দৃষ্টান্ত। উপদেশ অপেক্ষা যখন দৃষ্টান্তের শিক্ষা সর্বকালেই অধিকতর ফলপ্রসূ তখন ইতিহাসের শিক্ষা যে নীরস উপদেশাদির অপেক্ষা অধিকতর

* From a Lecture of Sir J. Fitch on "The National Portrait Gallery"—It (a visit to the gallery) will, I hope, strengthen in us the feeling of patriotism. By this I do not mean that theatrical patriotism which exults in conquests, and which expresses itself by waving the Union-Jack and singing 'Rule Britannia' in our schools and public places ; but a rational patriotism, founded on knowledge and on an affectionate and grateful recognition of what has been done for us by our ancestors and of the preciousness of the inheritance which they have left us." অনুবাদ—এই জাতীয়-চিত্রশালা দর্শনে যে আমাদের হৃদয়ের স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি হইবে, ইহা আমার বিশ্বাস। যে নাট্যমঞ্চো-পযোগী স্বদেশানুরাগ দ্বিধিক্ষয়ে উল্লসিত এবং বিজালয় ও অতীত প্রকাণ্ড স্থানে জাতীয়

ফলপ্রদ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তবে তেমন করিয়া শিখান চাই । ‘এই পর্য্যন্ত মুখস্থ করিয়া আসিবে’—যে শিক্ষক ইহাই আদেশ করিয়া ইতিহাস শিক্ষা শেষ করিয়া থাকেন, তিনি উপকার না করিয়া বরং অপকাবই করিয়া থাকেন । প্রকৃতরূপে ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইলে, মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটাকে সর্বদা স্থির রাখিতে হইবে ।

নিম্ন শ্রেণীতে ইতিহাস ।—নিম্ন শ্রেণীতে ঐতিহাসিক সমস্ত ঘটনা ধারাবাহিকরূপে না শিখাইয়া, বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপাখ্যানরূপে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । যে শিক্ষক শিক্ষাদান করিবেন, তাঁহার উপাখ্যান বলিবার ক্ষমতা থাকা চাই । পুস্তকের বিবরণ ইতিহাসের নীরস ভাষায় ব্যক্ত করিলে, কোনই ফল হইবে না । যে প্রণালীতে ঠাকুরমা উপকথা বলিয়া থাকেন, কতকটা সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে । তাই বলিয়া প্রকৃত ঘটনার সহিত অপ্রকৃত ঘটনার যোজনা করিতে হইবে না । ছুঃখের কথাগুলি একটু কাতরস্বরে, ভয়ের কথাগুলি ভীতিসূচক মুহুঃস্বরে, রাগের কথাগুলি একটু কৰ্কশস্বরে ব্যক্ত করিলে ও সঙ্গে সঙ্গে হাতে ও মুখে ছুঃখ, ভয়, রাগ প্রভৃতির বাহ্যিক প্রকাশ দেখাইলে বালকগণের প্রীতিপ্রদ হইবে । কথকগণ যে প্রণালীতে পৌরাণিক আখ্যানিকাগুলির কথন করিয়া থাকেন, এ প্রণালীও কতকটা সেইরূপ । কথকগণ মধ্যে মধ্যে যেমন সঙ্গীত কবিয়া থাকেন, ইতিহাসের শিক্ষকগণ তদ্রূপ প্রসিদ্ধ কবিগণের ঐতিহাসিক কবিতার অংশ উদ্ধৃত করিয়া উপাখ্যানকে আরও সঙ্গম করিতে পারেন ।

পতাকা সকালনে ও জাতীয় সঙ্গীত কীর্তনে প্রকাশিত, আমি সেক্ষপ স্বদেশানুরাগের কথা বলিতেছি না : যে স্বদেশানুরাগ প্রকৃষ্ট জ্ঞানে সংস্থাপিত এবং ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে পূর্বপুরুষগণকৃত কাব্যাদির ও তাহাদিগের পরিত্যক্ত অমূল্য সম্পত্তির যথার্থ গর্ম্ম-এহণে শক্ত—আমি সেইরূপ সঙ্গত স্বদেশানুরাগের কথা বলিতেছি । (পণ্ডিতপ্রবর সার জল্লয়া ফিচ)

ইতিহাস শিক্ষাতে পরিচিত বিষয়ের সাহায্যেই শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। গ্রামের কোন প্রসিদ্ধ লোকের জীবনচরিত বা কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার বর্ণনা কর। কিন্তু সাবধান, লোক বিশেষের কেবল গুণের ভাগই বিকাশ করিতে হইবে। আবার সেই গুণাগুণ কেবল বর্ণনা করিয়াই যাইবে; তাহা হইতে যে সকল নীতি শিক্ষা হইতে পারে, তাহা পৃথকভাবে দেখাইয়া দিও না। “রামচন্দ্র পিতৃসহ্য পালনের জন্ত বনে গেলেন”—এই ঘটনাই উত্তমরূপে বর্ণনা কর। ‘তোমাদেরও এইরূপ পিতৃভক্ত হওয়া উচিত’ ইত্যাদিরূপ উপদেশের অবতারণা করিও না। সরস হইলে এই উপদেশ অজ্ঞাতভাবে বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। দৃষ্টান্ত—অমুক মুখোপাধ্যায় মহাশয় খুব বড় জমিদার ছিলেন, প্রজাদিগকে খুব ভাল-বাসিতেন ও তাহাদিগের উপকার করিতেন; অমুক প্রকার কার্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, অমুকের ঘর করিয়া দিয়াছিলেন, পূজার সময় সমস্ত গ্রামকে খাওয়াইতেন, গরীবদের কাপড় দিতেন; স্কুল, ডাক্তারখানার টাকা দিতেন ইত্যাদি। (২) অমুক মোলবী ছিলেন, অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখেন, হাঁটিয়া দিল্লীতে গিয়া আরবী পড়েন, পরে বড় মোলবী হইয়া-ছিলেন, সরকারে খুব সম্মান করিত, সত্য কথা কহিতেন, ৫ সফা রীতিমত নামাজ করিতেন ইত্যাদি। (৪) অমুক সাহা ৫০ টাকা পুঁজী নিয়ে এক দোকান করে, দিন রাত্রি পরিশ্রম করিত; কোথায় কোন্ জিনিষ সস্তা খোঁজ রাখিত; দুই বৎসরের মধ্যে দোকান খুব বড় হইল, শেষে পাটের কারবার আরম্ভ করিল, খুব হিসাবী ছিল, মরিবার সময় ছেলের জন্ত ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যায়, ইত্যাদি।

এইরূপ জেলার ২৩টি লোকের বা ঘটনার এবং পরে সেই প্রদেশের বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিবরণ বিবৃত করিবে। তারপর ভারত ইতিহাসের অতি প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলি শিখাইয়া দিবে। ভারত ইতিহাস শিক্ষার উপযোগী জীবনী ও ঘটনার তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল। বালকগণের বয়স ও

বিদ্যালয়ের সময় বিবেচনায় বিষয়গুলির সংখ্যা কম বা বেশী করিয়া লইবে আর এই সকল উপাখ্যান বলিতে হইলে শিক্ষকগণকে জীবনচরিত, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও বড় বড় ইতিহাসের আশ্রয় লইতে হইবে। ছোট ছোট ইতিহাসে সে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা উপাখ্যানের পক্ষে উপযোগী নহে।

রামায়ণের গল্প, মহাভারতের গল্প, বুদ্ধদেবের গল্প, মহম্মদের গল্প, মুসলমান রাজাদের গল্প (আকবরের, আওরঙ্গজেবের ও তাজমহলের) শিবাজীর গল্প, চৈতন্যের গল্প, পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, ইংরাজদিগের গল্প, পলাশীর যুদ্ধ, ঠগী, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ, সতীদাহ, সিপাহী বিদ্রোহ, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার গল্প, রামমোহন বায়ের গল্প, বিদ্যাসাগরের গল্প। কি কি গুণে স্বপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সমাজে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, কি কি কারণে তাঁহারা জনসাধারণের নেতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর আমরাদিগের উপকারার্থ তাঁহারা কোন্ বিশেষ ব্যাপার লইয়া জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছিলেন—জীবনী বর্ণনায় এইগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দেশ শাসনের রীতিও একটু বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। গ্রামে গ্রামে চৌকিদার থাকে, ইহারা সকলে এক এক থানার দারোগার অধীন, আবার অনেকগুলি থানার দারোগা ম্যাজিস্ট্রেটের বা ডেপুটি কমিশনারের অধীন; এইরূপ নানা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট একজন বিভাগীয় কমিশনারের অধীন, আবার নানা বিভাগের কমিশনার একজন গবর্নরের অধীন, নানা প্রদেশের গভর্নর একজন গবর্নরজেনারেলের অধীন। এইরূপ আবার নানা দেশের গভর্নরজেনারেল এক রাজার অধীন। নিজের জেলা ও প্রদেশের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিবে। সাময়িক চিফ কমিশনার, ছোটলাট বা লাট ও বড়লাট এবং রাজার নাম জানা নিতান্তই আবশ্যক।

মধ্য শ্রেণীতে ইতিহাস।—রীতিমত শিক্ষাদান করিবার পূর্বে বালকগণকে শাসননীতির একটু আভাস প্রদান করা কর্তব্য।

ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, লাট, বড়লাট প্রভৃতি কর্মচারিগণ কি কার্যের অর্থ নিযুক্ত ও তাঁহারা কিরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন, ইহা স্থূলভাবে বুঝাইয়া দিবে। ইংরাজের পূর্বে কোন্ জাতি ভারত শাসন করিতেন; কোন্ দেশ হইতে তাঁহারা আসিয়া কেমন করিয়া ভারত অধিকার করিলেন, তাহাও অতি সংক্ষেপে বলিয়া দিবে। আবার মুসলমান জাতির পূর্বে, ভারত-শাসন-কার্য যে ভারতবাসীর হাতেই ছিল, তাঁহারা যে সে সময়ে পৃথিবীতে খুব উন্নত জাতি ছিলেন, নানা বিজ্ঞান পারদর্শী ছিলেন, ইহাও বলা আবশ্যক। এই সমস্ত বলিয়া ইতিহাসের শিক্ষা আরম্ভ করিবে। কেহ কেহ বর্তমান সময়ের ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অতীতের ইতিহাস শিক্ষা দিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ অতীতের ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বর্তমানের দিকে অগ্রসর হইবেন। প্রথা দুইটাই ভাল, তবে যে শিক্ষক যে প্রথায় কার্য করিয়া সুবিধা পান, তিনি সেই পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন।

ইতিহাসের শিক্ষাদানের ধারাকে সাধারণতঃ তিনটি পৃথক সোপানে বিভক্ত করা হইয়া থাকে—নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ। নিম্ন সোপানে কেবল উপাখ্যান ভাগ শিক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত—বুদ্ধদেবের কোথায় জন্ম—কে পিতা, কে মাতা, কাহার সহিত বিবাহ, গৃহ পরিত্যাগ, প্রচার, প্রভৃতি সাধারণ ঘটনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সরল বিবরণ। পলাশীর যুদ্ধের কারণ, উভয় পক্ষ, যুদ্ধের স্থান, যুদ্ধের কোশল, যুদ্ধের ফলাফল, ইত্যাদি বিষয়ক উপাখ্যান মাত্র। এইরূপ উপাখ্যান শিক্ষা নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীর উপযোগী। মধ্য সোপানে উপাখ্যানের সহিত সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থার সাধান বর্ণনা আবশ্যক। বুদ্ধদেবের জন্মের সময় দেশের যেরূপ সামাজিক অবস্থা ছিল, বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সমাজের যে হিতাহিত হইল, বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচারের কারণ ইত্যাদি বিষয়। পলাশীর যুদ্ধের সময় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, মিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র, রাজ্য কোম্পানীর হস্তগত হওয়াতে লাভালাভ ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয় মধ্য শ্রেণী হইতে মেট্রিকিউলেশন শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষণীয়। উচ্চ সোপানে ঘটনার কার্যকারণ ও ফলাফলের সমালোচনা করিতে হইবে। বৌদ্ধধর্মের মতামতের সহিত হিন্দুধর্মের মতামতের পার্থক্য, বৌদ্ধধর্মের

বিস্তারের ও অবনতির কারণ, শঙ্করাচার্যের মতামত, বৌদ্ধধর্ম প্রচারে দেশের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধবাদীগণের মতামত, সিরাজের নিরুদ্ভুততা, দেশের রাজস্ববর্গের সহিত সিরাজের অসম্মত, ক্রাইবের কোশল, কি পথ অবলম্বন করিলে সিরাজের দয় হইত, সিরাজেব দয় হইলে ভারত ইতিহাসের শ্রোত কোন্ দিকে প্রবাহিত হইত, বাজা ইংরাজের হস্তগত হওয়াতে কি লাভ হইয়াছে ইত্যাদি। এই-রূপ শিক্ষা নর্মাল স্কুলের ও কলেজ-ক্লাসের উপযোগী।

ইতিহাস শিখাইবার নিয়ম।—(১) ইতিহাস শিক্ষায় ভূগোলের যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যিক। প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত মনুষ্যের অবস্থার যে যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝাইতে হইবে। পার্বত্য জাতি সবল ও পরিশ্রমী, নিম্ন স্থানের লোক অপেক্ষাকৃত দুর্বল; শীতপ্রধান স্থানের লোক শ্বেতবর্ণ, গ্রীষ্মপ্রধান স্থানের লোক কৃষ্ণবর্ণ; সমুদ্রতীরবর্তী লোক ব্যবসায়-পটু ইত্যাদি। যুদ্ধ-বিগ্রহ বর্ণনায় ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণনায় মানচিত্রের সাহায্য আবশ্যিক। সুতরাং যে দেশের ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে, সেই দেশের মানচিত্র দেওয়াতে বুলাইয়া রাখা কর্তব্য।

(২) যে অংশ শিক্ষা দিবে, সেই অংশ প্রথমে বালকগণকে গল্পছলে শুনাও, পরে বালকগণকে পুস্তক পড়িতে দাও। প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে ইতিহাসের প্রধান বিষয়গুলি মুখে মুখেই বালকগণকে শিখাইয়া দিতে পারা যায়।

(৩) বালকগণের বয়স বিবেচনায় কিঞ্চিৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাস শিখান কর্তব্য। রাজাদিগের নাম মুখস্থ করা অপেক্ষা এই শিক্ষাই কার্যকরী।

(৪) এক সঙ্গে অনেক শিখাইতে চেষ্টা করিও না। অনেক শ্রেণীপাঠ্য ইতিহাসের পুস্তকে এক অহুচ্ছেদের ছত্রে ছত্রে বহু ঘটনার বিবরণ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বালকগণের আনন্দ না হইয়া, বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে।

(৫) যে সকল কঠিন রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনা বালকগণের পক্ষে সহজে বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর নহে, সে বিষয় পুরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ ।

(৬) শিক্ষক উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে, ইতিহাস পড়াইতে পারিবেন না, ইহা যেন তাঁহার মনে থাকে । মানচিত্র, ছবি বা অত্যাশ্চর্য যে সকল জিনিষ সংগ্রহ করা আবশ্যিক, তাহা পূর্বেই ঠিক করিয়া রাখা কর্তব্য । বিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে নানারূপ পুরাতন মুদ্রা, তাম্রফলক, দলিল, পুথি, পুরাতন রাজপ্রাসাদ বা কীর্তিস্তম্ভের ইষ্টক বা পাথর, ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র, পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যের সংগ্রহ রাখিতে পারিলে ইতিহাস শিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হইবে ।

ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক সহরে বালক বালিকাদিগের শিক্ষাদানার্থে ঐতিহাসিক মিউজিয়াম খোলা হইয়াছে । ইহাতে বড় বড় পুতুলের সাহায্যে ইতিহাসের ঘটনাগুলি অতি সুন্দররূপে তারিখ অনুসারে পর পর মাজান রাখিয়াছে । চোখে দেখিলে বিষয়টি যেমন মনে থাকে, কেবল শুনিয়া বা পুস্তকে পড়িয়া সেকণ মনে থাকিতে পারে না । বালকেরা একবার এই মিউজিয়াম ভাঙ্গ করিয়া দেখিয়া গেলেই ছবিগুলি তাহাদিগের চোখে ভাসিতে থাকে । সুতরাং ইতিহাসের ঘটনা মনে করিয়া রাখিতে কোনই কষ্ট হয় না । কিন্তু এইরূপ মিউজিয়াম করিতে খরচ অনেক । আমাদের দেশে তাহা করা একরূপ অসম্ভব । অনেক বিদ্যালয়ে মাজিক লন্ঠনের সাহায্যে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয় । মাজিক লন্ঠনের জন্ত এই সকল ঐতিহাসিক ছবি কিনিতে বা প্রস্তুত করাইতেও খরচের আবশ্যক । স্টেরিওস্কোপের সাহায্যেও ইতিহাসের শিক্ষা চঙ্গিতে পারে—কিন্তু স্টেরিওস্কোপের দামও কম নয় । শিক্ষকগণ একটু চেষ্টা করিলে নিজে ঐতিহাসিক চিত্র আঁকিয়া লইতে পারেন । এই চিত্র খুব সুন্দর না হইলেও ক্ষতি নাই । যতদূর সম্ভব স্মৃতির সাহায্যার্থ, চক্ষুর সাহায্য গ্রহণ করা বিশেষ আবশ্যিক ।

ভূদেব বাবুর সম্পর্কে গল্প আছে যে একবার তাঁহার শিক্ষকতা পরীক্ষার নিমিত্ত কোন সাহেব তাঁহাকে কতকগুলি ছুট-ছেলের শ্রেণীতে ইতিহাস হইতে পলাশীর যুদ্ধ পড়াইতে আদেশ করেন । ভূদেববাবু শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেই ছাত্রগণ বাহির হইয়া

গেল ও রাত্তার ধারে বসিয়া কচুর গাছ ছিঁড়িতে লাগিল। ভূদেববাবুও তাহাদের সঙ্গে কতকগুলি কচুর গাছ উঠাইয়া বালকগণকে বলিলেন যে “কচুগাছগুলি লইয়া শ্রেনীতে চল। ভোমাদিগকে এই কচুর গাছ দিয়া একটা খেলা দেখাইব। “বালকগণ তাহার সঙ্গে শ্রেনীতে প্রবেশ করিলে, তিনি ঐ কচুর গাছগুলি ছুরিঘারা ছোট বড় করিয়া কাটিলেন ও পলাশীর যুদ্ধের স্থান অনুসারে সেই কচুর খণ্ডগুলি নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। ক্লাইবের সৈন্য, মিরজাফরের সৈন্য, মোহনলালের সৈন্য এইরূপে সজ্জিত করিয়া খেলার ছলে পলাশীর যুদ্ধটী এমন সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে বালকেরা বোধ হয় তাহা জীবনেও কোনদিন ভুলিয়া যায় নাই। চক্ষুর সাহায্য লইলে এইরূপই সফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৭) বালকগণের দ্বারা এক প্রস্তুত ঐতিহাসিক মানচিত্র অঙ্কন করাইতে চেষ্টা করিবে। আকবরের রাজত্ব কতদূর বিস্তৃত ছিল, আওরঙ্গজেবের সময়েই বা তাহার কি পরিবর্তন হইল, লর্ড ক্লাইবের সময় ইংরাজদিগের কি পরিমাণ অধিকার ছিল, তারপর ক্রমে বৃদ্ধি হইতে হইতে (ওয়েলেসলি, ডালহৌসি, বেনটিং, ক্যানিং, ডফ্রিং) লর্ড কার্জনের সময় তাহার কি পরিমাণ প্রসার হইল ইত্যাদি বিষয়ক মানচিত্র স্বরণশক্তির খুব সহায়। আজকাল ইতিহাসের প্রায় সকল পুস্তকেই এ সকল মানচিত্র থাকে। (জপেন সাহেব কৃত “ভারত ইতিহাসের মানচিত্র” নামক ইংরাজী ভূচিত্রাবলী, কলিকাতা লণ্ডম্যানস্ গ্রীনের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়—মূল্য ২২)।

মন তারিখ শিক্ষা।—মন তারিখ শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ কোন সহজ প্রণালী দেখা যায় না। কেবল পুনঃ পুনঃ আলোচনা করাই তারিখ মনে রাখিবার একমাত্র উপায়। তবে শিক্ষকগণ বালকগণের স্মৃতির সাহায্যার্থ নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। নিম্নে সাধারণ কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

(১) সদৃশ বা বিসদৃশ প্রথায়—একটি সদৃশ প্রথার দৃষ্টান্ত

(তারিখগুলি সমস্তই পরিবর্তনের যুগ ও এক রকমের অর্থাৎ ৫৭ যুদ্ধ) :—

যথা—৫৫৭ খৃঃ বুদ্ধদেবের জন্ম । হিন্দুধর্মের পরিবর্তন ।

৫৭ খৃঃ বিক্রমাদিত্যের সংবৎ আরম্ভ । সাহিত্য যুগের অভ্যুদয় ।

৬৫৭ খৃঃ অঃ মুসলমানদিগের ১ম আক্রমণ ।

১৩৫৭ খৃঃ অঃ বাহমণি রাজত্বের গঠন শেষ (১৩৪৭ সনে আরম্ভ) ।

১৫৫৬ খৃঃ অঃ আকবরের রাজ্যপ্রাপ্তি ও মোগল রাজত্বের উন্নতি ।

১৬৫৮ খৃঃ অঃ আরঞ্জিবের রাজ্যপ্রাপ্তি ও মোগল রাজত্বের অবনতি ।

(১৬৫৮ হইতে ১ বাদ দিয়া, আকবরের রাজ্যপ্রাপ্তির সহিত যোগ করিলে উভয়েরই রাজ্যপ্রাপ্তির সময় ৫৭ই পড়িবে) ।

১৬৫৭ খৃঃ অঃ প্রতাপগড়ের যুদ্ধ, হিন্দুর পুনরুত্থান ।

১৭৫৭ খৃঃ অঃ পলাশীর যুদ্ধ, ইংরাজ রাজত্বের স্বত্বপাত ।

১৮৫৭ খৃঃ অঃ সিপাহী বিদ্রোহ ও মহারানী কর্তৃক ভারত শাসনের ভার গ্রহণ ।

একটী বিসদৃশ প্রণার দৃষ্টান্ত (একটী তারিখ অপরাটীর উল্টা) :—

১১৯১ খৃঃ অঃ গজনাব্যাক মহম্মদ ঘোরী তিরোয়ারীর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হন ।

১৯১১ খৃঃ অঃ ইংলণ্ডের পঞ্চম জর্জ আগন্তিত হইয়া দিল্লীনগরীতে ভারতসম্রাট-রূপে অভিষিক্ত হন ।

(২) কবিতা বা ছড়ার সাহায্যে—

বেন্টিং লাটের কথা শুন দিয়া মন ।

আঠার আটশে তাঁর হেথা আগমন ॥

উনত্রিশে সতীদাহ হ'ল নিবারণ ।

কিছুদিন পরে হ'ল ঠগের দমন ॥

বত্রিশে কাছাড় দেশ রাজ্যভুক্ত হ'ল ।

ছ'বৎসর পরে রাজা কুর্গুও গেল ॥

খন্দেবের নরবলি হইল বারণ ।

কোন্ জাতি করিলেক বশতাজহণ ॥

শাসনের ব্যয়ভার কাধে হইল ।

পারসী উঠিয়া গিয়া বাঙ্গলা চলিল ॥

ইংরাজী শিক্ষার চল পঁয়ত্রিশে হ'ল ।

রাজা রাম এর তরে অনেক খাটিল ॥

সেই সনে ডাক্তারী কলেজ বসিল ।

সেই সনে বেন্টিং ভারত ছাড়িল ॥

(৩) অত্যাশ্চর্য্য সঙ্কেতের সাহায্যে :—

(ক) ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০
মনে করিয়া লও । এখন এই ছড়া মনে রাখ :—

ত্রাণনৃপ—আকবর

তাপমণি—জাহাঙ্গীর

ত্রিপথিব—সাজাহান

তপনব—আরাজেন

ত্রাণনৃপ (অর্থাৎ ত=১, থ=২, দ=৩, ধ=৪, ন=৫, প=৬, ১৫৫৬) আবার অর্থ=ত্রাণনৃপ অর্থাৎ যে
নৃপ ভারতকে অশান্তি হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন । এইরূপ তাপমণি (১৬০৫) অর্থাৎ মৃত্যু
মাংসাদি তাপ প্রদানকারী জিনিষের যিনি মণি ছিলেন । ত্রিপথিব (১৬২৮)=ত্রিপথ+ইব
অর্থাৎ রাজা, পিতাও বন্দী যিনি এই তিন পথেই ছিলেন । তপনব (১৫৫৮) অর্থাৎ রাজার
পূর্বপুরুষেরা যে তপ বা তপস্তা বা ধর্ম অনুসারে চলিয়াছিলেন, তিনি তাহা ছাড়িয়া নব
তপ লইয়াছিলেন ।

(খ) তারপর গভর্ণর জেনারেলদিগের নাম মনে রাখার সঙ্কেত :—প্রত্যেক লাটের
নামের আদ্যক্ষর লইয়া হে কসোয়ো, কমি ময়া বেয়, এ হাদা কে ?*
অর্থ—‘হে’ (কোন ব্যক্তিকে ডাকিয়া) ‘কসোয়া’ অর্থাৎ খুব কমান্বিত (কুপণতা) কর,
তাহলে ‘কমি’ (কম) ‘ময়া’ (খাবার জিনিষ) ‘বেয়’ (বায়) হইবে । ‘এ’ (এই) ‘হাদা’
(অর্থাৎ হাদা, বোকা) ‘কে’ ? যে এ কথা বোঝে না ।

তার পর রাজপ্রতিনিধিদিগের নাম উক্ত প্রকারে কে এল, মেন, ৯ ধা, ডালা এক ।*

* হে হেষ্টিংস, ক কর্ণওয়ালিস, সো সোর (জনসোর), যো ওয়েলেসলি, ক কর্ণওয়ালিস
(পুনর্বার), মি মিণ্টো, ম ময়রা, য়া আমহার্ণষ্ট, বে বেণ্টিং, য় অকল্যাণ্ড, এ
এলেনবরা, হা হার্ডিঞ্জ, দা দালহাউসী, কে কেনিং ।

* কে কেনিং, এ এলগিন, ল লরেন্স, মে মেয়ো, ন নর্থব্রুক, ৯ লিটন, ৯ রিপন, ডা
ডাফরিণ, লা লান্সডাউন, এ এলগিন, ক কর্জন ।

অর্থ—‘কে এল ?’ অর্থাৎ কে আসিল ? উত্তরে যেন কেহ বলিতেছে ‘মেন’ অর্থাৎ অনেক লোক । ইংরাজীতে উত্তর দেওয়া হইল, পাছে যাহারা আসিয়াছে তাহারা বুঝিতে পারে । তারপর যেন প্রশ্ন হইল, কয় জন লোক ? সম্বন্ধে উত্তর হইল ৯ জন অর্থাৎ ৮৭ জন (স্বরবর্ণের ৮ম ও ৭ম বর্ণ বলিয়া) কিন্তু, ‘ডাঙ্গা’ মাত্র ‘এক’ থানি । কাজেই, খুব কসাকসি করিয়া ব্যয় করিতে হইবে । (এ সমস্ত অর্থ অবশ্য কষ্ট-কষ্টনা, কেবল মনে রাখিবার সহায়তার জন্য এরাপ করিতে হয় ।)

তবে বেশী তারিখ শিক্ষা দেওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত নহে । যে সকল বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটয়াছে, সেই সকল ঘটনার তারিখই আবশ্যিক । প্রধান ঘটনাগুলি যে শতাব্দীতে ঘটিছিল তাহার একটা জ্ঞান থাকা উচিত । ১ম পাণিপথের যুদ্ধের তারিখ ১৫৫৬ না লিখিয়া ১৫৩০ কি ১৫৪০ লিখিলে তত সারাজ্যক হয় না, যেমন ১৬২৬ লিখিলে হয় । মায়াল সাহেব কৃত ‘খার্টী ইয়ার্স অব টিচিং’ নামক পুস্তকে সময় নির্দেশক তালিকা প্রস্তুত করিবার যে উপদেশ আছে, তাহা দৃষ্টে একটা তালিকা প্রস্তুত হইল । (২য় পরিশিষ্ট দেখ) । পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ একখানা তালিকা প্রস্তুত করিলে, অন্ততঃ শতাব্দীর ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না ।

ইতিহাসের পাঠাভ্যাস ।—ইতিহাস মনে রাখিতে হইলে খুব ঘন ঘন আলোচনা করিতে হইবে । সম্ভাহে অন্ততঃ একবার করিয়া সমস্ত পুরাতন পাঠের আলোচনা না করিলে ইতিহাস কিছুতেই মনে থাকিবে না । যে সকল বালক ইতিহাস কম জানে বা ইতিহাস পাঠে শৈথিল্য করে, তাহাদিগকে ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত করা মন্দ নহে । নিম্ন শ্রেণীতে (বা গৃহে ভাইভগিনীদিগের) ইতিহাস শিক্ষার সময় এইরূপ বালকের দ্বারা ইতিহাসের পাঠদান করাইলে তাহার উত্তম ইতিহাস শিক্ষা হইবে । (কেবল ইতিহাস কেন, যে সকল বালক অঙ্কে কাঁচা, তাহাদিগকেও এইরূপ শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত করিয়া উত্তম ফল লাভ করিয়াছি ।)

“কোন বিষয় মনে করিয়া রাখিতে হইলে, কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ?”—এই প্রশ্নের উত্তরে একজন বিজ্ঞ শিক্ষক বলিয়াছিলেন “৭ জন

লোকের নিকট ঐ বিষয়টী সম্বন্ধে ৭ বার গল্প করিবে ।” ইতিহাস মনে রাখিতে হইলে এই উপদেশ অমূল্য । এক শ্রেণীর ৩৪ জন একত্র হইয়া ইতিহাসের আলোচনা করিলেও বিশেষ উপকার হয় ।

ইতিহাস পাঠনার আদর্শ ।—উপকরণ—বঙ্গদেশের ও ভারত-বর্ষের মানচিত্র দেয়ালে বুলান, টেবিলের উপরে রাজা লক্ষ্মণ সেনের বাটির ধবংসাবশেষ ইষ্টক, কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি ; চক ও ব্ল্যাক বোর্ড ।

(এই পাঠ উচ্চ প্রাথমিকের প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে । এই আদর্শ পাঠনা ভূদেব বাবুর পুস্তক হইতে গৃহীত ।)

শি । নবদ্বীপ দেখাও ।—নবদ্বীপ এক্ষণে কি জন্তু প্রসিদ্ধ ?

বা । এইখানে অনেক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করেন । অনেক সংস্কৃত টোল আছে । গৌরান্দ্র এইস্থানে জন্মগ্রহণ করেন ।

শি । পূর্বে ঐ নবদ্বীপ সমুদায় গোড় দেশের রাজধানী ছিল । এইজন্তই আজ পর্যন্তও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেব প্রধান সমাজ । এখন ইংরাজী ভাষাব বিদ্বান্ লোক কোন্ সহরে সর্বাপেক্ষা অধিক ?

বা । কলিকাতায় সর্বাপেক্ষা অধিক ।

শি । যেমন কলিকাতা ইংরাজদিগের রাজধানী বলিয়া এখানে ইংরাজীতে বিধান লোক অধিক হইয়াছে, তেমন নবদ্বীপ হিন্দুরাজাদিগের রাজধানী ছিল বলিয়া তথায় সংস্কৃত বিদ্যার প্রাচুর্য্য হইয়াছিল । আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ঐ নবদ্বীপে লক্ষ্মণ সেন নামে এক রাজা রাজ্য করিতেন (এই লক্ষ্মণ সেনের রাজবাড়ী ভাঙ্গা হইট) । সেন উপাধি বিশিষ্ট আর কোন রাজার নাম শুনিয়াছ ?

বা । বল্লাল সেন ।

শি । যে বল্লাল সেনের নাম শুনিয়াছ, এই লক্ষ্মণ সেন সেই বংশেরই একজন রাজা বলিয়া মনে হয় । আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে লক্ষ্মণ সেনের বয়স ৮০ বৎসর গত । সুতরাং বৃদ্ধ রাজা রাজকার্য্যে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিতেন না । কেবল ধর্ম্ম কার্য্যেই মন দিয়াছিলেন । একদিন রাজা লক্ষ্মণ সেন বসিয়া আছেন ; এমন সময় তাঁহার পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজা তাঁহাদিগকে যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিলেন । কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, বলিতে পার ?

বা। রাজা দাঁড়াইয়া সকলকে প্রণাম করিলেন ও বসিবার আসন দিলেন।

শি। হাঁ, ঠিক কথা। তারপর রাজপুত্রোহিত বলিতে লাগিলেন “মহারাজ, শাস্ত্রের উক্তি মিথ্যা হইবার নহে। বঙ্গদেশ যে যবনাদিকৃত হইবে তাহার কাল উপস্থিত। শুনিলাম যবন সেনা আগতপ্রায়; অতএব চমুস, ত্রীক্ষেত্রে প্রস্থান করি।” মানচিত্রে ত্রীক্ষেত্র দেখাও—নবদ্বীপ হইতে কোন্ রাস্তায় ত্রীক্ষেত্র যাওয়া যায়—ত্রীক্ষেত্রের অপর নাম কি?

বা। (মানচিত্র প্রদর্শন) ত্রীক্ষেত্রের অপর নাম জগন্নাথ বা পুরী।

শি। রাজা বৃদ্ধ—বৃদ্ধ অবস্থায় প্রায়ই পরিবর্তনে অনিচ্ছা হয়। রাজা পণ্ডিতবর্গের পরামর্শ গ্রহণে অসম্মত হইলেন। ভ্রাতৃগণেরা বৃদ্ধ রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন কি না ভাবিতে লাগিলেন। অনেকেই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু কেহ কেহ রাজার প্রতি মেহবশতঃ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। একপভাবে রাজাকে পরিত্যাগ করা কি ভাল হইয়াছিল?

বা। কখনই না—যাঁহার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন তাঁহার নিতান্ত স্বার্থপর।

শি। যে সময়ে নবদ্বীপে এই ব্যাপার ঘটে তাহার একমাস পূর্বে দিল্লীর (মানচিত্র দেখাও) বাদসাহ কুতুবুদ্দিন একদিন মক্কাপরি বসিয়া বহু পশুর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। পূর্বকালের রাজাদিগের এটি একটী প্রধান আমোদ ছিল। তাঁহার কেবল বহু পশুদিগের পরস্পর যুদ্ধ দেখিয়াই তুষ্ট হইতেন এমন নহে, বলবান মল্লগণের সহিত ঐ সকল পশুর সংগ্রাম করাইতেন—তাঁহাতে অনেক নরহত্যাও হইত। আর কোন দেশের গল্পে এইরূপ মানুষ ও পশুর যুদ্ধের কথা শুনিয়াছ?

বা। হাঁ, সে দিন ভুগোল পড়ার সময় রোমনগরের উপলক্ষে শিক্ষক মহাশয় এই কথা বলিয়াছিলেন।

শি। কুতুবুদ্দিন যুদ্ধ দেখিতেছেন, এমন সময় একটা বিকৃতাকার পুরুষ সেইখানে প্রবেশ করিল। তাহার হস্ত বানরের হস্তের স্থায় দীর্ঘ, আকার খর্ব এবং গাত্র সমুদয় বড় বড় লোমে আবৃত। আচ্ছা, বল দেখি, ঐ ব্যক্তিও মুসলমান—মুসলমানেরা গায়ে জামা পরে। তবে ঐ ব্যক্তির গায়ের বড় বড় লোম কিরূপে দেখা গেল?

বা। যাহারা কুস্তি করিতে যায় তাহার গায় জামা পরে না। তাহার কেবল কাচা পরে।

শি। সেই খর্বাকার ব্যক্তি রঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটা প্রকাণ্ড হস্তীর সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলে, দর্শক মাঝেই চমৎকৃত হইয়া থাকিল। কাহারও মুখে কথা নাই। ঐ ব্যক্তি হস্তীর সহিত ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়া পরে তাহার গুণ্ডে এসনি দাবণ প্রহার করিল যে হস্তীটি চীৎকার করিতে করিতে দূরে পলায়ন করিল।

বা। গায় ত খুব জোর।

শি। তখন বাদসাহ তাব প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অনেক পুরস্কার প্রদান করিলেন। এই ব্যক্তির নাম বক্তিয়ার খিলিজি (বোর্ডে লিখন। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে বক্তিয়ার বেহার জয় করিয়াছিলেন। এইবারে ইনি বঙ্গদেশ জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে আসিতে হইলে কোন্ কোন্ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়? কোন দেশে সৈন্য লইয়া যাইতে হইলে, সাধারণতঃ সেই দেশে যে নদী গিয়াছে তাহারই তীরে তীরে যাইতে হয়।

বা। তবে দিল্লী হইতে যমুনা নদীর ধার দিয়া আসিলে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত আসা যায় (মানচিত্রে দেখাইয়া)। তারপর গঙ্গার পাশে পাশে যাইয়া কাশী ও বেহার পার হইলেই বঙ্গদেশে উপস্থিত হওয়া যায়।

শি। হাঁ, বক্তিয়ার খিলিজি প্রাচ্য ঠিক ঐ পথ দিয়াই আসিয়াছিলেন। তাহারই আগমনের কথা শুনিয়া নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ পলায়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বক্তিয়ার কেবল গঙ্গার পার ধরিয়া আসিতে থাকিলে কোথায় গিয়া পড়িতেন?

বা। সমুদ্রে।

শি। তবে কোন্‌খান হইতে তিনি নবদ্বীপের পথ ধরিয়া লইলেন? নবদ্বীপ কোন্ নদীর উপর?

বা। নবদ্বীপ ভাগীরথীর উপর—ভাগীরথী গঙ্গার এইখান থেকে বাহির হইয়াছে। এই স্থানকে ছাপঘাটীর মোহানা বলে—মুর্শিদাবাদ জেলার একটা গ্রাম (মানচিত্রে দেখাইয়া)।

শি। ঐ সকল স্থান নদীর ধোয়াট মাটির পরিপূর্ণ। অনেকস্থল কেবল বালুকাময়। এইজন্যই নদীর মুখ সকল সময় ঠিক থাকে না। যেখানে বর্ষাকালে গঙ্গার বেগ অধিক লাগে সেই স্থানেই ভাগীরথীর মোহনা হয়। বক্তিয়ার এই মোহানা হইতে ভাগীরথীর তীরে তীরে আসিয়া নবদ্বীপের নিকট উপস্থিত হইলেন। সৈন্য সামন্ত দূরে রাখিয়া কেবল সপ্তদশ জন অশ্বারোহণে নগরে প্রবেশ করিলেন। নগররক্ষী কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন, আমরা বেহার-জেতা যবন রাজার দূত।

বা । নগররক্ষীরা তাহাদিগকে কেন মারিল না ?

শি । দূতকে মারিতে নাই—সকল বাজারই এই নিয়ম । এইরূপ বধনা করিয়া মুসলমান সেনাপতি রাজবাড়ীর দ্বারে উপনীত হইলেন এবং অসতর্ক রক্ষিবর্গকে হনন করিতে লাগিলেন । রাজা আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়া রাজবাড়ীর পশ্চাত্তের দরজা দিয়া ভাগীরথীর তীরে পলায়ন করিলেন ও একখানি নৌকামোড়ে জগন্নাথ চলিয়া গেলেন । শাস্ত্রে লেখা আছে বঙ্গদেশে যবনের অধিকার হইবে, আর যবনও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৃথা ।—ইহাই মনে করিয়া নগরবাসী এবং রাজমৈত্র্য সামন্তও নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন । এইরূপে বঙ্গদেশ মুসলমানের হস্তগত হইল ।





ষষ্ঠ প্রকরণ—বিজ্ঞান বিষয়ক ।

১। পদার্থ পরিচয় ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ।— পদার্থ বিশেষের গুণাগুণের পরিচয় করাকে পদার্থ পরিচয় বলে । পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা কাচখণ্ডের স্বচ্ছত্ব, কঠিনত্ব, ভঙ্গুরত্ব প্রভৃতি নির্ধারণ করিলেই কাচ রূপ বস্তুর গুণাগুণের পরিচয় হয় । বালকেরা পুস্তকে যে সকল বিবরণ পাঠ করিয়া থাকে, তাহা পণ্ডিত-গণের পর্যবেক্ষণের ফল । যাহাতে বালকগণ নিজের পর্যবেক্ষণের দ্বারা, সেই সেই ফল সেই সেই পদার্থ হইতেই, অত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে লাভ করিতে পারে, পদার্থ পরিচয় শিক্ষার ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য ।

পদার্থ পরিচয় শিক্ষায় বালককে পর্যবেক্ষণ করিবার প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে ; আর তাহার সেই পর্যবেক্ষণী শক্তিকে বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে । এই পর্যবেক্ষণশক্তির উদ্যোগ ব্যতীত পদার্থ পরিচয় শিক্ষায় আরও কয়েকটা বিশেষ ফল লাভ হয় । (১) নিজের হস্ত ও চক্ষুর সাহায্যে নানা বস্তু পরীক্ষা করিতে শিখিয়া বালকেরা বিশেষ আনন্দ লাভ করে । (২) বালকগণ পুস্তকাদির সাহায্য ব্যতীত নানা প্রাকৃতিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় । (৩) জীব জন্তুর গুণাগুণ বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে । (৪) কর্মোদ্ভির ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমূহের সমবায় উন্নতি সাধিত হয় । (৫) বালকগণ যে নিজ শক্তি নিয়োগেও

অনেক কার্য সম্পন্ন করিতে পারে, ইহা বুঝিতে পারিয়া আত্মশক্তিতে নির্ভর করিতে শিক্ষা করে ।

পদার্থ পরিচয় শিক্ষার বিষয় ।—গরু, ঘোড়া, বিড়াল, কুকুর, প্রভৃতি পশু ; মোরগ, হাঁস, পায়রা, কাক, প্রভৃতি পাখী ; মশা, মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি ফডিং ; পিপীলিকা, উই, মাকড়সা, প্রভৃতি কীট ; সাপ, বেঙ, মাছ, ; সীম, মটর, আলু, আম, বাঁশ, তাল প্রভৃতি উদ্ভিদ ; সোণা, রূপা, পিত্তল, লোহা প্রভৃতি ধাতু ও ক্ষিতি, আপু, তেজ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি সাধারণ বিষয়ই পদার্থ পরিচয় শিক্ষার বিষয় । তবে এ সম্বন্ধে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ শিক্ষকগণের সাহায্যার্থে সমুচিত বিষয় নির্দেশ ও উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন ।

যখন বালকগণ বিদ্যালয়ের নিয়মিত কাজ করিতে করিতে বিরক্ত বোধ করে, তখন শিক্ষকগণ পদার্থ পরিচয়ের শিক্ষা দ্বারা তাহাদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন । পদার্থ পরিচয় পাঠ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয় নহে, আর বার্ষিক পরীক্ষায়ও এ বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হয় না । বালককে আনন্দ দান করাই এ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, জ্ঞানদান তাহার অন্তরালে—পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের সময় শিক্ষকের যেন এই কথা বিশেষ ভাবে মনে থাকে ।

পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের দৃষ্টান্ত ।—একটা দৃষ্টান্ত দিলেই শিক্ষকগণ শিক্ষাদানের পদ্ধতির একটা আভাস পাইবেন । মনে করুন প্রচলিত মুদ্রার আকার বিষয়ে পাঠ দান করিতে হইবে । বালকগণের হাতে একটা করিয়া পয়সা দিয়া জিজ্ঞাসা করুন :—

শি । এগুলি কি ।

ছা । এ পয়সা ।

শি । ইহার আকার কেমন, কোন্ তিনিষের মত ।

ছা । ইহার আকার গোল, থালার মত ।

শি। আর কোন্ জিনিষের মত ।

ছা। লুচির মত (চাঁদের মত ইত্যাদি) ।

শি। (একখানি কাঠের, টানের বা স্টেটের বা সেইরূপ অন্য কোন শক্ত পদার্থের ছোট টুকরা হাতে দিয়া) এ টুকরাখানির আকার কেমন ?

ছা। চৌকর মত আকার ।

শি। হাতে চাপিয়া ধর ; হাতে ব্যথা লাগে কি ?

ছা। চৌকর এই চারিটি কোণ হাতে লাগে ।

শি। পয়সাটা চাপিয়া ধর, হাতে লাগে কি ?

ছা। না, লাগে না ; পয়সা গোল, ইহার কোণ নাই ।

শি। পকেটে রাখিলে কি হাতে করিয়া নিলে ব্যথা লাগিবার সম্ভাবনা নাই । (হাতে কতকগুলি মার্বেল দিয়া) এগুলিরও ত কোণ নাই, হাতে চাপিয়া দেখ ত লাগে কি না ?

ছা। হাতে চাপিলে লাগে না । তবে পয়সা মার্বেলের মত গোল করিলেও ত হইত ?

শি। আচ্ছা, তোমাদের মার্বেলগুলি দাও । (মার্বেলগুলি এক সঙ্গে লইয়া, একটু জোরে টেবিলের উপর ফেলিয়া) এই মার্বেলগুলির দশা কি হইল ?

ছা। টেবিলের উপর দিয়া গড়াইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল ।

শি। পয়সাগুলি কি এমন করে গড়াইয়া যায় ?

ছা। না, পয়সা মার্বেলের মত গোল নয়, অমন ক'রে ছড়ায় না ।

শি। অমন ক'রে ছড়াইলে কি হইত ?

ছা। পয়সাগুলি অতি সহজেই হারাইয়া যাইত ।

শি। (পয়সার সঙ্গে কয়েকটা আধুলী হাতে দিয়া) কোন্টা পয়সা ও কোন্টা আধুলী কেমন করে বুঝিতেছ ?

ছা। পয়সাটা তামার তৈয়ারী, লাল রং—আর আধুলীটা রূপার তৈয়ারী, সাদা রং ; রং দেখিয়াই পয়সা আধুলী চিনিতে পারিতেছি ।

শি। আচ্ছা, তুমি চোখ বুঁজিয়া থাক । একজন একটা পয়সা চাহিল, কেমন করিয়া দিবে ?

ছা। (একটু চিন্তা করিয়া) তা দিতে পারি । এই আধুলীর ধার কাটা আছে, হাতে দিলেই বুঝিতে পারা যায় । পয়সার ধার তেলতেলে ।

শি। (হাতে একটা সিকি ও একটা আধ পয়সা এবং একটা আনী দিয়া) কোন্টা

সিকি, কোন্টা আধ পয়সা ও কোন্টা আনী চোথ বুজিয়া ঠিক কর ত ।

ছা। (চোথ বুজিয়া) এই পাশ কাটাটা সিকি, এই ঘেটার পাশে ঢেউতোলা সেটা

আনী, এই তেলতেলে পাশওয়াটা আধ পয়সা ।

শি। আকাবে এত রকম করা হইয়াছে কেন ?

ছা। আমরা অন্ধকারেও টাকা, পয়সা, সিকি ও আনী দিতে ভুল না করি ইত্যাদি ।

('পাঠনাব নোট' পরিচ্ছেদের ৯ম ও ১০ম নোট পাঠ করুন ।)

পদার্থ পরিচয় শিক্ষার ধারা ।—(১) বালকেরা যে সকল পদার্থ সাধারণতঃ দেখে, প্রথমতঃ সেই সকল পদার্থ বিষয়েই পদার্থ পরিচয়ের পাঠ দিতে হইবে । যে বস্তু সম্বন্ধে পাঠ দিতে হইবে, সে বস্তু সংগ্রহ করা আবশ্যিক । যদি পদার্থটি ছোট ও সহজপ্রাপ্য হয় (যেমন পাথুরে কয়লা, লোহার প্রেক, ধুতরা ফুল ইত্যাদি), তবে প্রত্যেক ছাত্রের হাতে এক একটা করিয়া পদার্থ প্রদান করিতে হইবে । যদি পদার্থ বৃহৎ হয় বা অধিক সংগ্রাহের পক্ষে অসুবিধা হয়, তবে একটা বস্তু সংগ্রহ করিয়া (যেমন গরু, টেবিল, গৃহ ইত্যাদি) তাহার চারিদিকে বালকগণকে দাঁড়া করাইয়া পাঠ দিতে হইবে । কথা এই যে, বালকগণ যেন বস্তুর সমস্ত অংশ নিজ হাতে পরীক্ষা করিতে পারে । অভাব পক্ষে কোন কোন পদার্থের ছবি বা পুতুলের সাহায্য (যেমন সিংহ, কয়লার খনি, আলোক-স্তম্ভ ইত্যাদি) পাঠ দিতে হয় বটে, কিন্তু বিশেষ আবশ্যক না হইলে এরূপ পদার্থ সম্বন্ধে পাঠ না দেওয়াই ভাল ।

(২) পদার্থপরিচয়ের পদার্থ শ্রেণীর উপযোগী হওয়া আবশ্যিক, আবার সেই পদার্থের এমন সমস্ত গুণাগুণ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যিক, যাহা বালকগণ সহজে বুঝিতে পারে । আলোচনায় কঠিন বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার না করাই ভাল ।

(৩) বালকেরা বাহ্যতে পদার্থটি পরীক্ষা করিয়া নিজেরাই তাহার

গুণাগুণ নির্ধারণ করিতে পারে, একপ ভাবে তাহাদিগকে পরিচিত করিতে হইবে ।

(৪) যে পদার্থ বিষয়ে পাঠ দেওয়া হইবে (সহজপ্রাপ্য হইলে) সেই পদার্থ সংগ্রাহের জন্য বালকগণকে উৎসাহিত করিতে হইবে । যদি বালকগণ পদার্থটির অংশ বা সমস্ত পদার্থটির অঙ্কন করিতে সমর্থ হয়, তবে অঙ্কন করান আবশ্যক । আর যদি মাটি দ্বারা তাহার প্রতিকৃতি গঠন করিতে পারে, তবে আরও ভাল ।

(৫) শিক্ষাদানের একটা শৃঙ্খলার অনুসরণ করা বিশেষ আবশ্যক । গুরু বিষয় আলোচনা করিবাব সময়, গুরু মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া লেজ পর্যন্ত বর্ণনা কর, কিংবা লেজ হইতে আরম্ভ করিয়া মাথা পর্যন্ত আলোচনা কর । কিন্তু মাথার এক কথা বলিয়া, তারপব লেজের এক কথা আলোচনা করিয়া, আবার মাথার কথা বলা বীতিবিরুদ্ধ ; এইজন্য শিক্ষককে বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে ।

(৬) ব্ল্যাক বোর্ডের উপযুক্তরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক । যে পদার্থ বিষয়ে পাঠ দিবে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি বোর্ডে আঁকিয়া দেখাইতে হইবে, আর পাঠের সংক্ষিপ্তসারও বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে (পাঠনার নোটের পরিচ্ছেদ দেখ) ।

(৭) যাহা শিখাইলে, তাহা শৃঙ্খলাক্রমে বর্ণনা করিতেও শিক্ষা দিতে হইবে । নিম্ন শ্রেণীর বালকগণ মুখে মুখে বর্ণনা করিবে, উচ্চ-শ্রেণীর বালকগণ লিখিয়া বর্ণনা করিবে । এই প্রথা রচনামাধ্যমও প্রধান সহায় ।

২। বিজ্ঞান ।

বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যকতা ।—কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি আমাদিগের জীবনধারণের প্রধান সহায় । এই কৃষি, বাণিজ্যের সম্যক

উন্নতি কেবল বিজ্ঞান আলোচনার উপর নির্ভর করে। কোন দেশ বিশেষের সভ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করিতে হইলে, সেই দেশের বিজ্ঞান আলোচনার পরিমাণ নির্দেশ করিলেই তথাকার সভ্যতার উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। বিজ্ঞানোন্নত দেশসমুদায়ই ধনে ও জ্ঞানে সমৃদ্ধিশালী হইয়া পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং বিজ্ঞানের আলোচনা যে সকল শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষা অধিকতর আবশ্যক ও ফলপ্রসূ তাহা বলা বাহুল্য।

পদার্থ পরিচয় বিজ্ঞানালোচনার আরম্ভ। আবার কিওয়ারগার্টেন পদার্থ পরিচয়ের প্রারম্ভ। তবে পদার্থ পরিচয় ও বিজ্ঞানে এই মাত্র সামান্য প্রভেদ আছে যে, পদার্থ পরিচয় অনেক পরিমাণে পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ, আর বিজ্ঞান অনেক পরিমাণে পরীক্ষণসাপেক্ষ।

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বিষয়।—উদ্ভিদবিদ্যা পড়াইতে হইলে মূল্যবান যন্ত্রাদির আবশ্যক হয় না; একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র হইলেই হইল। অভাব পক্ষে একখানা স্থূলমধ্য কাচ (মূল্য ২৩ টাকা) হইলেও কাজ চলিতে পারে। আর যখন উদ্ভিদবিদ্যার সহিত কৃষির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তখন গ্রামা বিদ্যালয়ে উদ্ভিদের আলোচনার বিশেষ ফল লাভ হইবে বলিয়া বিশ্বাস। উদ্ভিদের পরে শরীরতত্ত্ব; কিঞ্চিৎ বায়বাহুল্য বটে। তবে একবারে কতকগুলি আদর্শ কিনিয়া রাখিলে আর বিশেষ বায়ের আবশ্যক হয় না। কিন্তু পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন ব্যয়সাপেক্ষ। একবারে জিনিষ কিনিলে চলে না। আরক প্রভৃতি ফুরাইয়া যায়, আর যন্ত্রাদি সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। তবে ব্যবস্থা করিতে পারিলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন পড়ান কর্তব্য বটে। কারণ সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলে এই দুই বিজ্ঞান নিহিত আছে। শিক্ষকগণের পক্ষে এই চারিটি বিজ্ঞানের আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক; সুতরাং ট্রেনিং স্কুলে এই চারিটি বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া কর্তব্য।

পরীক্ষণ বিষয়ে সাধারণ উপদেশ।—(১) কোন পরীক্ষণ প্রদর্শন করিবার পূর্বে নিজে সেই পরীক্ষণের পরীক্ষণ করা কর্তব্য। অপ্রস্তুতভাবে শ্রেণীতে আসিয়া কোন পরীক্ষণের চেষ্টা করিও না।

(২) পরীক্ষণের জন্য যে সকল দ্রব্যাদির আবশ্যক হইবে, তাহা

পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিবে । পরীক্ষণের সময় দ্রব্যাদির জন্ত দৌড়াদৌড়ি করা বড়ই কদর্য্য ।

(৩) যে সময় কোন দ্রব্য উত্তপ্ত বা শীতল করিতে হয়, সে সময় বালকগণ (বিনা কাজে না বসিয়া থাকিয়া) নিজ নিজ খাতায় সেই পরীক্ষণের যন্ত্রাদির প্রতিকৃতি অঙ্কন করিবে ।

(৪) আবশ্যক বিবেচনায় শিক্ষক ব্লাক বোর্ডে সমস্ত যন্ত্রের বা তাহার অংশের ছবি আঁকিয়া দিবেন । বালকেরা তাহা নকল করিয়া লইবে ।

(৫) ব্যবস্থা থাকিলে বালকগণের দ্বারাও পরীক্ষণ করান কর্তব্য । নিজের হাতে পরীক্ষণ করিলে উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায় ও বিশেষরূপ মনে থাকে ।

(৬) পরীক্ষণের প্রত্যেক কার্য্য শান্তভাবে ও ধীরে ধীরে দেখাইবে । তাড়াতাড়ি করিলে বালকেরা পরীক্ষণের বিষয় ভাল করিয়া অনুধাবন করিতে পারিবে না ।

(৭) পরীক্ষণের কি ফল লাভ হইবে, তাহা পূর্বে বলিয়া দিও না । বালকের সম্মুখে পরীক্ষণের কার্য্য করিয়া যাও ও বালকগণকে সেই কার্য্য ও তাহার ফল পর্য্যবেক্ষণ করিতে বল । পূর্বে বলিয়া দিলে ঔৎসুক্য নষ্ট হইয়া যায় ।

বায়ুর উর্দ্ধচাপ পরীক্ষণ করিবার পূর্বে যে শিক্ষক “বায়ুর উর্দ্ধ চাপ পরীক্ষণ করিতেছি” বলিয়া আরম্ভ করেন, তিনি বালকগণের তেমন মন আকর্ষণ করিতে পারেন না । কিন্তু যে শিক্ষক কিছু না বলিয়া, এক গেলাস ভল লইয়া তাহার মুখে একখানা শক্ত কাগজ দিয়া গেলাস্ উল্টাইয়া দেখাইলেন যে জল পড়িল না, তিনিই বালকগণের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইলেন । কারণ এই পরীক্ষণে ‘জল কেন পড়িল না’ তাই জানিবার জন্ত ষাণ্ড হইয়া বালকেরা নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিতে থাকিবে ।

(৮) এক বিষয় সম্বন্ধে অনেক রকমের পরীক্ষণ দেখান ভাল নয় । আবার নিজের বাহ্যিক দৃষ্টি দেখাইবার জন্ত শক্ত শক্ত পরীক্ষণও দেখান

উচিত নয়। পরীক্ষণ যেমন সংখ্যায় কম হওয়া উচিত, তেমন সরল হওয়াও আবশ্যিক।

(৯) অনেক সময় বালকেরা পরীক্ষণের বিষয় ও পরীক্ষিত সত্য পৃথক করিয়া লইতে পারে না। পূর্বোল্লিখিত পরীক্ষণের পর পরীক্ষিত সত্য সম্বন্ধে বালকগণকে প্রশ্ন করিলে, হয় ত কেহ কেহ উত্তর করিবে “গেলাসের মুখে কাগজ আঁটিয়া দিলে জল পড়িবে না।” এইজন্য পরীক্ষিত সত্য (বায়ু উর্দ্ধদিকেও চাপ প্রদান করে) বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া আবশ্যিক।

পরীক্ষণের যন্ত্রাদি —মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বা পদার্থপরিচয়ের যে পাঠ্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা শিখাইবার জন্য প্রায়ই মূল্যবান যন্ত্রাদির আবশ্যিকতা হয় না। কতকগুলি সাধারণ শিশি বোতল কিনিয়া রাখিলেই হইল। পরীক্ষণের সামান্য সামান্য যন্ত্রাদি শিক্ষক নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়া লইবেন। এইরূপ যন্ত্র আকারে একারে একটু বিকী হইলেও কোন ক্ষতি নাই। শিক্ষককে নিজ হাতে যন্ত্র প্রস্তুত করিতে দেখিলে বালকেরা উৎসাহের সহিত নানারূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিবে। বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ইহাই একটা প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেক শিক্ষক একথা একেবারেই ভুলিয়া যান। বাজার হইতে যন্ত্র ও আয়ক কিনিয়া আনিয়া শিক্ষক পরীক্ষণ দেখাইলেন, আর বালকেরা বিজ্ঞানের পুস্তক মুখস্থ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন—এরূপ বিজ্ঞান শিক্ষায় কখনই বাঞ্ছিত ফল লাভ হইতে পারে না।





সপ্তম প্রকরণ—শিল্প বিষয়ক ।

১। চিত্রাঙ্কন ।

আবশ্যকতা ।—স্থল কার্যে চক্ষুর ও হস্তের যে কার্যকারিতা শক্তির আবশ্যক হয়, চিত্রাঙ্কনে তাহার যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করিতে পারা যায় । শিল্প ব্যবসায়ীদিগের এ বিজ্ঞা বিশেষ প্রয়োজনীয় । বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার, চিত্রবিজ্ঞার যথেষ্ট আবশ্যকতা হইয়া থাকে । যন্ত্রাদির আভ্যন্তরিক অবস্থা, জীবদেহের ব্যবচ্ছেদ, গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি স্থিতি, স্তরের ভূগর্ভস্থ বিস্তার প্রভৃতি অনেক সময় চিত্র দৃষ্টেই বুঝিয়া লইতে হয় । বহু বর্ণনা করিয়াও যে বিষয় প্রকাশ করা কঠিন, এরূপ অনেক বিষয়ও চিত্রের সাহায্যে অতি সহজে প্রকাশ করা যায় । এ সকল ছাড়া চিত্রবিজ্ঞার একটা মোহিনী শক্তি আছে । সঙ্গীতের মত ইহাতে মানুষের মন প্রফুল্ল রাখিতে পারে । চিত্রবিজ্ঞায় সৌন্দর্য ও সমতার জ্ঞান বিকাশ করিয়া দেয় । বিশেষ চিত্রাঙ্কন না জানিলে শিক্ষকতা কার্য চালাইতে কঠিন হইয়া পড়ে ; কারণ শিক্ষককে বালকের পরিচিত, অপরিচিত নানা পদার্থের চিত্র আঁকিয়া অনেক বিষয় বুঝাইতে হয় ।

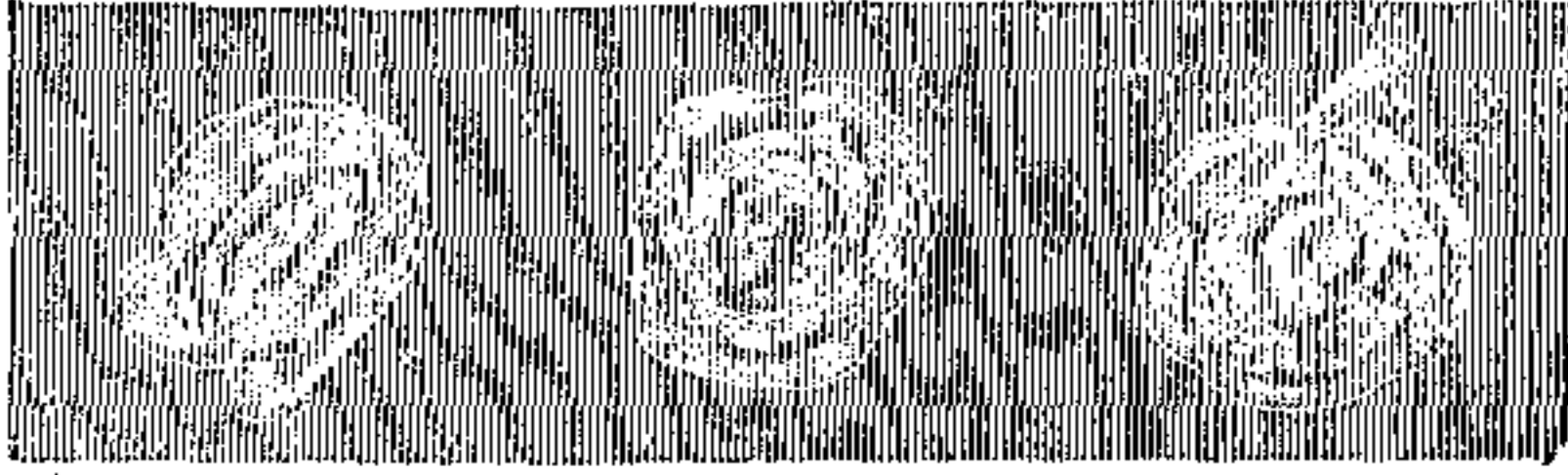
বিভাগ ।—একটা ছবি দেখিয়া তদ্রূপ বা তাহার অপেক্ষা বড় কি ছোট চিত্র অঙ্কনকে ‘চিত্রালিপি’ কহে । একটা দ্রব্য দেখিয়া তদ্রূপ কি তাহা অপেক্ষা বড় কি

ছোট চিত্রাঙ্কনকে 'দ্রব্যালুপিত্রি' কহে । আবার আঁকিবার প্রথাও দুই রকম—এক প্রকার যন্ত্রাদির (স্কেল, কম্পাস প্রভৃতি) সাহায্যে (যান্ত্রিক অঙ্কন) অপরূপ যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত (অযান্ত্রিক অঙ্কন বা মুক্ত পানী অঙ্কন) । বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ যে সকল চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা প্রধানতঃ যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকেই অঙ্কন করিতে হয় ।

শিক্ষার আরম্ভ ।—কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি বর্ণনা কালে, শিশু-শ্রেণীতে যেরূপ ভাবে অঙ্কন শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা (২২৪ পৃঃ) একরূপ বলা হইয়াছে । সেইরূপ আরম্ভ করাই সুবিধাজনক ।

বালকেরা অঙ্কন খুব পছন্দ করে, কিন্তু ধৈর্যের সহিত লাইন শিক্ষার কষ্ট সহ্য করিতে চায় না । যেমন গান শিখিতে গেলে শিক্ষার্থী সা খা গা মা সাধন করিবার কষ্ট সহ্য করিতে চায় না, একেবারেই গান শিখিতে চায়, অঙ্কন সম্বন্ধেও তদ্রূপ । এটি স্বাভাবিক ভাব । সুতরাং এই ভাবের সহিত যোগ রাখিয়া বালকগণকে সহজ সহজ দ্রব্যাদির অঙ্কন শিখাইতে আরম্ভ করা কর্তব্য । কিণ্ডারগার্টেন প্রকরণের কাঠি সাজান প্রবন্ধে (১৯৫ পৃঃ) এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে । প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে লেপনাঙ্কন (Mass drawing) সহজ ও সুখকর । এই লেপনাঙ্কনে নরম কয়লা (কাঠকয়লা) নরম চা খড়ি বা ক্রেয়ন নামক রঙ্গিন চক্ আবশ্যক । ইহার যে কোন পদার্থের দ্বারা তক্তা, সেট বা খসুখসে কাগজে (দোকানদারেরা যে প্রকার ছাই রঙের অথবা কটারঙের কাগজে পুস্তকাদি প্যাকিং করিয়া ডাকে পাঠায়) ঘসিয়া ঘসিয়া সরল দ্রব্যের চিত্রাঙ্কন করিতে হয় । এইরূপ চিত্রাঙ্কনের সময় দ্রব্যটির বাহিরদিক হইতে আঁকিতে নাই অর্থাৎ প্রথমে চকের বা কয়লার দাগ দিয়া দ্রব্যটির চৌহদ্দি আঁকিয়া লইতে নাই । মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া বাম হইতে ডাহিনে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চক্ ঘসিতে ঘসিতে বাহিরের দিকে আসিবে ও যতদূর ঘসিলে দ্রব্যটির মোটামুটি আকার হইবে, ততদূর পর্যন্ত চক্ ঘসিবে । মনে কর একটা বাতাবী লেবুর চিত্র আঁকিবে । তুমি বোর্ডের

উপর আরম্ভ কর । ছেলেরা সেটে বা কাগজে আরম্ভ করুক । যে রূপ ভাবে চক ঘসিয়া দ্রব্যটির আকার করিয়া আনিতে হইবে, তুমি তাহা বোর্ডে দেখাও । যথা—



প্রথম অবস্থা

মধ্য অবস্থা

পূর্ণ অবস্থা

যে ভাবে চক ঘসিতে হইবে চিত্র দেখিলেই তাহার আভাস পাইবে । বালকেরা তোমার অনুকরণে চিত্র আঁকিবে । এক কথা মনে রাখিবে— এই সকল চিত্র বড় বড় করিয়া আঁকিতে হইবে ।

এইরূপ চক দিয়া (রঙ্গিন হইলেই ভাল হয়) সহজ পাতা সহ ছোট ডাল, ছোট ফল বা ফুল সহ ডাল আঁকা যাইতে পারে । সকল চিত্রই জিনিষ দেখিয়া আঁকিতে হয়—চিত্র দেখিয়া নহে । এইরূপে চকের দ্বারা নানারূপ সরল দ্রব্যের ছবি আঁকিতে আঁকিতে চিত্রাঙ্কনে হাত ঠিক হইয়া যাইবে ও এবিষয়ে একটা অনুরাগ ও জন্মিবে । চকের দ্বারা যে সকল ফল ফুল ও দ্রব্যাদির চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া সহজ তাহার একটা ক্ষুদ্র ফর্দি প্রদত্ত হইল :—

(১) কমলালেবু, বেল, বাতাবীলেবু, আলু, পেয়ারা, আম, কলা, গোল বিস্কুট ।

(২) নিশান (চৌকো ও তিন কোণা), যুড়ি (নানা রঙের ও নানা আকারের), তাম, পাখা ।

(৩) পান, বট, কাঁটাল, আখ, কচু, কাঞ্চন, কুমড়া প্রভৃতি পাতা ।

(৪) বেগুন, পেঁপে, নারিকেল, তরমুজ, আনারস (আন্ত ও অর্ধেক কাটা) ।

(৫) একটা ফল ও চার পাঁচটা পাতা সহ ফুলের ডাল, ঐ প্রকার লক্ষার ডাল, ঐ প্রকার মটর স্টীর লতা, ধানগাছ ইত্যাদি ।

পেন্সিলে কাঠাম অঙ্কন (outline) শিক্ষাদানের সূচনা ।—নানা আকৃতির কতকগুলি গাছের পাতা সংগ্রহ কর। পুরাতন খবরের কাগজের ভাঁজে ভাঁজে পাতাগুলি রাখিয়া, কোনও ভাষি জিনিষ দিয়া চাপ দিয়া রাখ। পাঁচ সাত দিনেই পাতাগুলি চাপে সমান হইয়া যাইবে। এইরূপ এক একটি পাতা বালকদিগকে দাও। তাহার পাতাটী স্কেটের উপর রাখিয়া, তাহার চারি পার্শ্বে পেন্সিল দিয়া দাগ কাটিবে। পাতা উঠাইয়া নিলেই স্কেটে পাতার ছবি দেখিতে পাইবে। এইরূপে কিছুদিন অভ্যাসের পর, পাতা দেখিয়া পাতা আঁকিতে শিক্ষা দিবে। স্কেটে পাতা আঁকার একটু অভ্যাস হইলে, পেন্সিল দিয়া কাগজে ঐ পাতার ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিবে। পেন্সিল দিয়া চিত্রাঙ্কনের এই আরম্ভ। এইরূপে খুব সহজ ফুলের (যেমন রঙ্গুন, চামেলী, যুঁই ইত্যাদি) মাথার অংশ (কেবল পাপড়িগুলি) আঁকিতে অভ্যাস করাইবে। এইরূপে অভ্যাস করিতে করিতে বালকগণ শ্রেণীর নির্দিষ্ট চিত্র অঙ্কন করিতে সক্ষম হইবে।

কাগজ, পেন্সিল ও রবার ।—চিত্রাঙ্কনের কাগজ পুরা ও খম্বসে রকমের হওয়া আবশ্যিক। পাতলা ও তেলতেলে কাগজে চিত্রাঙ্কন ভাল হয় না। যে পেন্সিলের উপর H বা BH লেখা থাকে (ইহাকে ড্রইং পেন্সিল বলে), অঙ্কনের পক্ষে তাহাই সুবিধাজনক।

সাধারণ নরম পেন্সিলে আঁকিতে গেলে কাগজ ময়লা হইবে ও দাগগুলি মোটা হইবে। ড্রইং পেন্সিলের অগ্রভাগ ছুরি দ্বারা বেশ সরু করিয়া লইবে। ভেঁতা হইয়া গেলে আবার সরু করিয়া লইতে হইবে। এইজন্য একখানা ছুরি থাকাও দরকার। একখানা রবার থাকা আবশ্যিক, কিন্তু বালকেরা মাহাতে রবারের যথেষ্ট ব্যবহার না করে সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যাহাতে তাহারা প্রথম অঙ্কনের সময় পেন্সিল দিয়া খুব জোরে দাগ না কাটে, সে বিষয়ে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সার্বধান করিতে হইবে। চিত্রের কাঠাম করিয়া লইবার সময় এত পাতলা করিয়া দাগ দিতে হইবে যে, রবারের দ্বারা এক

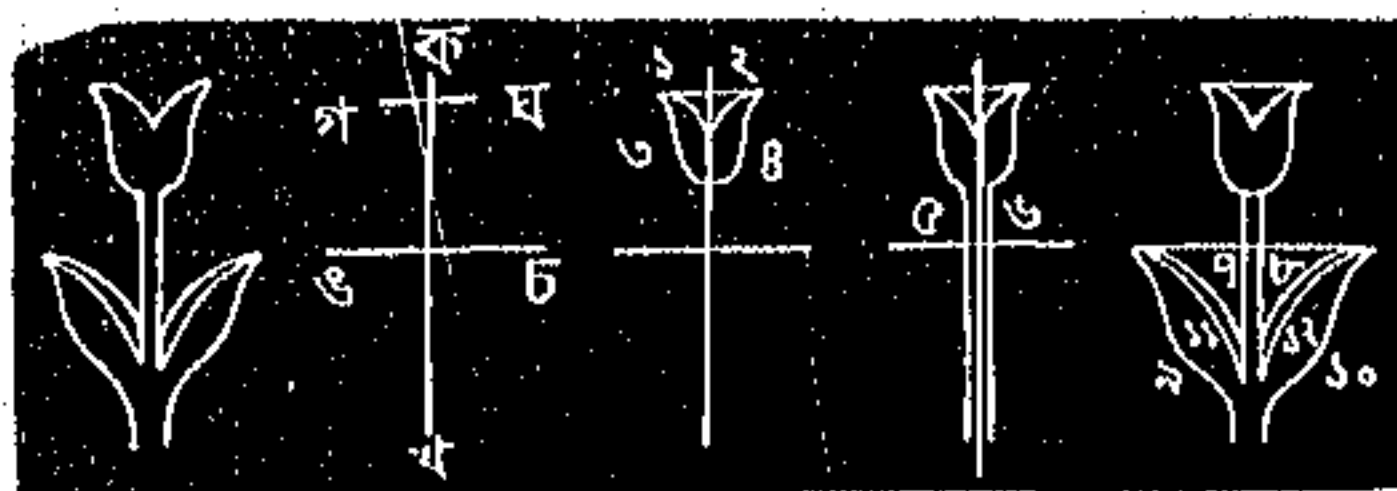
টান দিলেই যেন সে দাগ উঠিয়া যায় । চিত্র শেষ হইলে আবশ্যক দাগের উপর দিয়া, একটু জোরে পেন্সিল চালাইয়া সে দাগটী পরিষ্কৃত করিবে ও অন্ত দাগগুলি রবার দিয়া তুলিয়া ফেলিবে । অনেক বালক রবারের ব্যবহারও জানেন না । রবারের দ্বারা দাগ তুলিতে হইলে এদিক ওদিক করিয়া ঘসিতে নাই । বাম হইতে ডাইনদিকে বা উপর হইতে নীচে অর্থাৎ একদিক হইতে রবার ঘসিতে থাকিবে । দুইদিক ঘসিলে কাগজ ছিড়িয়া যাইতে পারে বা কাগজের মসৃণতা নষ্ট হইতে পারে । কেহ কেহ বলেন যে, প্রথমে বালকের হাতে রবার না দেওয়াই ভাল, কারণ রবার হাতে আছে এই ভরসায়, সে অসাবধানে যেমন তেমন করিয়া রেখা টানিতে থাকিবে ; রবার না দিলে সাবধান হইতে অভ্যাস করিবে । একথা মন্দ নয় ।

চিত্রানুলিপি ।—পাঠ্য পুস্তকে বা পরীক্ষার প্রশ্নে যে সকল চিত্র থাকে, তাহার অধিকাংশই সমপার্শ্ব চিত্র । বালকেরা এইগুলি অঙ্কন করাই একটু কঠিন মনে করে । এ সকল চিত্রাঙ্কনে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

যে চিত্রের অনুকরণ করিতে হইবে, তাহাকে একটী কাল্পনিক লম্বরেখা টানিয়া সমান দুই ভাগে বিভক্ত কর । তোমার কাগজে একটা লম্বালম্বি রেখা টানিয়া, মনে করিয়া লও যেন সেইটাই তোমার ঐ কাল্পনিক রেখার নকল । এখন এই রেখার বাম পার্শ্বে যেক্রপ রেখাদি আছে, তাহা উপর হইতে আঁকিতে আরম্ভ কর । প্রথমে বামদিকের এক অংশ আঁকিয়া, তদ্রূপ ডাইনে নকল কর । আবার বামদিকের অন্ত এক অংশ আঁক, আর তদ্রূপ ডাইনে নকল কর । এইরূপ করিয়া ক্রমে নীচের দিকে নামিতে থাক । নিম্নের চিত্রে ১, ২, ৩ প্রভৃতি চিত্রের দ্বারা কোন্ রেখা প্রথমে ও কোন্টী পরে আঁকিতে হইবে, তাহার একটু আভাস দেওয়া হইল ।

একেবারে সমস্ত রেখা না আঁকিয়া, সময় সময় বিন্দুর দ্বারা মোটামুটি সমস্ত চিত্রটী অঙ্কিত করিয়া লইলেও সুবিধা হয় । লম্বালম্বি একটা রেখা ছাড়া পাশাপাশি আরও কতকগুলি রেখা টানা আবশ্যক হইতে পারে । কি কি রূপ রেখা টানিলে অঙ্কনের সুবিধা হইবে, তাহার আদর্শ অনেক চিত্র

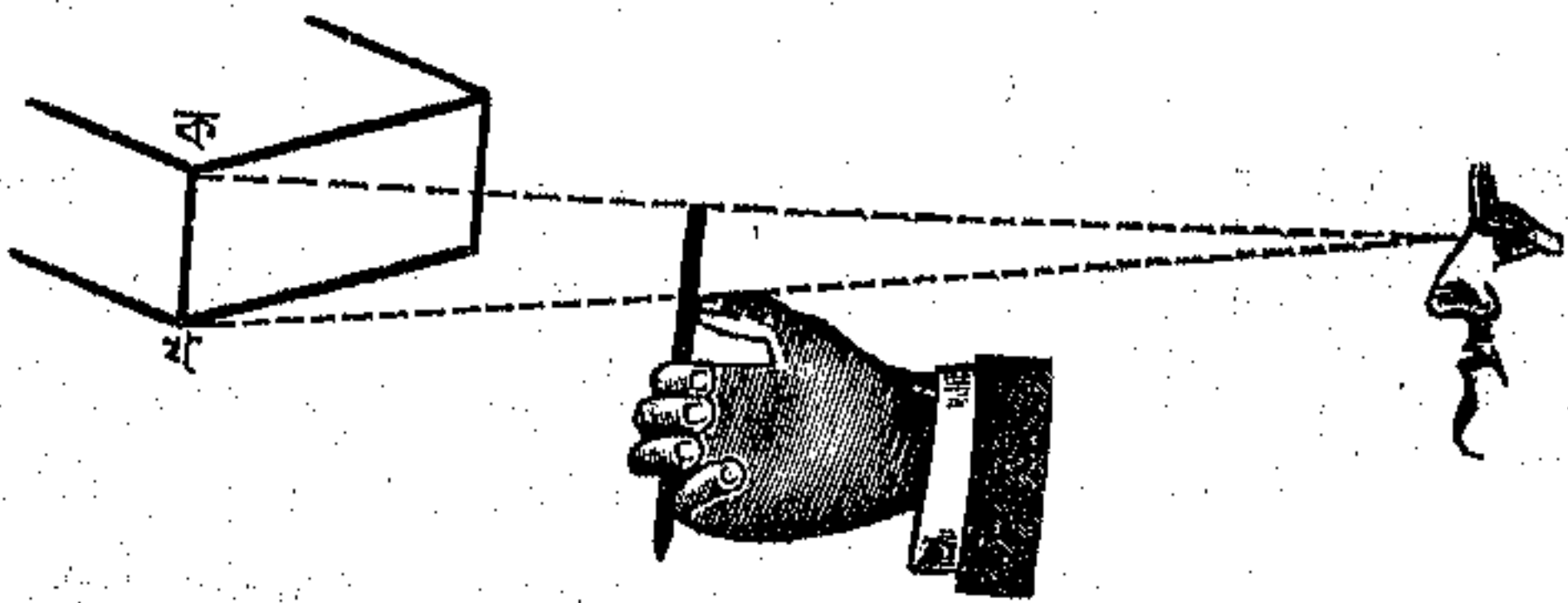
পুস্তকে প্রদত্ত হইয়া থাকে। চিত্র শেষ হইলে অবশ্য এ রেখাগুলি রবারের দ্বারা পুঁছিয়া ফেলিতে হইবে। বক্র রেখাগুলি একটানে আঁকিবে; একটু একটু করিয়া আঁকিতে গেলে বক্রত্বের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে। খুব অভ্যাস না করিলে উত্তম চিত্রকর হওয়া যায় না। পরীক্ষার দুই মাস পূর্বে ইতিহাস, ভূগোল মুখস্থ করিয়া সেই বিষয়ে পাস করা যায়, কিন্তু সমস্ত বৎসর অভ্যাস না করিলে চিত্রাঙ্কনে পাস করা যায় না।



৮৩ চিত্র—সমপার্শ্ব চিত্রাঙ্কন।

দ্রব্যানুলিপি।—দ্রব্যানুলিপি শিক্ষা দিবার পূর্বে, দ্রব্যানুলিপি বিষয়ক চিত্র দৃষ্টে বালকগণকে চিত্রানুলিপি করাইতে হইবে। গোলা, বাটী, ঘটী, ঢোল, বোতল, গেলাস, ছক, বাক্স, টেবিল প্রভৃতি দ্রব্যের চিত্র নকল করাইতে হইবে। ইহাতে তাহারা বিষয়ের একটা ভাব পাইবে। আমরা নিকটস্থ ও দূরস্থ দ্রব্যাদি কিরূপ দেখি তাহা বুঝাইতে হইবে। যদি নিকটে রেলের পথ, কি অনেক দূর বিস্তৃত সড়ক পথ, কি লম্বা ঘর বা বারান্দা থাকে, তবে বালকগণকে সেইরূপ কোনও স্থানে লইয়া যাইবে। দেখাও যে, রেলের রাস্তা যতই দূরে গিয়াছে, ততই যেন দুই রেলের মধ্যে ফাঁক গিশিয়া গিয়াছে; আর শেষে যেন আকাশ ও মাটি যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেইখানে গিয়া মিলাইয়া গিয়াছে। আর এক কথা—রেলের রাস্তা যতই দূরে গিয়াছে, ততই যেন উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। আর টেলিগ্রাফের থামগুলি সব সমান হইলেও যেন দূরের থামগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া নীচু হইয়া পড়িয়াছে। যদি বালক এই শেষ

বিষয়টী বুদ্ধিতে না পারে, তবে এক কাজ কর । আগে তাহাকে আয়ত ক্ষেত্রাকার জর্রাদির বাহুর সহিত পেন্সিল মিল করাইতে শিখাও । বালকের হাতে পেন্সিল বা একখানি সরল কাঠি দাও । তাহাকে সেই কাঠিখানা ভূসমান্তর ভাবে ধরিয়া, বোর্ডের ধারের সহিত, টেবিলের ধারের সহিত, ডেস্কের ধারের সহিত মিল করিতে বল । তুমি নিজেও একটা পেন্সিল বা কাঠি লইয়া মিল করিবার প্রণালী দেখাইয়া দাও । এই সময় হইতেই এক বিষয়ে সাবধান করা কর্তব্য—বালকগণ মাপ লইবার সময় যখন পেন্সিল বা কাঠি ধরিবে, তখন বাহু যেন সহজ ভাবে বেশ টান করিয়া রাখে । বাহু ভাঙ্গিয়া পেন্সিল ধরিয়া মাপ লইলে, প্রথমবার যেক্রপ মাপ পাওয়া যাইবে, দ্বিতীয় বারে তাহা নাও হইতে পারে ; কারণ পূর্বে বাহু যে পরিমাণ বক্র ছিল, তাহা ত দ্বিতীয়বার ঠিক থাকিবার কথা নহে । এইজন্ত সকল সময় বাহু টান করিয়া মাপ লওয়াই কর্তব্য । পেন্সিলকে আবশ্যক মত লম্বভাবে বা ভূসমান্তরভাবে ধরিতে হইবে । কিন্তু একথা যেন মনে থাকে যে, কোন সময়েই পেন্সিলকে তেড়া করিয়া ধরিয়া কোনও তেড়া রেখার সহিত মিল করিতে হইবে না । মাপ লইবার



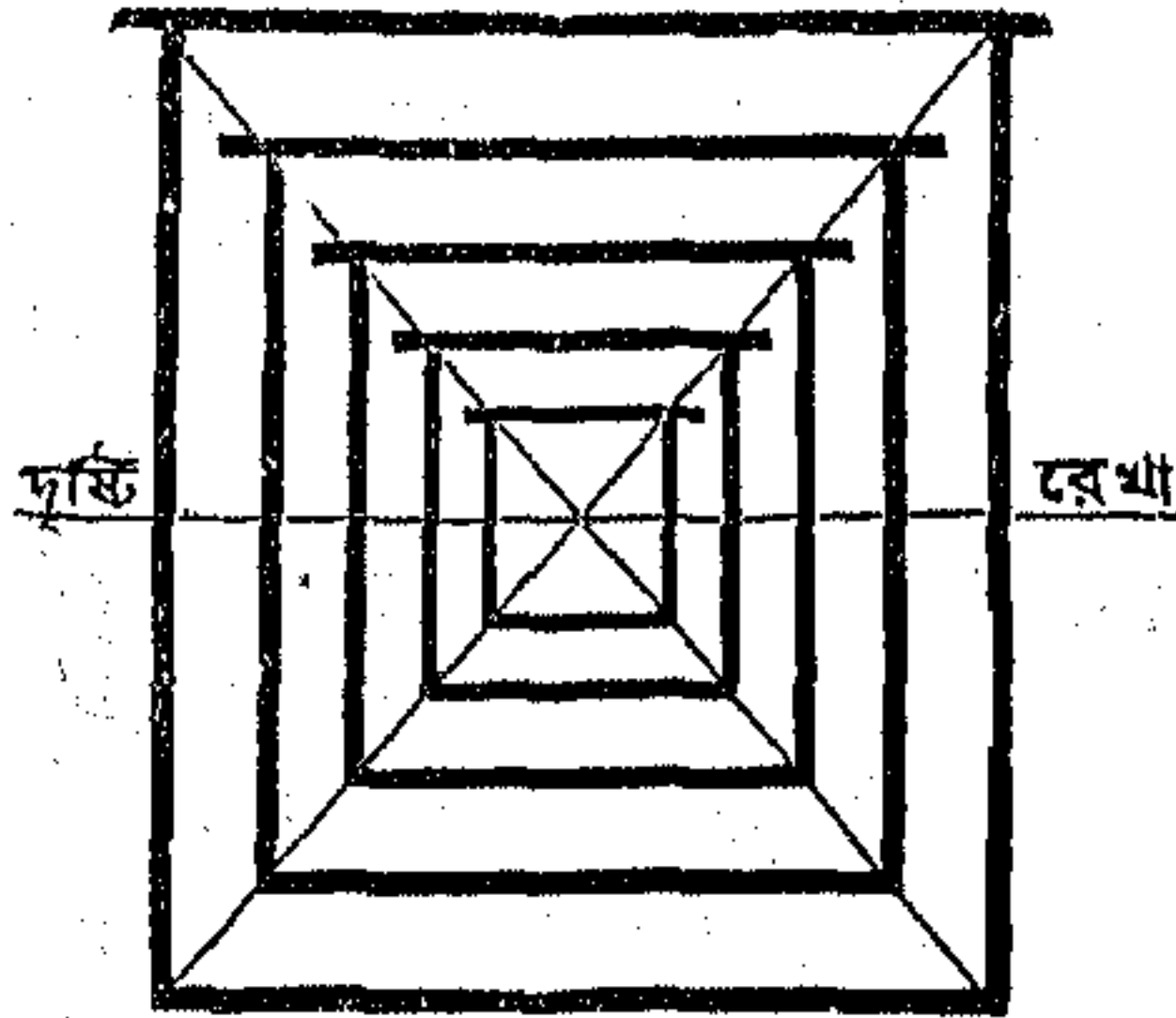
৮৪ চিত্র—পেন্সিল দিয়া মাপ লওয়া ।

সময় হয় ভূরেখার উপরে কোনও লম্বের মাপ লইবে বা ভূরেখার সমান্তর কোনও ব্যবধানের মাপ লইবে । পেন্সিল সকল অবস্থাতেই বাহুর সহিত

সমকোণে অবস্থিত থাকিবে। বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা সরাইয়া সরাইয়া উঁচু নীচু করিতে হইবে। একটুকু মুদ্রিত করিলেই মাপ লইবার সুবিধা হয়। যেক্রমে পেন্সিল ধরিতে হইবে, তাহা উপরের চিত্র দৃষ্টে কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

এইক্রমে পেন্সিল বা কাঠির দ্বারা দ্রবোর লাইনের সহিত পেন্সিল মিল করিয়া ধরিতে শিখিলে বালকগণকে একটা খুব লম্বা ঘর বা বারান্দায় দাঁড় করাইবে। সেই ঘর বা বারান্দার মেজেতে কতকগুলি লম্বা লম্বা কাঠি, আড়াআড়ি ভাবে সাজাইয়া রাখ। এখন বালকগণকে সেই ঘর বা বারান্দার এক প্রান্তে দাঁড়া করাইয়া, সেই লম্বা কাঠিগুলির সহিত পেন্সিল (ভূমাস্তুরভাবে ধরিয়া) মিল করিতে বল। প্রথমে যে কাঠি নিকটে, তাহার সহিত পেন্সিল মিল করিতে বল। তারপর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমে মিল করিতে থাকুক। বালকগণকে বুঝাইয়া দাও যে কাঠি যতই দূরে যাইতেছে, পেন্সিল ততই উচ্চ করিয়া মিল করিতে হইতেছে। আবার এইক্রমে ছাদের বিমের (কড়িকাঠ) সঙ্গে পেন্সিল মিল করাও। এবারে তাহার বুঝিতে পারিবে যে যতই দূরের বিমের সহিত পেন্সিল মিল করিতে হইতেছে, ততই পেন্সিলটী নীচের দিকে নামাইতে হইতেছে। যদি কোন গৃহ বা বারান্দায় গিয়া একরূপ পরীক্ষার সুবিধা না থাকে, তবে আর এক উপায় বলিয়া দিতে পারি। একটু পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। একটা মাঠের মধ্যে বা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, এক লাইনে, দূরে দূরে পাঁচ গাত হাত ফাঁকে ফাঁকে চারি পাঁচটা আড়া (হরাইজন্ট্যাল বারের মত) বসাইয়া লও; আর প্রত্যেক আড়ার নীচে মাটির উপরে একখানা করিয়া লাঠি আড়াআড়ি ভাবে রাখ। সামান্য বাথারীর (কাবাদী, কাইম) দ্বারা এইরূপ আড়া করিলেই হইবে। তবে খুঁটির বাথারিগুলি যেন ছয় হাতের কম না হয়। ইহাতেও পূর্বের মত পরীক্ষা করা যাইতে পারিবে। বালকেরা এই আড়াগুলি যেক্রমে দেখিল, তাহা বোর্ডে অঙ্কিত করিয়া দেখাও

(৮৫ চিত্র)। বুঝাইয়া দাও যে যদি বহুদূর পর্যন্ত এইরূপ আড়া সাজান থাকিত, তবে যেখানে আকাশ ও মাটি মিশিয়াছে, সেইখানে শেষে তাহারাও



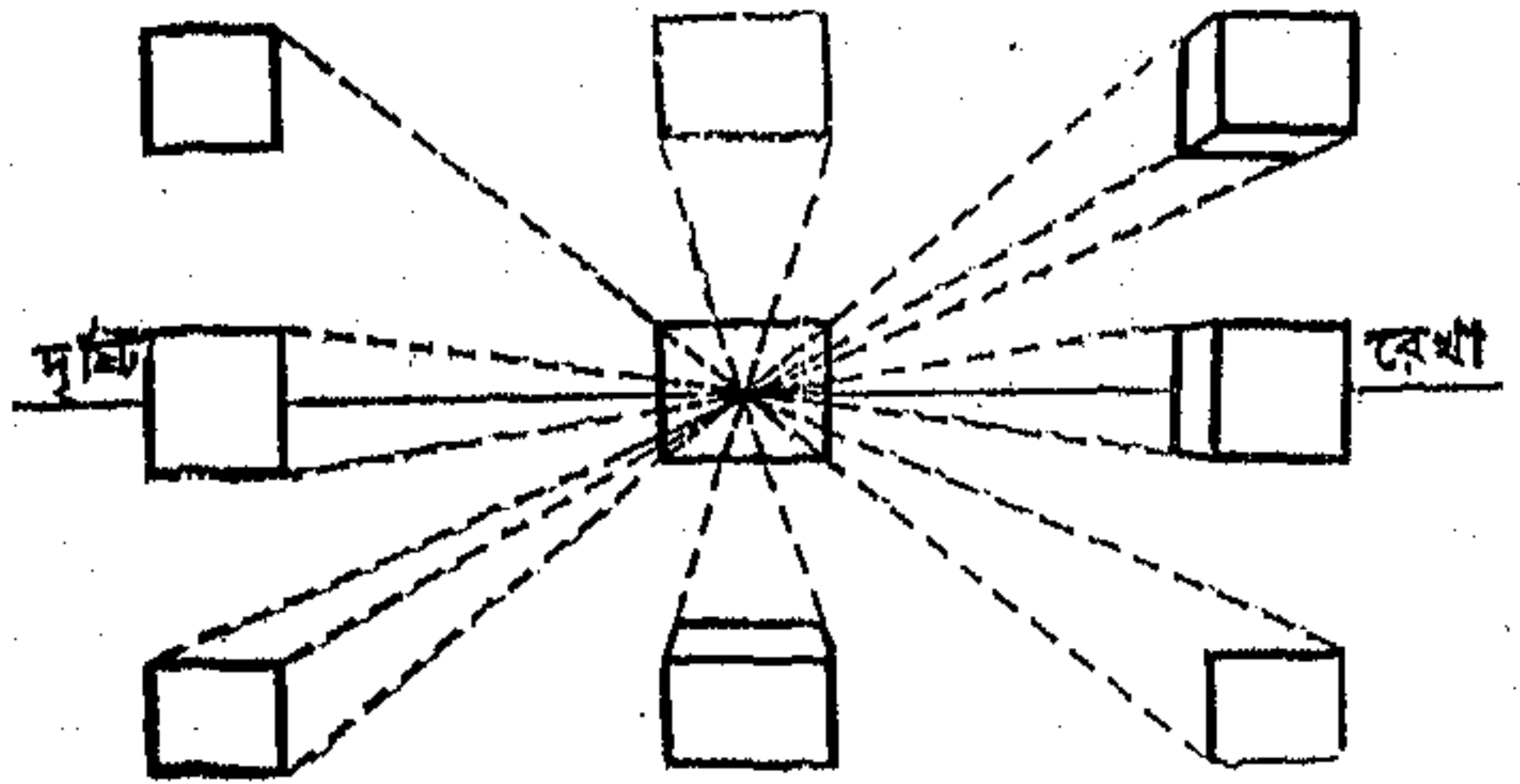
৮৫ চিত্র ।—দৃষ্টি বোধ ।

ছোট হইতে হইতে এক বিন্দুতে পরিণত হইত । এই বিন্দুর নাম 'মিলন বিন্দু' । আমাদেরিগের চক্ষুর উপরে যে সকল জিনিষ থাকে তাহা যেন নাগিয়া আসে, আর চক্ষুর নীচে যাহা থাকে তাহা যেন উঠিয়া গিয়া মাটি ও আকাশের মিলিত রেখার উপরে মিলিত হয় । এই রেখাকে 'চক্রবাল রেখা' বলে । সমস্ত মিলন বিন্দু এই চক্রবাল বা 'খ' রেখাতেই পতিত হইবে ।

কতকগুলি জুতার খালি বাক্স, কি কতকগুলি আস্ত ইঁট এক লাইন করিয়া সাজাইয়া যাও । বালকগণকে এক প্রান্ত হইতে সেই ইঁটগুলি দেখিতে বল । কি দেখিল ? ইঁটগুলি ক্রমে ছোট হইয়া গিয়াছে । এক পাশে দাঁড়া করাইয়া দেখাও । পাশগুলিও ক্রমে ছোট হইয়া গিয়াছে । এ সমস্ত রেখাকে যদি বাড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই চক্রবাল রেখায় গিয়া এক বিন্দুতে মিলিত হইবে ।

এখন একটা বাক্স লও । বালকদিগের সম্মুখে ধর । তাহারা বাক্সের

কয় পিঠ একসঙ্গে দেখিতে পারে, তাহা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে। চক্ষু ঠিক রাখিয়া, একবারে একসঙ্গে তিন পিঠের অধিক দেখা যায় না। তারপর বাক্সটী নানা অবস্থায় ধরিয়া বালকদিগের দ্বারা বোর্ডে বাক্সের চিত্র অঙ্কন করাও। প্রথমে বুঝাইয়া দেও যে, বাক্সের পাশের রেখাগুলি বাড়াইয়া দিলে ইহারাও বহুদূরে গিয়া চক্রবাল রেখার এক বিন্দুতে মিলিয়া যাইবে। নিম্নের চিত্রানুযায়ী বাক্সের স্থান পরিবর্তন করাইয়া বালকদিগকে শিক্ষা দাও :—

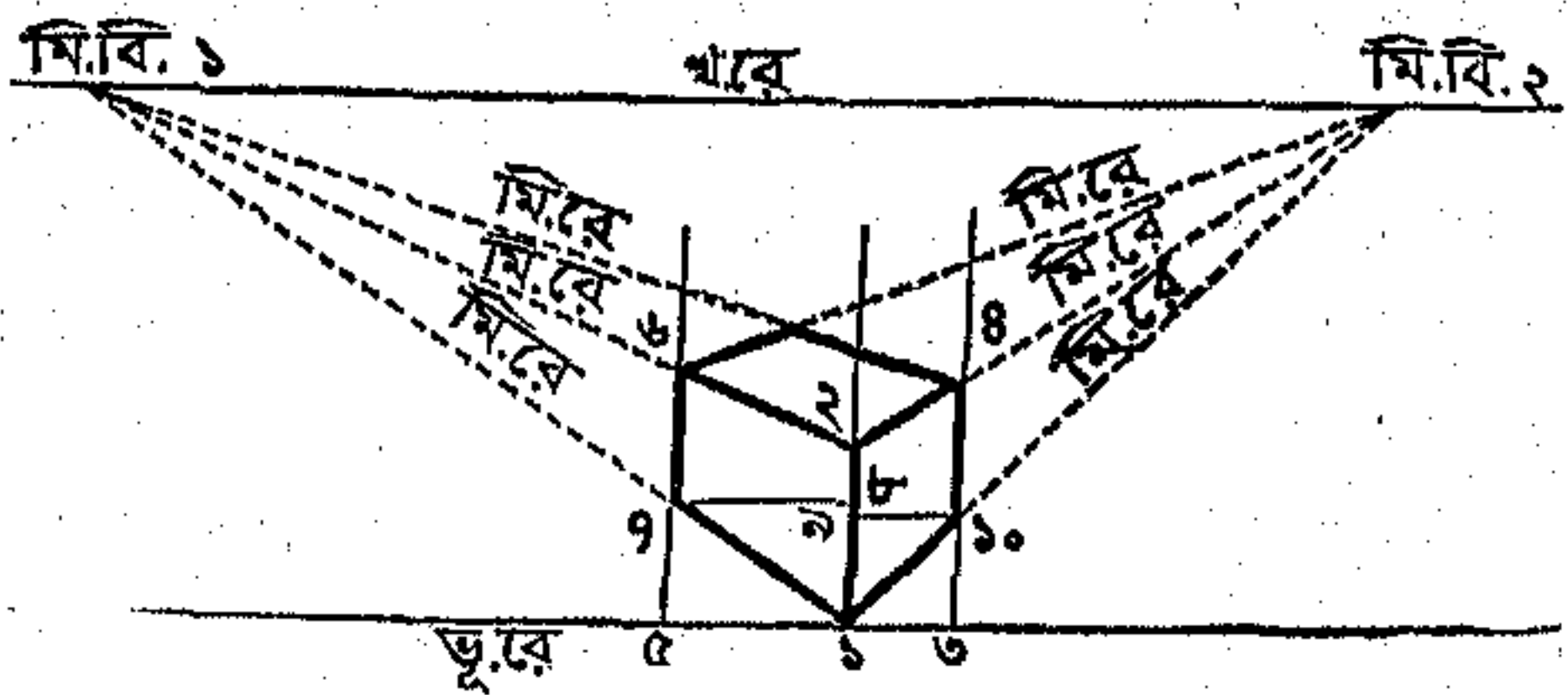


৮৬ চিত্র।—সমঘন বা কিউব অঙ্কন।

দৃষ্টান্ত :—বাক্সের যখন তিন পিঠ দেখা যায় তখন কিরূপে আঁকিতে হইবে? প্রথমে বালক বাক্সের সম্মুখের পিঠ আঁকিয়া লইবে (যেমন বামদিগের উর্দ্ধ চিত্র) তারপর তাহার তিন কোণ হইতে সরু রেখা টানিয়া মিলন বিন্দুতে মিলিত করিবে (বামের নিম্ন চিত্র)। তারপর বাক্সের অপর দুইটি পিঠ আন্দাজে আঁকিবে এবং কোণের নিকটস্থ রেখাগুলি সংলগ্ন করিয়া দিবে (ডাইনের উর্দ্ধ চিত্র)।

সমঘন বা কিউব অঙ্কন শিক্ষাদানের ধারা।—কাগজের উপর আড়াআড়ি ভাবে একটি রেখা টান। ভূমিতে যে স্থানের কিউবের সম্মুখস্থ কোণ আছে (১ কোণ) তাহার ঠিক নীচ দিয়া সমকোণকরতঃ,

ভূমিতে একটা কাঠি রাখিলে যে রেখা পাওয়া যায়, এইটী যেন সেই রেখা । ইহার নাম ভূরেখা । ইহার উপর একটা লম্বা উত্থান কর ; যথা ১, ২ । কিউবের ১০, ৪ বাহু বর্জিত করিলে ভূরেখার যেখানে মিলিত হইবে বলিয়া মনে হয়, সেই স্থানটি লক্ষ্য করিয়া রাখ (যেন ৩,) ; তারপর পেন্সিলের এক প্রান্ত কিউবের ১ বিন্দুতে রাখিয়া, পেন্সিলের যে স্থানে ৩ বিন্দু মিলিত হইবে বুঝিবে, পেন্সিলের সেই স্থান ধরিয়া আনিয়া কাগজের উপর অঙ্কিত ভূরেখার ২ হইতে মাপ লইয়া, ৩ বিন্দু নির্ধারণ কর । তারপর ৩ বিন্দু হইতে অগ্ন একটা লম্ব উত্তোলন কর ; যথা—৩, ৪ ।



৮৭ চিত্র ।—কাগজে কিউব অঙ্কন ।

এই প্রণালীতে ৫ বিন্দু নির্ধারণ করিয়া, ৫, ৬ লম্ব উত্তোলন কর । পেন্সিল লম্বভাবে ধরিয়া, কিউবের ১, ২ বাহুর মাপ ঠিক করিয়া তোমার চিত্রের ১, ২ রেখার মাপ ঠিক কর । তারপর পেন্সিল ভূসমান্তর ভাবে ধরিয়া ও তাহার এক প্রান্ত ১, ২ রেখায় সংলগ্ন রাখিয়া ক্রমে পেন্সিল উঠাইতে থাক । যেখানে দেখিবে যে কিউবের ১০ কোণ আসিয়া পেন্সিলের সহিত মিলিল, ১, ২ রেখার সেই স্থান নির্দিষ্ট (যেমন ৮) রাখ ও সেই বিন্দু হইতে ভূরেখার সমান্তর একটা রেখা টান ; যেমন ৮, ১০ । সেইরূপ ৯, ৭ টানিয়া লও । এখন ১, ৭ ও ১, ১০ সংযুক্ত কর ; তারপর কিউবের

১০, ৪ বাহু মাপিয়া চিত্রে ৪ বিন্দু নির্ধারণ কর। এইরূপে ৬ বিন্দুও ঠিক করিয়া লও। ২, ৪ ও ২, ৬ সংযুক্ত কর। তোমার এই সমস্ত মাপ ঠিক হইল কি না, ; তাহা এখন এইরূপে পরীক্ষা কর। (১) ১, ১০ ও ২, ৪ রেখা বর্দ্ধিত করিয়া দিলে এক বিন্দুতে মিলিত হওয়া আবশ্যক। (২) সেইরূপ ১, ৭ ও ২, ৬ রেখা বর্দ্ধিত করিলেও এক বিন্দুতে মিলিত হওয়া আবশ্যক। (৩) আবার এই দুই বিন্দু (মি, বি, ১ ও মি, বি, ২) সংযুক্ত করিলে যে রেখা (খরে) পাওয়া যাইবে, তাহা ভূরেখার সমান্তর হওয়া আবশ্যক। এই তিনটি বিষয় যদি ঠিক হয় তবে তোমার মাপ ঠিক হইয়াছে ও চিত্রও ঠিক হইয়াছে। তাহা না হইলেই মাপ বা অঙ্কনে ভুল হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই সমস্ত ঠিক হইলে কিউবের উপরের পিঠ অঙ্কন করা শক্ত নয়। মি, বি, ১ এর সঙ্গে ৪ ও মি, বি, ২ এর সঙ্গে ৬ যোগ করিয়া দাও ; এই দুই রেখা যেখানে ছেদ করিবে, সেইখানেই কিউবের উপর পিঠের দূরত্ব কোণ। এখন কিউবের পার্শ্বস্থ রেখাগুলি রাখিয়া, অন্য রেখাগুলি মুছিয়া ফেল। কেহ কেহ “মাপ” শিখাইবার জন্ত প্রথমেই কিউবের মাপ লওয়া না শিখাইয়া, বালকগণকে ব্ল্যাক বোর্ড বা দেওয়াল-সংলগ্ন মানচিত্র বা ঐরূপ কোনও পদার্থের (বেধ বাদ দিয়া) চিত্র অঙ্কন করাইয়া থাকেন। এ প্রথাও বেশ। তারপর আবার কিউব অঙ্কন শিখাইবার জন্ত কেহ কেহ প্রথমে এইরূপ প্রথাও অবলম্বন করিয়া থাকেন :—টেবিলের উপর একখানা সার্মীর কাচ (২ খানা ইটের সাহায্যে) খাড়া করিয়া রাখ। কাচের সম্মুখে একটা কিউব রাখ। অপর পার্শ্বে একটা চতুর বালককে দাঁড় করাইয়া, তাহাকে কাচের উপর কিউবের কোণগুলি যে যে স্থানে দেখা যাইতেছে, সে সকল স্থান কাচের উপর চিহ্নিত করিতে বল। তারপর রেখা টানিয়া কাচের উপরের সেই বিন্দুগুলি (কিউবের পার্শ্বের লাইন অনুসরণ করিয়া) যোগ করিতে বল। একটা সাদা চক-পেন্সিল লাল কালিতে ডুবাইয়া লইলেই তাহা দ্বারা

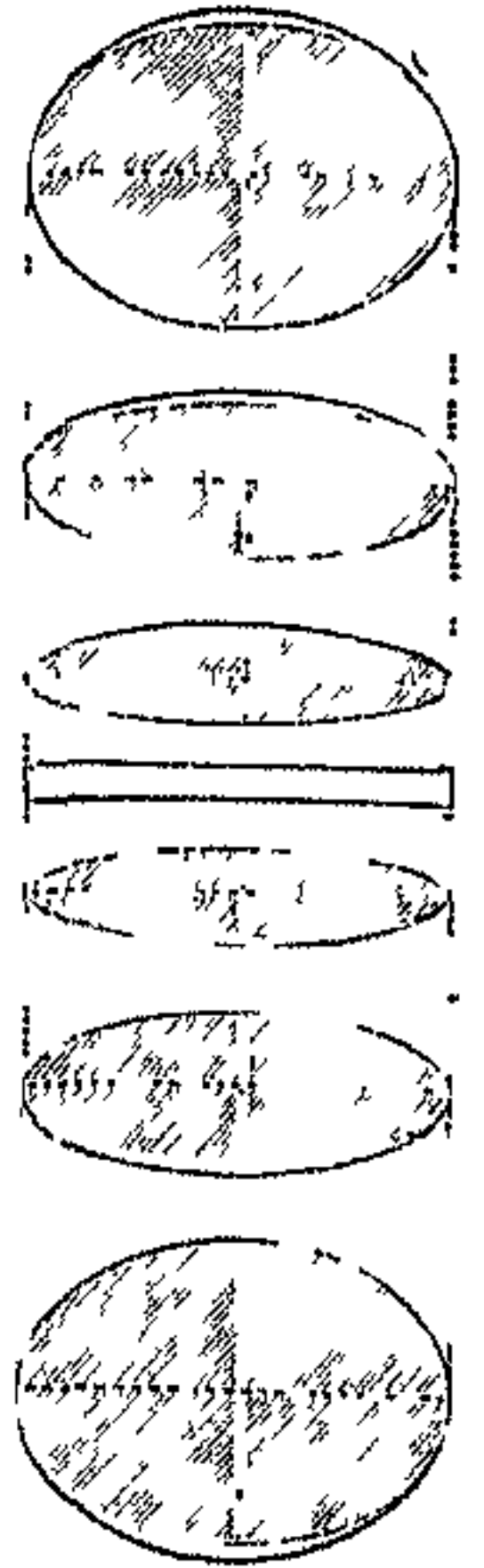
কাচে দাগ কাটা যাইবে। ভূতলস্থ কিউব এইরূপে চিত্রতলে অঙ্কিত হইল। 'চিত্রতল' ও 'ভূতল' কথা দুইটীও একটু বুঝাইয়া দিতে হইবে। স্কেট, ব্ল্যাক বোর্ড, কাগজ প্রভৃতি পদার্থ অর্থাৎ বাহার উপর আমরা চিত্র অঙ্কিত করি তাহাই "চিত্রতল" আর যে ভূমির উপর কিউব আছে সেই ভূমি (চক্রবাল রেখা পর্য্যন্ত) 'ভূতল'। সাধারণ কাগজে কিউব অঙ্কিত করিতে হইলে অনেক সময়েই এত স্থান পাওয়া যায় না যে, কিউবের বাহুগুলি (মি. রে. = মিলন রেখা ক্রমে) দুইটী মি. বি. (মিলন বিন্দু) পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। তবে চোখের দ্বারাই এরূপ বুঝিতে পারা চাই যে, বাহুগুলি বর্দ্ধিত হইলে শূণ্যে গিয়া যেন একই থ রেখায় মিলিত হয়। কাগজে কিউবের চিত্র বড় হইলে ২, ৪ ও ১, ১০ এবং ২, ৬ ও ১, ৭ রেখাগুলি প্রায় সমান্তর হইয়া থাকে। অনেক সময় ১, ১০ ও ১, ৭ রেখা টানিয়া ২, ৪ ও ২, ৬ রেখাদ্বয় যথাক্রমে তাহাদের সমান্তর করিয়া টানিলেও কিউবের চিত্র হয়।

বালকগণ যদি উত্তমরূপে কিউবের অঙ্কন প্রণালী বুঝিতে পারে তবে অন্যান্য দ্রব্যের অনুলিপি করিতে আর কাঠিন্য বোধ করিবে না। সেইজন্য কিউবের অনুশীলন খুব অধিক হওয়া আবশ্যক। কারণ চেয়ার, টুল, ডেস্ক, বাক্স প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই কিউব হইতে উৎপন্ন। সিলিণ্ডার ও বলের চিত্র শিক্ষা করা তত শক্ত নয় বলিয়া বণিত হইল না। সিলিণ্ডার ও বল আঁকিতে শিখিলেই গাছ, পালা, ফুল, ফল, মানুষ, গরু প্রভৃতি সকলই আঁকিতে পারিবে। কারণ এ সমস্তই সিলিণ্ডার ও বলের সংযোগে গঠিত।

স্থান ভেদে বৃত্তাকার জিনিষের যেরূপ পরিবর্তন ঘটে তাহা না বুঝাইয়া দিলে বালকেরা ঘটী, বাটী, গেলাস, বাল্‌তী প্রভৃতি পাত্রের মুখ আঁকিতে পারিবে না। তাহারা মনে করে যে এই সকল পাত্রের মুখ যখন বৃত্তাকার তখন একটা বৃত্ত আঁকিয়া দিলেই মুখ আঁকা হইবে। কিন্তু বৃত্তাকার

মুখ যে স্থান ভেদে বৃত্তাভাস আকার ধারণ করে তাহা বুঝাইয়া দিলেই বালকেরা করিতে পারিবে ।

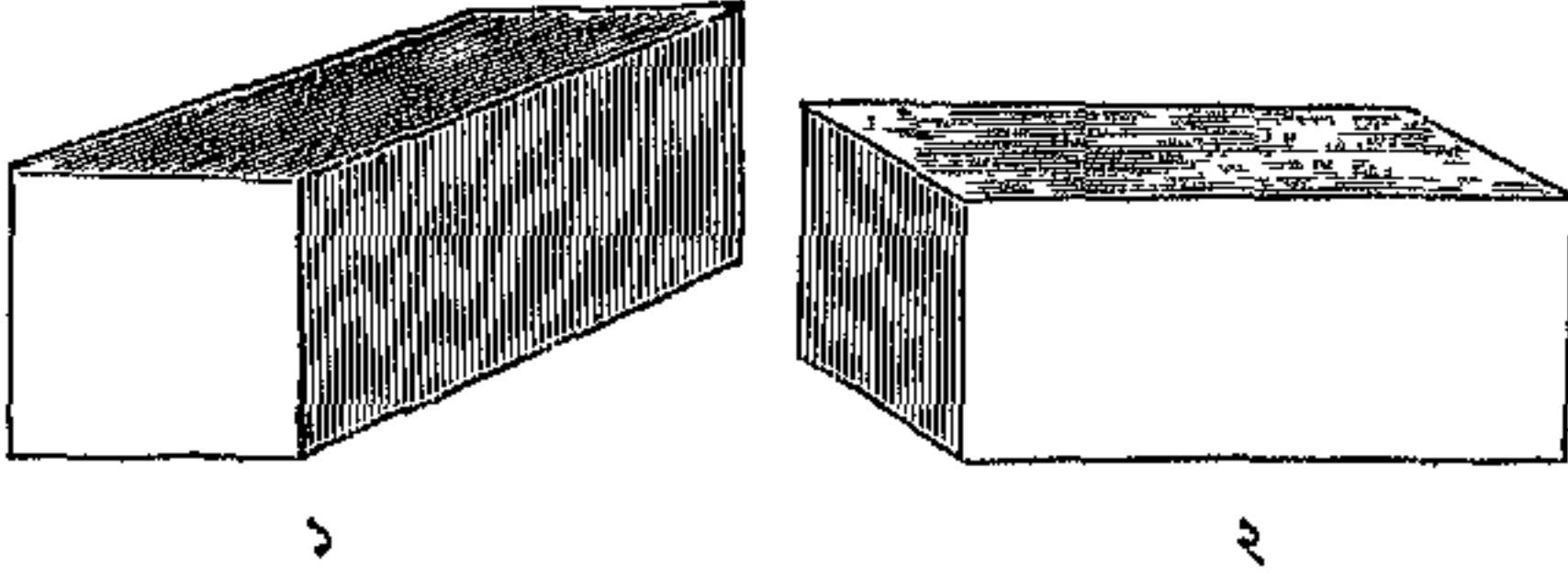
একখানি থালা মাটির উপর রাখ । বালকগণকে জিজ্ঞাসা কর থালার কি রূপ দেখিতেছে । তাহারা অবশ্য বলিবে সম্পূর্ণ বৃত্তাকার—কিন্তু তাহা নয়, মাটির উপরেও একটু বৃত্তাভাস । যাহা হউক থালাখানি একটু একটু উঁচু করিতে থাক ও বালকগণকে জিজ্ঞাসা কর যে তাহারা থালার আকারের কি পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছে । তাহারা হয়ত প্রথম প্রথম ধরিতেই পারিবে না । থালাখানি তাহাদিগের দৃষ্টি রেখায় লইয়া আইস । এবারে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে থালার ধার ছাড়া মধ্যাংশের কিছুই দেখা যাইতেছে না । একটু একটু করিয়া উঠাইতে থাক । এখন যে থালার মধ্য অংশ একটু একটু করিয়া তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারিবে । থালার দক্ষিণ বামের ব্যাসটী সব সময় পুরাপুরিই দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আর একটী ব্যাসের পরিবর্তন ঘটে । ঘটা বাটার মুখ এইরূপ বৃত্তাভাস করিয়া আঁকিতে হয় ।



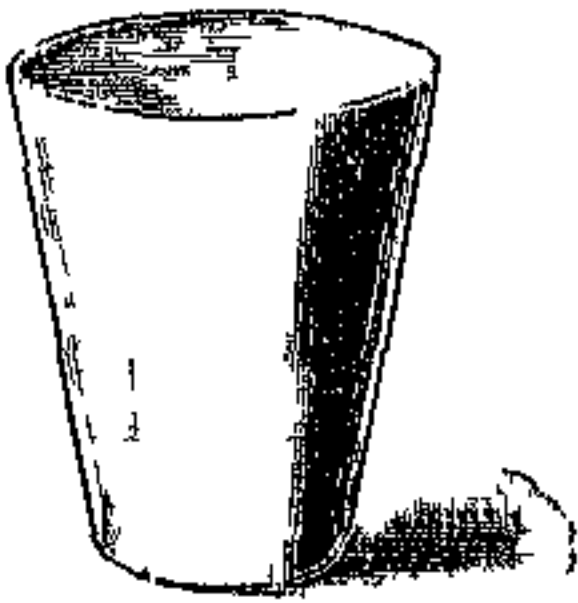
আলো ও ছায়াপাত ।—চিত্রে একটু আলো ও ছায়ার ভাব বিকাশ করিলে চিত্রটী বেশ ভাল দেখায় । বালকেরা চিত্রাঙ্কনে একটু অগ্রসর হইলে আপনা আপনিই নিজ চিত্রে একটু আলো ছায়ার ভাব ফুটাইতে চেষ্টা করে । একটু বুঝাইয়া দিলে তাহারা সহজেই আলো ছায়ার স্থান ঠিক করিতে পারিবে ।

ঘরের সকল দরজা জানালা বন্ধ করিয়া একটা দরজা বা জানালা

খোলা রাখ। সেই দরজা বা জানালার সম্মুখে একটা বাক্স বসাত।
বালকগণকে দেখাও যে বাক্সের সকল পাশে সমান আলো পড়িতেছে না।



বাক্সের লম্বা পাশটী আলোর দিকে রাখিলে (২ চিত্র) ছোট পাশে
আলোক খুব কম পড়িবে। আবার ছোট পাশটী (১ চিত্র) আলোর
সম্মুখে রাখিলে লম্বা পাশটীতে ছায়া পড়িবে। বাক্সের উপরের ভাগে
ছুই অবস্থাতেই অল্প একটু ছায়া পড়িবে। এই জন্ত এই রূপ বাক্সের ছবি
আঁকিতে হইলে—যে পাশে আলো পড়ে না—সে পাশ পেন্সিল দিয়া ঘসিয়া
কাল করিয়া দিতে হয়। উপরের ভাগে কম ছায়া পড়ে বলিয়া একটু
কম কাল করিতে হয়।

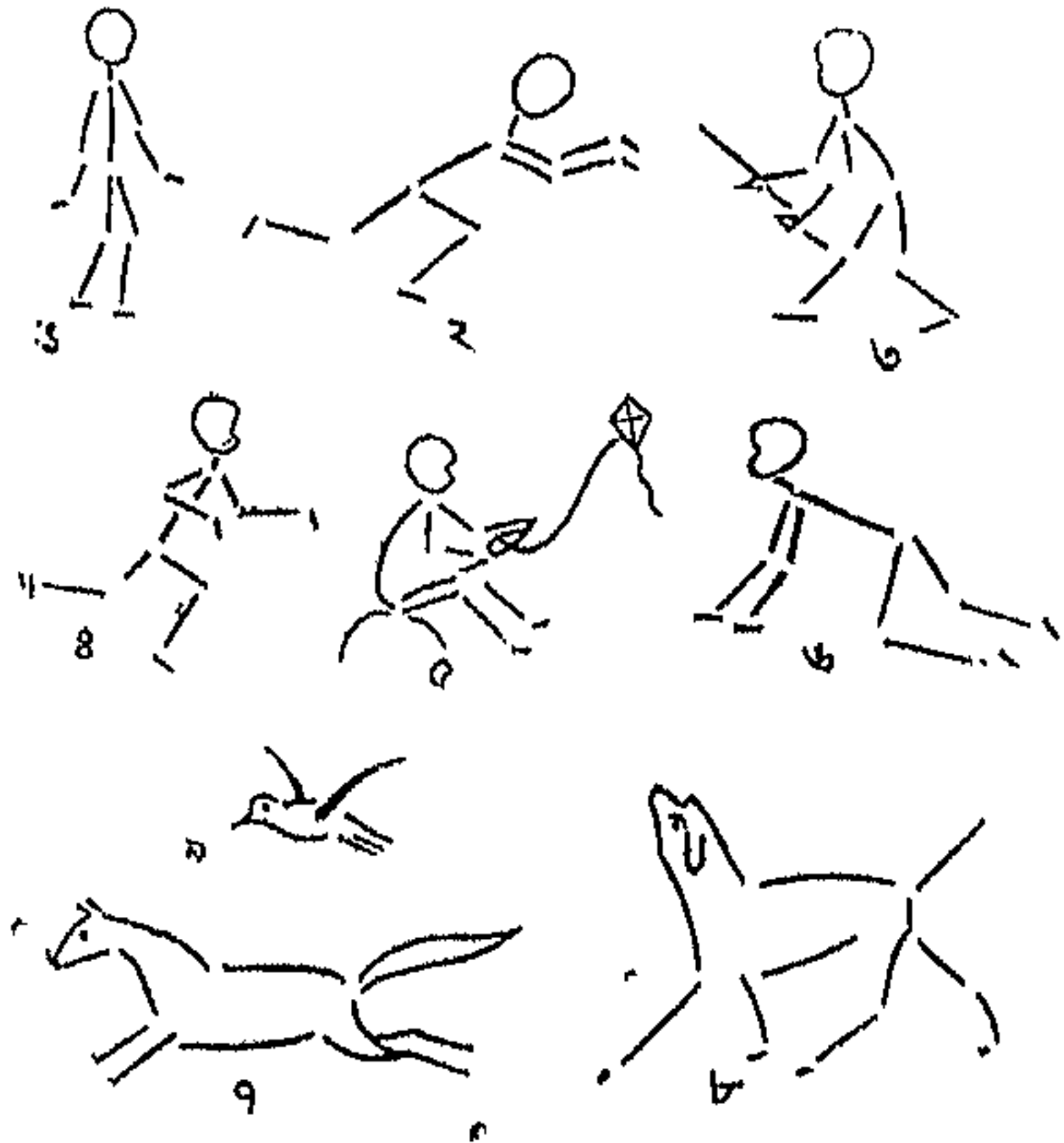


ছায়ার গভীরতার ক্রমবিকাশ বালকেরা
ধরিতে পারিবে না বলিয়া প্রথম অবস্থাতে
সমান গভীরতার ছায়াপাত শিক্ষাদান সুবিধা-
জনক। ইহার পর গোলাকার বা চোলাকার
জিনিষে ছায়াপাত শিক্ষা দিলেই ছায়ার গভী-
রতার ক্রমবিকাশ বুঝিতে পারিবে। দরজার
সম্মুখে একটা গেলাস রাখ।

এখন বুঝাইয়া দাও যে গেলাসের উপর যেখানে আলো পড়িয়াছে
তার ছুই পাশে ছায়া একটু একটু করিয়া গভীর হইয়া গিয়াছে।
গেলাসের ভিতরের দিকে যেখানে আলোক পড়িয়াছে তাহাও দেখান

হইয়াছে । মাতীতে যে জিনিসের একটু ছায়া পড়ে চিত্রে তাহাও আঁকা আবশ্যক ।

রেখা-চিত্র ।—বালকগণকে, বিশেষতঃ ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রগণকে রেখা-চিত্র শিক্ষা দিলে, স্বল্প সময়ে অনেক বিষয়ের চিত্র অঙ্কন করিয়া বিষয়াদি বুঝাইবার সুবিধা হয় । ড্রিল, কসরৎ প্রভৃতি নানারূপ ভঙ্গী রেখা-চিত্রের দ্বারা অতি সহজে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারা যায় । উক্ত ভঙ্গীগুলির লিখিত বর্ণনা অপেক্ষা রেখা-চিত্রে বুঝিবারও অধিকতর সুবিধা হয় । আর রেখা-চিত্র শিক্ষা করা বিশেষ কঠিনও নয় । নিম্নে রেখা-চিত্রের সামান্ত দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল ।



৮৮ চিত্র ।—রেখার দ্বারা চিত্র ।

এরূপ চিত্রাঙ্কনে বালকদিগকে এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিতে বলিবে :—মাথা প্রায় একটা গোলাকার শূণ্যের দ্বারা অঙ্কিত করিতে হইবে। যেমন ১, ২, ৩। বা পারিলে একটু মুখের ভঙ্গী দেখাইতে হইবে (যথা ৪, ৫, ৬)। প্রত্যেক ঘোড়ের স্থান ফাঁক রাখিয়া দিতে হইবে। মাথা ও গলার মধ্যে, গলা ও খড়ের মধ্যে, খড় ও হাত পা'র সন্ধিস্থলে ফাঁক। পিঠের রেখা অবস্থানুসারে একেবারে সরল (যথা ১), সম্মুখে কুজ (যথা ৩) বা পশ্চাতে কুজ (যথা ৪) করিতে হইবে। যদি এক অঙ্গের উপর দিয়া অন্য অঙ্গ বা কোনও বস্তু দেখাইতে হয়, তবে উপরে যে অঙ্গ বা বস্তু থাকিবে তাহার রেখা সম্পূর্ণই থাকিবে। নীচের রেখা কাটিতে হইবে ও কাটার দুই পার্শ্বে একটু একটু ফাঁক রাখিতে হইবে; যথা ৪র্থ চিত্রে—ডান হাত শরীরের উপর বলিয়া হাতের রেখা ঠিক রাখা হইয়াছে, কিন্তু পিঠের রেখা কাটিয়া হাতের দুই পাশে একটু ফাঁক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অঙ্গুলির রেখাটি আবশ্যক মত সরল বা সম্মুখে একটু বক্র করিতে হইবে। ৩নং চিত্রে, যে হাত দিয়া বাঁশ ধরিয়াছে তাহার অগ্রভাগ বক্র কিন্তু ১নং চিত্রে যে হাত বুলিয়া আছে তাহা সরল। চরণের রেখা সম্বন্ধেও এইরূপ। ৪ চিত্রের সম্মুখে চরণ সরল রেখায়, কিন্তু পশ্চাতের চরণের অগ্রভাগে ভর পড়িয়াছে বলিয়া একটু বক্র।

এইরূপে বালক যুড়ি উড়াইতেছে, নৌকা বাহিতেছে, সেট হাতে স্কলে যাইতেছে, দুইজনে হাতাহাতি করিতেছে, লাঠি খেলিতেছে প্রভৃতি অনেক-রূপ ছবি রেখাচিত্রে সুন্দরভাবে দেখান যাইতে পারে।

ব্ল্যাক-বোর্ডে চিত্রাঙ্কন ।—ব্ল্যাক-বোর্ড চিত্রের দুইটা প্রকরণ। (১) বোর্ডের উপর বালকগণের শিক্ষাদানার্থ বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতির পূর্ণ বা আংশিক চিত্র অঙ্কন করা। (২) বোর্ডের উপর দুই বাছ দ্বারা একসঙ্গে সমপার্শ্ব চিত্র অঙ্কন করা। এই দ্বিতীয় প্রকরণই সাধারণতঃ

“ব্ল্যাক-বোর্ড চিত্রাঙ্কন” বা দ্বিবাছিক চিত্রাঙ্কন নামে প্রচলিত। প্রথম প্রকরণের চিত্রাঙ্কন করিতে হইলে পূর্বলিখিত চিত্রানুলিপির প্রণালী অনুসারে কিছুদিন চেষ্টা করিলেই হাত ঠিক হইয়া যাইবে। তবে এ পরিমাণ অভ্যাস হওয়া উচিত যে পড়াইবার সময় যেন আবশ্যিক মত স্বল্প সময়ে বোর্ডে সাধারণ দ্রব্যাদির সকল প্রকার অবস্থা সহজে অঙ্কন করিতে পারা যায়। দ্বিতীয় প্রকরণও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, তবে কিঞ্চিৎ উপদেশ আবশ্যিক :—

- (১) দুই হাতে দুইখানি চক্-পেন্সিল লও।
- (২) বোর্ডের খুব নিকটে দাঁড়াইও না। যে স্থানে দাঁড়াইয়া বাহু প্রসার করিলে চক্-পেন্সিলের মাথা বোর্ডে গিয়া লাগে, এত দূরে দাঁড়াইবে।
- (৩) বোর্ডে আঁকিবার পূর্বে, দুই হাত, দু’চার বার (চিত্রের রেখানুকরণে) শূন্যে ঘুরাইয়া হাত ঠিক করিয়া লইবে।
- (৪) বক্র রেখাগুলি যথাসম্ভব এক টানে আঁকিতে চেষ্টা করিবে।

মৃন্মূর্ত্তিগঠন।

আবশ্যিকতা।—চিত্রাঙ্কন শিক্ষার যে আবশ্যিকতা ইহারও প্রায় তদ্রূপ। অধিকন্তু ইহাতে দুই হস্তের সমস্তগুলি অঙ্গুলির পরিচালনা আবশ্যক হয় বলিয়া ইহা দ্বারা হাতের জড়তা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং সমস্তগুলি অঙ্গুলি নানারূপ সূক্ষ্ম কার্যে ব্যবহারের উপযোগী হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার মত ইহাতেও নির্দোষ আমোদ উপভোগ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে।

মাটি প্রস্তুত।—উত্তম আঠালে মাটীই এই কার্যের উপযোগী। যে মাটিতে প্রতিমাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে সেই মাটি হইলেই চলিবে। মাটিতে জল দিয়া উত্তমরূপে মথিয়া লইতে হইবে। শক্ত কোন জিনিষ

থাকিলে বাছিয়া ফেলিতে হইবে । যখন মথা ময়দার (কাটির জন্ত) মত হইবে অর্থাৎ সহজে হাতে লাগিয়া থাকিবে না, কিন্তু যেমন করিয়া গড়িতে ইচ্ছা হয়, তাহাই পারা যাইবে, তখন মাটি ঠিক হইল । ৫।৬ ইঞ্চ লম্বা কতকগুলি বাঁশের চটী প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে । এইগুলির দ্বারা কাটা ছাঁটার কাজ চলিবে ।

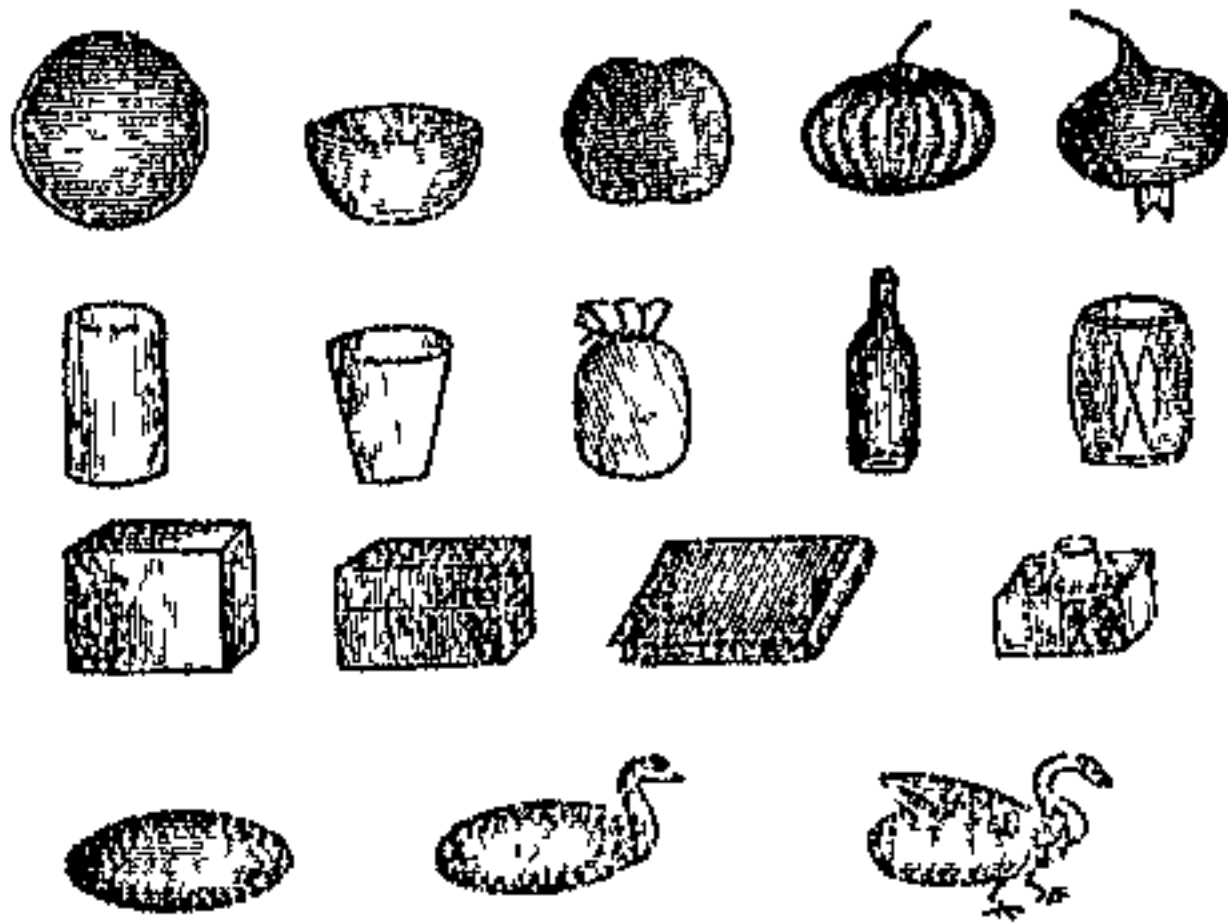
আরম্ভ ।—বালকগণকে সর্বপ্রথমে বন্ বা গোলক প্রস্তুত শিক্ষা দিতে হইবে । মাটি লইয়া বাম হাতের তালুর উপরে রাখিয়া ডান হাতের তালুর দ্বারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বন্ প্রস্তুত করিবে । তারপর সেই বন্ চটীর দ্বারা সমদ্বিখণ্ডিত করিবে, এবং চটীর অগ্রভাগের সাহায্যে সেই অর্ধ গোলায় মধ্যের মৃত্তিকা তুলিয়া ফেলিয়া দুইটী বাটী প্রস্তুত করিবে । যদি বাটীর ভিতর বা বাহির অপরিষ্কার বোধ হয়, তবে অঙ্গুলে একটু জল লাগাইয়া, বাটীর সমস্ত গাত্র মাজিয়া মাজিয়া সমান করিতে হইবে । ইহার পর মাটি দ্বারা একটা ঢোল প্রস্তুত কর । মধ্য হইতে মাটি খুঁড়িয়া ফেলিয়া ঢোল হইতে গেলাস, বোতল, বস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারা যায় । তারপর একটা ছক্ (কিউব) প্রস্তুত কর ও পূর্ববৎ মাটি তুলিয়া ফেলিয়া তাহাকে ডালাশূন্য বাক্সে পরিণত কর । একটা ডিম প্রস্তুত কর । একদিক অপেক্ষা, ডিমের অপর দিক একটু বেশী মোটা । তারপর পাখীর গলা ও ঠোঁট প্রস্তুত কর । ডিমের যে দিক সরু, সেইদিকে ঠোঁট ও গলা লাগাইয়া দাও । ডিম হইতে পাখী হইল (৯০ চিত্র দেখ) ।

ফল গঠন ।—বিদ্যালয়ে মানুষ, গরু প্রভৃতি মূর্তিনির্মাণ শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা বা সময় হয় না । কতকগুলি সাধারণ সহজ ফল প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইল । যে ফল শিখাইতে হইবে তাহা সংগ্রহ করা নিতান্তই আবশ্যক । বালকেরা দেখিয়া দেখিয়া গড়িতে থাকিবে । বন্ বা গোলক হইতে কমলা লেবু করা যায় । বৃন্তের স্থান ও তাহার বিপরীত স্থানে আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া দিলেই ঠিক

কমলা হইল। তবে একটা বৃন্ত না লাগাইলে ফল ভাল দেখায় না। একটু মাটি দ্বারা ছোট একটা বৃন্ত প্রস্তুত কর, আর যে স্থানে সেই বৃন্তটি লাগাইবে সেখানে পেন্সিলের মাথা দিয়া একটু গর্ত করিয়া, সেই গর্তে বৃন্তটি আস্তে টিপিয়া ধর। বৃন্ত লাগিয়া যাইবে। বোঁটাটা খাড়া করিয়া রাখিলে ভাল দেখায় না; একটু হেলাইয়া দিবে। লেবু, জাম, শশা প্রস্তুত করিয়া একটা বৃন্ত লাগাও। পেয়ারা, দাড়িম্ব, বেগুন প্রভৃতি ফল প্রস্তুত বিষয়ে একটু উপদেশ আবশ্যক হইতে পারে। সাধারণ পেয়ারার আকার গোল নহে—নীচের দিকে মোটা, বোঁটার দিকে সরু। তারপর ফলের উপর পল তোলা আছে। সকল জাতীয় ফলের গঠনেই দুই হাতের আঙ্গুল চালনা আবশ্যক। প্রথম মটির একটা বল করিয়া লও। বাম হাতের আঙ্গুল কয়টাব উপরে সেই বলটি রাখিয়া, ডান হাতের আঙ্গুল কয়টির অগ্রভাগ দ্বারা সেই ফলটি ঘুরাও ও একটু একটু করিয়া উপরের দিকে (পেয়ারার উর্দ্ধভাগের মত) লম্বা করিয়া লইয়া যাও। আকার ঠিক হইলে ডান হাতের আঙ্গুলের টিপতে পল তোলার কাজ শেষ কর। তারপর বোঁটার স্থানে টিপিয়া একটু নীচু করিয়া রাখ। পূর্বের মত বোঁটা প্রস্তুত করিয়া লাগাও। এবারে আরও একটু কাজ আছে। পেয়ারার নীচে ফুল দেখাইতে হইবে। ঐষধের বড়ির মত ৪৫টী বড়ি প্রস্তুত কর; তাহা টিপিয়া চেপ্টা কর। পেয়ারার নীচে একটু একটু দাগ কাটিয়া সেই দাগের মধ্যে ঐ চেপ্টা খণ্ডগুলি চক্রাকারে লাগাইয়া দাও। একটা ফুলওয়ালা পেয়ারা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। দাড়িম্বের ফলও এইরূপ পৃথকভাবে প্রস্তুত করিয়া লাগাইতে হইবে। বেগুনের বোঁটার সঙ্গে যে কুণ্ড (Calyx) থাকে তাহা পৃথক প্রস্তুত করিয়া লইলেই প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধা হয়। -

এই বিবরণ পড়িয়া কাজ কঠিন বোধ হইতে পারে; কাজ কিন্তু

তেমন কঠিন নয়। বালকেরা অতি সহজেই এই সমস্ত গঠন শিক্ষা করিয়া থাকে। আবার স্বাভাবিক শিল্প-বুদ্ধি-সম্পন্ন বালকেরা ছুঁচার দিনের মধ্যেই, চমৎকার গঠন-কৌশলের পরিচয় দিয়া থাকে। একবার কার্যতঃ পরীক্ষা করিলেই শিক্ষকগণ বুঝিতে পারিবেন যে এ কার্য তেমন শক্ত নয়।



৯০ চিত্র।—মৃৎকীর ফলাদি গঠন।

৩। সঙ্গীত ।

আবশ্যকতা।—সঙ্গীতে যেমন নির্মল আনন্দ অনুভব করা যায়, এমন আব কিছুতে হয় বলিয়া মনে হয় না। আর এই আনন্দ বিনা ব্যয়ে সকলেই যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ করিতে পারেন। সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনা যে অত্যাবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য। উত্তম সঙ্গীতে হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিগুলিকে খুলিয়া দিয়া, মানুষের মন পবিত্র করে ও চরিত্র উন্নত করে। এইজন্য ধর্মমন্দিরে সঙ্গীতের ব্যবস্থা। রোগে, শোকে, দুঃখে, কষ্টে সঙ্গীতের সাহায্যে আশ্চর্য্য শান্তি লাভ করা যায়। ইহা ছাড়া গানে ফুসফুসের উপকার হয়, আর রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা হয়।

ইংরেজ বালকদিগের জন্ম যে সকল বিদ্যালয় আছে, তাহাতে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদিগের দেশে কোন কোন বালিকা-বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু বালকদিগের বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ ব্যবস্থা না করিলে, আমরা যে নিজ হইতে কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইব, তাহা আমাদিগের অকৃতি নয়। এ কথা আমরা জানি যে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, কর্তৃপক্ষ বিশেষ উৎসাহ দিবেন বই বাধা দিবেন না, কিন্তু তবুও সকল ব্যবস্থার জন্মই আমরা কর্তৃপক্ষের আদেশের অপেক্ষা করিয়া থাকি। যেটা ভাল বুঝিতে পারা যায়, সুবিধা হইলে সেটা কার্যে পরিণত করাই সম্ভব। কর্তৃপক্ষেরও সকল বিষয়ে আদেশ দেওয়া সম্ভবপর নহে।

বিদ্যালয়ে অবশ্য অস্থায়ী বিষয়ের সঙ্গে এ বিদ্যার যথেষ্ট আলোচনা হওয়া সম্ভবপর নহে। আর বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিখাইয়া এক এক জনকে তানগেন করাও উদ্দেশ্য নহে। সাধারণ সঙ্গীতাদি বুঝিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যিক; তাহা না হইলে সঙ্গীতের রসাস্বাদ করিতে পারা যায় না। বিদ্যালয়ে সেই ক্ষমতার উদ্যোগ করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। আর বাহ্যতে অন্ততঃ ধর্মসঙ্গীতে বা কীর্তনাদিতে যোগদান করিয়া ধর্মচর্চার সহকারী হইতে পারে, বালককে সে বিষয়ে উপযুক্ত করিয়া দেওয়াও অন্য উদ্দেশ্য বটে। মণ্ডাহে ২ কি ৩ দিন, ১৫ কি ২০ মিনিট করিয়া সঙ্গীতের আলোচনা করিলেই বিদ্যালয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

শিক্ষার ধারা।—শিক্ষক নিজে একটা সহজ সুরের ক্ষুদ্র সঙ্গীত বাছিয়া লইবেন। লক্ষ্যে ঠুংরীই অনেক প্রথম শিক্ষার্থীর উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক একতালী, ঠুংরী, যৎ, কাওয়ালী, ছেপ্কা প্রভৃতি সহজ সহজ তালে, খাম্বাজ, ভৈরবী, জলিত, সাহানা, মল্লার, বিভাগ, ঝাঁঝিট, বেহাগ প্রভৃতি সুরে রচিত গান আরম্ভের পক্ষে উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয়। তবে প্রথম শিক্ষাদানের সময়ে কোন সুরেই তরঙ্গ, মুচ্ছনা, গিঠখারী প্রভৃতির অবতারণা করিতে নাই। যতদূর সম্ভব সুর সরল হওয়া আবশ্যিক। শিক্ষক প্রথমে গানের প্রথম লাইন ২৩ বার গাইবেন, বালকেরা শুনিবে। তারপর বালকগণও শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে গান আরম্ভ করিবে। বালকেরা খুব সহজেই সুর

নকল করিতে পারে। সুতরাং শিখাইতে কষ্ট হইবে না। প্রথম দিন কেবল প্রথম একটী কি দুইটী লাইন মাত্র আলোচনা করিবে। সেই লাইন দুইটী এক বকম অভ্যাস হইলে, অন্তরা আরম্ভ করিতে হইবে। দু'চার দিন অন্তরার অভ্যাস হইয়া গেলে, আবার প্রথম হইতে সমস্ত গান এক সঙ্গে গাইতে হইবে। ইহার পর শিক্ষক গান আরম্ভ করিয়া দিবেন মাত্র, কিন্তু বালকগণের সঙ্গে সমস্ত লাইন গাইবেন না। প্রত্যেক অন্তরার প্রথম অংশ আরম্ভ করিয়া দিয়া, তিনি শামিয়া গাইবেন, বালকেরা গাইয়া যাইবে। এইরূপে অভ্যাস করাইবেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত নিম্নলিখিত গানটী অনেক বিদ্যালয়ে প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে :—

পাছাজ—একতারা ।

- (১) তোমারি গেহে পালিছ রেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে ।
- (২) আমারি প্রাণ, তোমারি দান, তুমি ধন্য ধন্য হে ॥
- (৩) দিয়েছ জন্ম জননী ক্রোড়ে, রেখেছ পিতার বক্ষে মোরে,
বেঁধেছ মনারে প্রণয় ডোরে, তুমি ধন্য ধন্য হে ॥
- (৪) তোমার বিশাল বিপুল ভুবন, করেছ আমার নয়ন লোভন,
নদী গিরি বন সরস শোভন, তুমি ধন্য ধন্য হে ।
- (৫) অন্তরে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে, যুগযুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে শোকে সন্তোষে, তুমি ধন্য ধন্য হে ॥

শিক্ষকের সাহায্যার্থে নিম্নে স্বরলিপি প্রদত্ত হইল :—

(১) সা—সা—সা— | গা—গা— | ম—ম—ম— | দা—দা—
তো মা রি গে হে পা জি ছ . নে হে

সা—নি— | দা—ম— | দা—দা—ম— | গা—
তু মি ধ ঞ ধ . ঞ হে

(২) না—না—না— | না—না— | সা—সা—সা— | দা—দা—
আ মা রি প্রা ণ তো মা রি দা ন

সা—নি— | দা—ম— | দা—দা—ম— | গা—
তু মি ধ ঞ ধ . ঞ হে

(৩) ম—দা—দা— | না—না— | না সা সা না | সা সা
দি রে ছ জ ন ম জ ন নী কো ডে

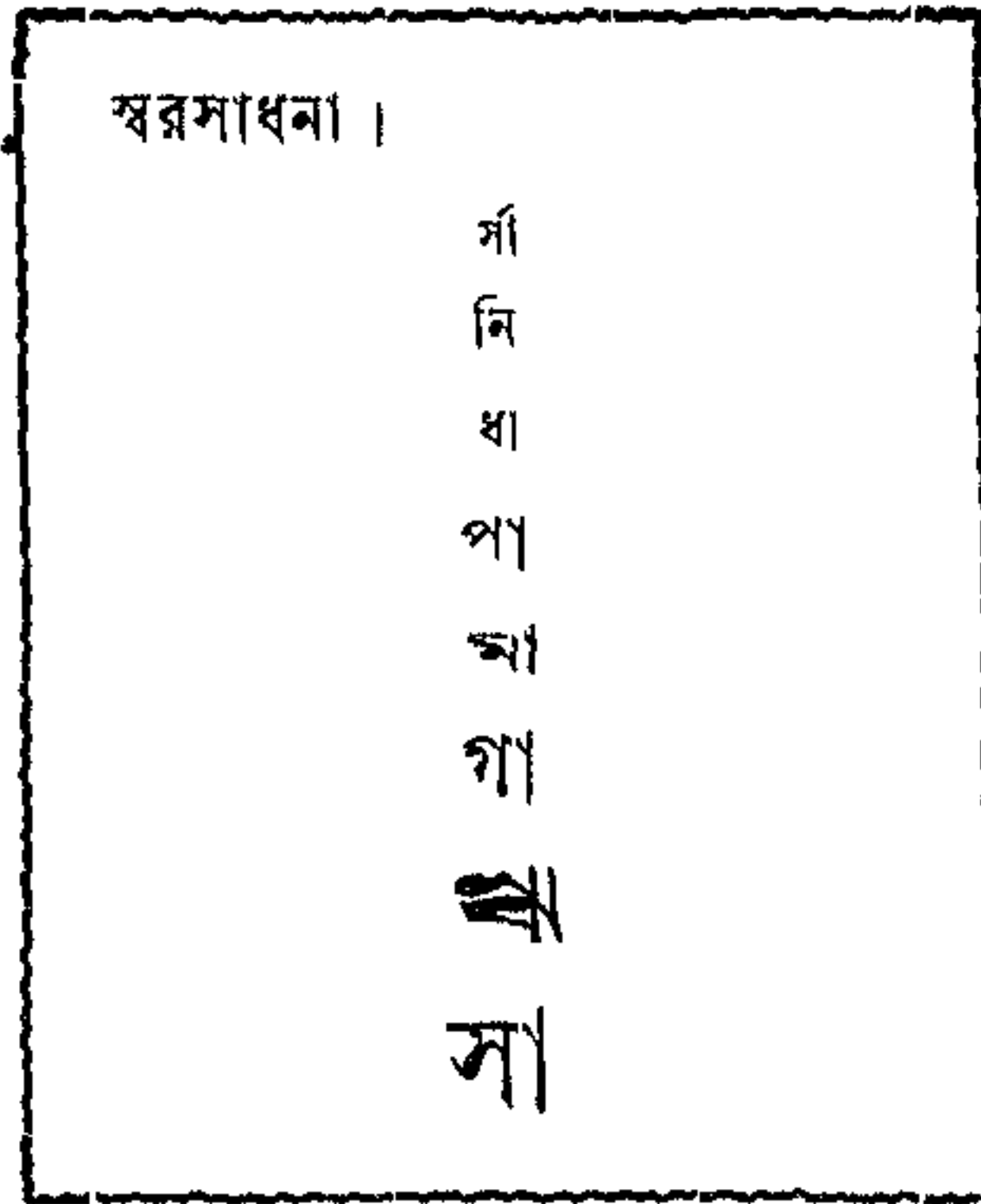
না—না—না— | সা সা সা | সা সা সা নি | দা—দা—
রে থে ছ পি তা র ব . ক্ষে মো রে

দা—দা—দা—দা— | ম না দা না | ম ম ম | দা—দা—
বে ধে ছ স বা রে প্র ণ য ডো রে

সা—নি— | দা—ম— | দা—দা—ম— | গা—
তু মি ধ ঞ ধ . ঞ হে

সাক্ষীগামা সাধনাও একটু শিখাইয়া দেওয়া কর্তব্য। একখানা বড় কাগজে নিম্নলিখিতরূপে সা খা গা মা বড় বড় অক্ষরে * লিখিয়া দাও।

* বাজালা মূদ্রাক্ষেপে সাধারণতঃ যেকোন প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সে সমস্তের নাম জানা আবশ্যিক। এই স্বর সাধনার চিত্রে যে বড় অক্ষরটি (সা) দেখিতেছ



৯১ চিত্র ।—স্বরসাধন পত্র ।

এই কাগজখানি দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখ । পরে একখান লম্বা কাঠির (মাপ পয়ণ্টার) দ্বারা (একাদিক্রমে) সুরের এক একটি অক্ষর কাঠির অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ কর, আর সঙ্গে সঙ্গে সা, ধা, গা, মা, রীতিমতভাবে গাহিয়া যাও ; বালকগণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে গাহিবে । আবার এইরূপ সী, নি, ধা, পা, করিয়া কাঠী নামাইয়া আন । এইরূপ প্রত্যহ ৪।৫ বার অভ্যাস করাইলে ভাল হয় । সুরের আরম্ভ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ দৃষ্ট হয় । আজকালকার মত এই যে আরম্ভে সা হইতে উপরের দিক না গিয়া, সী হইতে নীচের দিকে নামিয়া আসাই সুবিধা । যাহাঁ হউক, শিক্ষক যেক্রম সুবিধা মনে করেন তাহাই করিবেন । এইরূপ কয়েকদিন

তাহার নাম 'টুলাইন পাইকা,' তার উপরে ঋ 'এট প্রাইমার এণ্টিক', গা 'এট প্রাইমার', মা 'স্মল পাইকা এণ্টিক', পা 'ইংলিস', ধা 'পাইকা', নি 'স্মল পাইকা', ও সী 'বরজাইস' ।

সা ঋ গা মা'র অভ্যাস হইলে পর ঐরূপ কাঠী সঞ্চালনের দ্বারা ঐ কাগজের উপর সাধা, ঋগা, গামা ইত্যাদি ছুইটী ছুইটী করিয়া ও সাধাগা, ঋগামা ইত্যাদিরূপ তিনটী তিনটী করিয়া সুরের অভ্যাস করাইতে হইবে। একটা হারমনিয়ম সংগ্রহ করিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হইবার কথা।

সুরের কথা ।—সাধা, গামা প্রভৃতি নামগুলি যড়জ (নাসা, কণ্ঠ, উরঃ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছয় স্থান হইতে জাত কেকাতুল্য স্বর), ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত, নিষাদ প্রভৃতি শব্দের সংক্ষিপ্ত মাত্র। আমাদিগের স্বর সহজে যতদূর উঠে উঠে ও সহজে যতদূর নিম্নে নামে, এই সীমার মধ্যের অংশকে সাত ভাগে ভাগ করিয়া, এক একটা সুরের যথাক্রমে যড়জ, ঋষভ প্রভৃতি নামকরণ করা হইয়াছে। এই সপ্তস্বর, যেটী যে ভাব-বাঞ্ছক, নিম্নে তাহা লিখিত হইল :—

সা—গম্ভীর বা উত্তেজক বাঞ্ছক স্বর।

ঋ—উত্তেজক বা আশা উদ্দীপক।

গা—ধীর বা শান্তি বিধায়ক।

মা—কোমল বা ভয়ভক্তি প্রণোদক।

পা—ভয়ঙ্কর বা আনন্দবাঞ্ছক।

ধা—করুণ বা শোকজ্ঞাপক।

নি—হৃদয় বিককারী বা মোহসঞ্চারক।

তবে গানের অর্থের সঙ্গে ও গায়কের গান করিবার কায়দার সঙ্গে সুরের এই সমস্ত ভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এ সমস্ত কথা বালকগণ সহজে বুঝিতে পারিবে না বলিয়া এ বিষয়ের অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

তিনটী গ্রামের (উদারা, মৃদারা, তারা) কথাও একটু বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাল যে সময়পরিমাপক উপায় বিশেষ ইহা বলিয়া দিবে; এবং তালের সহিত সঙ্গত হইলে সঙ্গীত যে মধুর হয়, আর তাল ভগ্নে যে শ্রুতিকটু হয়, তাহা পরীক্ষণের দ্বারা দেখাইবে। কোনরূপ বাস্তবজ্ঞের প্রয়োজন নাই; কেবল একটা কাঠীর দ্বারা টেবিলের উপর (তাল রক্ষার জন্ত) ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করিলেই হইবে। গানগুলির সুরের নাম ও তালের নাম বলিয়া দিবে; সঙ্গীতের দিকে বালকগণের অকুরাগ বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারিলেই হইল—বিদ্যালয়ে গ্রাহকে সমস্ত শিখাইবাব প্রয়োজন নাই, আর সময়ও নাই। তবে সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে অবশ্য সমস্ত বিষয়ের রীতিমত আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

৪ । সূচিশিল্প ।

আবশ্যিকতা ।—বঙ্গ যখন আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু, তখন এই বস্তু রক্ষার উপায় শিক্ষা করা নিতান্তই কর্তব্য। সূচিবিদ্যা জীবিকানির্বাহেরও একটি সহজ সূত্রপায়। অবস্থাপূর্ণ ব্যক্তিদিগের এ বিচার তত আবশ্যক না হইতে পারে, কিন্তু গদ্যবিৎ ও দরিদ্রের গৃহে সূচিশিল্প অন্নব্যঞ্জনের মত নিত্য আবশ্যক। এই শিল্প প্রত্যেক বালিকার শিক্ষা করা কর্তব্য; কারণ গৃহস্থালীতে যেমন তাহাদিগকে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের অশনের ভার লইতে হইবে, তেমনি বসনের ভারও লইতে হইবে। বালকগণেরও এই শিল্প কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক। বোতাম ছিঁড়িয়া গেলে, জামার সেলাই খুলিয়া গেলে, বালিশের খোলার আবশ্যক হইলে, দর্জির আশ্রয় গ্রহণ করা লজ্জার কথা।

আসবাব ।—কাঠের বা টিনের কিসা বেতের একটি ছোট বাক্স। তাহাতে সূঁচ, সূতা, ছুরী, কাঁচি, বোতাম প্রভৃতি উপকরণ থাকিবে। বাক্সটির মধ্যে ছোট ছোট ২৩টা খোপ থাকিলে আরও ভাল হয়। নানা প্রকারের সূঁচ (৫৭৭৭৮ নং) আবশ্যক। যে সূঁচ টিপিলে বাঁকিয়া যায় না তাহাই ভাল সূঁচ। সাদা রঙের ২৩টা রিল, ২৩টা গুঁটা সূতা, ২১টা কাল রিল, একখানা বড় কাঁচী, (কাপড় কাটিবার জন্য) ও একখানি সরু চোট কাঁচী, একখানি ছোট ছুরী, একটি অঙ্গুলি-জাগ, একটি ফিতার গজ, কতকগুলি পিন, একটু মোম ও আবশ্যকমত কতকগুলি বোতাম হইলেই মোটামুটি সেলাইএর আসবাব হইল।

শিক্ষার ধারা ।—প্রথমে বালিকাকে এক টুকরা ছেঁড়া কাপড় দিবে ও একটা সূঁচে সূতা লাগাইয়া তার ডান হাতে দিবে। সে নিজের ইচ্ছামত কাপড়ের ভিতর সূঁচ ঢালাইয়া যেমন তেমন ভাবে সেলাই করিবে। ইহাতে সে সূঁচের ব্যবহার নিজের চেষ্টাতেই কতক

পরিমাণে আয়ত্ত করিতে পারিবে। একপ ৬৭ দিন শিক্ষার পর, তাহাকে আর এক খণ্ড কাপড় দাও আর সেই কাপড়ের উপর নীল পেন্সিল দিয়া একটী সরল রেখা টানিয়া দাও। বালিকাকে এবারী এই রেখার বরাবর সেলাই করিতে বল। এইরূপে আবার ৬৭ দিন চলিয়া গেলে, কাপড়ের উপর একটা লাল পেন্সিল দিয়া দাগ কাটিয়া, সেই লাল দাগের উপর সমান দূরে দূরে নীল পেন্সিলের দ্বারা বিন্দু চিহ্ন দিয়া দাও। এবার বালিকাকে লাল রেখার উপর দিয়া ও কেবল ঐ সকল নীল বিন্দুর মধ্য দিয়া স্ট্রুচ চালাইতে বল। তারপর কাপড়ে একটী বৃত্ত আঁকিয়া দাও ও ছাত্রীকে সেই বৃত্তের দাগের উপর সেলাই করিতে বল। এইরূপে অভ্যাস করাইলেই বালিকার হাত ঠিক হইয়া আসিবে। প্রথমে সাদা কাপড়ের উপর সাদা সূতা দিয়া সেলাই না করাইয়া, কাল সূতার দ্বারা সেলাই করান কর্তব্য; কারণ সাদার উপরে কাল রঙ ভাসিয়া উঠে বলিয়া শিক্ষার্থী তাহার নিজকৃত সেলাইএর সৌন্দর্য্য বা দোষ গুণ সহজেই বুঝিতে পারে। সেলাইএর সময় বালিকার বাহাতে প্রথম হইতেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করিতে শিক্ষা করে, সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যিক। অনেকগুলি বালিকাকে এক সঙ্গে শিক্ষা দিতে হইলে বোর্ডে সেলাইয়ের দ্বারা আঁকিয়া দেখাইতে হইবে।

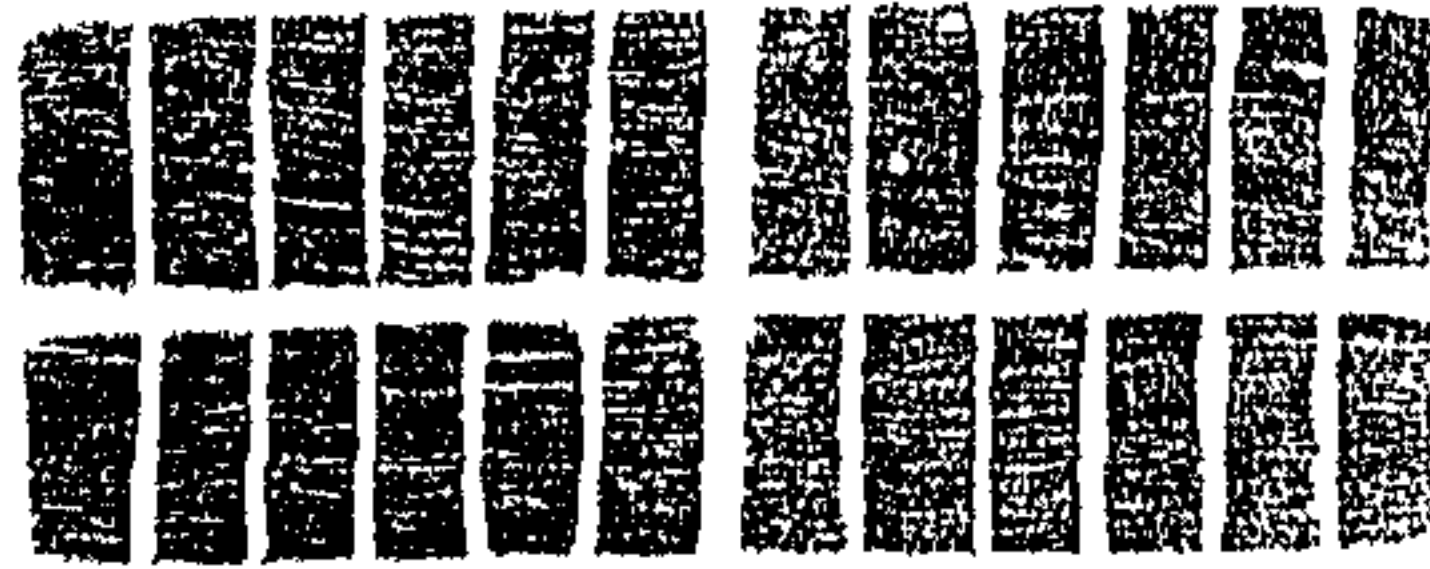
আবশ্যিক সেলাই।—প্রথমে লপ্‌স্কী বা সাদা সেলাই শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। কারণ এইটাই শিক্ষা করা সহজ। তারপর মুড়ি সেলাই ও তৎপর বথিয়া সেলাই শিক্ষা দিলেই সাধারণ কাজ চলিবার মত বিদ্যা হইবে। বোতামের ঘর করা, চুনট করা, মশারির ঝুল ও চাল (ফিতার ভিতর দিয়া) সেলাই করা, বালিশের খোলে বালর লাগান প্রভৃতিপরে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। আর একটা অতি আবশ্যিক সেলাই—রিপু করা। এটা শিক্ষা করা নিত্য প্রয়োজন। ছাঁটের

মধ্যে পুতুলের জামার ছাঁট প্রথমে শিক্ষা দিতে হইবে। তারপর ছোট ছোট পিরান, ফ্রক, বডি, ড্রয়ারস্, সেমিজ ইত্যাদি। ইহা অপেক্ষা অধিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা বা অবসর থাকিলে মোজা বুনান, মোজার রিপু, ক্রমালে নাম লেখা শিখান যাইতে পারে। উলের কাজ তেমন আবশ্যক মনে হয় না। তবে উলের কাজে যে একটা সৌন্দর্য্য বোধ জন্মে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ছোট টুপি, ফ্রক, গলাবন্ধ, মোজা প্রভৃতির কাজ মন্দ নয়। কারপেটের জুতা, আসন, খঞ্চিপোষ প্রভৃতি কার্য্য সুন্দর হইলেও সে সকল কার্য্যে যে পরিমাণ সময় নষ্ট হয় ও যে পরিমাণ চক্ষুর প্রতি অত্যাচার করিতে হয়, তাহাতে সে সমস্ত কার্য্যের অধিক প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। কল্কা কাটা (Embroidery) কাজ এদেশে অনেককাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে—কাজও বেশ। বিড়ালয়ে সূতা দ্বারা ফুল কাটা শিখান যাইতে পারে। লেসের কার্য্যও খুব আদরের। স্কুচ এবং কাঠিম (bobbin) আর আলপিনের সাহায্যে লেস প্রস্তুত শিক্ষা দিতে পারা যায়। কাঠিমের দ্বারা লেস ও কার প্রস্তুতের প্রণালী অত্যন্ত সহজ—একবার দেখিলেই বালিকারা অতি সহজে শিখিয়া লইতে পারিবে।

৫। উদ্যান রচনা।

আবশ্যিকতা।—(১) বাগক বালিকাদিগের সৌন্দর্য্য বোধ বিকশিত করা (২) প্রকৃতির লীলা পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ প্রদান করা (৩) জীবন ধারণের প্রধান সম্বল কৃষিকার্য্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করা (৪) নিজ হস্তে কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া (৫) আর এক উপকার এই হয় যে, এই কার্য্যের প্রতি অনুরক্ত হইলে তাহাদিগের অবসর সময় এই কার্য্যেই ব্যয় করিতে ইচ্ছা হয়, সুতরাং সৎ কার্য্যের অভাবে আর অনায়াস কার্য্য করিবার অবসর পায় না।

শিক্ষাদানের প্রণালী ।—এক খণ্ড জমিতে জাল দিয়া নিম্নের চিত্রানুরূপ ভাগ করিয়া দাও :—



৯২ চিত্র ।—জমি বিভাগ ।

এক ভাগ জমি (পাঠশালার ছাত্রের পক্ষে) যেন ৩ × ৬ হাতের বেশী না হয় । সেই স্থান তাহাকে পরিষ্কার করিতে দাও ; কিরূপে কোদলাইতে হয় (খুব ছোট ছেলের জন্ত নয়), কিরূপে নিড়াইতে হয়, কিরূপে ঘাস বাছিতে হয় দেখাইয়া দাও । তারপর নানারূপ সার সংগ্রহ কর, যথা—পচা গোবর, খৈল, পচা মাছ, ভেড়া ছাগলের নাদি, হাঁস পাঁয়রা, কুক্কুটের বিষ্ঠা, ছাই, উঠান ঝাটুনা, পোড়ামাটি প্রভৃতি । এক এক দল বালককে এক এক রকমের ফুলের বা সবজীর বীজ দাও আর প্রত্যেক বালককে এক প্রকারের সার দাও । বালকেরা জমিতে সার প্রয়োগ করিয়া বীজ রোপণ করিবে এবং রীতিমত জল সেচন করিবে । প্রত্যেক বালকের একখান করিয়া খাতা থাকিবে । তাহাতে প্রত্যহ নিরূপিত সময়ে নিজ-হস্ত-রোপিত বীজোৎপন্ন বৃক্ষের বিষয় (পেন্সিলের দ্বারা) নোট করিবে । নিম্নে এইরূপ নোট করিবার একটা আদর্শ প্রদত্ত হইল ।—

অমুক বীজ—অমুক সার ।

৭।৬।০৭—সন্ধ্যার সময় বপন করিয়া জল দিলাম ।

৮।৬।০৮—অঙ্কুর দেখা দিয়াছে । জল দিয়াছি ।

৯।৬।০৯—অঙ্কুর বড় হইতেছে । জল দিলাম না । বৃষ্টি হইয়াছে ।

১০।৬।০৭—

ঐ । জল দিয়াছি ।

১১।৬।০৭—একটা পাতা খুলিয়াছে । জল দিলান না ।

১২।৬।০৭—আব একটা পাতা দেখ' দিয়াছে । মাটি ভিজা আছে ।

১৩।৬।০৭—একটা জাল পোকায় নূতন পাতাটা নষ্ট করিয়াছে । সেই পোকাটা মারিয়াছি ।

১৪।৬।০৭—গাছ ১ ইঞ্চি বড় হইয়াছে । ছোট ছোট ঘাস তুলিয়া ফেলিলাম ; ইত্যাদি ।

একটী বালককেও ছুই তিন রকমের সার দেওয়া যাইতে পারে । সে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সার প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিতে পারে ।

কোন বীজের কয় দিনে অঙ্কুর বাহির হয়, কয় দিনে গাছ বড় হয়, কয় দিনে একটা পাতা বাহির হয়, কোন সারের কিরূপ শক্তি—এই সমস্ত লক্ষ্য করাইবার জন্ত এই নোটের ব্যবস্থা ।

ছোট ছেলের জন্ত ফুলের টবে বা ছোট ছোট হাঁড়িতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক । একটা টবে কেবল মাটি দিয়া গাছ লাগাও, সার ও জল দিও না । ২য় টবে মাটি ও সার দাও, জল দিও না । ৩য় টবে মাটি আর জল দাও, সার দিও না । ৪র্থ টবে মাটি, সার ও জল দাও । কোন গাছ কিরূপ বাড়িতেছে, তাহা বালকগণকে লক্ষ্য করাও ।

শিক্ষক নিজে ছাত্রগণের সহিত কোদালি না ধরিলে ছাত্রগণকে এই কার্যে ত্রুটি করিতে পারিবেন না । আর শিক্ষক যদি নিজ হাতে যত্ন করিয়া বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে উত্তম ফুল ও সবজীর বাগান রচনা করিতে পারেন, তবে সেই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বালকগণ অতি আনন্দের সহিত এই কার্যে প্রবৃত্ত হইবে । পুষ্পের সৌন্দর্য্য যখন কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন বালকেরা কেন হইবে না ?

নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় কৃত 'সরল কৃষি বিজ্ঞান' (মূল্য ১৮) নামক পুস্তকখানি প্রত্যেক শিক্ষকের পাঠ করা কর্তব্য ।



অষ্টম প্রকরণ—নীতিধর্ম বিষয়ক ।

১। নীতিশিক্ষা ।

কে দায়ী ?—অভিভাবক বলেন যে বালকের স্বভাব চরিত্রের জন্ত শিক্ষক দায়ী, শিক্ষক বলেন যে অভিভাবক দায়ী । শিক্ষক বলেন যে বালকের সহিত যখন তাঁহার কেবল ৫।৬ ঘণ্টা মাত্র সময়ের সম্বন্ধ, তখন অভিভাবকই বালকের চরিত্রের জন্ত দায়ী ; আবার অভিভাবক বলেন যে সেই ৫।৬ ঘণ্টা কাল শিক্ষক বালকের মনের উপর যে পরিমাণ আধিপত্য করিয়া থাকেন, তাহার সহিত তুলনায় ১৮।১৯ ঘণ্টার আধিপত্য অকিঞ্চিৎকর ; সুতরাং শিক্ষকই দায়ী । ফল কথা, উভয়েই দায়ী । শিক্ষকেও উপদেশ কোথায় আসিয়া যাইবে, যদি বালক বাড়ীতে আসিয়া পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীর আচার ব্যবহারে চরিত্রহীনতার দৃষ্টান্ত দেখিতে পায় । আবার পিতা মাতার সহপদেশও সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে, যদি বালক বিদ্যালয়ে যাওয়া শিক্ষকের দোষ জ্ঞাতি প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পায় ।

শিক্ষার উপায় ।—“উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের শক্তি অধিকতর প্রবল”—একথা পুরাতন হইলেও এখন মত । বালকের আত্মীয় বন্ধ বান্ধব প্রভৃতি সকলেই চরিত্রবান হইলে, বালক কখন কুচরিত্র হইতে পারে না । তবে যে ভাল ভাল পরিবারের ছেলেকেও চরিত্রহীন হইতে

দেখা যায় তাহার কারণ এই, পিতা মাতার অসাবধানবশতঃ সে ছেলে কুসঙ্গে মিশিবার সুবিধা পায় । ব্যাপার খুব শক্ত । চারিদিকের পাপ প্রলোভনের দৃষ্টান্তের মধ্যে বালক বালিকাকে সচ্চরিত্র করিয়া রাখা বড়ই কঠিন ।

(১) বালক বাহাতে কুসঙ্গে মিশিতে না পারে তাহার উপায় করা সর্বপ্রধান কর্তব্য । বালক সঙ্গী চায়, সে আমোদ আহ্লাদ চায় ; সে সমস্ত দিন এক প্রকার কার্যে লিপ্ত থাকিতে চায় না, ইহা তাহার প্রকৃতি । সুতরাং তাহার আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে । পিতা মাতা যদি ছেলের সহিত মিলিয়া খেলা করিতে পারেন, তবে ইহার অপেক্ষা সুন্দর ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে ? কিন্তু আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা হওয়া কঠিন । পিতাকে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অন্ন চিন্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, আর মাতা মূর্থ । তবে যে সকল স্থলে একরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর সেখানে সেই ব্যবস্থাই হওয়া কর্তব্য ।

বালক বালিকা বিনা কার্যে থাকিতে চায় না । তাহাদিগকে কেবল ‘পড় পড়’ বলিয়া আবদ্ধ রাখা যায় না বা উচিতও নয় । চিত্রাঙ্কন, মৃত্তিকাদি দ্বারা পুতুল গঠন, কাগজ কাটিয়া ফুল পাতা প্রস্তুত করণ, উদ্ভানে পুষ্প-বৃক্ষাদি রোপণ ও নানারূপ আমোদজনক কার্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখিতে হইবে । কোন কাজ না পাইলেই অত্যাশ কার্য্য করিবে বা কুসঙ্গে মিশিবে ।

(২) চাকর চাকরানীর হস্তে বালক বালিকার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বড় দোষের । তাহারা চরিত্রহীন ও সর্বদা কুৎসিৎ আমোদে এবং গল্পে লিপ্ত থাকে । বালক বালিকাকেও সেই সকল গল্প শুনায়ে ও সেই সকল আমোদের স্থলে লইয়া যায় । অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেরা প্রায়ই এই জন্ত চরিত্রহীন হইয়া পড়ে ।

(৩) চরিত্র উন্নত করিবার একটা প্রধান উপায় সময়নিষ্ঠ হওয়া ।

নির্দিষ্ট সময় ঘুম হইতে উঠিবে, নির্দিষ্ট সময় পড়িতে বসিবে, নির্দিষ্ট সময় স্কুলে যাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক। বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইবার ১০ মিনিট পূর্বে বালক স্কুলে পৌঁছিবে। অনেক পূর্বে স্কুলে যাইয়া গন্দ ছেলেদের সঙ্গে মিশে ও শিক্ষকের নিন্দা বা বিদ্যালয়ের দ্রব্যাদি নষ্ট করে।

(৪) অপরাহ্নে বেড়ান ভাল বটে, কিন্তু প্রায়ই বালকেবা ছুটে ছেলেদের দলে মিশিয়া কুৎসিৎ গল্প বা পরনিন্দায় সময় কাটায়। ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। অভিভাবক নিজে সঙ্গে করিয়া বেড়াইবেন বা পরিচিত ২।১টী ভাল ছেলের সঙ্গে বেড়াইতে দিবেন।

(৫) সন্ধ্যার (প্রদীপ জ্বালান) পরে কোন বালককে বাহিরে থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। কুসঙ্গে মিশিয়া, কুৎসিৎ গানে বা আমোদে লিপ্ত থাকে বলিয়া, ঠিক সন্ধ্যার সময় অনেক বালক বাড়ীতে ফিরিয়া আসে না। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় যে ‘রামের বাড়ী হইতে খাতা আনিতে গিয়াছিলাম বা যত্নকে পাটীগণিত ফিরাইয়া দিতে গিয়াছিলাম’ ইত্যাদি। এ সকল খাতা বা পুস্তক আনিবার কথা প্রায়ই সত্য হয় না।

(৬) যাত্রা, নাটক প্রভৃতির অভিনয় দেখিবার জন্ত বালকগণকে একা ছাড়িয়া দেওয়া বড়ই অনিষ্টজনক। কুসঙ্গে মিশিয়া কুকার্য্য করিবার জন্ত এই সকল স্থানই উপযুক্ত ক্ষেত্র। অনেক সময় দেখিতে না দেওয়াই ভাল। তবে ভাল যাত্রা, নাটক হইলে অভিভাবক নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারেন।

(৭) অপরাহ্নে অর্ধ ঘণ্টার অধিক ক্রিকেট, ফুটবল, কি হাডু ডুডু মত খেলায় লিপ্ত থাকিতে দিবে না। অনেকক্ষণ খেলা করিয়া একরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে সন্ধ্যাবেলা পড়িতে পারে না। অতি সন্ধ্যাই ঘুমাইয়া পড়ে।

(৮) বৃথা গল্প বা তর্ক করিতে শুনিলে তখনই থামাইয়া দিবে । ইহাতে চরিত্র নীচ হইয়া পড়ে । নাটক, নভেল পাঠে ভাষার বোধ জন্মে বটে, কিন্তু চরিত্রে ভোগ বাসনা প্রবল হইয়া উঠে । তবে যে সমস্ত নভেল পাঠে এরূপ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহা পড়িতে দেওয়া যাইতে পারে ।

(৯) অভিভাবকের উদাসীনতায় অনেক বালক নষ্ট হইয়া যায় । নিজে আফিস হইতে আসিয়াই পাশা খেলায় বসিলেন । রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত খেলাই চলিল । ছেলে কি করে না কবে তার খোঁজ নাই । নিজের নিকটে বসাইয়া পড়াইতে হইবে, আর মধ্যে মধ্যে শিক্ষকের নিকটও খোঁজ লইতে হইবে । কিরূপ সঙ্গে মিশে তাহাও অনুসন্ধান করিতে হইবে । যে দিনের যে কাজ সে দিন তাহা সম্পন্ন করিল কি না, ইহা প্রত্যহ খোঁজ লওয়া আবশ্যক ।

(১০) অনেক অভিভাবক আবার অতি শাসনে ছেলে নষ্ট করিয়া থাকেন । দিনরাত কড়া কথা, দিনরাত মার মার ;—রাত্রিদিন চোখ রাঙ্গান অতি অনিষ্টকর । আদরের সঙ্গে শাসন চাই । আদরের মাত্রাই আবার অধিক হওয়া আবশ্যক । যে অভিভাবককে বালক উত্তম খেলার সাথী মনে করে, তিনিই প্রকৃত অভিভাবক ।

বন্ধু বান্ধবের নিকট পুত্র কন্যার সুখ্যাতি ভিন্ন কখনও অখ্যাতি করিবে না । পুত্র কন্যার যে কিছু সামান্য গুণ দেখিতে পাও, তাহাই লক্ষ্য করিয়া প্রশংসা করিবে । নিন্দা একেবারেই করিবে না । এইরূপ সুখ্যাতি শুনিতে শুনিতে আরও সুখ্যাতি শুনিবার অল্প সম্ভাবনার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে । সুতরাং সে কেবল সুখ্যাতিকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে চেষ্টা করিবে । ইহা পরীক্ষিত সত্য ।

(১১) অনেক অভিভাবক নানা কারণে বাধ্য হইয়া উপশিক্ষক (প্রাইভেট টিউটর) নিযুক্ত করেন । এরূপ শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইলে অল্প বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত করিতে নাই । হয় অধিক বেতন দিয়া ভাল

শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে, না হয় একেবারেই নিযুক্ত করিবে না। অল্প বেতনের শিক্ষকের দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। ছেলে কম পড়ে, সুতরাং অল্প বেতনের একজন যেমন তেমন লোক হইলেই চলিবে—ইহা মারাত্মক বিশ্বাস। যেমন তেমন শিক্ষক পড়া পড়াইতে ত পারিবেই না, অধিকন্তু ছেলেটীর মাথা খাওয়া যাইবে। ছোট ছোট ছেলে শিখানই শক্ত।

(১২) বালকগণকে বিলাসী হইতে দিবে না। ভাল জামা, ভাল মোজা, ভাল জুতা পরিব; আতর ল্যাভেণ্ডার ও সুগন্ধি তৈল মাখিব; মাথার উপরে নানারকমের সিঁথি কাটিব ইত্যাদিরূপ আবদারের প্রশ্রয় দিতে নাই। সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতে না দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। অনস্থা বিবেচনায় সাধারণ জামা, কাপড়, মোজা, ব্যবহার করিতে দিবে। মাথার চুল খুব ছোট করিয়া কাটিবে। বিলাসিতায় সময় নষ্ট হয় ও মনকে কলুষিত করে।

(১৩) আহাৰাদি সম্বন্ধেও সাবধান হওয়া কর্তব্য। আহাৰের মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্তব্য নহে। পুত্র এবার মেট্রিক পরীক্ষা দিবে, অতএব তিন বেলা তাহাকে লুচী মোহনভোগ খ ওয়াইতে হইবে—ভুল ধারণা। স্বল্প আহাৰেই বুদ্ধি সতেজ হয়। যাহারা অধিক শারীরিক পরিশ্রম করে তাহাদের অধিক আহাৰের প্রয়োজন বটে। অধিক মিষ্ট বা অল্প দ্রব্য ভক্ষণে যে কেবল শারীরিক রোগ জন্মে তাহা নহে, বুদ্ধিবৃত্তিও নষ্ট হইয়া যায়। আবার অধিক মিষ্ট দ্রব্যাদি খাইলে মিষ্ট খাইবার জন্ত একটা নেশা হইয়া পড়ে। অনেক বালক শেষে পয়সা চুরি বা দোকানে দেনা করিয়া সন্দেহ খাইতে আরম্ভ করে।

যাহা বলা হইল সে সমস্ত বিষয়ে অভিভাবকের দায়িত্বই অধিক। শিক্ষকের কর্তব্য বিষয়ে ‘সুশাসন’ পরিচ্ছেদে অনেক কথা বলা হইয়াছে। বালককে সর্বদা কার্যে নিযুক্ত রাখাই যে তাহাকে চরিত্রবান করার এক

মাত্র উপায় তাহাও কথিত হইয়াছে । বিদ্যালয়ের নিয়মিত ৪।৫ ঘণ্টার পরও শিক্ষক বালকগণকে লইয়া অন্য কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকিতে পারেন । অপরাহ্নে ব্যায়ামাদির চর্চা করা যাইতে পারে বা খেলারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । অবসর দিনে বালকগণকে দিয়া কবিতা প্রভৃতির আবৃত্তি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিনয় করান যাইতে পারে । মধ্যে মধ্যে বালকগণকে সঙ্গে করিয়া কোন সুন্দর স্থানে বেড়াইতে যাওয়া উত্তম প্রথা ; ইহাতে শিক্ষা ও আমোদ দুইই হয় । সভা সমিতিতেও বালকগণকে ব্যাপ্ত রাখিতে পারা যায় । বিদ্যালয়ের সভা সমিতিতে যে বালকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক যোগদান করে না, তাহার প্রধান কারণ এই যে শিক্ষকগণ সভাকেও বিদ্যালয়ের রচনা শিক্ষার শ্রেণী বিবেচনা করিয়া, সভাতে কেবল রচনার পারিপাট্য ও ব্যাকরণ গত ভুল লইয়া বাস্তব হইয়া পড়েন । সভায় অভিনয় হইবে, কবিতার আবৃত্তি হইবে, হাসির গল্প হইবে, গান হইবে, কৌতুক প্রদর্শন হইবে ও এইরূপ নানা আমোদের ব্যবস্থা থাকিবে । ইহার সঙ্গে সঙ্গে রচনা, বক্তৃতা প্রভৃতিও থাকিবে ।

কোন কোন শিক্ষক বালকগণের নৈতিক বৃত্তির উন্মেষকল্পে এইরূপ আদেশ করিয়া থাকেন ; যথা—বাড়ীতে, বিদ্যালয়ে, পথে বা খেলিবার মাঠে যে সকল ঘটনায় নিম্নলিখিত গুণের একটীর বা একাধিকের পরিচয় পাইবে, সেই সকল ঘটনার সংক্ষেপ বর্ণনা লিখিয়া রাখিবে : - সত্যানুরাগ, সহানুভূতি, সদাচার, সততা, সংসাহস, স্বার্থত্যাগ, সহিষ্ণুতা, স্বদেশানুরাগ ইত্যাদি । শিক্ষক সপ্তাহে একদিন সমস্ত বর্ণনা পাঠ করেন ।

কেমন করিয়া বালকের চরিত্র রক্ষা করিতে হইবে তাহাই লিখিত হইল । তাহার চরিত্র কিস্তিপে উন্নত করিতে হইবে তাহা বলা কঠিন । ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিতে এই বিষয়ের যথেষ্ট উপদেশ ও উপায় নির্দিষ্ট আছে । সে সমস্তের কিস্তিপে অয়োগ করিলে বালকগণের চরিত্র উন্নত হইবে তাহা ধর্মোপদেশক বলিতে পারেন । বিদ্যালয়ে এ পর্য্যন্ত সে ব্যবস্থা হয় নাই , আগরাও জানি না ।

২ । ধর্ম ।

আবশ্যকতা ।—বাল্যকালে মন সরস ও নমনীয় থাকে । এই সময়ে ধর্মের বীজ রোপণ করিতে পারিলে যে স্নফল ফলিবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । যদি চরিত্রের ভিত্তিতে ধর্মভাব না থাকে, তবে কেবল শুষ্ক নীতির সাহায্যে চরিত্র নিষ্ফলক রাখা স্ককঠিন । এইজন্য বিদ্যালয়ে ধর্মালুশীলন নিতান্ত আবশ্যক ।

শিক্ষার প্রণালী ।—বিদ্যালয়ে কি প্রণালীতে ধর্মালুশীলনের শিক্ষা প্রদান করিলে স্নফল লাভ করিতে পারা যাইবে তাহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই । খৃষ্টানদিগের বিদ্যালয়ে প্রার্থনা হয়, বাইবেল পড়া হয় ও তাহার ব্যাখ্যা করা হয় । কানীর হিন্দু কলেজের (শ্রীমতী আনৌ বেসান্তের) জন্ত কতকগুলি শ্লোক সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করা হইয়াছে । সেখানে ঐ পুস্তকের পাঠ ও ব্যাখ্যা হয় । আর প্রত্যেক ছাত্রকে রীতিমত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে হয় । শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোলপুর বিদ্যালয়েও রীতিমত উপাসনা বন্দনাব ব্যবস্থা আছে । আর রবীন্দ্র বাবু নিজে প্রত্যহ ধর্মোপদেশ প্রদান করেন । আলিগড় কলেজের মুসলমান ছাত্রগণকে রীতিমত নমাজ করিতে হয় । আর সেখানেও মধ্যে মধ্যে কোরাণসরিফ কি অন্য ধর্ম গ্রন্থাদির পাঠ ও ব্যাখ্যা হয় । গুরু-কুল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে রীতিমত ব্রহ্মচর্যের পালন করিতে হয় । যাহা হউক, এই সমস্ত দৃষ্টে আমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছি যে, বালকগণ যাহাতে রীতিমত ধর্মালুয়ায়ী দৈনিক উপাসনা বন্দনা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে সে বিষয়ে শিক্ষকগণকে যত্নবীল হইতে হইবে । কিন্তু শিক্ষক নিজে ধর্মালু না হইলে বালকগণকে কেবল উপদেশের দ্বারা কার্য নিয়োগ করিতে পারিবেন না । এ সমস্ত বোর্ডিং স্কুলের ব্যবস্থা । ডে স্কুলের ছাত্রগণের জন্ত শিক্ষক অপেক্ষা অভিভাবক অধিকতর দায়ী ।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া অসম্ভব । বিশেষ আমাদের দেশে । কোন্ ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হইবে ? শাক্ত না বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম না খৃষ্টান, বৌদ্ধ না জৈন, সিয়া না সূন্নি ? বিদ্যালয়ে কোন ধর্ম বিশেষ লইয়া তর্ক করিতে হইবে না । যে বালক যে ধর্ম-সম্প্রদায় ভুক্ত, তাহাকে সেই ধর্মালুয়ারী দৈনিক সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে বাধ্য করিবে মাত্র । কোন বালক তর্ক করিতে আসিলে, তাহাকে কঠোর শাসনে তর্ক হইতে নিবৃত্ত করিবে । ধর্ম বিষয়ে তর্ক বিচারাদির সময় বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর ।

কিছুদিন পূর্বেও দেখিয়াছি যে, ঠাকুরমার সঙ্গে নাতি নাতিনীরা অতি প্রভুাবে “ঠাকুর তুমি কালো, আমার কর ভালো” প্রভৃতি সরল কবিতা আবৃত্তি করিয়াছে । ছেলেরা এখন ঘুম থেকে “খাব খাব” করিয়া উঠে, আর সমস্ত দিনেও সে খাওয়া মিটে না । মিটিবেও না । যা’ক সে কথা—ছোট ছোট ছেলেদিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় বন্দনাপূর্ণ ছোট ও সরল কবিতা আবৃত্তি করাইবে । নিম্নে এইরূপ একটি কবিতার আদর্শ প্রদত্ত হইল :—

তুমি ভালবাস ব’লে, কত স্থখে থাকি
ব্যথা পেলে কর কোলে, যেই আগি ডাকি ।
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি দয়াময়,
ন’ চাহিতে দয়া করে, দাও সমুদয় ।
আশীর্বাদ কর যেন জীবন ভরিয়া,
তোমারে বাসিতে ভাল, না যাই ভুলিয়া ।
কুকথা না শূপে আনি, লোভে নাহি পড়ি,
বিবাদ কাহার সনে কভু নাহি করি ।
ভক্তি করি গুরুজনে, কাজে রাখি মন,
কুসঙ্গীর সনে যেন না মিথি কখন ।

তুমি থেকে সাথে সাথে, চালাও আমারে,
ভক্তি ভরে ভগবান, প্রণমি তোমারে ।

রয়েকটি ভাগ্যশিশুকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় এইরূপ একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে শুনিয়েছিলাম । শিলচর নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের হোস্টেল নিবাসী হিন্দু ছাত্রগণ সোমবার প্রাতে সমবেত হইয়া সমস্তরে মহানির্ঝরণ তন্ত্রের "নমস্তে সতে সর্ব লোকাভ্যায়" শ্লোক পাঠ করে, ও মুসলমান ছাত্রগণ শুক্রবার প্রাতে সেকেন্দরনামার অন্তর্গত "খোদায় তোহা পাদশাহী তুরাত্ত" নামক শ্লোক পাঠ করে । যাহারা কোনরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা অন্ততঃ প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্বধর্মানুযায়ী সন্ধ্যাবন্দনা করে ; আর যাহারা কোনরূপ দীক্ষা গ্রহণ করে নাই তাহারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিশ্চন্দে উক্ত শ্লোক পাঠ করে । শিক্ষকগণের অনুরোধে এবারে এই শ্লোক দুইটি তৃতীয় পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল ।

নীতি ধর্ম-বিষয়ক কতকগুলি ছোট ছোট বচন বা কবিতা মুখস্থ করাইলে অনেক সময় তাহার দ্বারা উপকারই হইয়া থাকে । যখন পাপ প্রলোভন বা নিরাশা পথভ্রষ্ট করিতে চায়, তখন সে সাধুবচনগুলি মনের মধ্যে উদিত হইয়া পথভ্রষ্ট হইতে দেয় না । সেকালে হিন্দুর ঘরে চারণক্যলোক, মোহমুদগর, গঙ্গাস্তব প্রভৃতি মুখস্থ করাইবার রীতি ছিল । মুসলমান সম্প্রদায়ে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কবি জালাল উদ্দিনের কবিতার বিশেষ আদর ছিল । এখন কবিতা মুখস্থ করাইবার তেমন ব্যবস্থা বা প্রবৃত্তি দেখা যায় না । কিন্তু এখন উত্তম বাঙ্গালা কবিতার অভাব নাই—ছোট বড়, মহজ কঠিন, সকল রকম কবিতাই আছে । ছোট ছেলেদের উপযোগী এইরূপ একটি কবিতার দৃষ্টান্ত দিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিলাম :—

আকাজক্ষা ।

যা পেয়েছ তাই ভাল বেশী কেন আর
বহু লোকে পায় নাই অর্ধেক তোমার ।
তারা যদি সুখী তবে তুমি কেন হায়
পেলেনা পেলেনা বলে কঁাদ নিরাশায় ॥



নবম প্রকরণ—নানা বিষয়ক ।

১। পাঠনার নোট লিখিবার পদ্ধতি ।

শিক্ষকগণ কোন বিষয় শিক্ষা দিবার পূর্বে সেই বিষয় সম্বন্ধে উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া বালকগণের শিক্ষাদানের নির্মিত উপযুক্ত তত্ত্ব ও প্রশংসনীয় নির্ধারণ করিয়া থাকেন এবং শ্রুতির সাহায্যার্থে সেই সমস্ত সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন । এই লিপিকেই পাঠনার (পড়াইবার) নোট (টোকা) বলে । ইহার সাহায্যেই শিক্ষক পরিপাটীরূপে শ্রেণীর অধ্যাপনা কার্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হন ।

পাঠনার নোট প্রস্তুত করিতে হইলে শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি উত্তমরূপে জানা আবশ্যিক । নূতন শিক্ষকের পক্ষে প্রথম প্রথম উত্তম নোট প্রণয়ন কিঞ্চিৎ কষ্টকর হইতে পারে, কিন্তু কিছুদিন শিক্ষকতা কার্য করিলে এবং নোট প্রস্তুতের চেষ্টা করিলে বিষয় অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া যায় ।

শিক্ষাদানের নোট সাধারণতঃ দুই প্রকারে লিখিত হইয়া থাকে । এক বিস্তৃত নোট, অপর সংক্ষিপ্ত নোট । পরীক্ষা-কাগজে বিস্তৃত নোট লেখা রীতি, কারণ পরীক্ষক সেই নোট দেখিয়া পরীক্ষার্থীর জ্ঞান ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া থাকেন । আর শিক্ষকতা কার্যের অন্ততঃ প্রথম তিন বৎসর বিস্তৃত নোট লেখাই কর্তব্য ; কারণ এই সমস্ত নোট দৃষ্টেই পরিদর্শকগণ নূতন শিক্ষকের উপযুক্ততার বিচার করিয়া থাকেন ।

যদি এক বৎসর চেষ্টা করিয়া নোট প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে আর অগ্ৰাণু বৎসর বড় একটা বেগ পাইতে হয় না। নোটের খাতার এক পৃষ্ঠা করিয়া লেখা উচিত, অপর পৃষ্ঠা সাদা থাকিবে। শিক্ষকতা কার্যের অভিজ্ঞতার সঙ্গে, পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা মনে আসিয়া থাকে। সময় সময় আবার কার্যক্ষেত্রেও অনেক অচিন্তাপূর্ব্ব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে, নোট প্রস্তুতের সময় বালকদিগের যে অভাব অনুমান করিয়া প্রণালী নির্ধারণ করা হয়, কার্যকালে হয়ত অগ্ৰরূপ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং নূতন প্রণালী উদ্ভাবনের আবশ্যিকতা হইয়া থাকে। সাদা পৃষ্ঠায় এই সকল নূতন কথা লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

লিখিবার নিয়ম।—শিক্ষাদানের নোট প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

(১) শ্রেণী—বালকগণের পূর্ব্বজ্ঞান বিবেচনা করিয়া নোট প্রস্তুত করা আবশ্যিক। যাহারা সুদক্ষ জানে না, তাহাদিগকে কোম্পানি-কাগজ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পাবে না। শিক্ষাদানের ভাষা, দৃষ্টান্ত, প্রণালী প্রভৃতিও বালকগণের অবস্থানুযায়ী করা আবশ্যিক।

(২) সময়—শ্রেণী ও পাঠ্য বিষয়ের বিবেচনায়, সময় নির্ধারণ করিয়া, সেই সময়ের উপযুক্ত পাঠনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ২০, ৩০ কি ৪০ মিনিটের উপযুক্ত নোটই সাধারণতঃ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। সময়ের পরিমাণ বুঝিয়া পাঠনার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে, বরং একটু কম হইলে তত ক্ষতি হয় না; কিন্তু অল্প সময়ে অধিক পাঠ দেওয়া অত্যন্ত অনিষ্টকর।

(৩) বিষয়—বিষয় শ্রেণীর উপযুক্ত হওয়া আবশ্যিক। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীতে, একটাবিষয় ও পড়ান যাইতে পারে—কেবল বিষয়ের 'সাধারণ ভঙ্গুর' ও 'প্রণালীর' পরিবর্তন করা আবশ্যিক। 'তুল্যদণ্ডের' বিষয় নিম্ন

শ্রেণীতে শিক্ষা দিতে হইলে, একটা দাঁড়িপাল্লা ও এক প্রস্ত বাটকারা আনিয়া কোন জিনিস মাপিয়া, তাহার ব্যবহার দেখান যাইতে পারে । কিন্তু, সেই বিষয় উচ্চ শ্রেণীতে পড়াইতে হইলে তুল্যদণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার বিষয় (ভারমধ্য, বলমধ্য, আশ্রয়মধ্য) শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ।

(৪) উদ্দেশ্য—প্রত্যেক দিনের শিক্ষাদানে, একটা প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের প্রতি লক্ষ্য থাকা আবশ্যিক । সাহিত্য শিক্ষায় আজ বহুব্রীহি সমাস শিখাইব, আর এই এই শব্দের অর্থ শিখাইব ; পাটীগণিত শিক্ষায় আজ ভগ্নাংশ কথার অর্থ বুঝাইব ইত্যাদি । এক পাঠে একটা বা দুইটির অধিক উদ্দেশ্য লইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য নহে । কর্মসম্পাদনের আলোচনা দুই চারি দিন হইলে, তাহার পর বহুব্রীহি আরম্ভ করা যাইতে পারে । এইরূপ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া নোট প্রস্তুত করা আবশ্যিক । এই উদ্দেশ্যের কথা নোটের কাগজে লিখিয়া রাখিতে হয় ; অনেক সময় কেবল বিষয় উল্লেখই উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা হইয়া থাকে ; যথা, বিষয় ‘সবুজ ও কমলা রং’, উদ্দেশ্যও তাই ; সবুজ ও কমলা রং শিক্ষা । এরূপ স্থলে উদ্দেশ্য উল্লেখ না করিলেও চলে ।

(৫) উপকরণ—শিক্ষাদানে যে সমস্ত উপকরণ আবশ্যিক, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে ও পাঠনার নোটে একটা একটা করিয়া লিখিতে হইবে । বোর্ডের ব্যবহার আবশ্যিক মনে করিলে, উপকরণের মধ্যে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যিক । অনাবশ্যিক উপকরণ বা অতিরিক্ত উপকরণ সংগ্রহ করিবে না । আর শ্রেণী বিবেচনায় উপকরণের আবশ্যিকতা নির্ধারণ করিবে । ‘বিছালোক-সম্পন্ন-হৃদয়-কুটীর’ বুঝাইবার জন্য দেশালাই ও নোমবাতির আবশ্যিকতা নাই ; কারণ যে শ্রেণীর জন্য উক্ত অংশের নোট লিখিতে হইবে, তাহারা আলোকের কার্য জানে ও বুঝে । (১ম পাঠনার নোট দেখ) ।

(৬) সূচনা বা উপক্রমণিকা—বিষয়ের প্রতি বালকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্ত (সময় সময়) পাঠনার প্রারম্ভে নানারূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যিক হইয়া থাকে । বিষয় ভেদে এই প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন । সাহিত্য শিক্ষায়, পাঠের সংক্ষিপ্তসার বলিয়া বা গ্রন্থকার সম্বন্ধে কোন ঘটনা বলিয়া বা পাঠসংস্পৃষ্ট ক্ষুদ্র গল্প করিয়া, পাঠনা আরম্ভ করা যাইতে পারে । পাঠীগণিত শিক্ষায়, প্রায়ই দুই তিনটি মানসিক অঙ্কের অনুশীলন করাইয়া কার্য আরম্ভ করা হয় । ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষায়, পূর্বদিনের পাঠ সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠ আরম্ভ রীতি । বস্তুবিচার শিক্ষায়, নির্দিষ্ট বস্তু বা তাহার প্রতিকৃতি বা ছবি উপস্থিত করিয়াই বালকগণের চিত্তাকর্ষণ করা যাইতে পারে । তবে এ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই ; অবস্থা বিশেষে ও শিক্ষকের দক্ষতা অনুসারে ‘উপক্রমণিকা’ বহু প্রকার হইতে পারে । কেবল ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে, উপক্রমণিকাতে ২ হইতে ৫ মিনিটের অধিক সময় নষ্ট না হয় । আর উপক্রমণিকা না হইলেও যে বিশেষ কোন দোষ হয় তাহাও নহে । কোন কোন পাঠে উপক্রমণিকা একেবারেই আবশ্যিক হয় না ।

(৭) বিষয় বিভাগ — পাঠনার বিষয়টিকে শৃঙ্খলার সহিত ভাগ করিয়া লইতে হইবে । এক ভাগ শিক্ষা দেওয়া হইলে, অপর ভাগ আরম্ভ করিবে । এইরূপ ভাগ যেন সংখ্যায় খুব অধিক না হয় ; যথা, ভারতবর্ষের নদীর বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে, ইহাকে এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) বিদ্যা পর্বতের উত্তরাংশের নদী (২) বিদ্যা পর্বতের দক্ষিণাংশের নদী (৩) নদীর গতি (৪) নদীর উপত্যকা বা বেসিন (৫) প্রধান প্রধান শাখা নদী (৬) নদীতীরস্থ প্রধান প্রধান নগর (৭) বাণিজ্যাদির সুবিধা ও অসুবিধা ।

(৮) পদ্ধতি—বিষয়ের প্রত্যেক বিভাগ শিক্ষা দিবার পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখিতে হইবে । পদ্ধতি লিখিতে এই কথা মনে রাখা বিশেষ

আবশ্যক যে, জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যে অজ্ঞাত, সরল বিষয়ের সাহায্যে জটিল, নিকটস্থ বস্তুর সাহায্যে দূরস্থ বস্তু ও বর্তমানের সাহায্যে ভূত ভবিষ্যৎ শিক্ষা দিতে হইবে ।

(৯) পুনরালোচনা—পাঠনা কালে যে সমস্ত নূতন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইল, তাহার মধ্য হইতে অত্যাবশ্যক অংশ বাছিয়া লইয়া, সেই সম্বন্ধে পাঠের শেষে (২ হইতে ৫ মিনিট কাল) পুনরালোচনা করা আবশ্যক । পুনরালোচনার উদ্দেশ্য বালকের স্মরণ ও বোধশক্তির পরীক্ষা করা এবং বিষয়ের অত্যাবশ্যক অংশে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করা ; এইজন্ত পুনরালোচনায় কেবল কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় ।

(১০) বোর্ডের ব্যবহার—প্রায় প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষাতেই উপযুক্ত-রূপ বোর্ডের ব্যবহার আবশ্যক । পাঠনা কালে বিশেষ আবশ্যকীয় শব্দ, সূত্র, সিদ্ধান্ত বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে । আর পাঠ বিশদীকরণার্থ আবশ্যকমত নানা চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে । নোট সেই সমস্ত শব্দ, সূত্র, সিদ্ধান্ত এবং চিত্রাদির উল্লেখ থাকা আবশ্যক ।

পঞ্চাঙ্গ পদ্ধতি ।—নোট লিখিবার আর একটি বিস্তৃত পদ্ধতি আছে ; ইহাকে “পঞ্চাঙ্গ পদ্ধতি” বলে । নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল । এ পদ্ধতিও উত্তম, তবে নূতন শিক্ষকের পক্ষে তত সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না । যাহা হউক, পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে নোট লিখিতে শিখিলেই এই পদ্ধতি অনুসারে নোট লেখা শক্ত হইবে না । এই পদ্ধতি নিম্নলিখিত পাঁচ অংশে বিভক্ত :—

১ । প্রবেশ ।—বালকের পূর্বজ্ঞাত বা পরিচিত বিষয়াদির একরূপ উল্লেখ করিতে হইবে যে, বালক নূতন বিষয় বুঝিতে যেন সেই বিষয়গুলির সহায়তা পাইতে পারে । কিরূপে বালকের পূর্বজ্ঞানের সহিত নূতন বিষয়ের সংযোগ করিতে হইবে, তাহা শিক্ষককে বিশেষ বিবেচনা পূর্বক নির্ধারণ করিতে হইবে । ইহাই সাধারণ পদ্ধতির উপক্রমণিকা বা সূচনা ।

২ । প্রদান ।—শিক্ষক বিষয়ের নূতন তত্ত্ব সম্বন্ধে বালককে শিক্ষাদান করিবেন । কিন্তু সাবধান, যেন নূতন তত্ত্ব শিখাইতে গিয়া কেবলমাত্র কতকগুলি নূতন শব্দ শিখাইয়াই শিক্ষক সন্তুষ্ট না হন । প্রদানের উদ্দেশ্য নূতন জ্ঞান প্রদান ।

৩। প্রকাশ।—বালককে যে সকল নূতন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইল, সেগুলি কিরূপে উপযুক্ত ও পরিমিত ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে, তাহাও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এখানে ক্রতক ‘আদানের প্রথা’ অবলম্বন করিতে হইবে।

৪। প্রসঙ্গ।—কোন পরিচিত পদার্থ বা ঘটনার সহিত সংযোগ করিতে পারিলে, নূতন বিষয় মনে রাখিবার সুবিধা হয়। বালকের স্মৃতির সাহায্যার্থে এরূপ উপায় অবলম্বনীয়। নিঃসংশয় বিষয়েও স্মৃতির সাহায্য হইয়া থাকে, যেমন কোন কথার স্মরণার্থ চাপরে গেরো দিয়া রাখা হয়। এখানে গেরোর সহিত বিষয়ের কোন সাদৃশ্য থাকে না বটে, কিন্তু গেরো দেখিয়া কি ঘটনা স্মরণ করিতে হইবে, তাহাই চিন্তা করিবার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইহাই ভাব প্রসঙ্গ।

৫। প্রয়োগ।—বালক যে যে বিষয় শিক্ষা করিবে, তাহার প্রয়োগ আবশ্যক। পাটীগণিতের নিয়ম অঙ্কে প্রয়োগ করিবে, ব্যাকরণের নিয়ম পদ বিছাসে বা পদ-রচনায় প্রয়োগ করিবে, পদার্থ পরিচয়ের বিষয় রচনায় লিপিবদ্ধ করিবে বা বস্তুবিচারে প্রয়োগ করিবে, বিজ্ঞানের বিষয় পরীক্ষণে প্রয়োগ করিবে ইত্যাদি। বাস্তবিক পক্ষে যদি উপার্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করিতে না শিখিল, তবে সে জ্ঞানের কোনই আবশ্যকতা নাই।

এইগুলি নোট লিখিবার নিয়ম।—নোট লিখিবার নানারূপ ধারা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে নানা বিষয়ের নোট প্রদত্ত হইল :—

১। গদ্য-সাহিত্য।—সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যে প্রণালীতে শিক্ষাদানের নোট লিখিয়া থাকেন, নিম্নে তাহারই আদর্শ প্রদত্ত হইল। আবশ্যকমত ইহা অপেক্ষাও অল্প কিছু সংক্ষেপ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে নবীন শিক্ষকের সুবিধা হইবে না।

অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত চারুপাঠ তৃতীয় ভাগের “সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতে তারতম্য” প্রবন্ধের নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ পড়াইতে হইলে যেরূপ নোট আবশ্যক তাহার আদর্শ :—

জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব। বিদ্যার কি মনোহর মূর্তি। বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নয়। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষায় যত উৎকৃষ্ট জ্ঞান-জনিত বিগুহ্ব স্থখ ইন্দ্রিয়জনিত সামান্য স্থখ অপেক্ষা তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্লধামিনীর সহিত অসাবিতার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যা-লোক সম্পন্ন সূচার চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান-ভিম্বিত হৃদয়-

কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয় । অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট স্থখে ও নিকৃষ্ট কার্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া নিকৃষ্ট স্থখাধিকারী নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে গণনীয় হয়, অশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞান-জনিত ও ধর্মোৎপাদ্য পরিপূর্ণ স্থখ সম্ভোগ করিয়া আপনাকে ভুলোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিয়া থাকেন । এই উভয়ের মনের অবস্থা ও স্থখের তারতম্য পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উভয়কে একজাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া স্বকঠিন ।"

—:—

মধ্য শ্রেণী ।

বিষয়—গল্প সাহিত্য ; উদ্দেশ্য—জ্ঞানোপার্জনে বালকগণের

উৎসাহ বৃদ্ধি করা ।

সময়—৪০ মিনিট ।

উপকরণ—ব্ল্যাকবোর্ড ও চক ।

বিষয়	পদ্ধতি
উপক্রমণিকা	"স্বদেশে পূজাতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজাতে" কেন ? বিজ্ঞান-গগন দরিদ্র কিম্ব তঁাহার বন্ধু পাইকপাড়ার রাজা ধনী ছিলেন ; কাহার প্রভাব বেশী ? ইত্যাদি ।
১ । শকার্থ ও ব্যাখ্যা	জ্ঞান বিজ্ঞান ফলস্বরূপ ; বিজ্ঞান জ্ঞানলাভের উপায় । আবার
জ্ঞান ও বিজ্ঞান—	"বিদ, জ্ঞানে ।"
বিজ্ঞানহীন মনুষ্য	বিজ্ঞানহীন মনুষ্য মনুষ্যই নয়, তবে কি ? কেন ?
পৌর্ণমাসী প্রভৃতি	মনের গৌরব কি ? আর দেহের গৌরব কি ?
	পূর্ণ মাস—মাস পূর্ণেই-পূর্ণ চন্দ্র—ফ ও ঈপ্ ।
	সুখাময়ী শুক্লশামিনী, অজ্ঞান-তিমিরাবৃত—অর্থ ও সমাস ।
অজ্ঞানতার দৃষ্টান্ত	অজ্ঞানতা যদি তিমির সদৃশ, তবে জ্ঞান কি ? কেন ?
	লক্ষ্যে বাক্যগণ বাক্য করে, পৃথিবী ত্রিকোণ ও গজকচ্ছপের উপর অবস্থিত, সূর্য্যই ঘুরিতেছে, রাহু চন্দ্রকে গিলিয়া ফেলে ইত্যাদি ।

বিষয়	পদ্ধতি
চিত্ত-প্রাসাদ ও হৃদয়- কুটীর— পৌর্ণ মাসীর— প্রতীয়মান হয়	প্রাসাদ = বৃহৎ অট্টালিকা—সজ্জিত, আলোকিত । কুটীর = ক্ষুদ্র গৃহ—অপরিষ্কার ও অন্ধকার । কাহার সহিত কাহার তুলনা ? অলঙ্কার ? বাক্যের ভাবার্থ কি ?
নিকৃষ্ট স্বর্থ ও নিকৃষ্ট কার্য	ইন্দ্রিয়াদির অপরিমিত পরিভূষ্টি সাধনে যে স্বর্থ । অতি ইতর রস তামাসায় যে আনন্দ । নিকৃষ্ট কার্য, যথা—চুরি, ডাকাতি, পরহিংসা, পরগীড়া, পরনিন্দা, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাকথন ইত্যাদি । অশিক্ষিত ব্যক্তি কেন নিকৃষ্ট স্বর্থ ও নিকৃষ্ট কার্যে রত থাকে ? শিক্ষিত থাকে না কেন ?
জ্ঞানজনিত স্বর্থ ও ধর্মোৎপাদিত স্বর্থ	আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, লাগলাগেব বৃত্তান্ত, রামায়ণ মহা- ভারতের আখ্যায়িকা পাঠে বা শ্রবণে স্বর্থ—জ্ঞানজনিত । পরোপকার, পরসেবা, গুরুভক্তি, কর্তব্যপালন, সাধুতা, সত্য- নিষ্ঠায় স্বর্থ—ধর্মজনিত ।
ভুলোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট- তর	'দ্বালোক' কথা শিখাইতে হইবে । উৎকৃষ্টতর কেন ? ভুলোকই বা অপকৃষ্ট কেন ?
একজাতীয় প্রাণী পুনরালোচনা	একজাতীয় প্রাণীর দৃষ্টান্ত দাও । তবে কি বিষয়ে প্রভেদ ? জ্ঞানের প্রভাব আশ্চর্য্য কেন ? মানবজাতি পশু অপেক্ষা কি গুণে শ্রেষ্ঠ ? অশিক্ষিতের মন অমাবস্থা আর সুশিক্ষিতের মন পৌর্ণমাসী, ইহার ভাঁব বুঝাইয়া দাও । অজ্ঞান-তিমির- বৃত্ত, ধর্মোৎপাদিত, ভুবনাবধিস—বাস বাক্য ও সমাস ।

২। পদ্য সাহিত্য ।—সাধারণতঃ ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রগণ পরীক্ষা-
কাগজে যেক্রপভাবে নোট লিখিয়া থাকে, নিম্নে তাহারই আদর্শ দেখান

হইল । এই নোট নিম্ন প্রাথমিকের শ্রেণী উপলক্ষ করিয়া লিখিত হইয়াছে ।
উচ্চ প্রাথমিকের জন্ত প্রায় এইরূপই হইবে, তবে কিঞ্চিৎ কমাইয়া দেওয়া
যাইতে পারে । নিম্ন প্রাথমিকের ছাত্রগণের পক্ষে দুই দিনের (৩০ মিনিট
করিয়া) মত পাঠ হইয়াছে । কিছু কমাইয়া উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীর জন্ত
(৩০।৪০ মিনিটের) একদিনের পাঠ করিয়া লওয়া যাইতে পারে ।
এইরূপ নোটকেই ‘বিস্তৃত নোট’ বলে । (শিলচর নর্মাল স্কুলের
এসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাবু জগন্নাথ দে কৃত “শিক্ষাদানের নোট” হইতে
গৃহীত) ‘সম্ভাবনাতকের’ নিম্নোক্ত অংশের পাঠনার নোট :—

ফুটিয়াছে সরোবরে কমলনিকর,
ধবিয়াছে কি আশ্চর্য্য শোভা মনোহর ;
গুণ গুণ গুণ রবে কত মধুরে,
কেমন পুলকে তারা মধু পান করে ;
কিন্তু এরা হারাইবে এদিন যখন,
আসিবে কি অলি আর করিতে গুণন ?

আশায় বঞ্চিত হ'লে আসিবে না আর,
আর না করিলে এই মধুর ঝঞ্ঝার ।
স্বপ্নময়ে অনেকেই বজু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয় ।
কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি,
সকল সময়ে বজু সকলের তিনি ।



নিম্ন প্রাথমিকের প্রথম শ্রেণী ।

বিষয়—পঞ্চ সাহিত্য ; সময়—৩০ মিনিট করিয়া ২ দিন ।

উদ্দেশ্য—ঈশ্বরই প্রকৃত বন্ধু ।

উপকরণ—পদ্ম, মধুমক্ষিকা (বা ছবি) বোর্ড, চক ।

বিষয়	পদ্ধতি
১। বোর্ডে লিখিত নূতন শব্দের পাঠঃ— বিষপতি, নৃঙ্গার, বধিত, গুঞ্জন ।	১। নূতন শব্দ কয়েকটি শৃঙ্খলার সহিত বোর্ডে লিখিতে হইবে । বালকগণ প্রথমে তাহা আমার সঙ্গে সঙ্গে সম্বন্ধে পাঠ করিবে । নির্দেশ দ্বারা যে কোন শব্দ পড়িবে । তৎপরে ভিন্ন ছাত্রকে পড়িতে বলিয়া পাঠ শিক্ষা হইয়াছে কি না দেখিতে হইবে ।
২। সূচনাঃ— ফুলের বাগানে ভ্রমণ, ফুল ও পতঙ্গাদি বিষয়ে কথোপকথন ।	২। বালকগণকে সঙ্গে লইয়া ফুলের বাগানে যাইতে হইবে ও ফুটন্ত ফুলে পতঙ্গাদি দেখাইয়া প্রস্তুতের ছলে পতঙ্গের উদ্দেশ্য কি, তাহা আদায় করিতে হইবে । ফুল ফুটিলে পতঙ্গাদি জুটে আর শুকাইয়া গেলে কোন পতঙ্গ তাহাতে আসে না ।
৩। আদর্শ পাঠ ও বাখ্যাঃ— সরোবরে কমলনিকর	প্রথমে পাঠটি পড়িতে হইবে ; তৎপরে দৃষ্টান্ত, বর্ণনা ও প্রথের সাহায্যে ভাব বুঝাইতে হইবে । কমল ফুল দেখাইতে হইবে (অভাবে স্থলপদ্ম, গোলাপ ইত্যাদি দেখাইয়া পদ্ম বর্ণনা করা যাইতে পারে), 'কমল' কথা শিখাইতে হইবে এবং 'পদ্ম' নাম আদায় করিতে হইবে । পদ্ম কোণার ফুটে ? দিঘীকা ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা সরোবর ও জলাশয় কথা শিক্ষা দিতে হইবে । নিকর = সকল । পদ্মবন ও তাহার শোভা বর্ণনা করিতে হইবে ।
আশ্চর্য্য মনোহর শোভা	বাগানের শোভা মনোহর, কি আশ্চর্য্য ! ইহা বুঝাইতে হইবে । যাহা আমরা সর্বদা দেখিতে পাই না, এইরূপ বস্তুকে 'আশ্চর্য্য' বস্তু বলি ; দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে হইবে । যেসকল শোভা সকল সময় দেখা যায় না, তাহাই আশ্চর্য্য শোভা । যে শোভা দেখিলে মনে খুব আনন্দ হয়, তাহাই মনোহর শোভা ।

বিষয়	পদ্ধতি
মধুকর	মৌমাছি কিরূপ, ছবি আঁকিয়া দেখাইতে হইবে । 'মধুকর' কেন বলে ? অলি ও ভ্রমর শিখাইতে হইবে ।
গুণ গুণ রবে	পাখী সব রব করিতেছে ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা রব = শব্দ বুঝাইতে হইবে । পাখা নাড়াতেই এইরূপ শব্দ হয়, মৌমাছি বসিয়া থাকিলে শব্দ হয় না, ইহাও বুঝাইতে হইবে ।
পুলকে মধু পান কবে	কলকে করবী বা অম্বু, ফুলের রস চুমিয়া খাইতে দিয়া, মধু কি, বুঝাইতে হইবে । বালকগণ, পুলকের সহিত সন্দেশ খায় ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা "পুলকে = আনন্দের সহিত" আদায় করিতে হইবে ।
গল্প	কমলগুলি কোথায় ফুটিয়াছে ? তাহার কিরূপ শোভা ধরিয়াছে ? তাহাদের মধু কাহাবা পান করিতেছে ? কিরূপ শব্দ করে ? এইরূপ প্রণেব সাহায্যে গদ্য করাইতে হইবে । প্রশ্ন দ্বারা আদায় করিয়া বোর্ডে মাঝে লিখিতে হইবে ।
এরা যখন	[জলাশয়ে পদ্ম ফুল ফুটিয়াছে, ভ্রমর তাহার মধুপান করিতেছে] "এরা" কে ? 'এদিন' অর্থাৎ ফুটন্ত অবস্থা । হারাইবে এদিন = শুকাইয়া যাইবে ।
শ্রুতন করিতে আশায় বঞ্চিত হ'লে	গুণ গুণ রব করিতে । কিরূপে এই শব্দ উৎপন্ন হয় ? রাম পরীক্ষায় পুরস্কারের আশা করিয়াছিল, কিন্তু সে আশায় বঞ্চিত হইয়াছে । এইরূপ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে, কিছু পাইবার ইচ্ছা করাই 'আশা' আর তাহা না পাইলে আশায় বঞ্চিত হ'ল বলা যায় । অলি কি আশায় ফুলে আসে ? কিরূপে তাহাতে বঞ্চিত হইতে পারে ?
মধুর ঝঙ্কার	শিশুগণ পায়ে নুপুর ঝুল পরিলে ঝঙ্কার শব্দ হয় ইত্যাদি বলিয়া "ঝঙ্কার" কথা বুঝাইতে হইবে । তাহা শুনিতে কেমন

বিষয়	পদ্ধতি
গল্প—	লাগে ? কোকিল, দৈয়াল, বুলবুল ইত্যাদির শব্দের দৃষ্টান্ত দ্বারা গল্প শব্দ কি, বুঝাইতে হইবে । কাক, পেঁচা, ময়ূর ইত্যাদির কর্কশ শব্দের কথাও বলিতে হইবে । ইহা দ্বারা পূর্বোক্ত গুণ গুণ রব ও গুণনকেই বুঝাইতেছে । হারাইবে কে ? কি হারাইবে ? অলি আসিবে কি ? কি করিতে আসিবে না ? কেন আসিবে না ? আর কি করিবে না ? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া গল্প আদায় করিতে হইবে । বোর্ডে লিখিতে হইবে (ফুলগুলি শুকাইয়া গেলে জমর আর আসিবে না) ।
সুসময়ে... নয় ব্যাখ্যা	পিতামাতা ও সহপাঠীদের দৃষ্টান্তে 'বন্ধু' শব্দ বুঝাইতে হইবে । আদর করা যে বন্ধুর কার্য্য, প্রশ্ন দ্বারা আদায় করিতে হইবে । কুটস্ত অবস্থায় পদের বন্ধু কে ছিল ? পদ্ম শুকাইয়া গেলে আর তাহার আসে কি ? কেন আসে না ? 'হায়, ছুঃখের সময়ে' উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে । মাঝের সুসময় কখন বলা যায় ? অসময় কি ? ধনীদের অনেক আত্মীয় স্বজন থাকে, কিন্তু দরিদ্রের নিকট কেহ যায় না—প্রশ্ন দ্বারা আদায় করিতে হইবে । ভাবার্থ এই :—আমাদের টাকা পয়সা যখন থাকে, তখন অনেক আত্মীয় কুটুম্ব জুটে ; আর যখন টাকা পয়সা থাকে না, তখন কেহ আমাদের কাছে আসে না ।
ঈশ্বর... যিনি	বিষ = সমস্ত সংসার ; গল্প, গর, গাছ, চলা, স্থা, আকাশ লইয়া বিষ । যিনি এই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা যাহার পূজা করি ইত্যাদি বলিয়া বুঝাইতে হইবে—তিনিই ঈশ্বর । পতি—প্রীতিলোকের পতি, গৃহপতি ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা পতি =

বিষয়	পদ্ধতি						
সকল...তিনি ঈশ্বরই প্রকৃত বন্ধু	কর্তা, আদায় করিতে হইবে । ঈশ্বর আমাদের সকলের কর্তা এই বিশ্বের পতি । ঈশ্বর আমাদের সকল সময়ে রক্ষা করেন । দরিদ্র অবস্থায়ও অনুগ্রহ করেন । বিপদের সময়ও ছাড়িয়া যান না । অতএব তিনি আমাদের সকল সময়ে বন্ধু । প্রকৃত, ইহা প্রকৃত সোণার আংটি ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা প্রকৃত = যথার্থ, ঠিক, বুঝাইতে হইবে । ঈশ্বর কিরূপে আমাদের প্রকৃত বন্ধু ? কে প্রকৃত বন্ধু নয় ? প্রকৃত বন্ধু ও অপ্রকৃত বন্ধু বা নকল বন্ধু বুঝাইতে হইবে । বোর্ডে সার = [ভাল অবস্থায় আমাদের অনেক আত্মীয় জুটে, মন্দ অবস্থার সময় কেহই কাছে আসে না ; কিন্তু ঈশ্বর সকল সময়েই আমাদের সকল সময়েই অনুগ্রহ করেন । অতএব ঈশ্বরই আমাদের যথার্থ বন্ধু ।]						
৪। সমস্বরে পাঠ ৫। ব্যক্তিগত পাঠ ৬। পুনরালোচনা	বালকগণ আমার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে পাঠটি পড়িবে । প্রত্যেক বালক পড়িবে (আমি মধ্যে মধ্যে আদর্শ দেখাইব, কিন্তু পাঠের সময় বিশেষ বাধা দিব না) । বোর্ডের লেখা মুছিয়া প্রশ্ন করিতে হইবে :— ভ্রমরগুলি কখন পলায়নে আসে ? কখন আসে না ? মানুষের কোন সময় খুব বন্ধু জুটে ? কখন জুটে না ? কে আমাদের প্রকৃত বন্ধু ? কিরূপে ? তাহার প্রতি কি করা উচিত ? ইত্যাদি						
বোর্ডে <table border="1" data-bbox="233 2228 646 2496"> <tr> <td>বিশ্বপতি</td><td>স্বাক্ষর</td></tr> <tr> <td>আশীর্বাদ</td><td>গুণন</td></tr> <tr> <td>বন্ধু</td><td>বক্ষিত</td></tr> </table>	বিশ্বপতি	স্বাক্ষর	আশীর্বাদ	গুণন	বন্ধু	বক্ষিত	সার :—জলাশয়ে পদ্মকুল ফুটিয়াছে । ভ্রমরগণ তাহাতে মধুগান করিতেছে । ফুলগুলি শুকাইয়া গেলে ভ্রমর আর আসে না ; ভাল অবস্থায় আমাদের অনেক আত্মীয় জুটে, খারাপ অবস্থার সময় কেহ কাছে আসে না । কিন্তু ঈশ্বর সকল সময়েই আমাদের সকল সময়েই অনুগ্রহ করেন । অতএব ঈশ্বরই আমাদের যথার্থ বন্ধু ।
বিশ্বপতি	স্বাক্ষর						
আশীর্বাদ	গুণন						
বন্ধু	বক্ষিত						

৩। পদার্থ পরিচয়।—প্রথম দুইটা নোটে যেকোন ভাবে বিষয় ও পদ্ধতির বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে হয়ত পাঠকগণ একটু চিন্তান্বিত হইয়াছেন; কোন্টীকে বিষয় করিতে হইবে, আর কোন্টীই বা পদ্ধতি হইবে, তাহা হয়ত ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বাস্তবিক পক্ষে, বিষয় নির্ধারণের যে একটা বিশেষ বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে তাহা নহে; আবশ্যিকমত বিভাগ করিয়া লইতে হইবে। নিম্নে অনুরূপ একটা দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল (ওয়াটার কৃত অবজেক্ট লেসেন্স হইতে)।

মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণী।

বিষয়—শিশির; সময়—৪০ মিনিট।

উপকরণ—জল গরম করিবার পাত্র, আঙুন বা স্পিরিট

ল্যাম্প, দেশালাই, জল, ঠাণ্ডা থালা।

বিষয়	পদ্ধতি
১। শিশিরের উৎপত্তি— (ক) যদি একখানি থালায় একটু জল রাখিয়া বাহিরে রাখা যায়, জল ক্রমশঃ উড়িয়া যায়। জল বাষ্পীভূত হইল। (খ) গরম জলের উপর একখানা ঠাণ্ডা থালা ধর; থালা সরাইয়া পরীক্ষা কর। থালায় হাত দিলেই জল দেখিতে পাইবে।	(ক) শীতের প্রাতঃকালে মাঠে বেড়াইবার সময় ঘাস ভিজা দেখিতে পাই। বৃষ্টি না হইলেও ঘাস ভিজিয়া থাকে। (খ) পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে হইবে।

বিষয়	পদ্ধতি
(গ) একটা গেলাসে খুব ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া সেই গেলাসটী রান্নাঘরে (গরম) আনিলেই দেখিতে পাইবে যে, গেলাসের চার পাশে জলের আবরণ পড়িয়াছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, উষ্ণ বাতাস (বা বাষ্প) কোন শীতল বস্তুর সংস্পর্শে আসিলেই ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হয়। (১)	(১) সমুদ্র সর্বদা সূর্যের উত্তাপ পাইতেছে। সেই জন্য সমুদ্র হইতে সর্বদা বাষ্প উঠিতেছে। এই বিষয় বালকগণকে ২৪টি প্রশ্ন করিয়াই আদায় করা যাইতে পারে। তারপর বুঝাইতে হইবে যে, মাটি শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। গরম বাতাস ঠাণ্ডা মাটিতে লাগিয়া ঘনীভূত হয়। এইরূপে শিশিরের উৎপত্তি হয়।
২। শিশির সঞ্চার— নানারূপ প্রাকৃতিক অবস্থার ভেদে শিশির সঞ্চারের তারতম্য ঘটে। প্রধানতঃ (১) স্থান (২) শিশির সঞ্চার হইবার জন্ত যে জিনিষ বাহিরে রাখা হইয়াছে, সেই জিনিষের ঠাণ্ডাতার পরিমাণ (৩) বায়ুর অবস্থা।	(২) মেঘলা রাত্ৰিতে শিশির সঞ্চার হয় না কেন? গাছের নীচে শিশির সঞ্চার হয় না কেন?—জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ও বুঝাইয়া দিতে হইবে।
পরিষ্কার রজনীতেই উত্তমরূপে শিশির সঞ্চার হয়, কারণ পৃথিবীর তাপ বায়ু পথে শীঘ্রই উর্দ্ধে পরিচালিত হয়, সেথায় বাধা পায় না। মাটি খুব শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। (২)	
যুক্তিকা বা প্রস্তর অপেক্ষা বৃক্ষাদিতে অধিক শিশিরপাত হয়, কারণ বৃক্ষাদি প্রস্তরাদি অপেক্ষা অল্প সময়ে তাপ বিকীরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ অতি শীঘ্র শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে।	
৩। শিশিরের কার্য— পৃথিবীকে শীতল করা ও বৃক্ষাদির উৎপত্তির সহায়তা করা। কতক পরিমাণে বৃষ্টির কাজ করা। (৩)	(৩) তিব্বতে সময় সময় এত শিশিরপাত হয় যে, কখন কখন যুক্তিকা কঁদমে পরিণত হয়।

৪। পাঠীগণিত (গুণন)।—অঙ্কের নোট প্রস্তুত করিতে হইলে প্রায় সময়ই উদাহরণকে বিষয় ধরিয়া দাইতে হয়। নিম্নের নোটে তাহাই দেখান হইয়াছে। অঙ্কের নোটের সূচনায় বালকের পূর্বজ্ঞানের পুনরালোচনা আবশ্যিক। জড়িত প্রশ্ন হইলে, তজ্জপ সহজ সহজ প্রশ্ন করিয়া বিষয় আরম্ভ করা রীতি। যেসকল প্রশ্নের উত্তর বালকেরা মুখে মুখেই দিতে পারে, সূচনায় কেবল তাহাই জিজ্ঞাসা করিবে।

শ্রেণী—২য় মান।

বিষয়—পাঠীগণিত ; সময় ৪০ মিনিট।

উপকরণ—বালকগণের স্লেট, পেন্সিল ; শিক্ষকের বোর্ড ও চক।

পূর্বজ্ঞান—একটা অঙ্কের দ্বারা গুণের প্রণালী বালকেরা শিখিয়াছে।

উদ্দেশ্য—দুইটা অঙ্কের দ্বারা গুণশিক্ষা।

উদাহরণ	পদ্ধতি
১। সূচনা—পূর্বজ্ঞানের পুনরালোচনা। —	১। বোর্ডে ১১ লেখ। শেখের একের মানে কি ? নামে আর একটা এক লেখ। এই একেরই বা মানে কি ? ২৬এর ২এর মানে কি ? সেই জন্ত ২৬ মানে ২০ + ৬।
২। দুইটা বা ততোধিক অঙ্ক-যুক্ত সংখ্যার অর্থ :— ২৬ = ২ × ১০ + ৬ ৩৬৪ = ৩ × ১০০ + ৬ × ১০ + ৪ কোন রাশিকে ২৬ দ্বারা গুণ করাও যে কথা, সেই রাশির ২০ গুণকে আর ৬ গুণের সঙ্গে যোগ করাও সেই কথা। ২৬ জন বালকের একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে হইবে।	২। যদি শ্রেণীতে ২৬ জন বালক থাকে, আর প্রত্যেকের ৫৭টা করিয়া মার্বেল থাকে, তাহা হইলে সকল ছেলের কতগুলি মার্বেল আছে ? কেমন করে হিসাব করা যায় ? আগে ৬ জন বালকের কয়টা মার্বেল আছে দেখ, তারপর ২০ জনের কয়টা আছে হিসাব করা যাউক। এখন সকলের কয়টা আছে তা কেমন করে জানা যাবে ? তবে ২০ দিয়ে কেমন করে গুণ করা যায় তাই আগে শিখিতে হইবে।

উদাহরণ	পদ্ধতি ।
৩। ১০ দিয়া গুণ করিবার সময় সংখ্যার শেষে একটা শূন্য দিলেই হয়। ২০ এর দ্বারা গুণ করার সময় ২ দিয়া গুণ করে তাহার শেষে একটা শূন্য বসায়।	৩। ১০ দিয়া গুণ করার কাজ যে শূন্য বসাইলে হয়, তাহা যোগ করিয়া দেখাও। দুই চারিটা দৃষ্টান্ত দাও। রামের ১০ থলে মার্বেল আছে, আর যত্নর ২০ থলে আছে। কার বেশী? যত্নর মার্বেল রামের মার্বেল হইতে কত বেশী? মনে কর, প্রত্যেক থলেতে ১০টা করে মার্বেল আছে। রামের কয়টা, যত্নর কয়টা? এখন তবে ২০ দিয়া কেমন করে গুণ করিবে? (প্রথমে ১০ দিয়া, তারপর ২ দিয়া) ১৬৪কে ২০ দিয়া গুণ করিতে হইবে। $১৬৪ \times ১০ = ১৬৪০$ $১৬৪ \times ২০ = ৩২৮০$ এইরূপে দেখ— $\begin{array}{r} ১৬৪ \\ ২০ \\ \hline ৩২৮০ \end{array}$ উত্তরটা লক্ষ্য করুক, যদি শেষে শূন্যযুক্ত রাশি দ্বারা গুণ করিতে হয়, তবে উত্তরের শেষেও শূন্য হয়। ৩০, ৪০, প্রভৃতি দ্বারাও গুণ করিতে হইবে।
৪। এখন দুই অঙ্কের রাশির দ্বারা গুণ— ৫৭×২৬	৪। ২৬ জন বাগানের ৫৭টা করিয়া মার্বেল আছে। $\begin{array}{r} ৫৭ \times ৬ = ৩৪২ \\ ৫৭ \times ২০ = ১১৪০ \\ \hline ৫৭ \times ২৬ = ১৪৮২ \end{array}$ যোগ করিয়া আবার এই অঙ্ক সোজা সজিও করা যায়— $\begin{array}{r} ৫৭ \\ ২৬ \\ \hline ৩৪২ \\ ১১৪০ \\ \hline ১৪৮২ \end{array}$

৫। পাঠীগণিত (ভগ্নাংশ)।—আবার অঙ্কের নোট অগ্ররকমেও লিখিতে পারা যায়। নিম্নে আদর্শ দেওয়া গেল। এখানে উদাহরণকে বিষয় ধরা হয় নাই। (জইস কৃত 'হাওবুক অব স্কুল ম্যানেজমেন্ট' হইতে)।

বিষয়—ভগ্নাংশের যোগ।

শ্রেণী—পঞ্চম।

সময়—৩০ মিনিট।

উপকরণ—ব্ল্যাকবোর্ড, কয়েক খণ্ড কাগজ, একখান ছুরী বা কাঁচি।

বিষয়	পদ্ধতি
১। যদি ভগ্নাংশের হর সমান থাকে তবে কেবল লব যোগ করিলেই হইবে।	একখানা দাম্বা কাগজের ফালী (ফাইল) লইয়া কাটিয়া ৮ সমান ভাগে ভাগ করিবে। এইকপ ২ টুকরা ও ৩ টুকরা কাগজ একখানে করিলে ৫ টুকরা হইবে, অর্থাৎ— $\frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$ এইরূপ আর একটা দৃষ্টান্ত দিতে হইবে। (১) আর এক খণ্ড কাগজের ফালী লইয়া তিন সমান ভাগে ভাগ করিব। ২ টুকরা কাগজে সমস্তের $\frac{2}{3}$ । আবার এই ৩ টুকরা কাগজ কাটিয়া সমান ৬ টুকরা করিব। আগে যে ২ টুকরা কাগজ লইয়াছিলাম, এখন সেই ২ টুকরা ৪ টুকরা হইয়াছে। এখন সেই ৪ টুকরা সমস্তের $\frac{2}{3}$ । কারণ সমস্তকে ৬ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সুতরাং— $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ এই অঙ্ক বালকগণের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া লইবে।
২। ভিন্ন ভিন্ন হরযুক্ত ভগ্নাংশের যোগ। (১) ভগ্নাংশের লব ও হরকে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে ভগ্নাংশের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।	

বিষয়	পদ্ধতি
(২) ভগ্নাংশগুলিকে সমান হরে আনিয়া তাহাদের যোগ করিলেই যোগ করার কাজ হয় ।	(২) উদাহরণ— $\frac{৩}{৪} + \frac{১}{৪}$ সাধারণ হর—১২ $\frac{৩}{৪} = \frac{৯}{১২}$ $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$ $\therefore \frac{৩}{৪} + \frac{১}{৪} = \frac{৯}{১২} + \frac{৩}{১২} = \frac{১২}{১২}$ সমান হর বার বার না লিখিয়া একবার লিখিলেই হয় । যথা— $\frac{৩}{৪} + \frac{১}{৪} = \frac{৩+১}{৪} = \frac{৪}{৪} = ১$

৬। ইতিহাস ।—যাঁহারা নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদের হাতেই ইতিহাস ভূগোলের উত্তমরূপ শিক্ষা হইয়া থাকে । কারণ তাঁহারা স্থানগুলির উত্তম বিবরণ প্রদান করিয়া, বালকগণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন । নিম্নের নোট-লিখিত ইতিহাসের বিষয় শিক্ষায়, যদি শিক্ষক আগ্রহ কেহ ও যে ক্ষুদ্র কক্ষে সাজাহানকে বন্দী রাখা হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করিতে পারেন, তবে বালকগণের উক্ত বিষয় মনে রাখা বেশ সহজ হইবে । অস্তাব পক্ষে চিত্রাদি প্রদর্শন করান কর্তব্য । এই নোট দেখিয়া কোন কোন শিক্ষক মনে করিতে পারেন যে, এ সকল কথা ত পুস্তকেই আছে, পৃথক নোটের আবশ্যকতা কি ? কিন্তু যাঁহারা জানেন যে পুস্তক দেখিয়া শিক্ষাদান ও গল্পছলে শিক্ষাদানে অনেক প্রভেদ, তাঁহারা এ প্রশ্ন করিবেন না । শিক্ষক যাহাতে বালকদের নিকট এই ঘটনার একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিতে পারেন, সেইরূপে তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে । এই নোট তাঁহার স্মরণার্থ লিপি মাত্র । * (শিলচর ট্রেনিং ক্লাসের ইন্সট্রাক্টার মৌলবী আজহার আলী লিখিত নোট হইতে) ।

মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণী ।

বিষয়—ইতিহাস ; সময়—৪০ মিনিট ।

(আরঙ্গজেবের সিংহাসন প্রাপ্তি)

উপকরণ—ভারতবর্ষের মানচিত্র, আগ্রা-দুর্গের চিত্র,

আরঙ্গজেবের চিত্র, ব্ল্যাকবোর্ড, চক ।

বিষয়	পদ্ধতি
সূচনা, মাজাহানের পুত্র- গণের বিবরণ ।	দারা খোষ্ঠ, আকবরের মত একেশ্বরবাদী ও উদার, কিন্তু উদ্ধত । পিতার নিকট থাকিয়া তাঁহার রাজকাণ্ডের সহায়তা করিতেন । স্বজা দ্বিতীয়, মতাসক্ত, কিন্তু বুদ্ধিমান, বাঙ্গালার শাসনকর্তা । আওরঙ্গজেব তৃতীয়, চতুর, রণনিপুণ ও মুসলমান ধর্মের গোড়া, দক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা । (মানচিত্রে স্থানগুলি দেখাইতে হইবে ।)
(১) মাজাহানের পীড়া ।	(১) মাজাহানের কঠিন পীড়া দারা গোপন রাখিয়া রাজকাণ্ড চালাইতে লাগিলেন । কিন্তু অস্থায়ী পুত্রগণ জানিতে পারিয়া প্রত্যেকেই রাজপদ প্রাপ্তির চেষ্টা উদ্ভোগ আরম্ভ করিলেন । মাজাহানের আরোগ্য লাভ । কিন্তু পুত্রগণের বড়বড়ের দ্বন্দ্ব ।
(২) পুত্রগণের বড়বড় ও পরস্পরের যুদ্ধ ।	(২) প্রথমে দারার সৈন্য আগমন, দারার পুত্র মজিমান কামীর নিকট যুদ্ধে স্বজাকে পরাজিত করে । স্বজার দুইজন-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ । মুরাদ আরঙ্গজেবকে মিলিত হইতে অনুরোধ করেন । আরঙ্গজেব প্রত্যুত্তরে সম্মত, মুরাদকে রাজা দিয়া মকায় যাইবেন এরূপ প্রস্তাব করেন । মর্শদার তীরে দুই ভ্রাতার সৈন্য একত্র (মানচিত্রে দেখ) । যশোবন্ত সিংহ কর্তৃক চালিত দারার সৈন্য পরাজিত । দারার যুদ্ধে আগমন । উজ্জয়িনীর নিকট (মানচিত্রে দেখ) দারা পরাজিত ।

বিষয়	পদ্ধতি
(৩) সাজাহান বন্দী, আরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণ (১৬৫৮) ।	(৩) আরঙ্গজেব ও মুরাদের আগ্রা প্রবেশ । উজ্জয়িনীর নিকট যুদ্ধে মুরাদ আহত ও পীড়িত । দারার সাহোরে পলায়ন । আরঙ্গজেব কর্তৃক আগ্রা-দুর্গে সাজাহান বন্দী । আরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণ । ১৬৫৮ খৃঃ অব্দ ।
(১) (২) (৩) লিখিত বিষয় স্ন্যাক বোর্ডে লিখিতে হইবে । পাঠের শেষে এই বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়াই পুনরালোচনা করিতে হইবে ।	

৭ । ভূগোল ।—নিম্নে ভূগোলের নোট লিখিবার একটা আদর্শ প্রদত্ত হইল । কিন্তু এই আদর্শ দেখিয়া কেহ যেন এ কথা মনে না করেন যে, সমস্ত দেশের বিবরণই বুঝি এইরূপে লিখিতে বা শিখাইতে হইবে । আবশ্যক বোধে নোট বড়, ছোট বা খণ্ড খণ্ড করিতে হইবে । ভারতবর্ষ শিক্ষা দিতে হইলে, নদী, সাগর, পর্বত প্রভৃতি পৃথক পৃথক করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে । বঙ্গদেশের ভূগোল শিক্ষায় কেবল ভাগীরথী এবং আসামের ভূগোল শিক্ষায় কেবল ব্রহ্মপুত্রের বিষয়ই একদিন শিখাইবে । তবে যত অনাবশ্যক বিষয় হইবে বা যত নিঃসংস্কৃষ্ট দেশ হইবে, ততই শিক্ষণীয় বিষয় কমাইতে হইবে । নিম্নের নোট বিলাতের কোন ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রের লেখা । নোটের শেষে শিক্ষকের সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে । ইহা পাঠে ‘নোট সমালোচনা’ প্রণালীও শিক্ষা হইবে । (টেইলার কৃত ‘হাউ টু প্রিপেয়ার নোটস অব লেসনস্’ হইতে) ।

নব জিলাপুত্র ।

সময়—৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য—নব জিলাপুত্র ও যে উপনিবেশের পক্ষে উপযোগী তাই দেখান ।

উপকরণ—গোলক, ভূমণ্ডলের মানচিত্র, ব্র্যাকবোর্ড, চক ।

বিষয়	পদ্ধতি
১। সূচনা—নিজ দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের অস্থ- বিধা দেখিয়া অনেক লোক, বিশেষতঃ কৃষকাদি, নব জিলাপুত্রে উপনিবেশ স্থাপন করে । তাহাদের বাসের পক্ষে নব জিলাপুত্র উপযোগী কি না ?	বালকেরা এ বিষয়ের কিছু জানে বলিয়া বিভাগ, স্তত্রাং এরূপ প্রশ্ন করা স্বাভাবিক ।
২। উপনিবেশে যাহা থাকা আবশ্যিক :— (১) জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ; ইংলও হইতে শীতে অধিকতর উষ্ণ ; শস্ত উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট বৃষ্টি ; অনাবৃষ্টি নাই ।	২। উপনিবেশের স্থান নির্ণয় করিতে হইলে, বালকেরা কি কি চায় তাহার প্রশ্ন করিতে হইবে । তারপর উপ- নিবেশে কি কি আবশ্যিক, জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ।
(২) খাদ্য—শস্ত্র, শাক, সবজী, ফল । পশু— গরু, মেঘ, শূকর ইত্যাদি এবং মৎস্য ।	দেশ স্বাস্থ্যকর হওয়া চাই ইত্যাদি বালকগণের চিন্তাকে বিষয়ের সূচী অনুসারে চালিত করিতে হইবে । ব্র্যাকবোর্ডে সংক্ষিপ্তমাত্র লিখিতে হইবে ।
(৩) ব্যবসায়, ভূমি উর্বরা ; কমলা, লোহা, জল, কাষ্ঠ, উত্তম পথ, উত্তম রেললাইন (সম্ভব- পর হইলে) নগর ও বন্দর, যেখানে উদ্ভূত জব্য পাঠান যাইতে পারে ও যেখান হইতে অন্য জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে ।	
(৪) অধিবাসী—ইংরেজ বা ব্রিটনবাসী, অসভ্য জাতি নাই ।	

বিষয় ।	পদ্ধতি
৩। স্থানের উপযোগিতা বিষয়ক ভৌগোলিক বিবরণ ।	
(১) আকারাদি—তিনটি দ্বীপ ; উত্তর, দক্ষিণ, এবং ষ্ট্রুয়ার্ট ; কয়েকটি মিলিয়া গ্রাম বৃটন দ্বীপত্রয়ের সমান ।	ব্ল্যাক বোর্ডে মানচিত্র অঙ্কন করিতে হইবে ।
(২) অবস্থান ও তাহার ফলাফল—ইংলণ্ডের বিপরীত দিকে, বিষুবরেখার নিকট । প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে । ইংলণ্ড হইতে শীত কম, গ্রীষ্ম অধিক, বৃষ্টিও অধিক ।	ইংলণ্ড হইতে নব জিল্যাণ্ড পর্যন্ত জাহাজে বাইবার পথ দেখাইতে হইবে—মানচিত্রে ও গোলকে । শীত, গ্রীষ্মাদির তারতম্য কেন, তাহা বালকগণের নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে ।
(৩) ভূভাগ, মৃত্তিকা ও ফসল । উত্তর দ্বীপে অনেক পর্বত আছে । উর্বরা উপত্যকা আছে । অনেক খরশ্রোতা নদী উপত্যকা দিয়া গিয়াছে । দক্ষিণ দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে একটা পর্বতশ্রেণী, নাম আলম্ । পশ্চিমে ও পূর্বে প্রশান্ত উর্বরা সমতলভূমি আছে । অনেক নদী আছে, পূর্বের নদীগুলি বড় ।	ব্ল্যাক বোর্ডের মানচিত্রে পর্বতগুলি চিহ্নিত করিতে হইবে । দেশের বর্ণনা করিতে হইবে । যাহা যাহা আবশ্যিক তাহা এই দেশে আছে, ইহা বালকগণকে প্রশ্ন করিয়া আদায় করিতে হইবে ।
জলকষ্ট নাই, উত্তম মৎস্যের অভাব নাই । উত্তরের পথগুলি ভাল নয়, দক্ষিণের ভাল ।	
(৪) উৎপন্ন জন্ম—বিলাতী শাক, সবজী ও পথাদি । মেঘ ও গম যথেষ্ট । যথেষ্ট কয়লা । ইহা ছাড়া লোহা, তামা ও সোণা ।	নব জিল্যাণ্ড হইতে এদেশে কি কি আমদানী হয় ।
(৫) মহর ও বন্দর—ওয়েলিংটন, অকল্যাণ্ড, ডিউনডিন, ক্রাইস্টচার্চ ।	মানচিত্রে স্থানসমূহ চিহ্নিত করিতে হইবে ।
(৬) লোকসংখ্যা—১০ জন ইউরোপবাসী ও ১ জন মেণ্ডারী এই অনুপাত ; মোটসংখ্যা ৫০০,০০০ ।	পুনরালোচনা ও পরীক্ষা ।

সমালোচনা—ভূগোলের নোট লিখিতে শিক্ষকেরা সাধারণতঃ যে পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষক ভাবাই করিয়াছেন। প্রথমে অবস্থান, চতুঃসীমা, আকার, ভূভাগ প্রভৃতির বর্ণনা করা যে শিক্ষকগণের একটা বীধা নিয়ম আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া বেশ মনোরম ও কাজের কথা দিয়া পাঠনা আরম্ভ করা হইয়াছে। বিষয়ের দ্বিতীয় শীর্ষের কথাগুলি ভাষা হয় নাই। “কি কি অবস্থা দেখিয়া উপনিবেশের স্থান নির্দেশ করিতে হয়,” এইরূপ লিখিলেই ভাল হইত। যেখানে ভাষা পথ ঘাট কি রেলরাস্তা আছে, তাহা দেখিয়াই যে উপনিবেশের স্থান নির্ণয় করিতে হইবে, এ শিক্ষা ইংরাজ বালককে দেওয়া সম্ভব মনে করি না। আর এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়াও আমরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিতে যাই নাই। তৃতীয় শীর্ষের অন্তর্গত বিষয়গুলির সুন্দর নির্বাচন হইয়াছে। বহু নাম ও বহু সংখ্যা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষক কেবল ইংরাজদিগের দাসের পক্ষে নব জিল্যাও কি পরিমাণ উপযোগী, এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা যাহা আবশ্যক তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। পদ্ধতিব অন্তর্গত নোটগুলি খুব সংক্ষিপ্ত, তথাপি কতকগুলি বেশ হইয়াছে, আর কতকগুলি লেখার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, মনে হয় যেন কেবল শৃঙ্খলান পূরণ করিবার জন্তই শিক্ষক সেগুলি লিখিয়া রাখিয়াছেন। (শিক্ষকের দৃষ্টান্ত ও তারিখ)

— — —

৮। বিজ্ঞান।—নিম্নে বিজ্ঞানের নোট লিখিবার ধারা প্রদত্ত হইল। পদার্থ পরিচয়ের অনেক বিষয় বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া, উক্ত বিষয়ক নোট প্রস্তুত করিতেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। (গারলিক ও ডেকস্টার কৃত ‘অবজেক্ট লেগনস’ হইতে)।

বায়ুর চাপ।

উপকরণ—একটা গেলাস, শক্ত কাগজ, বোতলের মত মুখবিশিষ্ট টিনের পাত্র (তা’র তলায় আবার বাঁধার মত ছিদ্র করা), কাচের ফ্লাস্ক, পাতলা কাগজ, তুলা, স্পিরিট ল্যাম্প, চীনেমাটির বোতল, একটু বৈদ্যুতিক ডিমের খেঁত খণ্ড (ডিম খণ্ড চীনেমাটির বোতলের মুখের চেয়ে একটু বড়)।

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ	পরীক্ষণের ফল	সিদ্ধান্ত
(১) (ক) একটা গেলাস ভেঙ্গে পূর্ণ বর তার উপর শক্ত কাগজখানি দিয়া ঢাকিয়া দাও, সাবধানে গেলাসটী উঠাইয়া ফেল ।	কাগজ পড়িয়া বাইবে না, জলও পড়িবে না ।	বায়ু উর্দ্ধ দিকে চাপ প্রদান করে ।
(খ) ছিঁড়যুক্ত টিনের পাত্রটী জলে ডুবাইয়া পূর্ণ কর, পাত্রের মুখ বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া টিপিয়া ধরিয়া উঠাও ।	তলায় ছিঁড় দিয়া জল পড়িবে না ।	ঐ
(২) টিনের বোতলের মুখ থেকে আঙ্গুল সরাত ।	জল পড়িতে আরম্ভ করিবে ।	বায়ু নীচে দিকে চাপ প্রদান করে ।
(৩) (ক) পাতলা কাগজখানি কাম্বকের মুখে রাখিয়া গরম কর ।	কাগজ উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিবে ।	খালি ফ্লাস্কে তাপ দিলে, অভ্যন্তরের কতক বায়ু বাহির হইয়া যায় ।
(খ) চীনেমাটির বোতলের মুখে ডিম খণ্ড রাখ ।	ডিম বোতলের মধ্যে পড়িবে না ।	
(গ) ডিম সরাইয়া রাখ ; কাগজ জ্বালাইয়া বোতলের ভিতর ফেলিয়া দাও, আবার ডিম বোতলের মুখে রাখ ।	এবারে বোতলে ডিম ঢুকিয়া পড়িবে ।	বাহিরের বাতাস বোতলে প্রবেশ করিতে গিয়া, ডিম খণ্ডকে বোতলের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়াছে ।
(ঘ) আবার ঐ চীনেমাটির বোতলে কাগজ জ্বালাইয়া ফেলিয়া দাও, একটা বালককে এখন বোতলের উপর হাত রাখিতে বল ।	বালককে বোধ হইবে যেন তাহার হাত বোতলের ভিতর ঢুকিতে চাহিতেছে ।	বায়ু নীচের দিকে চাপ প্রদান করে ।
(৪) আবার (৩) এর (গ) পরীক্ষা কর, বোতলটী এবার কাত করিয়া রাখ ।	ডিম খণ্ড এবারেও বোতলের ভিতর প্রবেশ করিবে ।	বায়ু পার্শ্বে চাপ প্রদান করে ।

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ	পরীক্ষণের ফল ।	সিদ্ধান্ত ।
(৫) পূর্বে যে জলের চাপের পরীক্ষা করিয়াছে, তাহার উল্লেখ কর ।	বায়ু ও জল দুইই উর্দ্ধে, নিম্নে ও পার্শ্বে চাপ প্রদান করে ।	জলের মত বায়ুও সকল দিকে চাপ প্রদান করে ।

ব্ল্যাক বোর্ডে ।

বায়ু উর্দ্ধ দিকে চাপ প্রদান করে
 „ নিম্ন দিকে „ „ „
 „ পার্শ্বে „ „ „

{ যেমন জল করিয়া থাকে

(বায়ু জলের মত) সকল দিকেই চাপ প্রদান করে ।

৯। শিক্ষক ছাত্রের কথোপকথন ।—কথোপকথনচ্ছলে কখন কোন বিষয়ের পদ্ধতি লিখিতে হইলে, নিজের প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে । (মিসিস্ ব্রাণ্ডার্স কৃত ‘কিণ্ডারগার্টেন টিচিং ইন ইণ্ডিয়া’ হইতে) ।

প্রাথমিক শ্রেণী ।

বিষয়—মাকড়সা ।

সময়—৩০ মিনিট ।

উপকরণ—ব্ল্যাকবোর্ড, মাকড়সা ও তাহার জালের চিত্র ।

সম্ভবপর হইলে একটা জীবন্ত মাকড়সা ।

শিক্ষক—মহম্মদ ও তাহার সঙ্গিগণ যে কেমন করিয়া শত্রুদের হাত থেকে পলাইয়া গেলেন, তাহা সেদিন ভৌমাঙ্গিকে বলিয়াছি । তাহারা কোথায় গিয়া লুকাইয়াছিলেন ?

ছাত্র—তাঁহারা একটা গহ্বরে লুকাইয়াছিলেন ।

শি—শত্রুগণ সেই গহ্বরের ভিতর অনুসন্ধান করিল না কেন ?

ছাত্র—শত্রুগণ দেখিল যে, গহ্বরের মুখে একটা মাকড়সা জাল পাতিয়া আছে, আর নিকটেই একটা ঘুঘু তার বাসায় বসিয়া আছে ; এই সকল দেখিয়া তাঁহারা মনে করিল, এইখানে নিশ্চয়ই লোক নাই ।

শি—আচ্ছা, আজ তোমাদিগকে এই মাকড়সার কথাই বলি । এই মাকড়সাটা দেখ—বোর্ডে মাকড়সার ছবিও দেখ—মাকড়সার কি কি দেখিতেছ, বল ।

ছাত্র—এটা একটা ছোট প্রাণী ; ইহার শরীরটার দুই ভাগ, মাথা আর বড় । এক এক দিকে ৪ খান করিয়া ৮ খান পা আছে । দুইটা হল আছে, আর বড় বড় দুইটা চক্ষু আছে ।

শি—হাঁ, সবই ঠিক হইয়াছে কেবল হল ও চোখের কথা ছাড়া । যে দুটাকে হল মনে করিয়াছ, সেগুলি খুব শক্ত ছোট ছোট নখের মত, আর যেটাকে একটা চোখ মনে করিয়াছ, তাহা একটা চোক নয়, ৬টা কি ৮টা । যদি এক দিকেই ৬টা চোখ থাকে, তবে দুই দিকে কটা ?

ছাত্র—দুই দিকে তবে ১২টা চোখ, কি আশ্চর্য্য !

শি—আবার কোন কোন মাকড়সার ১৬টা চোখও থাকে । এতগুলি পা ও চোখ দিয়া মাকড়সা কি করে ?—মাকড়সা কি খায়, জান ?

ছাত্র—মাকড়সা কীট পতঙ্গ খায় ।

শি—হাঁ ; কেমন করে কীট পতঙ্গ ধরে ?

ছাত্র—জাল দিয়া ধরে ।

শি—মাকড়সা কেমন করে জাল বোনে, জান ?—জান না ?—তবে শোন । এটা গুন একটা চমৎকার কথা । আচ্ছা, গোপাল, মাকড়সার বড়টা আগায় দেখিয়ে দাও ত । এই বড়ের নীচে চারটা ছোট ছোট নল আছে, আর প্রত্যেক নলের নীচে প্রায় ১০০০ ছোট ছোট ছিদ্র আছে । আমাদের মুখের লালার মত এক বৈকম রসের দ্বারা মাকড়সা সূতা তৈয়ার করিয়া এই সকল ছিদ্র দিয়া বাহির করে । সেই সূতায় বাতাস লাগিবা মাত্র শুকাইয়া শক্ত হয় । মাকড়সার পিছনের পা দুখানির অগ্রভাগ চিরণির মত । এই দুই পা দিয়া সেই সব সূতাগুলি একত্র করিয়া ও

পাকাইয়া মোটা সূতা তৈয়ারী করে । সেই সূতা দিয়া জাল বোনে । তোমরাও
ত মাকড়সার জাল দেখেছ । সূতাগুলি বেশ সব না মোটা ?

ছা—খুব সর, ভাল রেশমের সূতা ।

শি—সব বটে কিন্তু সেই এক গাছির মধ্যে আবার কত গাছি আরও সব সূতা আছে ।
আচ্ছা, সেই একটা নলের ভিতর কতগুলি ছিদ্র আছে ?

ছা—এক হাজার ছিদ্র ।

শি—কয়টা নল আছে, বল ত ।

ছা—৪টা নল ।

শি—আচ্ছা, যদি প্রত্যেক ছিদ্র দিয়াই এক এক গাছি সূতা বাহির হয়, তবে সর্ব
সমেত কত গাছি সূতা হয় ?

ছা—চার হাজার সূতা । কি ভয়ানক !

শি—তাই এখন দেখ, জালের এক এক গাছি সূতা ৪০০০ গাছি সব সূতা পাকাইয়া
প্রস্তুত করিয়াছে । কেমন কারিকর দেখ । জেলের জালের চেয়েও কত বেশী
কারীকরী । বোর্ডে চিত্র আছে, তাহা দেখিয়া মাকড়সার জালটার একটা
বর্ণনা কর ।

ছা—গাড়ীর চাকার শলাকার মত সন্নিধান থেকে কতকগুলি সূতা জালের বাহিরের
দিকে গিয়াছে, সেগুলি আবার অন্য সূতার সঙ্গে নানা স্থানে বাধা ; এই শলাকা-
গুলির উপর দিয়াই ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সূতা বাধিয়া গিয়াছে ।

শি—যখন ফড়িং উড়িয়া যাইতে যাইতে এই জালে বাধিয়া পড়ে, তখন মাকড়সা
কি করে ?

ছা—মাকড়সা দৌড়িয়া গিয়া পোকটাকে ধরে ।

শি—এখন বুঝিতে পারিতেছ যে মাকড়সার ৬খানি পা, আর ১২টা চক্ষুর দরকার
কি ? চারিদিকে চোখ রাখিতে হয়, পোকা ফড়িং পড়িলেই দৌড়িয়া গিয়া ধরিতে
হয়, তা না হইলে তাহার পাকাইয়া যাইবে বা জাল টিঁড়িয়া উড়িয়া যাইবে
ইত্যাদি ।

১০ । সংক্ষিপ্ত কথোপকথন ।—এই কথোপকথনের
বিষয় উক্তরূপ না লিখিয়া সংক্ষেপেও নিম্নলিখিতরূপে লেখা যাইতে

পারে । (মিসিস্ মরটিয়ার কৃত 'নোটস অব্ লেসন্স ফর ইন্ফ্যান্টস্' হইতে) ।

বিষয়—বিড়াল ।

শ্রেণী—(৫।৬ বৎসরের) শিশু ।

উপকরণ—একটা পোষা বিড়াল ।

১ । সাধারণ বর্ণনা—বালকেরা বিড়ালের হাত, ধড়, মাথা প্রভৃতি দেখাইবে ও কোন্টা কেমন, তাহা বলিবে । মাথাটা গোল, চোখ দুটি বড়, শরীরটা লম্বা, গায়ের লোম বেশ নরম ও ঘন । বিড়ালের চারিখানি পা । তোমাদের কয়খানা ? বিড়ালের পায়ের নীচে কি আছে ? (থানা) আচ্ছা, এখন এই থাবা দেখ । থাবাতে কি কি দেখিতে পাচ্ছ ? (ছোট ছোট কটা রঙের নরম গদি) এই জন্যই বিড়াল চলিয়া গেলে শব্দ হয় না, যেরূপ চুকিলে টের পাওয়া যায় না ? জুতা পায়ের দিয়া হাঁটিলে টের পাওয়া যায় না ? আচ্ছা, আবার বিড়ালের নখ দেখ কেমন ধারাল ! এই নখ দিয়া কি করে ? (আঁচড়ায়) আচ্ছা, তোমার গায়ে বিড়ালের পা লাগিলেই কি আঁচড় লাগে ? (না) কেন লাগে না ? জান না ; তবে বলি, শুন । বিড়াল তার নখগুলি পায়ের গদির নীচে লুকাইয়া রাখে, যখন ইচ্ছা হয় তখন বাহির করে । যদি বিড়ালকে উৎপাত কর, কি মার, তাহা হইলে সে তোমাকে আঁচড়াইবার জন্য নখগুলি বাহির করিলে ।

২ । বিড়ালের চলাকেরা ও খাওয়াখাওয়া—আবার না রাগিলেও বিড়াল তার নখগুলি বাহির করিয়া থাকে । কখন বসিতে পার ? (কোন জিনিষ ধরবার জন্য) হাঁ, তার খাবার জিনিষ ধরবার জন্য । আচ্ছা, বিড়াল কি খায় ? কোন্ সময় বিড়াল তোমার কাছে না ডাক্তেই আসে ? (খাবার সময়) তোমাদের কার কার বাড়ীতে বিড়াল আছে ? আচ্ছা, লোকে বিড়াল রাখে কেন ? (ইঁদুর ধরার জন্য) আচ্ছা, বিড়াল ইঁদুর ধরে খেলে তোমার মা খুসী হন কেন ? (ইঁদুর আমাদের খাবার জিনিষ নিয়ে যায়) আবার তোমার মা কখন কখন বিড়ালের উপর রাগ করেন কেন ? কখন রাগ করেন ? (যখন আমাদের থালা থেকে মাছ চুরি করে নেয়) । (শিক্ষক এখানে বিড়ালের পানী ধরে খাওয়ার গল্প করিতে পারেন ; থাঁচা ভেঙ্গে যে পোষা পাখীও ধরিয়া খায়, একপ একটা ঘটনা বিবৃত করিবেন) । আচ্ছা, তাহা হইলে বিড়ালকে আমরা কি করি ? কিজ সব সময়ই কি তাকে মারা উচিত ?

বিড়াল যখন রাগ করে, তখন তাহার লেজটা দেখেছ ? বিড়াল কেমন করে ডাকে ? (ছই রকমে ডাকে ; মিউ মিউ করে, আবার পরন্ পরন্ করে) হাঁ, যখন তার মন খুসী হয় তখন পরন্ পরন্ করে । মিউ মিউ করে কখন ? (যখন সে মার খায় বা কোন জিনিষ চায়) বিড়ালের বাচ্চা দেখেছ ? তারা কি খায় ? (মা'র দুধ) বিড়ালী বাচ্চাকে দুধ দেয়, আর কি করে ? (আর গা পুছে দেয়) কি দিয়ে ? (তার জিভ দিয়ে) বিড়ালের জিভ, বড় খসখসে ; তোমার কেমন, হাত দিয়ে দেখ ত । (বেশ নরম) বিড়াল তার বাচ্চাগুলি নিয়ে কেমন খেলা করে দেখেছ ? সে সময় বিড়ালীকে উৎপাত করিতে নাই ।

৩। সংক্ষিপ্তসার—বালকগণ সমস্তে আবৃত্তি করিবে :—(১) বিড়ালের মাথা গোল । (২) বিড়ালের চোখ দুটা বড় বড় । (৩) বিড়ালের গা'র লোম বেশ নরম আর গরম । (৪) বিড়াল খুসী থাকিলে পরন্ পরন্ করে, আর যখন কিছু চায় তখন মিউ মিউ করে ।

৪। তারপর (সুবিধা হইলে বালকগণকে সিংহ ও ব্যাঘ্রের ভবি দেখাইয়া), এই বিড়াল কাদের মামী পিসী জান ? (না) বিড়াল এই ব্যাঘ্রের মামী, আর সিংহের পিসী ।

মন্তব্য ।—৫।৬ বৎসরের বালকগণের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । বিড়ালের অত্যাশ্চর্য্য বিবরণ উপর শ্রেণীতে শিক্ষা করিবে । নোট লিখিবার সময় যেন বালকগণের বয়সের দিকে দৃষ্টি থাকে ।

যে দিন বিশেষ কোন বিষয় লেখাইয়া দিতে হইবে, শিক্ষককে সেই দিন সেই বিষয়ই নোটের খাতায় লিখিয়া আনিতে হইবে ; যথা—রাজগণের বংশাবলীর তালিকা, আকবরের রাজত্ব-চিহ্নিত-গানচিত্র, আবৃত্তির জন্য কোন নূতন কবিতা ইত্যাদি । যে দিন সাপ্তাহিক বা অষ্টবিধ পরীক্ষা, সেই দিন সেই পরীক্ষার প্রশ্নই নোটের খাতায় লিখিয়া আনিতে হইবে । নোটের খাতা যেন শিক্ষকের দৈনিক কার্য্যের রোজনামচা ।

২। পাঠনা-সমালোচনা পদ্ধতি ।

পূর্বে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা শিক্ষকের কার্য্য পরিচালনার্থ একটা সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলন করিলাম । ইনস্পেক্টার প্রভৃতি

পরিদর্শকগণ এই সকল বিষয় দৃষ্টেই শিক্ষকের উপযুক্ততা বিচার করিয়া থাকেন । নমুনা ও ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রেরাও এই পদ্ধতি অনুসারে পরস্পরের পাঠনা-সমালোচনা করিয়া থাকে । যখন একজন পাঠদানে নিযুক্ত হয়, তখন অত্যাশ্রয় সকল ছাত্র তাহার প্রণালীর দোষ-গুণ (এই প্রণালীক্রমে) সংক্ষিপ্ত নোটের আকারে লিখিয়া রাখে । পরে শিক্ষার্থী শিশুগণ চলিয়া গেলে নিজ নিজ নোট দেখিয়া, শিক্ষকের নির্দেশক্রমে পাঠনার দোষ-গুণের বিচার করিয়া থাকে ।

সমালোচনা বলিলে আমরা সাধারণতঃ দোষ প্রদর্শনই বুঝিয়া থাকি । কিন্তু সে ভুল বিশ্বাস । সমালোচনায় দোষ-গুণ দুইই লক্ষ্য করিতে হইবে । অত্যাতির অপেক্ষা অত্যাতির ভাগই অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় । সমালোচনায় দোষ প্রদর্শন করিতে হইলে, সেই দোষের হেতু ও সেই দোষ সংশোধনের উপায়ও সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ করিতে হইবে ।

পরীক্ষকগণ শিক্ষানবীশ শিক্ষককে শিক্ষাদানের পূর্বে অধ্যাপনার বিষয়, শিক্ষার্থী ছাত্রগণের বয়স, শ্রেণী বা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদানের সময় বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকেন । শিক্ষককে নির্দ্ধারিত বিষয়ে নূতন পাঠনার নোট প্রস্তুত করিয়া বা পূর্বকৃত নোটের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হয় । নির্দিষ্ট সময় মধ্যে শ্রেণীস্থ বালকগণের বয়স ও পূর্বজ্ঞান বিবেচনায়, নির্দ্ধারিত বিষয়টী তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণাশক্তির আয়ত্ত করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইল কি না ও বালকগণ সেই শিক্ষায় লাভবান হইয়া আনন্দানুভব করিল কি না পরিদর্শক, পরীক্ষক ও সমালোচকগণ ইহাই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকেন । সুতরাং শিক্ষকগণকে নিম্নলিখিত বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে ।

১ । শিক্ষক বিষয়ক—

(ক) স্বর—উচ্চ, মৃদু, কর্কশ, ক্রটিমধুর, ধীর, দ্রুত ।

শিক্ষকের স্বরের বিষয়ে এইগুলি লক্ষ্য করা হইয়া থাকে । সমালোচনা কালে স্বরাক্রম তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে । ক্রটিমধুর স্বরই যে সর্বাপেক্ষা ভাল, তাহা বলা

বাহিনী । মানুষের স্বাভাবিক স্বর কৰ্কশ নয় । যাহারা মদ্য কুচিস্থাশ্রিত হইয়া নিরানন্দ থাকে, তাহাদের স্বরই কৰ্কশ হইয়া থাকে । অক্ষুন্নচিত্ত ব্যক্তির স্বর মধুর । আমরা যে স্বরে সাধারণতঃ কথা বলি, তাহাই শিক্ষাদানের পক্ষে উত্তম স্বর ।

(খ) ভাষা—অনর্গল (বাধ বাধ না হওয়া), বিশুদ্ধ (ব্যাকরণ-গত দোষ না থাকে), বিশদ (বুঝিতে কষ্টে না হওয়া), সুস্পষ্ট (উচ্চারণে জড়তা না থাকে), শ্রেণীর উপযোগী (কঠিন ভাষা না হওয়া) ।

সমালোচকগণ অশুদ্ধ ভাষা ও অশুদ্ধ উচ্চারণের নোট রাখিবেন । যথা, 'মেধের' স্থানে 'ম্যাব'—উচ্চারণের দোষ ; 'তাহার কাছে শুনিয়াছি' স্থানে 'তিনি'র কাছে শুনিয়াছি'—অশুদ্ধ ভাষা ।

(গ) ভাব—কঠোর, ক্রীতিশ্রদ, উৎসাহবর্জক, নৈরাশ্রপ্রণোদক ।

ক্রীতিশ্রদ ও উৎসাহবর্জক ভাবেই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় । কটমট দৃষ্টি ও নেত্র সঞ্চালন কঠোর ভাবের পরিচায়ক । 'তোমার কিছু হবে না, তুমি খাম কাট গিয়ে'—নৈরাশ্রপ্রণোদক ।

(ঘ) অবস্থান—দণ্ডায়মান স্থান হইতে সমস্ত ছাত্র শাসনযোগ্য কি না । ভঙ্গী, গতিবিধি, মুদ্রাদোষ, পরিচ্ছদ ।

যে ছেলেকে প্রশ্ন করা হয়, কোন কোন শিক্ষকের অভ্যাস তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়ান । এ সময়ে অশ্রু ছাত্রদিগের প্রতি দৃষ্টি থাকে না । কথা বলার সময় একটু হাত মুখের ভঙ্গী আবশ্যক । ইহাতে ভাব প্রকাশের সহায়তা করে । চিত্রপুস্তলিকার স্থায় এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকাও ভাল নয় বা ভুল্লকের মত ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করাও ভাল নয় । ভিত্ত বাহির করা, চোক মিটমিট করা, গৌফ দাড়ি কামড়ান, অঙ্গুলি মটকান, গায়ের ময়লা তোলা, পা নাচান, আস্তিন টানা প্রভৃতি মুদ্রাদোষ । আবার কেহ কেহ এক কথা বড় বেশী ব্যবহার করেন ; যথা—“আগি নাকি একবার নাকি যখন নাকি কান্দো গেলেম নাকি, সেখানে নাকি বড় গরম নাকি, তাই নাকি আগুন নাকি কলেরা হ'ল নাকি”—এও মুদ্রাদোষ । পরিচ্ছদ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুরচিসম্মত হওয়া আবশ্যক । সাধারণ পোশাক মলিন না হইলেই সুরচিসম্মত । অবস্থার অধিক ব্যবস্থা কুরচির পরিচায়ক । বাহার সোণার বোতাম ব্যবহার করিবার মত অবস্থা, তাহার পক্ষে সোণার বোতাম ব্যবহার দূষণীয় নহে । কিন্তু গরিবের পক্ষে সোণার গিল্টি করা বোতাম ব্যবহার করা কুরচির পরিচায়ক ।

(ঙ) পূর্বাভ্যাস—অধ্যাপনায় শিক্ষকের পূর্বাভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায় কি না ?

যে শিক্ষক বাড়ী হইতে পাঠনার নোট লিখিয়া প্রস্তুত হইয়া আসেন, তাঁহার প্রশ্ন করিতে কি পড়াইতে বাধ বাধ হয় না, আর তাঁহার পাঠনায় চিন্তারও পরিচয় পাওয়া যায় ।

২। শ্রেণী বিষয়ক—

(চ) স্থাপনা—বালকগণ উপযুক্ত স্থানে শৃঙ্খলাসমত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশে ও সুন্দর-রূপে উপবেশন করিয়া বা দণ্ডায়মান হইয়া আছে কি না ?

ইচ্ছামত কেহ বসিয়া আছে বা কেহ দাঁড়াইয়া আছে, এক বেঞ্চে ঘেসাঘেসি করিয়া অনেক বালক বসিয়াছে, অথবা বেঞ্চ খালি ; কেহ বেঞ্চে পা তুলিয়া বা কেহ অপরের গায়ে হেলিয়া বসিয়াছে, কেহ ত্রিভঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ইত্যাদি বিশৃঙ্খল ভাব সম্বন্ধে শিক্ষককে সাবধান হইতে হইবে । চাদরে বা জামায় গা ঢাকিয়া সমান দূরে দূরে বসিলে বা দাঁড়াইলে বেশ সুন্দর দেখায় ।

(ছ) দ্রব্যাদি—বালকগণের পুস্তক, খাতা, পেন, পেন্সিল প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রস্তুত আছে কি না ; আর সে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কি না ?

কোন জিনিষ না থাকিলেই নিজ শ্রেণী হইতে অথবা শ্রেণীতে যাইতে হয় । ইহাতে কেবল যে কাজের বিশৃঙ্খলা হয় তাহা নহে, বালকগণেরও উদাসীনতা বৃদ্ধি পায় । সুতরাং বালকেরা যাহাতে আবশ্যক জিনিষ আনিতে না ভুলে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । খাতা কিম্বা পুস্তকের মলাটে ও সেট যেন অপরিষ্কার না থাকে ।

(জ) শাসন—বালকগণ সমস্ত ক্রটি বিষয়ে শিক্ষক কর্তৃক শাসিত হইয়াছে কি না ?

(চ) ও (ছ) লিখিত ক্রটি ছাড়া ছুটামী, অশ্রুগনস্কতা প্রভৃতি আরও অনেক ক্রটি দেখিতে পাওয়া যায় ; ক্রটি দেখিলেই শাসন করিতে হইবে । চক্ষু চালনা দ্বারা যে শাসন তাহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম । একবার ছুটে ছেলেটির দিকে কটমট বরিয়া চাহিলেই সে সাবধান হইবে । পাঠনার সময় অশ্রুকপ শাসন করিতে হইলে কার্যের বাধাত হইবে, বালকগণের মনোযোগ নষ্ট হইয়া যাইবে ।

(ঝ) শিক্ষা—শিক্ষায় বালকগণ আনন্দ উপভোগ করিয়াছে কি না ?

বালকগণের মুখ দেখিয়া ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় । পাঠে স্খবোধ না করিলে বালকেরা অমনোযোগিতা ও চাঞ্চল্য প্রকাশ করে ।

(এ) ব্যবহার—বালকগণের বিনয়, ভদ্রতা, আজ্ঞা-প্রতিপালন, মনোযোগ প্রভৃতি লক্ষ্য করিবে ।

নুশুন শিক্ষক দেখিলে ছুটে বালকেরা কিছু উৎপাত করিতে চেষ্টা করে । কিন্তু শিক্ষক যদি শ্রেণীতে উপস্থিত হওয়া মাত্রই পড়াইতে আরম্ভ করেন, আর সমস্ত ছাত্রকে কাযো নিযুক্ত রাখেন, তবে গোলমালের বা অমনোযোগের সম্ভাবনা কম । শিক্ষক শ্রেণীতে প্রবেশ করিলে বালকেরা দাঁড়াই কি না, শিক্ষকের আজ্ঞা মাত্র পুস্তক, সেট, খাতা, পেন্সিল প্রভৃতি লয় কি না—ইত্যাদি বিষয়ও সমালোচকগণ দেখিয়া থাকেন ।

(ট) স্বাধীন ভাব—বালকগণ স্বাধীন ও নির্ভীক ভাবে এবং স্বেচ্ছাক্রমে প্রশ্নাদির উত্তর দিয়াছে কি না ?

স্বাধীন ভাবে অর্থাৎ অশু বালকের সাহায্য লইতে চেষ্টা করিয়াছে কি না । অনেক সময় এক বালক কিস্ কিস্ করিয়া অশু বালককে সাহায্য করে । দূর হইতে শিক্ষক শুনিতে পান না । আর যে সকল বিষয়ের একটা কথা বলিয়া দিলেই প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিতে পারা যায়, সেখানে অশুকে সাহায্য করা সহজ । শিক্ষক খুব কড়া শাসনে এই দুর্নীতি পরিত্যাগ করাইবেন । নির্ভীক ভাবে অর্থাৎ সাহসের সহিত (আন্দাজী উত্তর দিতে হইলে তেমন সাহস থাকে না) । স্বেচ্ছাক্রমে—মনে সন্দেহ থাকিলে কথাগুলি পরীক্ষারূপে বাহির হয় না ।

(ঠ) পূর্বজ্ঞান—বিষয় সম্বন্ধে বালকগণের পূর্বজ্ঞান ছিল কি না ?

যে ধর্ম প্রতিজ্ঞা জানে না, একপ ছেলে ৫ম প্রতিজ্ঞা বুঝিবে না । বালক হয়ত মূল বর্ণই জানে না, শিক্ষক তাহাকে মিত্রবর্ণ শিখাইতে আরম্ভ করিলেন । সুতরাং পূর্বজ্ঞানের পরিচয় আবশ্যিক । সুচতুর শিক্ষকেবা প্রশ্নমেই ২।৪টা প্রশ্ন করিয়া বালকগণের পূর্বজ্ঞানের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করেন ।

* (ড) বুদ্ধি চালনা—বালকগণ স্মরণশক্তি, তুলনাশক্তি, সিদ্ধান্তবৃত্তি, উদ্ভাবনীশক্তি, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির পরিচালনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল কি না ?

স্মরণশক্তি—প্রশ্ন করিয়া একটু সময় না দিলে, বালকগণ স্মরণশক্তির ব্যবহার করিতে পারে না । তুমি, তুমি, তুমি করিয়া একের পর অশু ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার স্মরণ করিবার অবসর পায় না ।

তুলনাশক্তি—বিড়াল ও কুকুর বা তাহাদের চিত্র প্রদর্শন করাইয়া জিজ্ঞাসা কর, ‘বিড়ালের মুখের সঙ্গে কুকুরের মুখের তুলনা কর’। বালকগণ নিজে দেখিয়া বুঝিবে ‘বিড়ালের মুখ গোল, কুকুরের লম্বা ইত্যাদি ; ভারতবর্ষের মানচিত্র ও ইংলণ্ডের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাও, ছুইটাই ত্রিভুজের মত। তারপর জিজ্ঞাসা কর, এই দুই ত্রিভুজে পার্থক্য কি? বালকেরা নিজে তুলনা করিয়া উত্তর দিবে “ভারতবর্ষের ত্রিভুজের ভূমি উপরে, ইংলণ্ডের ভূমি নীচে’। বালকগণের নিকট এইরূপে আদায় করিতে হইবে।

সিদ্ধান্তবৃত্তি—আমি যে লোহা আনিয়াছি ইহা আগুনে পোড়াইলে লাল হইল, তুমি যে লোহা আনিয়াছ তাহাও লাল হইল, যত্ন যেটা আনিয়াছে তাহাও তদ্রূপ হইবে ; এখন কি সিদ্ধান্ত করিতে পারি? বালক উত্তর দিবে, সব লোহা পোড়াইলেই লাল হয়।

উদ্ভাবনীশক্তি—আগুনের তাপে ঘটীর ডল বাষ্প হইয়া যাইতেছে। এই বাষ্পই মেঘ হইতেছে। প্রতিদিন একপাশে অনেক মেঘ হইতেছে। সমুদ্র ও নদী থেকেও এইরূপ বাষ্প উঠিয়া থাকে—কোন তাপে এইরূপ বাষ্প হয়?—বালকেরা চিন্তা করিয়া বলিতে পারিবে, ‘সূর্যের তাপে’। অন্ধ ও জ্যামিতিতে এই শক্তির চালনা হয়।

কল্পনাশক্তি—পাহাড়, পর্বত, নদী, হাট, বাজার, নগর প্রভৃতি বর্ণনা করিতে বলিলেই এই শক্তির অনুশীলন হয়। শিক্ষক কর্তৃক অজ্ঞাত বিষয়াদির বর্ণনা শ্রবণ করিলেও বালকের এই বৃত্তির অনুশীলন হইয়া থাকে।

(৬) নবজ্ঞান—বালকেরা কি পরিমাণ নবজ্ঞান লাভ করিল?

পূর্বে যাহা জানিত তাহারই পুনরালোচনা করা হইল, না তাহার কিছু নূতন শিখিল। যদি নূতন না শিখিয়া থাকে, তবে কেবল বৃথা সময় নষ্ট হইল। প্রত্যেক দিন বালকেরা যাহাতে কিছু নূতন বিষয় শিখিয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) ক্রটি—কোন বালকের চক্ষুর জ্যোতিঃ বা শ্রবণশক্তির হ্রাসতা কি উচ্চারণের জড়তা কি সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির স্বল্পতা লক্ষ্য করা হইয়াছে কি না ও তাহার কি প্রতিবিধান করা হইয়াছে।

যে বালকের চক্ষুর জ্যোতির হ্রাসতা আছে, তাহাকে বোর্ডের নিকটে এবং যাহার শ্রবণ শক্তির হ্রাসতা আছে, তাহাকে শিক্ষকের নিকট বসাইতে হইবে। উচ্চারণের জড়তা থাকিলে, তাহার দ্বারা কঠিন শব্দের অংশগুলি পৃথক করিয়া উচ্চারণ করাইয়া লইবে। বুদ্ধির স্বল্পতা থাকিলে, তাহার প্রতি একটু বেশী মনোযোগ দিতে হইবে।

৩। অধ্যাপনা বিষয়ক—

(ত) পরিমাণ—নির্দিষ্ট সময়ে পরিমাণের অধিক কি' অল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

কোন কোন শিক্ষক, পরীক্ষক বা পরিদর্শকের নিকট নিজের বিদ্যার পরিচয় দিতে গিয়া, বালকগণকে পরিমাণের অতিরিক্ত শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাতে পরিদর্শক বে-হিসাবী মনে করেন, পরীক্ষক কম নম্বর দেন।

(থ) নূতন শিক্ষা—পূর্বশিক্ষার সহিত যোগ করিয়া নূতন শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে কি না?

কোন কোন সময়ে পূর্বদিনের শিক্ষা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া বিষয় আরও করিতে হয়। ইতিহাস শিক্ষায় এই প্রথা অনুসরণ করা আবশ্যিক। অক্ষ জ্যামিতিতেও ইহার আবশ্যিকতা আছে। সাহিত্যের কোন গল্পের এক অংশ পড়া হইয়াছে, অবশিষ্টাংশ পড়াইবার সময় পূর্বদিনের পাঠের স্থল বিষয়ের পুনরাবলোচনা করা প্রয়োজন।

(দ) উপক্রমণিকা—শিক্ষাদানের উপক্রমণিকা উত্তম ও উপযুক্ত হইয়াছে কি না?

অধ্যাপনার বিষয়ে বালকের মন আকর্ষণ করাই উপক্রমণিকার উদ্দেশ্য। স্বল্প কথায় সুন্দররূপে উপক্রমণিকা বিবৃত হওয়া আবশ্যিক। এ বিষয়ে নানারূপ দৃষ্টান্ত পাঠনার নোট পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে।

(ধ) বিভাগ—বিষয়টী শৃঙ্খলামত বিভাগ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে কি না?

পদার্থ পরিচয় ও জ্যামিতি শিক্ষায় শৃঙ্খলার বিশেষ প্রয়োজন। ইতিহাস ভূগোলেও অনেক সময় শৃঙ্খলার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

(ন) প্রণালী—যে প্রণালীতে শিক্ষাদান করা হইয়াছে, তাহা ফলপ্রসূ হইয়াছে কি না?

বালকেরা যদি মনোমোহের সহিত শুনিয়া থাকে, তবে ফলপ্রসূ হইবারই সম্ভাবনা। তারপর শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে বালক যাহা বলে, তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়, বালক-কিছু শিখিয়াছে কি না।

* (প) উপকরণ—শিক্ষাদানের জন্ত যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা প্রচুর কি না ও তাহার সৎ ব্যবহার হইয়াছে কি না?

চক্ষুর সাহায্যে যে শিক্ষালাভ করা যায় তাহাই যখন সর্বাপেক্ষা উত্তম, তখন চক্ষুব-
সাহায্যার্থে যত উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায় ততই ভাল। আবার সেগুলির
সংব্যবহার আবশ্যক। দেয়ালে মানচিত্র ঝুলাইয়া রাখিলে বটে, কিন্তু কার্যকালে বালকের
নিকট কেবল ভূগোলের পাঠ মুখস্থ লইয়াই পড়া শেষ করিলে; তাহা হইলে মানচিত্র
ব্যবহার হইল কৈ ?

(ফ) ব্ল্যাকবোর্ড—ব্ল্যাকবোর্ডের উপযুক্তরূপ ব্যবহার হইয়াছে কি
না; অঙ্কিত চিত্রগুলি উত্তম ও উপযুক্ত হইয়াছে কি না ?

প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষায় যথেষ্টরূপ ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার করিতে হইবে। কঠিন শব্দ,
সংক্ষিপ্ত নিয়ম, মানচিত্র প্রভৃতি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিবে। চিত্রগুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশ
দেখাইবে। আর চিত্রাদির রেখা একটু মোটা করিয়া দিবে। দূরের বালকগণের দেখিবার
অসুবিধা হইবে না।

(ব) পদ্ধতি—পরিচিত বস্তুর সাহায্যে অপরিচিত, জ্ঞাত পদার্থের
সাহায্যে অজ্ঞাত, প্রত্যক্ষ বিষয়ের সাহায্যে অসুমেয়, বর্তমানের সাহায্যে
ভূত-ভবিষ্যত শিক্ষা দিবার যে প্রণালী তাহা অবলম্বিত হইয়াছে কি না ?

চিল বা বাজের সাহায্যে, অপরিচিত ঐগল পাখীর বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারা যায়।
পর্বতের উচ্চতা, নদীর দৈর্ঘ্য প্রভৃতি কেবল সংখ্যার দ্বারা উল্লেখ করিলে, সেই উচ্চতা
বা দৈর্ঘ্য বিষয়ে বালকগণের কোন জ্ঞান জন্মে না। এই জন্ত নিকটস্থ কোন বৃক্ষের উচ্চতা
মাপের দ্বারা ঠিক করিয়া রাখা আবশ্যক। কোন স্থানের উচ্চতা বুঝাইতে হইলে, উক্ত বৃক্ষেব-
সহিত তুলনায় বুঝাইয়া দিলে বালকগণের একটি ধারণা জন্মিতে পারে। সেইরূপ দৈর্ঘ্য
সম্বন্ধেও কোন পরিচিত রাস্তার পরিমাণ জানা থাকিলে, তাহার সাহায্যে নদী প্রভৃতির
দৈর্ঘ্য বিষয়ক জ্ঞানদান করা সহজ হইতে পারে। একটা নাস্তি ও নলের সাহায্যে দিবা রাত্রির
কারণ বুঝাইয়া দিলে পৃথিবী ও সূর্যের সম্পর্কে কিরূপে দিবারাত্রির সংঘটন হয়, তাহা
অনুমান করা সহজ হইতে পারে। কেহ কেহ ইতিহাস শিক্ষায়, প্রথমে বর্তমান কালের বিষয়ে
শিক্ষা আরম্ভ করিয়া, তাহার সহিত অতীত ঘটনাবলীর সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন।

৪। প্রশ্ন বিষয়ক—

* (ভ) সরলতা—প্রশ্নগুলি সরল, শুদ্ধ ও উদ্দেশ্য-প্রতিপাদক হইয়াছে
কি না ?

অতি অল্প কথায় সহজ ভাষায় প্রশ্ন রচনা করিতে হইবে । প্রশ্ন জ্ঞানীর যেন কোন উদ্দেশ্য থাকে, আর প্রশ্নের রচনা এরূপ কৌশলসম্পন্ন হওয়া আবশ্যিক যে, প্রশ্নের দ্বারা যেন সেই উদ্দেশ্য সাধন হয় ; অর্থাৎ বালকের নিকট হইতে যাহা আদিষ্ট করিবে মনে করিয়াছে, ঠিক তাহাই যেন আদায় হয় । সে প্রশ্নের যেন সে উত্তর ছাড়া অন্য উত্তর না হয় ।

(ম। প্রশ্নোত্তর—(১) শিক্ষক কোন প্রশ্নের উত্তর না পাইয়াও ক্ষান্ত হইয়াছেন কি না ?

(২) আংশিক শুদ্ধ উত্তর পাইয়া তিনি কিরূপে সম্পূর্ণ শুদ্ধ উত্তর আদায় করিয়াছেন ?

(৩) অশুদ্ধ উত্তর শ্রবণে তিনি কি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ?

(৪) নির্বোধের স্থায় উত্তর দিলে তিনি তাহার কি প্রতিকার করিয়াছেন ?

(১) কোন প্রশ্নের উত্তর না পাইলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে । বালক প্রশ্ন বুঝিতে পারে নাই, কি শিক্ষকের কথায় মনোযোগ করে নাই, কি সে প্রশ্নের যে উত্তর তাহা সে জানে না—এই সকল কারণের প্রতিকার করা আবশ্যিক । (২) আংশিক শুদ্ধ উত্তর পাইলে অপর অংশের জন্ত ভিন্ন প্রশ্ন কবিয়া, সে অংশের শুদ্ধ উত্তর আদায় করিতে চেষ্টা করিবে । (৩) শুদ্ধ উত্তর পাইলে বালককে উৎসাহ দিবার ও মধ্য মধ্য 'না, বেশ, ঠিক কথা' প্রভৃতি উৎসাহসূচক বাক্যের ব্যবহার প্রয়োজন । (৪) নির্বোধের মত উত্তর দিলে তাহারও কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যিক ।

(য) শৃঙ্খলা—প্রশ্নগুলি শৃঙ্খলাপূর্বক করা হইয়াছে কি না ?

শিক্ষাদানের নিমিত্ত যে সকল প্রশ্ন করা হয়, তাহার শৃঙ্খলা থাকা নিতান্ত আবশ্যিক । সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর একত্র করিলে যদি বিষয়টি ধারাবাহিকরূপে বুঝিতে পারা যায়, তবে প্রশ্নগুলি শৃঙ্খলা বলা বাইতে পারে । পরীক্ষার নিমিত্ত প্রশ্নে শৃঙ্খলার প্রতি নিশেধ কোনরূপ দৃষ্টি রাখা হয় না ।

(র) প্রশ্নসংখ্যা—শিক্ষক অত্যধিক কি অত্যল্প প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ?

ছুইই দোষের । তবে অত্যল্প অপেক্ষা অত্যধিক অধিকতর দোষের । বালকগণের বয়স, অভিজ্ঞতা ও সময়ের পরিমাণ দৃষ্টে প্রশ্নের সংখ্যা নির্ধারণ করিতে হয় ।

(ল) পুনরালোচনা—পুনরালোচনার জন্ত যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিয়াছেন তাহার দ্বারা বাগকের নবোপার্জিত জ্ঞানের উত্তমরূপ পরীক্ষা হইয়াছে কি না ?

বাগকেরা যে শব্দ, অর্থ, সূত্র, সংজ্ঞা প্রভৃতি (সম্পূর্ণ নূতন) শিক্ষা করিল, সেগুলি তাহাণা মনে করিয়া রাখিয়াছে কি না, তাহাই বুঝিবার জন্ত পাঠের শেষে পুনরালোচনার্থ প্রণয় করা হয় । এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ পাঠনার নোট পরিলেছেদে জ্ঞেয়া ।

৫ । বিয়য়গত ভুল—

(ব) অজ্ঞতা—কোন্ কোন্ স্থানে শিক্ষক নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন ?

আকবরের রাজত্ব কাল শিক্ষা দিতে যদি শিক্ষক মানচিত্রের দ্বারা আকবরের রাজত্বের পরিমাণ নির্দেশ করিতে না পারেন, ৫ম প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে যদি তিনি ৪র্থ প্রতিজ্ঞা প্রয়োগ করিতে না পারেন, তবে তিনি অজ্ঞতার পরিচয় দেন ।

* (শ) কোন্ কোন্ স্থানে শিক্ষক ভুল শিক্ষা দিয়াছেন ।

ঝালে ও নীলে মিশাইলে সবুজ হয়, কলিকাতা ভাগীরথীর পশ্চিম পায়ে, শ্রীরামপুরী কাগজের ২৪ খানে এক দিস্তা হয় প্রভৃতি ভুল শিক্ষা ।

সমালোচকগণ এই রূপে সমালোচনা করিয়া, উপসংহারে একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন ।

৬ । উপসংহারে সংক্ষেপ মন্তব্যের এই রীতি—

(ব) পাঠদান উত্তম হইলে—উত্তম, উৎকৃষ্ট বা সুন্দর ।

(স) মধ্যম হইলে—মধ্যম, সাধারণ বা মন্দ নয় ।

(হ) অধম হইলে—‘পাঠনা ভাল হয় নাই’ বলিয়া সমালোচনা শেষ করিতে হয় ।

জ্ঞেয়া ।—প্রত্যেক সমালোচনায় * চিহ্নিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে মনোযোগী হইতে হইবে । সে সকল সাধারণ গুণ প্রায় শিক্ষকেই দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ কোন্ কোন্ গুণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য না থাকিলে (সমালোচনা সংক্ষেপ করিবার জন্ত) কোন মতামত প্রকাশ না করিলেও চলিবে । কেবল মৌখিক-শিক্ষাদান সমালোচনা করিবার জন্তই এ পদ্ধতির নির্দেশ করা হইল, অগ্ররূপ শিক্ষাদান-কালে এই পদ্ধতির অবস্থানরূপ পরিবর্তন করিয়া লইতে হইবে । এই প্রণালী অনুসারে একবার সমালোচনা অভ্যাস হইয়া গেলে, আর নির্দিষ্ট পদ্ধতির আবশ্যকতা থাকিবে না । তখন সমালোচকগণ নিজেরাই সমালোচনায় নানাবিধ নতুন বিষয়ের অবতারণা করিতে পারিবেন ।

৩। পরীক্ষা-পদ্ধতি ।

পরীক্ষার আবশ্যকতা ।—যে শিক্ষক সমস্ত বৎসর বালককে পড়াইয়াছেন তিনি বিনা পরীক্ষায়ও বালকের গুণাগুণের সাক্ষ্য দিতে পারেন। কিন্তু যদি গুণের একটা সূক্ষ্মসীমা নির্দিষ্ট থাকে (যেমন সাহিত্যে $\frac{৩৩}{১০০}$, অঙ্কে $\frac{৩৩}{১০০}$, ইতিহাসে $\frac{৩৩}{১০০}$ উত্তীর্ণ হইবার শেষ সীমা), তবে পরীক্ষা না করিয়া গুণাগুণের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না।

পরীক্ষা আছে বলিয়া বালকগণ প্রথম হইতেই অতি সাবধানে পাঠাভ্যাস করে। পরীক্ষার সময় কেবল নিজের উপর নির্ভর করিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া স্নাবলম্বন শিক্ষা করে। কিন্তু ইহার আবার দোষ আছে। পরীক্ষা আছে বলিয়া বালকগণ অনেক সময় সমস্ত পাঠ্য না পড়িয়া, কেবল যে সকল স্থান হইতে প্রশ্ন আসিবার সম্ভাবনা, তাহাই পাঠ করে। তারপর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশায়, নানারূপ অসৎ উপায় অবলম্বন করিবার জন্ম প্রলোভিত হয়।

পরীক্ষার প্রকার ।—মৌখিক, লিখিত এবং মৌখিক ও লিখিত একত্রে। লিখিত পরীক্ষায় বালকগণ চিন্তা করিয়া উত্তর দিবার সময় পায় বটে, কিন্তু আবার উত্তমরূপ রচনাশক্তি না থাকিলে, উত্তর লিখিয়া উঠিতে পারে না। মৌখিক পরীক্ষায় রচনার তেমন আবশ্যকতা হয় না বটে, কিন্তু আবার চিন্তা করিবার সময় পাওয়া যায় না। এই জন্ম কতক লিখিত ও কতক মৌখিক যে রীতি, তাহাই অনেক উত্তম বলিয়া মনে করেন।

পরীক্ষার প্রশ্ন ।—অধিকাংশ বালক যেরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, সেইরূপ প্রশ্ন দেওয়াই কর্তব্য। বালক যাহা জানে, তাহাই পরীক্ষা করা প্রশ্নের উদ্দেশ্য; যাহা জানে না, তাহা পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য নহে। অনেক পরীক্ষক কঠিন প্রশ্ন দিয়া বাহাদুরী লইতে চান, কিন্তু

ইহাতে নিন্দা বই সুখ্যাতি হয় না । তারপর প্রশ্নগুলি নির্ধাচন করিয়া নিজে একবার তাহার উত্তর লিখিতে চেষ্টা করা উচিত । তাহা হইলে প্রশ্নসংখ্যা অধিক হইল কি না, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে । ৩ ঘণ্টার প্রশ্ন করিতে হইলে, ২ ঘণ্টায় যে পরিমাণ লিখিতে পারা যায়, তাহারই প্রশ্ন করিতে হইবে । অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময় চিন্তা ও পুনরাংলোচনার জন্য রাখা উচিত । পরীক্ষার্থীগণের মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন বালক নির্ধারণের জন্য, একটি মাত্র কঠিন প্রশ্ন দেওয়া যাইতে পারে । পরীক্ষক তাঁহার প্রশ্নের যে পরিমাণ উত্তর আশা করেন, তাহা বালকেরা প্রশ্নের পার্শ্বস্থ মূল্য দেখিয়া নির্ধারণ করিয়া থাকে ; সুতরাং যে প্রশ্ন যে পরিমাণে কঠিন বা তাহার উত্তর লিখিতে যে পরিমাণ সময় লাগিতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া প্রশ্নের মূল্য লিখিয়া দিবেন । প্রশ্নের অন্ত্যান্ত যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে ।

প্রশ্নের উত্তর ।—প্রশ্নের উত্তর যথাযথ হওয়া আবশ্যক । উত্তরের পরিমাণ প্রশ্নের মূল্য দৃষ্টে নির্ধারণ করিতে হইবে । “আকবরের বিষয় লিখ”—এ প্রশ্নে মূল্য যদি ১ হয়, *—তবে আকবরের বিষয় ৪।৫ লাইনে লিখিতে হইবে । কিন্তু যদি ১০ নম্বর থাকে, তবে $৪ \times ১০ = ৪০$ লাইন কি ৫০ লাইন লিখিতে পার । সাধারণতঃ ১ নম্বরের জন্য ৩।৪ লাইন পরিমিত লিখিলেই হইবে । তবে যদি একরূপ প্রশ্ন হয় যে, “পলাশীর যুদ্ধের তারিখ লিখ”—আর প্রশ্নের নম্বর থাকে ১, তখন অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তরে “১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল” ভিন্ন আর ৩।৪ লাইন লিখিবার কিছুই নাই ।

[পরীক্ষা-কাগজের দুই স্ফাল্ল পাশ রাখিলেই চলিবে । যত কম কাগজ ব্যবহার করা যায় ততই ভাল । পরীক্ষায় যখন কাগজ ওজন

* ইতিহাসের প্রশ্ন—৩ ঘণ্টার জন্য—পূর্ণ মূল্য ৬০—ছাত্রবৃত্তি বা মেট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় ।

করিয়া নম্বর দেওয়া হয় না, তখন কম কাগজে উত্তর দিলেই পরীক্ষকের পক্ষে স্বেচ্ছাজনক হইবে। লেখা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর (প্রশ্নের নম্বর দিয়া) পৃথক পৃথক করিয়া লিখিতে হইবে। উত্তরের কোন অংশ ভুল হইলে, কেবল মাত্র একটা টান দিয়া কাটিয়া দিবে। লেখার লাইনের মধ্যে মাত্র এক আঙ্গুল পরিমিত স্থান থাকা আবশ্যক। যদি কোন কথা বা অংশ কোন স্থানে যোগ করিতে হয়, তবে সেই স্থানে একটা ক্যারেট (^) চিহ্ন দিয়া উপরের ফাঁকে, সেই কথা বা অংশ যোগ করিয়া দিতে পারা যায়।

উত্তরের কাগজ পরীক্ষা।—সাপ্তাহিক পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষা করিয়া বালকগণকে ফেরৎ দিতে হয়। উত্তরে যত প্রকার অশুদ্ধ থাকে সমস্তই শুদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত নহে। বর্ণবিভ্রাস ভুল করিলে, সেই শব্দের নীচে একটা টান দিয়া রাখিবে; বালকগণ নিজে ভুল শুদ্ধ করিবে। ব্যাকরণ-দৃষ্ট * পদের নাচে দুইটা টান দিয়া রাখিবে। কোন স্থানে হঠাৎ কথা ফেলিয়া গেলে, সেই স্থানে একটা ক্যারেট (^) চিহ্ন দিয়া রাখিবে। বালকগণ সেই শব্দ নিজেই পূরণ করিবে। এক শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্বন্ধ ঠিক না থাকিলে, উভয় শব্দের নীচে x চিহ্ন দিয়া রাখিবে, বালকগণ তাহা নিজেই শুদ্ধ করিবে। অসম্বন্ধ বর্ণনা করিলে বা অসম্বন্ধ শব্দ লিখিলে সেখানে একটা (?) প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিবে। নির্কোষের মত কোন উত্তর লিখিলে তাহার উপর আশ্চর্য্যবোধক চিহ্ন (!) দিবে। যে ভুল বালক শুদ্ধ করিতে পারিবে না মনে হয়, কেবল সেই ভুল কাটিয়া শুদ্ধ করিয়া দিবে। যেখানে বালকের বাক্য বা বাক্যাংশ

* অধীনস্থ, অনাটন, আবশ্যকীয়, আশ্রয়াদীন, একত্রিত, জৈবাবৃত্তিক, জাতাগণ, বিধায়, নিন্দুক, নির্দোষী, নিরপরাধী, রাজাগণ, মহারাজা, মাব্যস্ত, মাধকশ, সাহায্যকৃত, সম্রাজ্ঞী, মহারাজ্ঞী, দিব্যরাত্রি, সঙ্গম, প্রভৃতি কথা ব্যাকরণ-দৃষ্ট হইলেও ভাষায় বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। একপদ শব্দ কাটা না কাটা শিক্ষকের স্বেচ্ছাদীন।

অপেক্ষা, উত্তম বাক্য বা বাক্যাংশের প্রয়োগ বিধেয় মনে কর, সেইখানে সেই উত্তম বাক্যাঙ্গি বালকের বাক্যের উপর লিখিয়া দিবে । লাল কালির দ্বারা ভুল সংশোধন করিবে । নিয়ে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল ।

"দশরথ অযোধ্যা মহাদেশের রাজা ছিলেন । তাহার প্রধান মহীষি কৌশল্যার গর্ভে
!!! জন্মগ্রহণ করেন

রাম, সুমিত্রার ৮ লক্ষণ এবং কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত ও শত্রুঘ্ন জন্ম দায়েন । দশরথ বার্মাকাতা দশায় উপনীত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকেই তিনি রাজপদে অভিষিক্ত করিতে

x

অভিলাষ করিল ।"

x

বালকেরা যে সকল প্রশ্নের উত্তর করে নাই, তাহার উত্তর প্রত্যেক কাগজে লিখিয়া দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে অসম্ভব । এই জন্ত যে দিন পরীক্ষার কাগজ ফিরাইয়া দিতে হয়, সেই দিন শ্রেণীতে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দিতে হইবে । যাহারা যে প্রশ্নের উত্তর লেখে নাই তাহারা তখন লিখিয়া লইবে বা সম্পূর্ণ লিখিয়া লইতে না পারিলে একটু একটু টোকা (নোট) করিয়া লইবে । পরে বাড়ীতে গিয়া পূর্ণ উত্তর লিখিবে । বালক লিখিল কি না, তাহার দিকে যেন দৃষ্টি থাকে । কোন কোন স্কুলে প্রত্যেক বিষয়ের পরীক্ষার জন্ত, বালকেরা এক একখানি পৃথক খাতা বাঁধিয়া রাখে । যেমন সাহিত্যের খাতা—অর্থাৎ বৎসরে সাহিত্যের বিষয়ে যত পরীক্ষা হইবে, সেই সমস্তই এই সাহিত্যের খাতায় লিখিত হইবে । পৃথক পৃথক আলগা কাগজে সাপ্তাহিক পরীক্ষার উত্তর লেখা সুবিধাজনক নহে । অনেকেই এইরূপ খাতার ব্যবস্থা পছন্দ করেন ।

প্রশ্নোত্তরের মূল্য ।—সুন্দর রচনা করিবার ক্ষমতা একটা বিশেষ শক্তি । যেমন সকলে কবিতা লিখিতে পারে না, তেমনি সকলে

স্বন্দর রচনা করিতে পারে না । মূল্য দিবার সময় এ কথা মনে রাখা কর্তব্য । আবার যে শ্রেণীর বালকের নিকট যেরূপ রচনা আশা করা যাইতে পারে, তাহাই দেখিয়া মূল্য দিতে হইবে । সাপ্তাহিক পরীক্ষার মূল্য ও বাৎসরিক পরীক্ষার মূল্য সম্বন্ধে একটু পার্থক্য রাখা আবশ্যক । সাপ্তাহিক পরীক্ষায় যেমন প্রত্যেক প্রশ্নোত্তরে অতি সূক্ষ্ম হিসাবে মূল্য দেওয়া হয়, বাৎসরিক পরীক্ষায় তাহার একটু ব্যতিক্রম করা আবশ্যক । এমন হয় যে, একটী বালক কতকগুলি শব্দের জীলিঙ্গ ও কতকগুলি শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় আন্দাজে লিখিয়া, এক আধ নম্বর জুটাইতে জুটাইতে কোন রকমে ৩৩ পাইয়া পাশের নম্বর রাখিল । কিন্তু তাহার রচনাংশ দ্রুত শ্রেণীর উপযোগী নয় । আবার একটী বালকের রচনাংশ উত্তম বটে, কিন্তু অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না বলিয়া ৩০ নম্বর পাইয়া “ফেল” হইল । এরূপ অবস্থায় উভয়কেই সমান নম্বর দেওয়া উচিত ; অথবা যাহার রচনা-প্রণালী ভাল, তাহাকে কিছু বেশী নম্বর দেওয়াও মন্দ নহে । সময় সময় নিতান্ত নিক্কোমের মত উত্তর লিখিয়াও বালকেরা নম্বর পাইয়া থাকে । মনে কর, প্রশ্নে আছে ‘গঙ্গাতীরস্থ ৬টা নগরের নাম লেখ’ । প্রশ্নের মূল্য ৩—অর্থাৎ এক একটী নগরে ২ । একটী বালক উত্তর লিখিল—এলাহাবাদ, নীলগিরি, সিমলা, কানী, কলম্বো, নর্মদা । ২টা নগর ঠিক হইয়াছে বলিয়া পরীক্ষক ১ নম্বর দিলেন । বালক কিন্তু সম্পূর্ণ আন্দাজে উত্তর লিখিয়াছে—হঠাৎ ২টা নাম মিলিয়া গিয়াছে । এরূপ উত্তরে নম্বর না দেওয়াই সঙ্গত । আবার দেখ, প্রশ্ন-পত্রের ৩টা অঙ্ক মাত্র কিসিয়া একজন $৩ \times ১০ = ৩০$ নম্বর পাইয়া পাশ করিল । আবার একজন ৪টা অঙ্ক কিসিয়াছে বটে, কিন্তু উত্তরের কাছে আসিয়া ২টা অঙ্কে একটু একটু ভুল করিয়া $২ \times ১০ = ২০$ নম্বর পাইয়া ফেল করিল । এ ফেলের কোন অর্থ নাই । হঠাৎ $\frac{৩}{৪}$ লিখিতে $\frac{৩}{৪}$ লিখিয়াছে বলিয়া অঙ্ক ভুল করিয়াছে । একটী অঙ্ক শুদ্ধ করিলেই যখন ১০ নম্বর

পায়, তখন ঐরূপ অঙ্কের কাগজ পরীক্ষার সময় এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক । এই জন্ত বাৎসরিক পরীক্ষার সময় সাপ্তাহিক পরীক্ষার নথিগুলির হিসাব করা উত্তম প্রথা ।

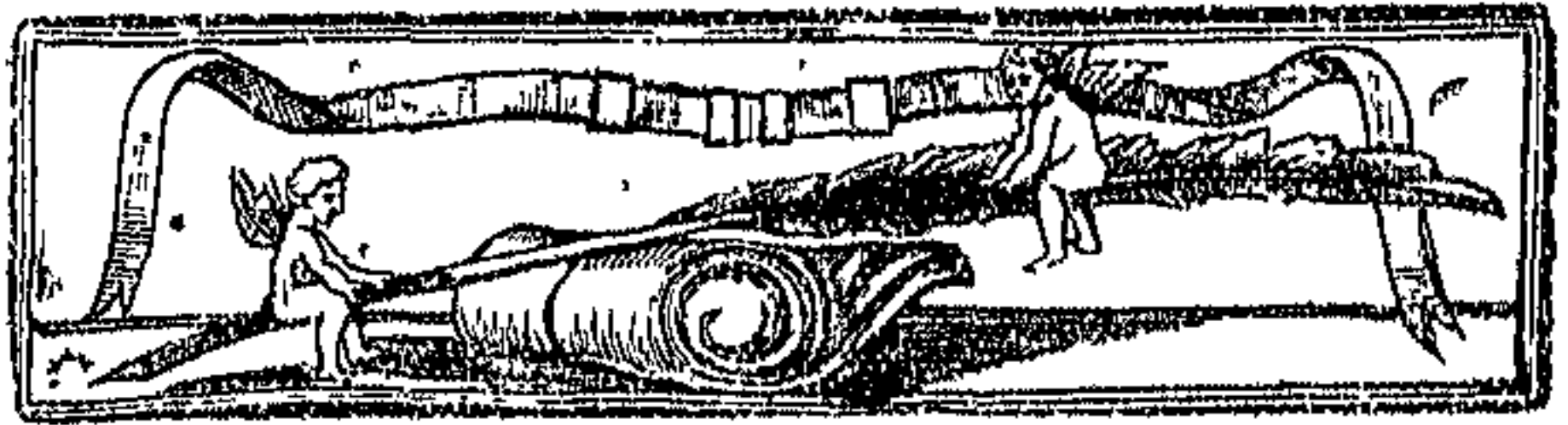
ভুলের কথা—পরীক্ষা-কাগজে যে সকল সাধারণ ভুল পাও তাহার একটা তালিকা করিবে । দেখিবে যে, ভুল ও ভুলিয়া বিপথে যায় না—তাহারও যেন একটা নির্দিষ্ট পথ আছে । এই সকল সাধারণ ভুল সম্বন্ধে বালকগণকে সাবধান করিলে অনেক উপকার হইবে । নিম্নে এইরূপ ভুলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল । এই ভুলগুলি প্রায় সকল বালকই করিয়া থাকে ।

বানানে ভুল ।—চিহ্ন, অপরাহ্ন, বক্র, শত্র ।

রচনায় ভুল ।—বিদ্যালয়গর তিনি বড় দয়ালু ছিলেন । শরীর রক্ষার জন্ত আশ্রয় আহ্বান করা কর্তব্য ।

বিয়োগে ভুল ।— $৩০৬ - ১৯৮ = ২০৮$ । ভগ্নাংশে ভুল ।— $\frac{৪}{৪} = ০$ ।

পরীক্ষার আধিক্য ।—পরীক্ষার আধিক্য ভালও বটে, আবার মন্দও বটে । যখন যখন পরীক্ষা হয় বলিয়া বালকেরা যদি পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত না হয়, আর যদি শিক্ষক কাগজাদি পরীক্ষা করিতে শৈথিল্য করেন, তবে পরীক্ষায় সফল না হইয়া বরং কুফলই হইয়া থাকে । সমস্ত সময় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বহুবিধ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন । শিক্ষকেরা মনে করেন যে, সময়ের স্বল্পতা ও বিষয়ের আধিক্য হেতু সে আদেশ পালন করা কঠিন । কিন্তু সে বিশ্বাস ভুল । পরীক্ষা বলিলেই যে ৩ ঘণ্টার প্রশ্ন বুঝিতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই । কতকগুলি প্রশ্ন মুখে মুখে জিজ্ঞাসা কর, একটা দুইটা প্রশ্নের উত্তর (যেমন রচনা, ড্রইং, অঙ্ক) লিখিতে দাও । এক ঘণ্টা কি অর্ধ ঘণ্টাতেই সমস্ত পরীক্ষা শেষ হইতে পারে । বালকগণকে প্রস্তুত করাইতে হইবে, পরীক্ষার এই উদ্দেশ্য ঠিক রাখিবে । কিন্তু লিখিত পরীক্ষায় যে সমস্ত কাগজ তোমাকে পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহা বাহাতে বীতিমত পরীক্ষা করিয়া সময়মত ফিরাইয়া দিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে । তাহা না করিলে পরীক্ষার প্রতি বালকগণের ভয় ভক্তি কমিয়া যাইবে ।



উপসংহার ।

পুস্তক শেষ হইল বটে কিন্তু সমস্ত কথা বলা হইল না । বলিতে গেলে যে কেবল পুস্তক বাড়িয়া যায় তাহা নহে, তাহাতে কিছু অপকারও হইতে পারে । সমস্ত কথা পুস্তকে পাইলে, শিক্ষকগণ আর তাঁহাদিগের স্বাধীন চিন্তাশক্তি পরিচালনা করিয়া নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিবেন না । এই শ্রেণীর পুস্তকের উদ্দেশ্যই কেবল শিক্ষককে পথে তুলিয়া দেওয়া মাত্র ; তারপর গন্তব্যাদিক, গন্তব্যায়ান ও গন্তব্যস্থান তিনি নিজে ঠিক করিয়া লইবেন ।

আর এক কথা—পুস্তকে নানারূপ পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে ; সকল পদ্ধতি সকলের ভাল লাগিবে না । যিনি যে পদ্ধতিতে কাজ করিয়া সুবিধা বোধ করেন, তিনি সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন । আবার তাই বলিয়া কোন পদ্ধতি বিশেষের দাস হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে । যেমন করিয়া ইউক বালককে প্রকৃতরূপে শিক্ষা দিতে হইবে । এখন যে পদ্ধতি (লাঠী মারা বাদে) অনুসরণ করিলে সেই ফল লাভ হয়, তাহাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি । আরও এক কথা, যে যে বিষয়ের শিক্ষাদান সম্বন্ধে এই পুস্তকে উপদেশ প্রদত্ত হইল, শিক্ষকের যদি সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকে, তবে তাঁহার পক্ষে কেবল পদ্ধতির পুস্তক পড়িয়া শিক্ষকতা করিতে

চেষ্টা করা যথা । এই পুস্তকে শিক্ষাদানের প্রকরণটী মাত্র দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—বিষয়ের জ্ঞান সেই সেই বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিয়া উত্তমরূপে প্রাপ্ত হইতে হইবে ।

তারপর আরও একটা বিশেষ কথা এই যে প্রকৃত শিক্ষক হইতে হইলে ছাত্র হইতে হইবে ; আশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে । বিদ্যালয়ে শিক্ষার শেষ হয় না । চিরজীবনই শিক্ষার সময় । বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর হইতে আশিক্ষার কাল উপস্থিত হয় ।

আর আশিক্ষা বিশেষ আবশ্যকও বটে, কারণ (১০) বিদ্যালয়ে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করা অসম্ভব, (১০) বিদ্যালয়ে যাহা কিছু শিক্ষা করা হইয়াছে সে সমস্ত সতেজ রাখিবার জ্ঞান আলোচনা আবশ্যক । (১০) চারিদিকের কঠোর প্রতিযোগিতার সহিত সমকক্ষতা রক্ষা করিতে হইলে, সর্বদা নিজকে নব নব জ্ঞানে উন্নত রাখা আবশ্যক (১০) আর আত্মোন্নতি, পদোন্নতি, ভবিষ্যৎ উন্নতি সমস্তই এই আশিক্ষার উপর নির্ভর করে ।

আশিক্ষার বহু উপায় আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলি সাধারণ—
(১) উত্তম গ্রন্থাদি অধ্যয়ন (২) পাঠ, কথকথা, বক্তৃতাাদি শ্রবণ (৩) উন্নত ব্যক্তিদের সহিত আলাপ (৪) দেশ ভ্রমণ (৫) পর্য্যবেক্ষণ ।

আশিক্ষার যে সমস্ত উপায় উল্লিখিত হইল তন্মধ্যে উত্তম পুস্তক পাঠই সহজ ও সর্বোৎকৃষ্ট উপায় । কিন্তু বিশৃঙ্খলভাবে কতকগুলি বাজে পুস্তক পাঠ করিলে, বিশেষ কোন ফল লাভ হয় না । আশিক্ষার জ্ঞান

(ক) নিজের ক্রটিকর উত্তম পুস্তক সংগ্রহ করিতে হইবে । জীবন-চরিত, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ইতিহাস, পুরাণ, প্রাণী-বৃত্তান্ত, উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতি উত্তম বিষয় ।

(খ) পুস্তক পাঠ করিয়া কি নূতন জ্ঞান লাভ হইল তাহা চিন্তা করিতে হইবে ।

(গ) কোন একটা উদ্দেশ্য স্থির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করা উচিত । কেবল সময় কাটাইবার জন্য পড়ায় কোন ফল নাই ।

(ঘ) যে বিষয় শিক্ষা করিলে অবস্থার উন্নতি বা মনের উন্নতিসাধন হইতে পারে, এইরূপ একটা কি দুইটা বিষয় নির্ণয় করিয়া, তাহার অনুশীলন করিতে হইবে ।

(ঙ) সম্ভবপর হইলে আরও একটা কি দুইটা ভাষা শিক্ষা করিতে চেষ্টা করা উচিত । আমাদের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক । ইহার উপর সংস্কৃত কি আরবীর আলোচনা করিতে পারিলে আরও উত্তম ।

(চ) সম্ভবপর হইলে নিজের একটা ক্ষুদ্র পুস্তকাগার করা আবশ্যক । আজকাল বঙ্গবাসী, বঙ্গমতী ও হিতবাদীর অনুগ্রাহে পুস্তকের দাম খুব কমিয়া গিয়াছে ।

(ছ) পৃথিবীর কোথায় কি ঘটনা ঘটিতেছে, কি কি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে ইত্যাদি বিষয়ে আপনাকে অভিজ্ঞ রাখিবার জন্য অন্ততঃ পক্ষে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র পাঠ করা কর্তব্য ।

শেষ কথা ।—উন্নতির মূলমন্ত্রের সাধনা ব্যতিরেকে কখনই কার্যসিদ্ধি হইবে না । শিক্ষক নিজে সেই মন্ত্রের সাধক হইবেন, আর শিষ্যগণকেও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন । সে মন্ত্র কি ?—

সর্বং পরবশং ভুংখং সর্বমাত্মবশং স্তুত্বম্—মনু ।



পালিশ (Polish) ।—বেঞ্চ, ডেস্ক, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি ব্যবহারে সয়লা হইয়া উঠিলে, প্রথমে সোডা মিশ্রিত গরম জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। ধুইবার সময় নারিকেলের ছোবড়া কাটিয়া লইয়া তাহা দ্বারা ঘসিলে সয়লা ও কালির দাগ অনেক পরিমাণে উঠিয়া যাইবে। পরে শিরিষ কাগজ দ্বারা ঘসিয়া আর একটু পরিষ্কার করিয়া লইবে। তারপর তাহাতে তুলি বা ছেঁড়া কাপড়ের দ্বারা পালিশ লাগাইতে হইবে।

পালিশ প্রস্তুত করিবার প্রণালী—সাধারণ স্পিরিটের (সুরাসার) মধ্যে কয়েক-খণ্ড টাচ (গহনার ভিতর যে লাক্ষা ভরিয়া দেয়) ফেলিয়া রাখ, টাচ স্পিরিটে গলিয়া যাইবে। যদি ঘন বোধ হয় তবে একটু স্পিরিট দিয়া পাতলা করিবে। রসগোল্লার পাতলা রসের মত ঘন হইলেই কার্যের উপযুক্ত হইবে। যদি একটু লালটে রঙ পছন্দ কর তবে ইহার সঙ্গে একটু খুনথারাপি (এক রকম লাল রঙের গুঁড়া) মিশাইয়া লইবে। এইরূপ রঙ সেগুন কাঠের পালিশে প্রায়ই মিশাইয়া থাকে। হলুদ রঙ (কাঁঠালের কাঠের মত) করিতে হইলে একটু পেউডী (এক প্রকার হলুদ রঙের গুঁড়া) মিশাইয়া লইবে। এইরূপ পালিশ একবার কি দুইবার লাগাইলেই হইবে।

বার্ণিশ (Varnish) —যদি পালিশ করিয়া তাহাকে আবার চক্চকে করিতে ইচ্ছা হয়, তবে বার্ণিশ লাগাইতে হইবে। অল্প বার্ণিশ প্রস্তুত করিয়া লওয়া অপেক্ষা কেনাই সুবিধা বলিয়া বার্ণিশ প্রস্তুতের কথা লিখিত হইল না। সাধারণতঃ এই সকল কার্যের পক্ষে কোপ্যাল বার্ণিশই উত্তম। এক সেরের দাম ১।০।

ব্ল্যাক-বোর্ডের রঙ (Black-Board Varnish) ।—যদি নূতন ব্ল্যাক-বোর্ডে (অর্থাৎ যে বোর্ডে পূর্বে রঙ দেওয়া হয় নাই) রঙ করিতে হয়, তবে পালিশের

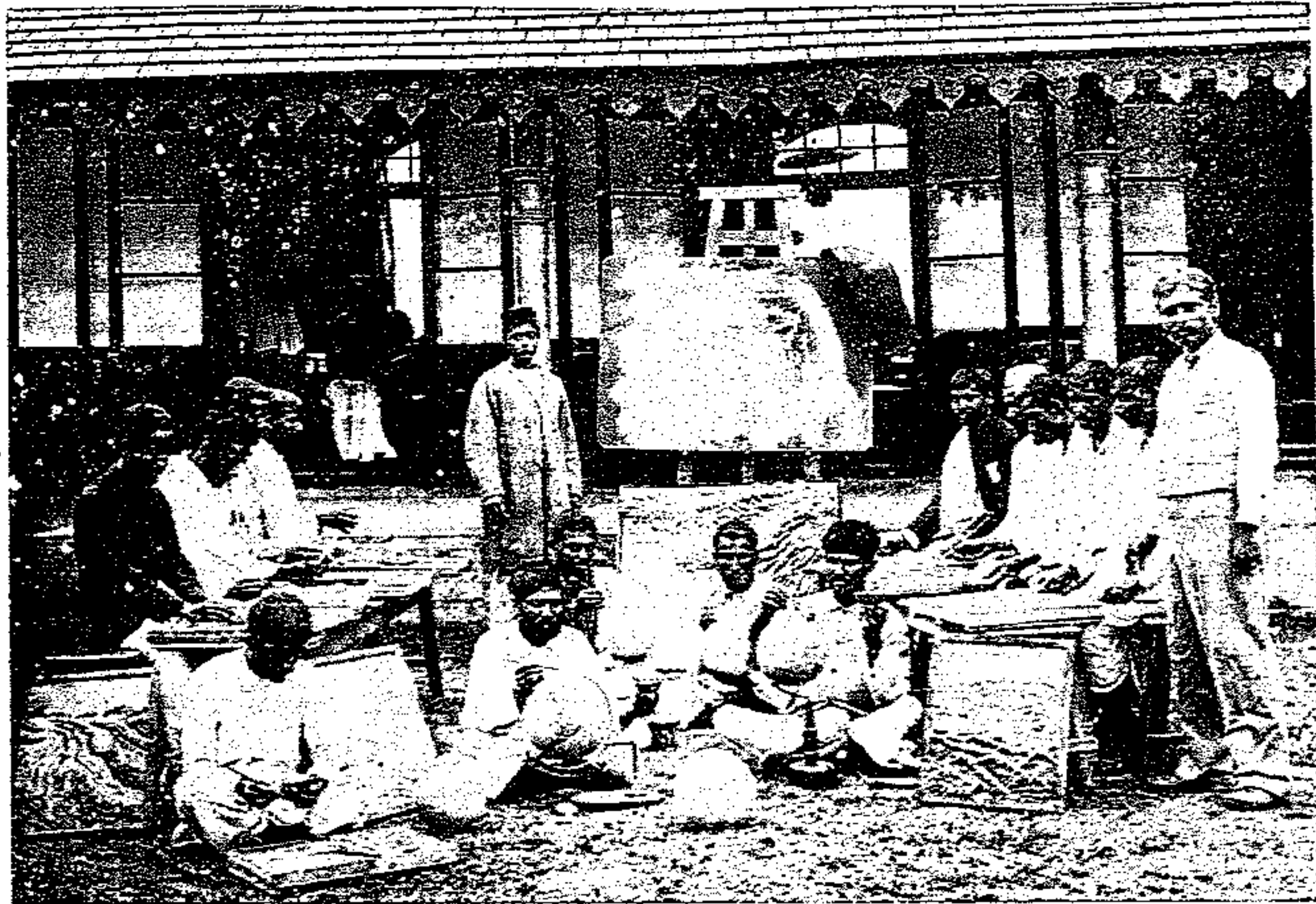
মধ্যে পেউড়ী বা ইটের ওঁড়া মিশাইয়া বোর্ডে একবার কি দুইবার পালিশ লাগাইবে । এই পালিশ শুকাইয়া গেলে শিরিষ কাগজ দিয়া ঘসিয়া, পুনরায় নূতন পালিশের সঙ্গে ভূষা কালী (ল্যাম্প ব্ল্যাক) ও সূক্ষ্ম কাঁচ চূর্ণ মিশাইয়া, বার দুই পালিশ লাগাইলে বোর্ডের রঙ হইল । বোর্ড বার্ণিশ করিতে নাই । বোর্ডের রঙ উঠিয়া গেলে ভূষা কালি মিশ্রিত পালিশ লাগালেই আবার নূতন হইয়া যাইবে । কিন্তু যদি বোর্ডে পূর্বের আলকাতরা (কোলটার) বা জাপান ব্ল্যাক দিয়া রঙ করা হইয়া থাকে, তবে সেই রঙ শিরিষ কাগজ দিয়া উঠাইয়া, নূতন বোর্ড রঙ করিবার প্রণালীতে রঙ করিতে হইবে । স্কুল-বুক-সোসাইটী ও লন্ডন কোম্পানীর দোকানে বোর্ডের রঙ কিনিতেও পাওয়া যায় । সূতান গায়ে লাল এনেমাল রঙ মাখাইয়া, সেই সূতা বোর্ডের উপর লাগাইয়া ধরিলে সূতের রঙের দাগ পড়িয়া যাইবে । দীর্ঘ প্রস্থে এইরূপ কল কাটিয়া লইলেই চারখানা বোর্ড হইবে ।

Black Board or School slating—The making of a good surface for drawing or writing on with chalk or crayons is not as easy as it would appear to be. The great secret of success, however, lies in avoiding grease or oil of any description in preparing the lacquer. The following gives good results :—

Shellac 500 parts ; ivory black 250 parts ; emery in fine powder 150 parts ; ultramarine 125 parts ; alcohol 2250 parts. Dissolve the Shellac in the alcohol and mix in the solid ingredients (Scientific American cyclopedia of formulas).

কাগজের শ্লেট (Artificial slate) খুব সূক্ষ্ম বালি ৪০ ভাগ ; ভূষা কালি ৪ ভাগ ; পাকা তিষির তেল ৫ ভাগ । আঙুণে ফুটাইয়া লও । তারপর ইহার সঙ্গে স্পিরিট অব তারপিন মিশাইয়া একটু পাতলা কর । তারপর পেট্রবোর্ডের উপর তুলি দিয়া এই রঙ লাগাও । একবার শুকাইলে আর একবার—এইরূপ তিন বার । তারপর একটা নেকড়ায় স্পিরিট অব তারপিন লাগাইয়া রঙ লাগান পিঠ একটু ঘসিয়া সমান করিয়া দাও । এই শ্লেটে সাধারণ শ্লেট পেন্সিল দিয়া লেখা যায় ।

বলফ্রেম (Ball-Frame) ।—কতকগুলি স্থপারি ছিদ্র করিয়া লইবে । তাহার ভিতর লোহার তার পরাইয়া একটা ছোট চৌকাঠার সহিত জাঁটিয়া লও, ইচ্ছা করিলে তেলের রঙ দিয়া রঙও করিতে পার । অথবা মাটির কতকগুলি ওঁটা করিয়া তাহাদের মধ্যে ছিদ্র কর । পরে শুকাইয়া গেলে পোড়াইয়া লও । ইহাতেও বেশ বলফ্রেমের ওঁটা হইতে পারে ।



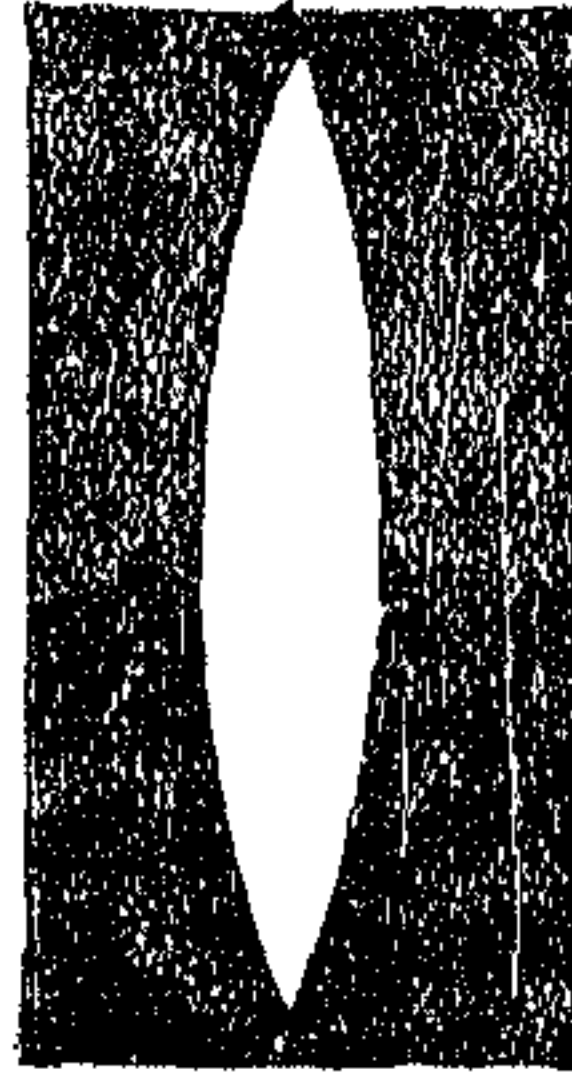
শিলচর নৰ্মাল বিদ্যালয়ের শ্ৰেণীকক্ষ—বহুৰ মানচিত্ৰ ও গোলক প্ৰস্তুত হইতেছে।

পুঁটিন (Putty) ।—এক মের চকের গুঁড়া, আধ পোয়া রক্তনের গুঁড়া ও আধ পোয়া মত তিসির তেল (এই তিনপাতে) একত্রে মিশাইলেই পুঁটিন হয় । প্রথমে চকের গুঁড়া ও রক্তন চূর্ণ মিশাইয়া তাহাতে একটু করিয়া তেল মিশাইবে ও হাতুড়ী বা পাগরের দ্বারা খুব করিয়া পিটিতে থাকিবে । যখন মিশ্রিত দ্রব্য রটী গড়ার ময়দার মত হইবে তখনই কাজের উপযুক্ত হইল মনে করিবে । আবশ্যক হইলে তেলের ভাগ একটু কমবেশী করিতে পার । কিন্তু সাবধান, বেশী তেল দিও না, তাহা হইলে কাজের তাম্বুপমুক্ত হইয়া পড়িবে । কাঠের কোন জিনিষে যদি কাটা কি গর্ত থাকে তবে এই পুঁটিনের দ্বারা তাহা বন্ধ করা যাইতে পারে । শুকাইলে এই পুঁটিন খুব শক্ত হয় । বন্ধুর-মানচিত্র (রিলিফ ম্যাপ) এই পুঁটিনে প্রস্তুত করিতে হয় ।

বন্ধুর-মানচিত্র (Raised map)—একখানা (১৮" × ২২" মত) কাঠের বোর্ড প্রস্তুত করিয়া লও । একখানি আস্ত কাঠ হইলেই ভাল, না হইলে জোড়ের স্থান বেশ ভাল করিয়া মিলাইয়া লইবে । চার দিকে আধ ইঞ্চি প্রস্থ ও আধ ইঞ্চি উচ্চ বিট্‌ বা কাগিশ লাগাইয়া লও । এই বোর্ডের উপর পেন্সিল দিয়া মানচিত্র অঙ্কিত কর । তার উপর (মানচিত্রের ভূমি ভাগের উপর) পুঁটিন টিপিয়া টিপিয়া বসাও । পর্বতের স্থানে বেশী পুঁটিন দিয়া উচ্চ করিবে । সমুদ্রের তটে খুব পাতলা করিয়া পুঁটিন দিবে । একখানা বন্ধুর মানচিত্র দেখিতে পারিলে প্রস্তুত করা সহজ হইবে । ভূগোল শিক্ষার অধ্যাত্ম আদর্শও এই পুঁটিনে প্রস্তুত করিতে হয় । কাগজের মণ্ডের দ্বারাও বন্ধুর মানচিত্র প্রস্তুত করা যায় । রাত্রে কাগজ ভিজাইয়া রাখ, পরদিন শিল নোড়া দিয়া বেশ করিয়া পিষিয়া লও । জল চিপিয়া ফেলিয়া, তাহাতে একটু গঁদের আঠা মিলাইয়া লইলেই বেশ কাজ করা যাইবে । কাগজমণ্ডের মানচিত্র বেশ হালকা হয় । পুঁটিনের মানচিত্র ভারি । তবে কাগজের এক অঙ্গবিধা এই যে (নদী, হ্রদ, সমুদ্রে) জল ঢালিয়া দেখান যায় না । পুঁটিনের মানচিত্রে জল ঢালিলে নষ্ট হয় না । আর পুঁটিনের মানচিত্র যত সহজে ভাঙা গড়া যায়, কাগজমণ্ডের মানচিত্র তত সহজে যায় না । এই জন্য বিদ্যালয়ের কাজের পক্ষে পুঁটিনের মানচিত্র করাই সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয় ।

গোলক (Globe)—একটু কাঁপা মাটির বল (৮১২ ইঞ্চি মত বাঁস) সংগ্রহ কর । কুস্তকারকে বলিজেই প্রস্তুত করিয়া দিবে । এই বলের উপর ছোট ছোট টুকরা কাগজ আঁটিতে আরম্ভ কর । প্রথম স্তর কেবল জল দিয়া, তার পরের স্তরগুলি আঠা দিয়া আঁটিতে হইবে । এইরূপে ১২।১৪ স্তর আঁটা হইলে, কাগজের স্তরের উপর ছুরী

দিয়া ইহা দুই পরিমাণ স্থান এইরূপ ভাবে। কাটিয়া লও। এখন গোলকের উপর একটা লাঠি দিয়া অল্প অল্প আঘাত দিলে, ভিতরের মাটির গোলকটি ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই কাটা স্থান ঝাঁক করিয়া মাটি বাহিরকরিয়া ফেল। এখন এই কাটা মুখ সংযুক্ত করিয়া সূতা দ্বারা সেলাই কর। একটা বেশ হালুকা কাগজের গোলক হইল। পরে এই কাগজের গোলকের উপর দুই (বিপরীত) দিকে দুইটি বিন্দু দিয়া মেরু চিহ্নিত করিয়া লও। পরে ৯৯ চিত্রের অন্তর্গত সাদা অংশের অনুরূপ করিয়া সাদা কাগজ কাটিয়া লও। এই কাগজ, একরূপ ভাবে লাগাইতে আরম্ভ কর যেন কাগজের দুইটি মেরু প্রান্ত দুইটি মেরু বিন্দুতে একত্রীভূত হয়। ইহার উপর সূতার সাহায্যে অক্ষরেখা আঁচিয়া টানিয়া লও, পরে মানচিত্র অঙ্কিত কর। যদি বন্ধুর-গোলক প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা হয় তবে এই মানচিত্রের উপর পুটীন জাঁটিয়া আবশ্যক মত উচ্চ নীচ কর। আর যদি সাধারণ গোলক করিতে হয়, তবে এই মানচিত্রেই রঙ দাও।



৯৯ চিত্র।

রঙের কথা (Paint and colour)।—বন্ধুর মানচিত্র ও বন্ধুর-গোলকে রঙ করিতে হইলে তেলের রঙ ব্যবহার করিতে হইবে। তেলের রঙের সাধারণ কোটা ১/০ কি ১/১০ আনাশ পাওয়া যায়। ভাল এনেমান রঙ কিনিতে হইলে এক এক কোটা ১১/০ কি ১১/১০ আনা লাগিতে পারে। সাধারণতঃ লাল, নীল, হলুদ, সাদা ও কাল রঙ কিনিলেই চলে। এইগুলি মিশাইয়াই অসংখ্য রঙ করিয়া লওয়া যায়। তবে পয়সা থাকিলে সকল প্রকার রঙই ক্রয় করা যাইতে পারে। কাঠের জিনিষেও এ সমস্ত রঙ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু যদি কাগজের সাধারণ চিত্রে রঙ দিতে হয়, তবে তেলের রঙ ব্যবহারই সুবিধা। গোলক ও মানচিত্র প্রভৃতিতে নরম তুলি দ্বারা পাতলা বার্ণিশ (কোপ্যাল বার্ণিশ) লাগাইলে সুন্দর দেখায়।

খাতার আদর্শ (Exercise Book)।—শ্রেণীর সকল বালকের খাতা এক আকারের ও এক রকম কাগজের হওয়া আবশ্যক। এমন কি তাহার মলাটগুলিও যেন এক রকমের ও এক রঙের হয়। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একখানি খাতা থাকিবে। এক বিষয় সম্বন্ধে যত কাজ, বাড়ীতেই করুক বা স্কুলেই করুক, সমস্তই এক খাতায় থাকিবে।

বিভাগের কার্যের জন্য কোনরূপ খসড়া খাতা থাকিবে না। পর পৃষ্ঠায় অঙ্কের খাতার নমুনা প্রদত্ত হইল। কিরূপে অন্যান্য খাতা প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা ইহা দৃষ্টেই বুঝিতে পারিবে।

খাতার এক পৃষ্ঠায় লিখিত হইবে। বাড়ীর অঙ্ক বাড়ীতে কালি দিয়া কসিবে, স্কুলের অঙ্ক স্কুলে কালি কি পেন্সিল দিয়া কসিবে। বৎসরের প্রথম হইতে ধান্নাবাহিকরূপে অঙ্কের নম্বর দিয়া যাইবে। বৎসরে যতগুলি অঙ্ক কমান হইল, ইহাতে তাহার একটা হিসাব থাকিবে। বামের পৃষ্ঠায় গুণ, ভাগ প্রভৃতি খসড়া কার্য্য করিবে। অঙ্কগুলি বালক নিজে চেষ্টা করিয়া কসিয়াছে কি নকল করিয়া আনিয়াছে তাহা এই বাম পৃষ্ঠা পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। আর বিভাগের কার্য্যের সময় যে সকল বালক অন্য বালকগণের আগে অঙ্ক কসিবে, তাহার বসিয়া না থাকিয়া এই বাম পৃষ্ঠায় নিজের ইচ্ছামত চিত্রাদি আঁকিবে। বাড়ীতে কোন কঠিন অঙ্ক কসিতে না পারিলে খানিকটা স্থান বাদ রাখিবে। পরে শিক্ষক বুঝাইয়া দিলে সেইখানে তাহা লিখিয়া রাখিবে। কিন্তু বালক সেই কঠিন অঙ্ক কসিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছে, বামের পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় থাকিবে। যেখানে ভুল করিবে সেখানে শিক্ষক X এইরূপ চিহ্ন দিয়া ভুল দেখাইয়া দিবেন (৪৮ অঙ্কের উত্তর দেখ)। খাতার পাতায় পাতায় পৃষ্ঠার সংখ্যা লিখিবে। কখনও কাগজ ছিঁড়িবে না। কোন অঙ্ক ভুল হইলে একটান দিয়া কাটিয়া রাখিবে। পরীক্ষার সময় এই সমস্ত খাতা দাখিল করিতে হইবে। বালক সমস্ত বৎসর রীতিমত কাজ করিয়াছে কিনা তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। খাতাগুলি যেন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। বামের দিকে দুই আঙ্গুল স্থান বাদ দিয়া একটা কালিব কসি টানিয়া রাখিবে। এই স্থানে বাড়ী ও বিভাগের অঙ্ক কসিবার তারিখ লেখা থাকিবে। শিক্ষকও এই স্থানে দস্তখৎ করিবেন। কসি টানিয়া বাড়ীর কার্য্য ও বিভাগের কার্য্য পৃথক করিয়া রাখিবে। রচনা, অনুবাদ, প্রাক্তলিপির জন্য যে খাতা থাকিবে, তাহাতেও উক্তরূপ কার্য্য ও স্কুলের কার্য্য ছুইই থাকিবে।

মানচিত্রের খাতা ও চিত্রাঙ্কনের খাতা ফুলস্ক্যাপ আকার বা ডিম্বাই কি রয়েল কাগজের ২ আকারে হওয়া আবশ্যক। দলিলাদি নকল করিবার খাতা ফুলস্ক্যাপ আকারে হইবে, কারণ যে সকল স্ট্যাম্প দলিল লেখা যায় তাহার ফুলস্ক্যাপ আকার। জমা খরচ প্রভৃতি খাতার আকার দোকানদারদিগের খাতার মত হইবে।



৩০৬৭
 ৪৮
 ২৪৫৩৬
 ১২২৬৮
 ১৪৭২১৬

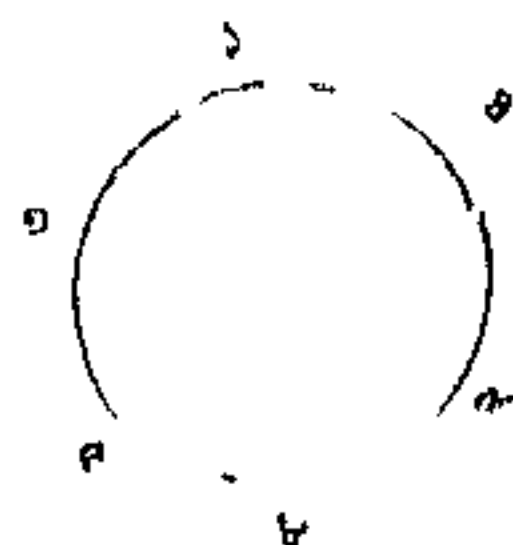


১৩৩২
 ৬৭৭
 ৫৫৫

৩৩৩
 ৪
 ১৩৩২
 ৫৫৫

৭৪
 ৪৭৪
 ৪৪৪৪
 ৪৪৪

৬) ২ ২ ৬ (৮৩
 ২০
 ৪২
 ৪৪
 ১৮



১ ১১৪২৮৫৭



২ ১২৮৫৮১৪

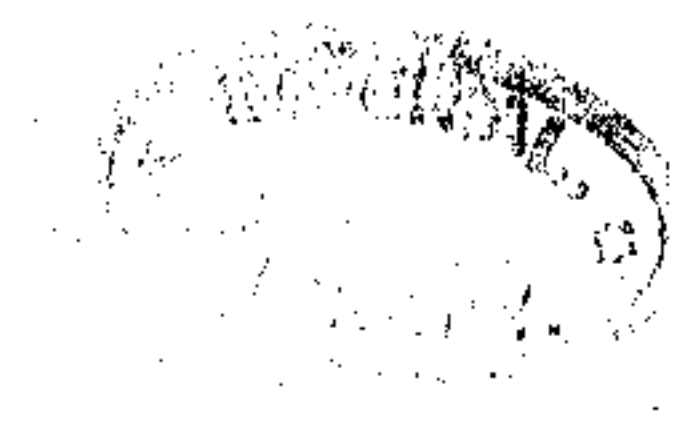
৩ ১৩৮৫৭

[যে বালকের খাতা, সে সকলের পূর্বেই অঙ্ক কসিয়া শেষ করিয়াছে বলিয়া অবশিষ্ট সময়ে এই হাতের চিত্র অঁকিয়াছে।]*

২৮ পৃঃ	১. এক এক প্রকাব লোকের সংখ্যা ১২ - ৫ ২. সমস্ত লোকের সংখ্যা (৫ × ৩) জন - ১৫ জন উঃ
বাড়ী ৩৯।০৮ শিক্ষকের দস্তগত	(৪৪) সবল কর $\frac{৩}{৪\frac{১}{২} \text{ এর } ১ + ৪\frac{১}{২} \times (১ + ১)}$ প্রথমাংশ = $\frac{৩}{১ + ৪\frac{১}{২}} = \frac{২}{৬ + ৪\frac{১}{২}} = \frac{৩}{১০\frac{১}{২}} = \frac{১২}{৪১}$ দ্বিতীয়াংশ = $\frac{৫}{৩ + ৪} + \frac{৪}{৩ + ৫} = \frac{২৫ + ১৬}{৩ + ৪ + ৫} = \frac{৪১}{১২}$ সমস্তাংশ = $\frac{১২}{৪১} \times \frac{১২}{৪১} = \frac{১}{৫}$ উঃ (৪৫) ৩৩৩টা টাকা ভাঙ্গাইয়া শিকিতে ও আধুলীতে ৭৭৭টি বেজগী পাইলাম। কয়টা শিকি ও কয়টা আধুলী ?
স্কুল ৪।৯।০৮	(৪৬) $\frac{১}{২ + \frac{১}{৩ + \frac{১}{৪ + \frac{১}{৫}}}}$ এই অবিবর্ত ভগ্নাংশকে সরল কর । অর্থাৎ $\frac{১}{২ + \frac{১}{৩ + \frac{১}{৪ + \frac{১}{৫}}}} = \frac{১}{২ + \frac{১}{৩ + \frac{১}{৪ + \frac{১}{৫}}}} = \frac{১}{২ + \frac{১}{৩ + \frac{১}{৪ + \frac{১}{৫}}}} = \frac{৬৮}{১৫৭}$ (৪৭) ১ ১৪২৮৫ বকে ৩৭৫ দিয়া গুণ কর । গুণফল = $১\frac{১}{৭} \times \frac{৩}{৮} = \frac{১৮}{৭} \times \frac{৩}{৮} = \frac{৩}{৭} = ৪২৮৫৭১$ (৪৮) ২পা. ৯শি. ৬পে এর ৫ - ৪পা. এর ৬ + ২১শি. এর ৩ঃ এর ২ঃ কত ? ২পা. ৯শি. ৬পে. এর ৫ - ৮শি ৩পে. × ৫ = ২পা. ২শি. ৩পে. ২১শি. এর ৩ঃ এর ২ঃ = ২১শি. × ৩ঃ × ২ঃ = $\frac{৯}{১১} \frac{৩}{৫} \frac{৯}{০}$ ৪পা. এর ৬ = ৪পা. × ২ঃ = ১পা. বাদ দিয়া $\frac{৮}{১৩} \frac{০}{০}$ উঃ

(୫୨୫)

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟା ।



বিবিধ বিধান।

শিক্ষকপদ প্রার্থীর পাঠ্য।—শিক্ষকতা কাম্য গ্রহণের অভিলাষ

কিলে অন্ততঃপক্ষে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করা কর্তব্য :—

ভাষাবিষয়ক।—কৃত্তিবাসের স্বাভাষ্য ও কাশীদাসের মহাভারত (দীনেশ
দ্র সেন কৃত) লিঙ্গপুরাণ (বঙ্গবাসী অনুবাদ) বেত্তাল পঞ্চবিংশতি (বিদ্যাসাগর)
ত্রিশ সিংহাসন (নীলমণি) আরোব্য উপন্যাস (ব্রাহ্মানন্দ) সেক্সপিয়রের গল্প (হারাণ)
হতোপদেশ (ভারাকুমার) মীতার বনবাস (বিদ্যাসাগর) কাদম্বরী (ভারাকুমার)
পারিবারিক প্রবন্ধ (ভূদেব) প্রভাতচিন্তা (কালীপ্রসন্ন) যুবকবন্ধু (প্রসন্ন) উদ্ভাসপ্রসন্ন
চন্দ্রশেখর) বাঙ্গালীকির ভ্রম (হরপ্রসাদ) শকুন্তলাতত্ত্ব (চন্দ্রনাথ) বাহ্য বস্তুর সহিত
মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (অক্ষয়) বিমবন্ধু (বঙ্কিম) সংসার (রমেশ) স্বর্ণজতা (ভারক)
বল্লমঙ্গল (গিরীশ) নীলদর্পণ (দীনবন্ধু) বিবাহবিভাটি (অমৃত) প্রহ্লাদ (রাজকুমার)
কুন্তলা (গোবিন্দরায়ের অনুবাদ) সরোজিনী (জ্যোতিরিন্দ্র) বিধাদমিনী (মির মোমতারেক
হাসেন) অমিয় নিমাই চরিত্র (শিশির) মাইকেল মধুসূদন (যোগীন্দ্র) বিদ্যাসাগর
বেহারী বা চণ্ডীচরণ) রামমোহন (নগেন্দ্র) বৃজসংহার (হেমচন্দ্র) মেঘনাদ বধ
মাইকেল) পলাশীর যুদ্ধ (নবীন) সম্ভাব-শতক (কৃষ্ণচন্দ্র) আলো ও ছায়া (কামিনী)
প্রকণা (গিরীন্দ্রমোহিনী) কাব্যকুসুমাজলী (মানকুমারী) গান (রবীন্দ্রনাথ) বঙ্গভাষা
ও সাহিত্য (দীনেশ) বাঙ্গালা ব্যাকরণ (নকুলেশ্বর) কাব্যনির্ণয় (জালমোহন) নৈয়মিক
ব্যবহার (***) শব্দতত্ত্ব (রবীন্দ্রনাথ) শিক্ষাবিচার (যদুনাথ) অনুশীলন (বঙ্কিম)
জ্ঞান ও কর্ম (গুরুদাস)

ভূগোলেতিহাস বিষয়ক।—ভূপ্রদক্ষিণ (চন্দ্রশেখর) ভারতপ্রদক্ষিণ
(ছর্গাচরণ) দক্ষিণাপথ ভ্রমণ (শরচ্চন্দ্র) তীর্থদর্শন (সান্তাল কোম্পানী) হিমালয়
(জলধর) দেবগণের মর্ত্য আগমন (**) ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ (শশিভূষণ)
প্রাকৃতিক ভূগোল (যোগেশ) পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিবরণ (কৃষ্ণমোহন) বাঙ্গালার
পুরাতত্ত্ব (পরেশ) নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস (কালীপ্রসন্ন) মোগলবংশ
(রামপ্রাণ) মুন্সলমানরাজত্ব (আবদুলকরিম) মুরশিদাবাদের ইতিহাস (নিখিল)
সিরাজদ্দৌলা (অক্ষয়) আকবর (বঙ্কিম) শিবাজী (সত্যচরণ) শাক্যমুনি (সাপু অদ্যোক্ত-
নাথ) মহম্মদ (কৃষ্ণকুমার) ঈশাচরিত্র (ত্রৈলোক্য) ভারতশাসন প্রণালী (গজেন্দ্র)
রাজস্থান (বহুমতী) সিংহি যুদ্ধ (রজনী) রানীজুবানী (দুর্গাদাস)

তৃতীয় পরিশিষ্ট ।

হিন্দু ছাত্রগণের নিমিত্ত সাধারণ স্তোত্র ।

(প্রাতঃসোমবার প্রাতে সমস্তরে পঠনীয়)

ঐ নমস্তে সন্তে সর্বলোকপ্রিয়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাকায় ।
নমোহৈবৈত ত্বায় যুক্তি প্রদায়
নমো লগাৎ ব্যাপিনে নিষ্ঠুগায় ॥ ১
ত্বমেব শরণ্যং ত্বমেব বরণ্যং
ত্বমেব জগৎ কারণং বিশ্বরূপম্ ।
ত্বমেব জগৎ কর্তৃপাতৃ গ্রহর্ভূ
ত্বমেব পরং নিষ্ঠলং নির্বিকল্পম্ ॥ ২
ভয়ানং ভয়ং ভীষণং ভীষণানং
গতিঃ প্রাণিনাং পানমং পাননানাম্ ।

মহোচ্চৈঃ পদানাং নিমন্তু ত্বমেব
পরেযাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥
পরেণ প্রভো সর্বরূপাবিনাশিন্
অনির্দেশ্য সর্বৈশ্বর্যমায়ম্ সত্য ।
অচিহ্ন্যাক্ষর ব্যাপকাব্যাক্তত্ব
জগত্ত্বাসকাধীশ পরাদপায়াম্ ॥ ৪
ত্বদেকং স্মরামস্তদেকং জপাম
স্তদেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বগীশং
ভবাহ্বোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ ৫

অনুবাদ — তুমি মিত্য, তুমি সর্ব লোকের আশ্রয়—তোমাকে নমস্কার করি । তুমি জ্ঞান স্বরূপ ; বিশ্বের আত্মা স্বরূপ অদ্বৈত-তত্ত্ব যুক্তি-দায়ক,—তোমাকে নমস্কার । তুমি সর্বব্যাপী নিষ্ঠুর ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার । (১)

তুমি একমাত্র শরণ্য অর্থাৎ আশ্রয়, তুমি অদ্বিতীয় বরণীয়, তুমি একমাত্র জগতের কারণ, তুমি বিশ্বরূপ ; একমাত্র তুমি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং অন্তে সংহারকর্তা, তুমি একমাত্র পরম পুরুষ, নিষ্ঠল ও নানানিধ কল্পনাশূন্য । (২)

তুমি ভয়ের ভয়, তুমি ভয়ানকের ভয়ানক, তুমি প্রাণীদিগের একমাত্র গতি, পানিত্র্য-দনক সকলের পানিত্র্যজনক । তুমি উচ্চপদাধিষ্ঠিত (ব্রহ্মা বিশ্ব মহেশ্বর প্রভৃতির) নিয়ামক, তুমি শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকলের শ্রেষ্ঠ ও রক্ষকদিগের রক্ষক । (৩)

হে পরেশ ! (ব্রহ্মাদি দেবোধিপ) হে প্রভো, তুমি সর্বরূপ, অবিনাশি, অনির্দেশ্য এবং সর্বৈশ্বর্যমায়—কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহ । হে সত্যরূপ ! হে অচিহ্ন ! হে অক্ষর ! হে ব্যাপক ! হে অন্যক্ত তত্ত্ব ! জগত্ত্বাসকাধীশ ! (জগত্ত্বাসক চন্দ্র সূর্যাদির অধীশ্বর) অথবা হে জগত্ত্বাসক ! হে অধীশ ! তুমি আমাদিগকে অপার অর্থাৎ ভক্তিবিশেষ ও জ্ঞানবিশেষ হইতে রক্ষা কর । (৪)

সেই একমাত্র ব্রহ্মকে আমরা স্মরণ কবি, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আমরা জপ করি ; সেই এক জগৎ সাক্ষী স্বরূপ ব্রহ্মকে আমরা জপ করি । সেই তুমি সৎ, একমাত্র, জগতের নিধান অর্থাৎ আশ্রয়ভূত, স্মর্য নিরালম্ব অর্থাৎ আশ্রয়শূন্য ; সেই তুমি ঈশ্বর, ভব সমুদ্রের পোত স্বরূপ ! আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । (৫)—
(মহানির্বাণ তন্ত্র)

মুসলমান ছাত্রগণের নিমিত্ত সাধারণ স্তোত্র ।

(প্রতি শুক্রবার প্রাতে সমস্তের পঠনীয়)

খোদায়া জেহা পাদশাহী তুরাত্ত,
জেহা খোদমত্ আয়েদ্ খোদায়ী তুরাত্ত ।
পনাহে বুলনি ও পাস্ত তুয়ী,
হমা নিসেত্তন্দ জাঁচে হস্তি তুয়ী । ১
তুয়ী বর্ তরী দানিশামুজ্জ পাক্,
জেহা দানিশ্ কলম্ রান্ বর্ জৌহেঁ থাক্ ।
খিরদ্ রা তু বোশন্ বসর্ করদয়ী,
চেরাথে হিদায়েত তু বর্কর্দয়ী । ২
কওয়াকিব্ ত বরবস্তি আফ্লাক্ রা,
বসর্দুহ্ তু আরাস্তি থাক্ রা ।

মরা দর্ শু বারে চুর্নী তিরা খুদা,
তু দাদি দিলে রোশণো জানে পাক্ । ৩
পাদীদ আওরে খুল্কে আলাম তুয়া,
তু মিরানি কিনাকুন্ হম্ তুয়ী ।
জেহা তাজিসে তু পোশে তু হস্তো নেস্ত,
আগর্ বাশদো গর্ নয়াশদ্ একেস্ । ৪
নবুদ্ আফিরিনিশ্ তু বুদি খোদা,
সবাশদ্ হমা হম্ তু বাশী বজা ।
চুর্না গর্নু কুন্ আজমে রামেম্ বতু,
কেথু রগ্দিশ্ আয়েম্ চুঁ আয়েম্ বতু ॥ ৫

অনুবাদ ।—হে খোদা (স্বয়তু), বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোমারই সাম্রাজ্য, আগরা (কেন্দ্র) তোমার পূজার অধিকারী, তুমিই একমাত্র ব্রহ্ম । তুমি উচ্চ ও অখোদোদেশের বিস্তৃত (স্বরূপ) ; যাহা বিদ্যমান আছে, তাহা তুমি, তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই । (১)

তুমি পরাৎপর, জ্ঞানদাতা এবং পবিত্র, তুমি (অপূর্ব) জ্ঞানকোশলে বিশ্বপটে বিচিত্র চিত্র সমূহ চিত্রিত করিয়াছ, প্রজ্ঞাকে তুমি জ্যোতিষ্মতী করিয়াছ, তুমি সত্য পথ প্রদর্শনের প্রদীপ জালিয়াছ । (২)

তুমিই আকাশতলে জ্যোতিষমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছ, এবং মানব (সৃষ্টির) স্বা .। পৃথিবীর শোভা সম্পাদন করিয়াছ । আমার এহেন অন্ধকারময় মলিনমেহে তুমি অত্যাশ্রয় চিত্র ও আশ্রয় প্রদান করিয়াছ । (৩)

তুমিই বিশ্ব এবং সৃষ্ট পদার্থসমূহের উদ্ভাসক, তুমিই মৃত্যু সংঘটন করিয়া থাক এবং তুমিই পুনর্জন্ম দানকারী । হে মহিমাময়িত, তোমার মহিমার নিকট অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ই সমান । (৪)

যখন সৃষ্টির অস্তিত্ব ছিল না, তখন তুমি স্বয়তু রূপে বিদ্যমান ছিলে, যখন কিছুই থাকিবে না তখনও তুমি বিদ্যমান থাকিবে ! (হে ইচ্ছাময়) আমার আকাঙ্ক্ষাকে তোমার দিকে ঈর্দশী আবেগময়ী কর যে তোমার কাছে আসিবার কালে যেন আনন্দমনে আসিতে পারে । (৫)—(সেকন্দরনামা) ।



বিবিধ বিধানের প্রশংসাপত্র ।

— O:❖O: —

I. প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের মত :—

(1) The Amrita Bazar Patrika, Jan. 1910—"Bibidha Bidhan" (in Bengali), a treatise on the art of the teaching, by Bab Aghore Nath Audhikari Vidyabhusan, Superintendent of the Silchar Normal School. This is a first venture in a new line which has not hitherto been attempted in a more successful and elaborate way. In all civilized societies the teacher is an important factor and the attempt at amelioration in the education of this factor bespeaks real progress. To make good teachers is to make good children. This book is a laudable attempt toward this right direction. It deals with the various departments of the teacher's profession and how he could make the best of them. The book is divided into two parts, the first dealing with the general principles and methods of teaching and the second with the special methods of teaching the different class-subjects under the new syllabus. In this book have been embodied the results of the long and varied experiences of a teacher's life. In the first part we find the author has ably and successfully dealt with matters such as Organisation, Discipline, Educational principles, etc.—the most important branches of teaching, and his words on these heads are instinct with life and may fairly be expected to carry conviction into the minds of the learners. In the second part the author's life-long and varied experience has been liberally drawn upon to the best advantage of those for whom the book is intended. It treats of Hygienic principles, Kindergarten system, Language, Mathematics, History, Geography, Science, Arts generally (including drawing, music etc.,) and Morality and Religion so far as they form part of and influence the education of children. Under the recent departmental circulars of the Government teachers are required to write Notes of Lessons. But the majority of teachers cannot form a regular idea as to how these Notes are to be prepared. This book not only gives detailed and systematic instructions about drawing up the notes but some excellent specimens of model notes are to be found herein. There is also an important chapter on "Criticism of Lessons. Our Education is most substantial if it is grounded upon observation rather than upon books and memory." This book gives prominence and preference to the former as against the latter. The language of the book is charming—it is written in simple and florid style to suit

the capacity of all classes of readers. Its get-up is excellent and the price is Rs. 2/- only. Considering the bulk of the book the numerous illustrations and diagrams and the binding the price seems to be moderate. It is a great aid not only to teachers but also to the guardians of boys and girls generally. The book is a substantial contribution to an important branch of practical education and the industry and intelligence spent upon it by the author speak volumes in its favour. As the book is a right thing in the right place—coming as it does from an experienced educationist of established reputation, we hope it will have a large sale and secure Government patronage. (অমৃতবাজার পত্রিকা)

(2) The Bengalee, Jan. 1910—We have received for notice a handsomely got up and beautifully bound volume in Bengali styled 'Bidyalaya Bidhayak Bibidha Bidhan' by Babu Aghor Nath Adhikari Vidyabhusan, Superintendent of Silchar Normal School. It is a valuable production and abounds with useful information on the subject of teaching. The author is a successful teacher of long experience and the work under notice is an out-come of the vast experience that he has gained throughout his career. The manner of treating the various subjects of education touched within a small compass, is really admirable and the language in which the instructions are concluded is at once terse, lucid and homely. It is indeed a hard task to bring small children under the yoke of school discipline without coercion and tears. It is not less difficult to lead them to the three R's. without their knowledge that they are being so led. But this book will enable the teacher to make them learn while they are laughing, playing and singing. The birch, the dread of our children, that does more harm than good, will have to be thrown away like a useless lumber. (বেঙ্গলী)

(3) The Bangabasi, Jan. 1910—বিবিধ বিধান (বিদ্যালয় বিধায়ক) বালকবালিকার অধ্যাপক ও অভিভাবকের সাহায্যার্থ। * * । পুস্তকের প্রথম ভাগে উপক্রমণিকা এবং সুব্যবস্থা, সুশাসন ও সুশিক্ষা বিষয়ক তিনটি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট। দ্বিতীয় ভাগে ব্যায়াম, স্বাস্থ্যরক্ষা, বর্ণ পরিচয়, ধারণাপাত, হস্তাক্ষর প্রভৃতি—অপিচ সাহিত্য, ব্যাকরণ, রচনা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, চিত্রাঙ্কন, মূর্তিগঠন, সঙ্গীত, সূচীশিল্প, নীতি, ধর্ম—কত বলিব? নববিধ অত্যাবশ্যক বিষয়েরই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। বিবৃতির প্রণালী সুন্দর, সুশৃঙ্খল এবং সুপরিপাটী। উদ্দেশ্য মহৎ। * * । বাস্তবিকই এরূপ পুস্তক আধুনিক বিদ্যালয় যাত্রেরই প্রয়োজনীয়। ছাপা ও বাধাই উত্তম। (বঙ্গবাসী)

(4) The Sanjibani, Feb. 1910—বালকবালিকাদিগের শিক্ষাদান-বিষয়ে অধ্যাপক ও অভিভাবকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ইংরাজীতে একরূপ পুস্তকের অভাব নাই কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় একরূপ পুস্তক আর নাই বলিলেও চলে। কি উপায়ে বালকদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও অনুভববৃত্তির পুষ্টিসাধন করা যায়, তাহাদিগের মনোযোগ বৃদ্ধি করা যায় এবং স্মৃতিশক্তি, বিচার-শক্তি, কল্পনাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি বিকশিত করিয়া তোলা যায়, এই পুস্তকে তৎসম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় উপদেশ আছে। এতদ্ব্যতীত সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, নীতিধর্ম, শিল্প প্রভৃতি শিক্ষাদান সম্বন্ধেও অনেক আবশ্যিক বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। শরীরপালন বিষয়টিও উপেক্ষিত হয় নাই। আজ কাল যাহারা কিঙারগার্টেন প্রণালী অনুসারে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন, তাহাদের অনেকেই কিঙারগার্টেনের উদ্দেশ্য কি তাহাই জ্ঞানেন না। এই গ্রন্থে উক্তরূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রণালী সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। লেখক শিক্ষাকার্য্যে অভিজ্ঞ। তিনি এই পুস্তকখানির জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, পুস্তকে তাহার প্রচুর নিদর্শন আছে। এক কথায়—এই পুস্তকখানির দ্বারা শিক্ষকগণের উপকার হইবে আশা করি। (সঞ্জীবনী)

(5) The Bharati, Aug. 1910—কবিতা, নাটক, নভেল-প্রাণিত বঙ্গ-সাহিত্যে প্রয়োজনীয় শিশুশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ বিরল বলিলে কিছুমাত্র অত্যাুক্তি হয় না। স্মৃতি জ্ঞানি বলিয়া গগণভেদী বক্তৃতায় আমরা রীতিমত করতালী সংগ্রহ করি, প্রবন্ধ লিখিয়া বাহবা লই, অথচ সেই জ্ঞানি গঠনের মূলে যে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের সুশিক্ষা নির্ভর করিতেছে, সে সম্বন্ধে আমরা ভুলিয়াও দুটি কথা বলি না। বাঙ্গালার অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ কাব্য সমালোচনা ও রস রচনাতেই অবসর কাল যাপন করেন অথচ তাহাদিগের ভূয়োদর্শন বা অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তাহাদিগের মতামত জানিতে পারিলে কত যে উপকার হয়, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না। অবশ্য আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, তাহারা কাব্যালোচনা ছাড়িয়া দিউন, তবে এ বিষয়েও তাহাদিগের একটা কর্তব্য আছে। আনাদিগের অধ্যাপক ও শিক্ষকগণের মধ্যে এমন অনেক মহাত্মা আছেন, যাহারা ওকালতী বা ডাক্তারী করিলে ধনকুবের হইতে পারিতেন। ইহারা শুধুই যে উদরারের জন্য শিক্ষকতা করিতেছেন, এ কথা মনে করিলেও পাপ। * * *। বর্তমান গ্রন্থখানি অখোর বাবুর বহুদর্শনের অমূল্য ফল। পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। বালকগণের শিক্ষা, শাসন, শরীরপালন, নীতিধর্ম প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় কথা গ্রন্থকার এই পুস্তকে বলিয়াছেন। এই গ্রন্থ সাধারণে প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার ও প্রকাশক বাঙ্গালী মাত্রেই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বালক, বালিকা, অধ্যাপক, অভিভাবক—সকলের পক্ষেই গ্রন্থখানি অতুল-নীয় সামগ্রী। সকলেরই একবার পাঠ করিয়া দেখা উচিত। গ্রন্থখানি গৃহ-পঞ্জিকার অন্ত বাঙ্গালীর গৃহে বিরাজ করুক, ইহাই আনাদিগের প্রার্থনা। (ভারতী, আর্ঘ্য ১৩১৭)

(6) The Prabasi, May 1910—কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে, প্রবেশার্থীকে সেই কার্য ভাল করিয়া শিখিয়া লইতে হয়। কিন্তু একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটয়া থাকে। সে ক্ষেত্র আমাদের শিক্ষাবিভাগ। অনেকই বলেন ‘ছেলে পড়ান ? ও। এ আবার কঠিন কি ?—পড়ালেই হইল। এই শ্রেণীর লোকই শিক্ষাবিভাগের কালস্বরূপ। অধ্যাপনা অপেক্ষা গুরুতর এবং কঠিনতর কার্য আছে কিনা সন্দেহ। শিক্ষককে শিশু হইয়া শিশুর অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। শিশু কি প্রকার জ্ঞান চাহিতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে শিশুর জ্ঞান-পিপাসা স্বাভাবিক ভাবে বর্ধিত হইবে, শিশু কেন বুঝিতেছে না, কি করিলে সে সহজে বুঝিতে পারিবে ইত্যাদি বিষয় শিক্ষকের বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যিক। ‘এ ছেলে গাধা, ইহার কিছুই হইবে না’—এইরূপ মধুর বাণী অনেক শিক্ষকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে যে কে গাধা, সে বিষয়ে আমাদের নিষম সন্দেহ থাকিয়া যায়। উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলে সকলকেই অল্পাধিক পরিমাণে উন্নত করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে অনেক শিক্ষকেরই দৃষ্টি নাই। তবে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি যখন এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে তখন আশা করা যায় কিছু সফল ফলিবে। কিন্তু শিক্ষকগণ যদি মনোবোণী না করেন, তবে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অধ্যাপনা কার্য ধর্ম প্রচার অপেক্ষাও পবিত্রতর। শিক্ষকগণ যদি পবিত্র ভাবে এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারেন, তাঁহাদিগের জীবন মার্থক হইবে ও দেশের কল্যাণ হইবে। * * * অধ্যাপনা কার্যের সাহায্যার্থে শ্রীঅধোরনাথ অধিকারী মহাশয় এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, আর গ্রন্থখানিও অতি সুন্দর হইয়াছে। শিক্ষকগণ ইহা পাঠে বিশেষ ভাবে উপকৃত হইবেন। যাহারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, আশা করি, তাঁহারা সকলেই এই গ্রন্থখানি ক্রয় করিয়া অধ্যয়ন করিবেন। এই গ্রন্থ একবার পড়িবার জন্ম নহে, পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিয়া ইহা আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে শিক্ষকগণের অদৃষ্ট জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় দক্ষতার সহিত লিপিত হইয়াছে। শিক্ষকের কি প্রকার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি হওয়া উচিত, কি প্রণালীতে সাহিত্য, ব্যাকরণ, রচনা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিতে হয়, কি প্রকারে পাঠনার নোট লিপিতে হয় ইত্যাদি বিবিধ বিষয় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৬)

—o—

II. সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরথিগণের অভিমত :—

(7) From SIR GURUDAS BANERJEE, Kt. M. A., D. L., *ex* Judge of the Calcutta High Court, late Vice-Chancellor of the Calcutta University &c. &c.

কল্যাণবরেষু—তোমার প্রদত্ত ‘বিদ্যালয় নিধায়ক বিবিধ বিধান’ নামক পুস্তকখানি মাদরে গ্রহণ করিলাম এবং পণ্যবাদের অধিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। এই

পুস্তকের কিয়দংশ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং প্রায় সমস্তই একপ্রকার দেখিয়াছি। উহাতে বিদ্যালয় ছালাইবার ও বালকবালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার সুপ্রণালী অতি সরল ভাষায় এবং বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। * * *। বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা প্রণালী বিষয়ক একুপ স্কন্দর গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় বোধ হয় আর নাই। ইহা বালকবালিকাদিগের শিক্ষক ও অভিভাবক মাত্রেই একবার পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। ইতি।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

(8) From BABU SARADA CHARAN MITTER, M. A. B. L, *ex-Judge of the Calcutta High Court, President of the Calcutta Sahitya Parisad, &c. &c.*

সঙ্গম নিবেদন—মহাশয়ের শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ বঙ্গভাষায়—মুকুটমিতে জলবিন্দুসম বোধ হইল। শিক্ষা বিষয়ে আর আমাদিগের অন্য গ্রন্থ নাই বলিলেই হয়। একুপ অভিনব গ্রন্থে কোন কোন বিষয়ের সম্যক পর্যালোচনা না থাকিলেও ইহা আমাদিগের বড়ই আদরের। আমাদিগের ধন্যবাদ গ্রহণ করিয়া বাধিত করুন। * * *।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

(9) From RAI BAHADUR KALI PRASANNA GHOSH VIDYASAGOR, C. I. E., *Founder of the Joydebpur Literary Society, Editor of the Bandhav &c. &c.*

শ্রীমান অঘোরনাথ অধিকারী কৃত ‘বিদ্যালয় বিধায়ক বিবিধ বিধান’ সাদরে পাঠ করিয়াছি। বঙ্গভাষাকে প্রকৃতপক্ষে সমৃদ্ধিশালী করিতে হইলে এইরূপ গ্রন্থেরই প্রয়োজন। নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থের অধিকাংশই লোপ হইয়া যায়। কিন্তু এই শ্রেণীর গ্রন্থ ভাষার স্থায়ী সম্পত্তি। বিশেষতঃ যে শিক্ষা জাতি সংগঠনের মূলস্বরূপ, সেই শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাহা বলাই বাহুল্য। এই পুস্তকের বিষয়নির্বাচন সুশৃঙ্খল, ভাষা সরল ও বিবৃতি সুখবোধ্য। এইরূপ নীরস বিষয় এমন সরস ভাষায় রচনা করিয়া অঘোরনাথ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যেক শিক্ষক ও অভিভাবক এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া লাভবান হইবেন—ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মহিলাগণও যে এই পুস্তক আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহাদিগের পরিদর্শন কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

(10) From Dr. RABINDRA NATH TAGORE, *the renowned poet :—*

বিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন—‘বিবিধ বিধান’ বইখানি উপহার প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। শিক্ষকদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি যে মূল্যবান হইয়াছে

তাহাতে সন্দেহ নাই। শিক্ষাপ্রণালী জড়যন্ত্রের মত একই পন্থা ধরিয়া এক প্রণালী-তেই চিরকাল চলিতে বাধ্য, ইহাই আমাদের দেশের অধ্যাপন-ব্যবসায়ীদের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে; তা ছাড়া, শিশুর মনকে তাঁহারা মন বলিয়াই গণ্য করিতে চান না। এই জন্য শিশুশিক্ষা কার্যে কোন প্রকার যোগ্যতা বা বিবেচনাশক্তির প্রয়োজন নাই মনে করিয়াই আমাদের দেশে শিক্ষকতার কাজ চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে যে কেবল সময় ও চেষ্টার ব্যর্থ ব্যয় হইতেছে তাহা নহে, ইহাতে বালকদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। আপনার এই গ্রন্থ পাঠে এ সম্বন্ধে যদি শিক্ষাব্যবসায়ীর মনে চিন্তার উদ্রেক করে তবে অনেক কাজ হইবে। ইংরাজী গ্রন্থ হইতে আপনি শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আমাদের দেশের বালকদের প্রতি তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধেও আপনার সৃষ্টিশীল অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ে একরূপ প্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ ইতিপূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর দেখি নাই।

ভবদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

III. বিস্তৃত বিদ্যালয়-পরিদর্শকগণের অভিমত :—

(11) From RAI, BAHADUR PRAMODA KUMAR BASU M. A.
Inspector of Schools, Surma Valley Division, Burdwan Division :—

অঘোর বাবু—আপনার পুস্তক যাহাতে নর্মাল স্কুলের পাঠ্য হয়, আমি সেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি। প্রত্যেক মধ্যশ্রেণী ও উচ্চপ্রাইমারী বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর নিমিত্ত আপ-
নার পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য ডেপুটী ইন্সপেক্টর মহাশয়গণকে উপদেশ দিয়াছি। যে সকল সব ইন্সপেক্টর ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাহাদিগকে আপনার পুস্তক পড়িতে বলিয়াছি। আমার বিশ্বাস ইংরাজী পুস্তক পড়িবার পূর্বে আপনার পুস্তক পড়িয়া লইলে তাহাদিগের সহজে বিষয়-বোধ জন্মিবে। অনেক ডেপুটী ইন্সপেক্টর ও হাইস্কুলের হেডমাষ্টার আপনার পুস্তক পড়িয়া লাভবান হইয়াছেন। তাহারা আমাকে নিজ মুখেই একথা বলিয়াছেন। এইরূপ একখানি বাঙ্গালা পুস্তকের অভাব ছিল, আপনার পুস্তকে সে অভাব পূরণ হইয়াছে। এই পুস্তকের দ্বারা যে নবীন শিক্ষক ও নবীন পরিদর্শকগণের বিশেষ উপকার হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

যশস্বদ শ্রীপ্রমোদাকুমার বসু।

(স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর)

(12) From MOULAVI ABDUL KARIM B. A., *Inspector of Schools, Dacca Division :—*

My dear Aghore Babu—Many thanks for kindly sending me a copy of your book 'Bibidha Bidhan'. I am sorry to say I have not yet had time to read it with the care that is due to it. But from the cursory glance I have taken of it I may say that it seems to be one of the best books of its kind I have seen. I think it is

much better than some of the books now in use. I shall read it with interest at leisure.

Yours sincerely
ABDUL KARIM,
(*Inspector of Schools.*)

(13) From BABU HARENDRA NARAYAN CHAKRAVARTY B. A.
Asst. Inspector of Schools, Chittagong Division :—

I have carefully gone through the book entitled "Bidyalaya Bidhayak Bibidha Bidhan" by Babu Aghore Nath Adhikari. As a comprehensive Manual in Bengali on the Art of Teaching, School management &c., it is the first of its kind. The style is admirably easy and well adapted for the purpose in view. I have no hesitation in saying that the book has supplied a real want. The illustration, Appendices & Chapter IX (on Miscellaneous subjects) have considerably added to its usefulness. The get-up is excellent and the price moderate. I hope that no vernacular teacher or student of our Training Schools will long be without a copy of the book which may well be appointed as a text book for all grades of Training Schools.

HARENDRA NATH CHAKRAVARTI
*Assistant Inspector of Schools,
Chittagong Division.*

(14) From BABU GOPAL CHANDRA SARKAR B. A., *Asst. Inspector of Schools, Rajshahi Division :—*

My dear Aghore Babu, I have now finished reading your book with the care and attention which it deserves. I am quite confident the merit of your book will be appreciated without any adventitious aid. It will prove of real value to Training School Students as a basis for instruction in methods as well as to those who intend to take to the work of teaching without going through regular course of professional training, and I dare say it will also benefit the conscientious workers even amongst experienced teachers who believe that there is always something to learn from the suggestions of others. You have admirably succeeded in the very difficult attempt to reduce teaching methods to condensed statements and present to young teachers definite directions of which they are always most in need. Though confining your attention strictly to the essentials of common School instruction, you have not omitted to dwell upon the general principles of education substantiating your own observations by apt and illustrative quotations from eminent thinkers and writers. This part of the book if carefully perused, will be of inestimable value to the

great body of teachers whether of Primary, Middle or High Schools, who cannot but be equally benefited by a study of the chapters in which you have given practical directions on the art of doing their work. The style is admirably suited to the subject and as far as I am able to see you have not overlooked a single detail which should find a place in a practical treatise on education. * * * *

Yours Sincerely
GOPAL CHANDRA SARKAR,
Asst. Inspector of Schools.

(15) From MOULAYI AZAD ALI. *District Deputy Inspector of Schools, Barisal* :—

My dear Adhikari,—* * * * Really I am charmed with your book—diction so simple, language so expressive, contents so comprehensive and the whole thing dealt with so masterly. It is unique of its kind in Bengali, well worth to be put in the hands of all teachers of Primary and Secondary Schools * * * *

Yours very Sincerely
AZAD ALI,
Deputy Inspector of Schools.

(16) From PANNALAL BANERJEE B. A., *Deputy Inspector of Schools, Howrah* :—

* * * * তুমি লিখিয়াছ যে তুমি আমার কথামতই বই লিখিয়াছ। সিজায়া করি, তাহাতে ক্ষতি হইয়াছে না লাভ হইয়াছে? বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকেই তোমার বই পড়িয়াছেন। সকলেই সুখ্যাতি করিয়াছেন। প্রত্যেক খবরের কাগজে তোমার বইএর প্রশংসা, শিক্ষক ও পরিদর্শকগণের মুখেও তোমার বইর কথা। আমি নিজে আর ছাত্রটি প্রশংসার কথা লিখিয়া তোমার পুস্তকের বেশী কি গৌরব বাড়াইব? * * * *। পুস্তকের যেসকল কাটুতি দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় এই বৎসরেই আবার ছাপাইতে হইবে।

তোমার স্নেহের ক্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়
(ডেঃ ইন্স্পেক্টর)।

(17) From BABU UPENDRA CHANDRA GUHA, B. A., *Sub-Inspector of Schools, South Sylhet* :—

* * * While appearing at the Departmental Examination I had the good fortune to go through the book in MS., and I must admit that this contributed not a little to my success at that examination. * * * I had previously read a large number of English books on the subject but the conflicting opinions and

scattered ideas were not properly assimilated until I had access to this MS. in mother tongue. * * *

UPENDRA CHANDRA GUHA,
Sub-Inspector of Schools.

(18) From MOULAVI ISRAB ALI, *Sub-Inspector of Schools, Silchar.*

* * * Is the only book of its kind in Bengali * * * useful companion to those who intend to make teaching their vocation in life. * * * My sincere advice to my brother officers going up for the Departmental Examination on the Art of Teaching, is the thorough perusal of this book which I consider to be more than enough to make one to pass any examination in that subject. * * * It not only contains the views of many eminent educationists but is a master piece in itself.

M. ISRAB ALI,
Sub-Inspector of Schools.

IV. অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণের মত :—

(19) From BABU HERAMBA CHANDRA MOITRA, M. A.,
Principal, City College, Calcutta.

কল্যাণবরেন্দ্র—* * * পুস্তকখানি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত লিখিত হইয়াছে—
ইহাতে সুখী হইলাম। এইরূপ গ্রন্থ রচনার তোমার উৎসাহ আশ্বাসের বিষয়।

আশীর্বাদক শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র গৈত্রয়।

(20) From BABU JOY GOPAL DEY B. A., *Professor of the Dacca Training College ;—*

Babu Aghornath Adhikari's 'Bibidha Bidhan' is completely up to date and one of the best books I have ever seen on the subject. It is an ideal book for teachers. I know the author most intimately—he is not a follower in the foot steps of others—he is a thinker and investigator and therefore it is no wonder that his book contains a good deal of original matter hitherto untouched by writers on the subject. The book is thoroughly reliable, firstly because it is not a translation, secondly because it is written to meet the requirements of our Indian teachers and thirdly because it is the product of much thought, nice discrimination and life-long experience of a successful teacher. It is most satisfactory in its well-thought of plan, wise and informing in its new matter and meritorious in its execution, style, method and get-up.

JOY GOPAL DEY,
Prof. Training College, Dacca.

(21) From BABU BISWESVAR SEN M. A., *Superintendent, Rangpur Normal School* :—

Your book is best of its kind—decided improvement upon existing ones (in a telegram).

BISWESVAR SEN.

(22) From BABU CHINTA HARAN CHAKRAVARTY B. A., *Superintendent, Chittagong Normal School*.

Your book supplies real want of Normal School text on method (in a telegram).

CHINTAHARAN CHAKRAVARTY.

(23) From BABU RAJKUMAR DASS M. A., *Head-master, Dacca Collegiate School*.

My dear Aghor, I am exceedingly pleased to go through your Bengali work on School management and method of teaching. I have no hesitation in saying that yours is not only the most comprehensive book of its kind yet published in Bengali, but embodies all up-to date information and improvement in educational methods. I am also pleased to find that you have not slavishly followed the English and American authors who have written much on the subject, though their methods have been largely adopted. The introductory Chapter on the Teacher and his qualification is a most delightful reading and it is very happy that the Hindu ideal has been set forth side by side with the western ideal and also the harmony of the two.

The subjects have been dealt exhaustively and in a clear and vigorous style. Your first attempt at bringing out a book of this description may be said to be a complete success. This Manual would, I am sure, be interesting and profitable to all teachers of our secondary schools, English as well as Vernacular.

Yours very sincerely,

RAJ KUMAR DAS,

Head master, Collegiate School, Dacca.

(24) From BABU ABHOYA CHARAN DAS, M. A., *Head master, Practising High School attached to the Dacca Training College* :—

শ্রীযুত অঘোরনাথ অধিকারী মহাশয়ের 'বিবিধ বিধান' নামক শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক পুস্তক আনন্দের সহিত অনেকবার পাঠ করিয়াছি। এই পুস্তক পড়িয়া আমি বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি। আমার টেনিলের উপর এই পুস্তকখানি সর্বদাই আছে—যখনই অম

কোন কাজ না থাকে, ইহা হইতে কিছু কিছু পাঠ করি। এতোক শিক্ষকের পক্ষে ইহা ভালরূপে পাঠ করা কর্তব্য মনে করি। ইংরাজি ১০।১২ খানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে লাভ হয়, এই এক গ্রন্থ পাঠেই তাহার সমান ফল পাওয়া যায়। নর্মাল ও ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রগণের পক্ষে এই গ্রন্থ অবশ্য পঠিতব্য। ট্রেনিং কলেজের ছাত্রগণ ইংরাজী পুস্তকখানি পাঠ করিবার পূর্বে এই পুস্তক একবার পাঠ করিয়া লইলে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন। অথোর বাবুর বহুদর্শন ও অভিজ্ঞতার ফলে পুস্তকখানি সর্বদাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। * * এই পুস্তক অভিধানের মত এতোক শিক্ষকের মতত সঙ্গী হওয়া কর্তব্য।

শ্রীমদয়াচরণ দাস এম, এ
হেড্ মাষ্টার প্রাক্টিসিং হাই স্কুল,
ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।

(25) From PANDIT TARINI KANTA VIDYANIDHI, *Head Pandit, Pabna Zila School.*

* * * কোন কোন পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হইল। সাহিত্য শিক্ষা দানের প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন—কোন ইংরাজী পুস্তকে এরূপ বিধান দেখি নাই। কোন কোন পরিচ্ছেদে নূতন নূতন অনুচ্ছেদ আছে। ভূগোল শিক্ষাদানের ধারাবাহিক প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন অনুচ্ছেদ। কোন ইংরাজী পুস্তকে নাই। কোন কোন চিত্রের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নূতন যেমন গৃহ ও বিদ্যালয়ে পাঠের পবিমাণ নির্দেশক চিত্র। এইরূপ যথেষ্ট নূতন জিনিষ আছে। * * *। এই শ্রেণীর পুস্তক লিখিতে বসিয়া অনেকেরই অনুবাদ করিয়া কাজ শেষ করেন। কাজেই সে পুস্তক আবাদিগের দেশের উপযোগী হয় না। আবার যাহারা লেখেন তাহারাও হয়ত নিজের সকল বিষয় জানেন না। কাজেই পুস্তক সর্বদাঙ্গসুন্দর হয় না। তুমি নিজে অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া নানা স্থানের শিক্ষা প্রণালী পর্যবেক্ষণ করিয়াছ। শিক্ষা বিভাগে বহুদিন কার্য করিতেছ। বিদ্যালয় পাঠ্য সকল বিষয়েই তোমার পাণ্ডিত্য আছে, ব্যায়াম, চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতবিদ্যাও তোমার নিকট বাদ যায় নাই। সুতরাং তোমার পুস্তক যে উত্তম হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আশীর্বাদ করি এই পুস্তকে তোমার ধন মান উভয়ই লাভ হউক।

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।
হেড্ পণ্ডিত, মেলানাস্কুল, পাবনা।

(26) *From an old experienced Head Pandit of a middle School who prefers to remain unknown :—*

মহাশয়, উপরওয়ালার পরিদর্শক কর্মচারীগণের যত্নগায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম। নোট লেখ না কেন, কিওয়ারগার্ডেন পদ্ধতিতে পড়াও না কেন, পদার্থ পরিচয়ের পাঠ দেও না কেন, ভঙ্গী সঙ্গীত শিখাও না কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। মহাশয়, আমি ইংরাজী জানি না, আর যাহারা একজন তাহারাও শিখাইয়া দেন না। চাকর

রাখা দায় হইয়া উঠিল, এমন সময় হা—র ডে ইন্স্পেক্টার পা—বারু আপনার পুস্তকের নাম করেন। ভট্টাচার্য্য কোম্পানীর দোকান হইতে সেইদিনই আপনার পুস্তক, কিনিয়া আনি। এখন সব বুঝিয়াছি। আপনার পুস্তকে অনেকের চোক ফুটিয়াছে ; এখন চাকরী থাকিলে বলিয়া মনে হয়। আপনার মজল হউক। অনুগ্রহ করিয়া নাম প্রকাশ করিবেন না, তাহ'লে চাকরী থাকিবে না। * * *।

হেড পণ্ডিত।

(27) From MISS E. M. LLOYD B. & A., *member of the Female Education Commission, E. B. A. Lady Superintendent, Silchar, Mission Girls High School.*

Dear Superintendent, Your manual of teaching is most comprehensive and contains a wealth of details which will be of great help to teachers. 'There' seem to be nothing connected with School work which you have not touched upon, and I think your book would be an invaluable guide. Your model lessons and your notes of lessons are helpful. * * * I see you emphasise action songs in the Kindergarten class and you give example of Bengali music. I have often wished to teach Bengali tunes to my girls. Could you help me in any way? For instance, could these tunes be written down in tonic solfa; * * * I would recommend your book as a very helpful guide to all teachers engaged in Bengali work.

Yours sincerely

E. M. LLOYD.

(28) From MISS MOTIA. L. T., *Teacher, Girl's School, Damo, Central Provinces* :—

বাল্যকালে আমি ভাল লিখিতে কিসা বলিতে পারি না। কিন্তু ঐ ভাষায় যে কোন সহজ পুস্তক পড়িতে ও বুঝিতে সক্ষম হই। আপনার প্রস্তুত পুস্তক পড়িয়া এত শিক্ষা করিয়াছি, যাহা দীর্ঘ দুই বৎসর কাল ট্রেনিং বিদ্যালয়ে শিখিতে সুবিধা পাই নাই। বাল্যলী মহিলাগণ আপনার পুস্তক পাঠ করিবার অধিকার পাইয়া লাভবান হইবেন, ইহাতে আমার হিংসা হইতেছে। আপনার পুস্তক হিন্দি ভাষায় তরজমা করণের প্রস্তাব চিন্তা করিবেন। ইতি—

আপনার কৃতজ্ঞতাপূর্ণা শ্রীমতিয়া।

V. সুবিজ্ঞ অভিভাবকগণের মত :—

(29) From RAI SARADA PRASAD SEN BAHADUR *Additional District Judge, Comilla* :—

It is an excellent hand-book for those with whom rests the education of young boys and girls. It defines in a brief, though forcible manner, the duties and responsibilities of the teacher,

and lays down ways and means by which children should be intellectually, morally and physically trained. The plan of the book is pretty comprehensive. In the first part (Sadharan Bidhan) the author goes on to treat of some of the general aspects of education, laying down, with much accumen the chief principles of securing good management, moral discipline and sound intellectual training. The second part (Bisesh Bidhan) deals with the various departments of elementary study—general and technical. Those on Kindergarten, art and science being specially important in these days, when the aim of education seems to be more practical than theoretical. I am glad to say, the author has handled them with great care and skill. * * * The book has been written in a simple style and contains more interesting illustrations. I have no doubt it will be a very useful guide not only to teachers but also guardians of young children.

SARADA PRASAD SEN.

(30) From RAI HARI CHARAN DAS BAHADUR, B. L.; Govt. Pleader, Law Lecturer &c., Silchar.

বিলাতে বালকবালিকারা বোর্ডিং স্কুলে (Boarding School) পাঠ করে সুভদ্রাঃ স্থানে অভিভাবকগণের দায়িত্ব কিছু কম। কিন্তু তথাপি প্রত্যেক অভিভাবক শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কিত ২১২ খানি পুস্তক পড়িয়া থাকেন। আমাদের দেশে প্রায় সমস্তই ডে স্কুল (Day School) ; অভিভাবকের দায়িত্ব এখানে যোল আনা। কিন্তু পরিভ্রমণের বিষয় আমাদের অভিভাবকগণ শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এমন কি অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক নিজ পুত্র-কন্যা কোন্ শ্রেণীতে পাঠ করে তাহারও ধরন রাখেন না। বিলাতের মাতা পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য সর্বদা ব্যস্ত, আর আমাদের মাতা সর্বদা উদাসীন। মহিলাদিগের পক্ষে বাঙ্গালা পুস্তকের অভাবও একটা অন্তরায় ছিল বটে কিন্তু তেমন আগ্রহ দেখিতে পাইলে এতদিন শিক্ষাপ্রণালী বদলক অনেক পুস্তকও প্রকাশিত হইত। কাহা হউক বাঙ্গালা পুস্তকের অভাব দূরিত। আশা করি যাঁহাদিগের পুত্র কন্যা আছে, যাঁহাদিগের ভ্রাতা ভগিনী আছে, যার যাঁহারা দেশের দশজনকে শিক্ষিত করিতে চাহেন, তাঁহারা সকলেই অঘোর গাবুর পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষরূপে লাভবান হইবেন। পুস্তকের ভাষা সরল ও বিষয়-বিস্তৃতি সহজ-বোধ্য, কাজেই সকল শ্রেণীর পাঠকেই অনায়াসে পাঠ করিতে পারিবেন। * * * শান্তিদান বিষয়ে কতকগুলি নজির সংগ্রহ করিয়া অবোক্ত গাবু উকিলদিগেরও কিছু সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীহরিচন্দ্র

(31) From KUMAR BHABENDRA NARAYAN
L. R. C. S (Edin.) L. F. R. & S. (Glas)

অর্থনীতি, প্রভৃতি

সমস্ত নূতন পদ্ধতির খবর রাখিতে পারেন কিন্তু অভিভাবকগণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। পুত্রকন্যার শিক্ষাদান যখন আমাদের গুরুতর কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন, প্রত্যেক অভিভাবককে এই সমস্ত নূতন পদ্ধতির খবর রাখিতে হইবে। বাঁহারা উপশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহারাও যদি নিজে শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মাদি না জানেন, তবে উপশিক্ষকের কার্যের গুণাগুণ বিচার করিতে পারিবেন না। বহু ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া নব নব শিক্ষাপ্রণালীর বিষয় অবগত হওয়ার সময় ও সুযোগ অনেক অভিভাবকের নাই সত্য। আবার বিদেশীয় প্রণালী কিরূপে আমাদের দেশে প্রচলিত করিতে হইবে তাহাও সকলের বুঝিয়া উঠা কঠিন। এই জন্য অনেক দিন হইতে অভিভাবকগণ একুশানি বাফালা পুস্তকের অভাব অনুভব করিয়া আসিতে ছিলেন। অথোর বাবুর পুস্তকে এই অভাব দূর হইয়াছে। বিদেশীয় প্রণালীসমূহ উত্তমরূপে সংকলন করিয়া, আমাদের পুত্রকন্যার শিক্ষার নিমিত্ত তাহার কিরূপ প্রয়োগ আবশ্যিক, অথোর বাবু তাহা পরিকার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। সাহিত্য-গণিতাদি বিদ্যালয় পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষাদানের রীতি ত আছেই, ইহা ছাড়া স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক মন্তব্যগুলিও উত্তম হইয়াছে। বিদ্যালয়ের আসনের দোষে যে বালকগণের মেরুদণ্ড বক্র হইয়া পড়িয়াছে, আলোকের সুবন্দোবস্তের অভাবে যে বালকগণের দৃষ্টি-শক্তির বিকার ঘটে, উহা অথোর বাবু দেখাইয়া দিয়াছেন। এক শ্রেণীতে পাঠ করে বলিয়া সবল দুর্বল সকল বালককে এক সময়ে এক রকমের ব্যায়ামচর্চা করিতে হয়—ইহাতে যে ইষ্ট না হইয়া বিশেষ অনিষ্ট হয়, অথোর বাবু তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন; বিদ্যালয় গৃহ ও ছাত্রাবাসের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত নিয়মগুলি উত্তম হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা খুব সরল, ব্যাখ্যা খুব সুখবোধ্য। কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না। এই পুস্তক পাঠে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের উপকার হইবেই, প্রত্যেক পিতা ও প্রত্যেক মাতাও এই পুস্তক পাঠে বিশেষরূপে উপকৃত হইবেন। এই শ্রেণীর পুস্তক প্রচারের উপরই শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

শ্রীভবেন্দ্র নারায়ণ।

(32) From BABU DINA NATH DAS, B. A. *Personal Assistant Commissioner, Surma Valley and Hill Districts.*

শ্রদ্ধাস্পদেষু—আপনার 'বিদ্যালয় বিধায়ক বিবিধ বিধান, পাঠ করিয়া বহু বিষয়ে নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছি। • প্রত্যেক শিক্ষক ও অভিভাবকের এই পুস্তকখানি পাঠ করা কর্তব্য। • গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নূতন প্রণালীতে শিক্ষাদান-পদ্ধতি এতদেশীয় শিক্ষকগণ সম্যকরূপে অবগত নহেন। অভিভাবকগণ ততোধিক অনভিজ্ঞ। আপনার পুস্তকখানি পাঠ করিলে পুত্রকন্যা ও ছাত্র-ছাত্রীগণকে কিরূপে গঠন করিয়া তুলিতে হয় তাহা বিশেষরূপে জানা যাইবে। • আশা করি আপনার গ্রন্থ প্রতি গৃহে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় রক্ষিত ও পঠিত হইবে।

